ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

দ্বাদশ ভাগ—দ্বাদশ বর্ষ।

(১৩১০ সালের শ্রাবণ হইতে ১৩১১ সালের আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত দ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ।)

কলিকাতা—হাটখোলা দত্তবাটী, ৩৯ নং মাণিকবসুর ঘাট ষ্ট্রীট,
"জন্মভূমি" কার্য্যালয় হইতে
সত্ত্বাধিকারী শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত
ব্রাদার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA:
PRINTED BY NILMONEY DHUR. AT THE
Bani Press.
No, 63 Nimtola Ghat Street.
1904.

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।] [ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

সূচীপত্র।

১।	অমরতা (পদ্য)	...	৫৩
২।	অনাদৃত (পদ্য)	... দেবকুমার রায় চৌধুরী	৫৪
৩।	অর্থোপার্জ্জন	... ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া	৩০১
৪।	আশা প্রসূন (পদ্য)	... শ্রীঃ——	৩৮
৫।	আর আমার আশা কি !	...	৮২
৬।	আশ্বিন মাস	...	১০৮
৭।	আগমনী (পদ্য)	...	১০৯
৮।	আয় বাজিয়ে মন (পদ্য)	... কালিপদ মুখোপাধ্যায় বি,এ	২৪৫
৯।	আসিও না আর (পদ্য)	... প্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০৭
১০।	আকবরের পূজা	... দেবেন্দ্রনাথ মাহান্ত	৪২১
১১।	এই কিরে সেই বৃন্দাবন (পদ্য)	... কালিপদ মুখোপাধ্যায় বি,এ	২৭
১২।	এসনা	...	৭৭
১৩।	ঐ আঁখি পানে (পদ্য)	... চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৯
১৪।	কবিবর হেমচন্দ্র	...	২১
১৫।	কমলিনী	...	৮৬
১৬।	কপাল-কুণ্ডলা	...	১৭৯
১৭।	গ্রন্থকারের খেতাব	...	১৯৯
১৮।	জন্মভূমির বর্ষবৃদ্ধি	...	১
১৯।	জন্মভূমির জন্মোৎসব	... দেবব্রত কবিরত্ন	৩৯
২০।	জাতীয় মহাসমিতি	...	১৯৩
২১।	জীবনী-শক্তি	... ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি	৩১৩
২২।	জীবন সঙ্গীত	... পূর্ণচন্দ্র দাস	৩১৮
২৩।	জাগায়ো না (পদ্য)	... শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৩৯১
২৪।	জন্মতিথি (পদ্য)	... ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া	৪২৫
২৫।	ডুবে মরাই ভাল	...	২০১
২৬।	তারা (গল্প)	... যতীন্দ্রনাথ দত্ত	১৮১
২৭।	তড়িৎপ্রবাহ ও চুম্বক আকর্ষণ	... উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪১
২৮।	তিনি কে (পদ্য)	... অমরনাথ বসু বিদ্যাবিনোদ	৪০৮
২৯।	তরঙ্গিণী	... ফণিভূষণ মিত্র	৪৬১
৩০।	থেকনাক দূরে (পদ্য)	... সুরেন্দ্রনাথ দাস	৪২৭
৩১।	দুই বিন্দু অশ্রু (গল্প)	... সুরেন্দ্রনাথ পাল	৫০
৩২।	ধুতুরার ফুল (পদ্য)	... দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী	৫২
৩৩।	নব বর্ষের শারদীয় দুর্গোৎসব	...	৮৪
৩৪।	নির্জ্জনে (পদ্য)	... ললিতমোহন রায়	৪২৬
৩৫।	পরম কল্যাণ গীতা	...	৭২, ১৩৫, ২৩৩, ২৭৫, ৩৮৬
৩৬।	প্রতিহিংসা (গল্প)	...	৬২, ১৩৮
৩৭।	পূর্ব্বজন্মের ঋণ পরিশোধ	...	১৬১, ২৩৮
৩৮।	প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী	... রজনীকান্ত বসু	৩১৯
৩৯।	প্রাপ্তি স্বীকার	...	৪২৮

৪১। বঙ্গে দুর্গোৎসব ... মধুসূদন চক্রবর্ত্তী

৪২। বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ... জলধর সেন

৪৩। বিসর্জ্জন ... ১

৪৪। বিজয়া (পদ্য) ... লিপদ মুখোপাধ্যায় বি,এ ১

৪৫। বঙ্গসাহিত্যে—বিদ্যাসাগর ... য ন্দ্রনাথ দত্ত ১৬৫, ২

৪৬। বীণা (পদ্য) ... দেব ত কবিরত্ন ১

৪৭। বুড়ীর ঘর ... ব্রজসু সান্যাল ১

৪৮। বিপিনবাসিনী (উপন্যাস) ... ৪৯, ২৮১, ৩২১, ৩৭

৪৯। বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা ... মধুসূদন চ র্ত্তী ২৬

৫০। বসন্তরোগ নিবারণ ... কবিরাজ ঈশ চন্দ্র বিশারদ ৩০

৫১। বঙ্গসাহিত্যে—হেমচন্দ্র ... যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৩৫৩

৫২। বালবিধবা (গল্প) ... গোপালচরণ স্মৃতিভূষণ ৩৯৯,৪

৫৩। ব্রহ্মচর্য্য ... ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি, ৪২

৫৪। ভক্তের মা (গল্প) ... ১১

৫৫। ভট্টাচার্য্যের ভাবনা ... ৯

৫৬। ভ্যাবা গঙ্গারাম ... ১১৩

৫৭। ভোরের বেলা (পদ্য) ... শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১৮৬

৫৮। ভুল (পদ্য) ... শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৩৯২

৫৯। মানবের ভবিষ্যৎ ... ভবানীচরণ শাস্ত্রী ৪১

৬০। মৃত্যুর পর ... আশুতোষ দেব এম্,এ ১৫৭

৬১। মিত্র সভা ... মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ১৭৫

৬২। মাতুল সহ শিশুর উদ্যান ভ্রমণ ... ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া ২২৭

৬৩। মৎস্য-পূজা ... ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ৩৯৩

৬৪। লোহিত আলোকে বসন্তচিকিৎসা... হেমচন্দ্র সেন এম্,ডি ৩৮৫

৬৫। শ্রীশ্রীধর্ম্ম ... ২২৯

৬৬। শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৫৬

৬৭। শ্রীশ্রীদুর্গা ... ১১১

৬৮। শিবাখ্যা কিঙ্কর কাব্য ... দেবেন্দ্রনাথ চট্টো ১৪৯, ৩৯০,৪২৩

৬৯। শুক্রধারণ বা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা...ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি ২৭৩

৭০। শ্রীযুক্ত জষ্টিস গুরুদাস বন্দ্যো ... ২৯৭

৭১। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ... অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ৩০৯

৭২। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ ... ৩৩৭

৭৩। ষড়ঋতু বর্ণন (পদ্য) ... ঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া ৫৫

৭৪। সমালোচনা ... ৭৬,১৫৬,১৯১,২৩১,৩০৯,৩৫১,৪২৭

৭৫। সৃষ্টিতত্ত্ব ... আশুতোষ দেব এম্,এ ৩

৭৬। সরস্বতী স্তোত্রম্ ... পূর্ণচন্দ্র দে, বি,এ ২৪২, ৩৯৭

৭৭। সরস্বতী ও লক্ষ্মী ... ২৬৫

৭৮। সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদ (সমালোচন) ... মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ২৬৮

৭৯। সরোবর তীরে (পদ্য) ... বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি,এ ৩৪৭

বশিষ্ঠদেব বলিয়াছে বৎসরে
করিবে না। তাহার
ভেদে উপদেশ দিয়াছি
উদ্দেশ্য এক, তরথ
লক্ষ্য করিয়া, প্রার্থ
আত্মতত্ত্বে উ এবং
হইয়াছে, এ উ
দুইটী
করিতে পা

ধর্ম্ম ও সমাজের মুখপত্র

জন্মভূমি।

(মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

দ্বাদশ বর্ষ। } শ্রাবণ, ১৩১০ সাল। { ১ম সংখ্যা।

জন্মভূমির বর্ষবৃদ্ধি।

"জন্মভূমি"র বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ অতীত হইল; এই শ্রাবণ মাসে "জন্মভূমি" দ্বাদশ বর্ষে উপনীতা। গত তিন বৎসরকাল "জন্মভূমি" আমাদের ক্রোড়ে আসিয়াছেন। "জন্মভূমি" আমাদের ক্রোড়ে আসিয়াছেন, কিংবা আমরাই এই তিন বৎসরকাল "জন্মভূমি"র ক্রোড়ে রহিয়াছি, পণ্ডিত মহাশয়েরা মনে মনে ইহা বিচার করিয়া লইবেন।

জন্মভূমির বয়ঃক্রম কত, অভ্রান্তে তাহা নিরূপণ করা যায় না। জন্মভূমির ক্রোড়ে কোটি কোটি প্রাণী বাস করিতেছে, কোটি কোটি তরু-লতা—জন্মভূমির উদ্যান ও কাননগুলি সুশোভিত করিতেছে, দীর্ঘ দীর্ঘ পর্ব্বত-মালা বিশাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, জন্মভূমির বক্ষে উঠিয়া, গগনের উচ্চতার পরিমাণ স্থির করিবার অভিলাষে শৃঙ্গশোভিত ঊর্দ্ধ মস্তকে শনৈঃ শনৈঃ শূন্যমার্গে উঠিতেছে; সাগর, মহাসাগর, হ্রদ, নদ, নদী প্রভৃতি জন্মভূমির বক্ষে প্রবাহিত হইয়া, জগৎ সংসারের অশেষ মঙ্গলসাধন করিতেছে; আমরা জানি না, এমন কত শত অদ্ভুত ব্যাপার জন্মভূমির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এত বড় জন্মভূমির কথা লইয়া আলোচনা করা মনুষ্যের সাধ্য নহে।

তবে আমরা কি বলিতেছি! জন্মভূমি অনন্তপ্রায়। জন্মভূমি অতি বড়। জনকতক মনুষ্য তাহার একটা পরিমাণ স্থির করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেও

জন্মভূমি অনন্তপ্রায়। অনন্ত জন্মভূমির বিচিত্র বিষ
আলোচ্য নহে, যে "জন্মভূমি"র বয়ঃক্রম আজ
সেই "জন্মভূমি"র অবস্থার কথাই আমরা বলিতেছি। বি,এ
জানেন, "জন্মভূমি" একখানি মাসিক-পত্রিকা।

আমরা জন্মভূমির অঙ্কে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, সাধ্যমত
সেবা করিলাম। সেবা করিয়া কতদূর কৃতকার্য্য হইলাম,
মহাশয়েরা তদ্বিষয়ের বিচারকর্ত্তা।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় "জন্মভূমি" আজ দ্বাদশ বর্ষে
লেন; আমাদের সেবা-যত্নের চতুর্থ বর্ষ আরব্ধ হইল। জগৎপিতার
সর্ব্বজীবের ন্যায় "জন্মভূমি"র জীবন। এই জীবন নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার
অভিলাষে, আমরা "জন্মভূমি"র সেবা করিতেছি। কতিপয় বিদ্যানুরাগী
সারবান্ প্রবীণ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-বন্ধু "জন্মভূমি"র সেবায় অনুকূলপক্ষে
আমাদিগের যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন, পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমরা
তাঁহাদিগের নিকটে অন্তরের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। যিনি সর্ব্ব-
মঙ্গলের নিদান, সেই মঙ্গলময় মহাপুরুষ আমাদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ
করুন, যে সকল সাহিত্য-বন্ধু আমাদের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা
আমাদের প্রতি সমান অনুগ্রহ রাখিয়া, "জন্মভূমি"র অঙ্গসংস্কারে সমান
যত্ন অব্যাহত রাখুন। আমরা আশা করিতেছি, চতুর্থ বর্ষে "জন্মভূমি"কে
সর্ব্বশ্রেণীর, সর্ব্ব সমাজের আদরের পাত্র করিতে পারিব।

মূলে আমাদের আর্য্যধর্ম্মের সুদৃঢ় পর্ব্বত স্থাপন করিয়া, জন্মভূমির
নিয়মিত কার্য্য সম্পাদন করা হইতেছে; যে কোন ভাবের, যে কোন প্রকৃ-
তির, যে কোন বিষয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, "জন্মভূমি"র গর্ভস্থ প্রবন্ধগুলি
প্রণীত অথবা বিরচিত হউক না কেন, কোন প্রকার প্রবন্ধেই সনাতন
হিন্দুধর্ম্মের শাসন-বাক্য লঙ্ঘন করা হয় না; যাঁহারা যত্নপূর্ব্বক "জন্মভূমি"
পাঠ করেন, তাঁহারা আমাদের এই বাক্যের সার্থকতা দেখিতে পান।
এই গৌরব আছে বলিয়াই আর্য্যসমাজে "জন্মভূমি"র অধিক আদর। যাহাতে
এই অবলম্বিত পদ্ধতির বিচ্যুতি না ঘটে, যাহাতে "জন্মভূমি"র আদর দিন
দিন আরও অধিক বৃদ্ধি হয়, তৎপক্ষে আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিব, ইহাই
আমাদের উত্তম। ছিলই ত উত্তম, আছেই ত উত্তম, তথাপি আজ এই
নূতন বৎসরে আজ আবার নূতন উত্তম।

বৎসরের আরম্ভ। "জন্মভূমি"র বর্ষারম্ভ শ্রাবণ মাসে।
বশিষ্ঠদেব
মার একাদশ মাস যাহাতে আমরা কুশলে থাকিয়া, জন্ম-
করিবে
রাখিয়া, "জন্মভূমি"র বন্ধুগণের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া, কার্য্য-
ভেদে
রথ হইতে পারি, তদুদ্দেশে ভক্তিভাবে করপুটে পরম পিতার
উদ্দে
প্রার্থনা করিতেছি। আমাদের অনুগ্রাহক, গ্রাহক, পাঠক,
লক্ষ
এবং বন্ধুগণ "জন্মভূমি"র শ্রীবৃদ্ধিকল্পে এই নূতন বৎসরটি সমভাবে
ক উৎসাহিত করুন, বর্ষারম্ভে ইহাই আমাদের সানুনয় নিবেদন।

সৃষ্টিতত্ত্ব।

মনুষ্যের উত্তরোত্তর যত জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে, তত সে আত্মানুসন্ধান করিতে ব্যগ্র হয়। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, এই জগতই বা কি, ইত্যাদি প্রকার চিন্তা স্বতঃ তাহার মনে উদয় হইতে থাকে। এই সকল প্রশ্ন সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্গত। বিষয়টী জটিল হইলেও, পূর্ব্বাচার্য্যগণ এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই উল্লিখিত হইতেছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দর্শনের সহিত পুরাণের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও, মোটের উপর উভয়েরই এক মত। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, এক পরব্রহ্মই সত্য, তাহা ভিন্ন সকলই অসত্য, অর্থাৎ মিথ্যা। উপনিষৎ এবং পুরাণ উভয়ই এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সৃষ্টি যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহা শ্রুতিতে কীর্ত্তন করা হইল কেন? ইহার উত্তরে মনীষিগণ বলেন যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদনের জন্য শ্রুতিতে মিথ্যা সৃষ্টির কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জগৎ সত্য হইলে, ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব হইতে পারে না, এইজন্য সৃষ্টি মিথ্যা প্রতিপাদনের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না হইবে, ততক্ষণ জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে না। সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে এবং জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সৃষ্টিতত্ত্বের পর্য্যালোচনার দ্বারা জীব স্থূল হইতে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বে উপনীত হয়।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে দর্শন, পুরাণ প্রভৃতির মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয় কেন? ইহার উত্তরে পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন

যে, "মনুষ্যের এককালে পরম সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বে প্রবেশ সা
জন্য "অধিকারিবিভেদেন শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ।" অর্থা
বিভিন্ন শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। অধিকারিভেদে বিভিন্ন দর্শনও
বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন যে,—

"ন্যায়বৈশেষিকাভ্যাং হি সুখিদুঃখ্যাদ্যনুবাদতো দেহাদিমা
প্রথমভূমিকায়া অনুমাপিতঃ। একদা পরম সূক্ষ্মে প্রবেশাসম্ভবাৎ

আত্মার সুখিত্ব দুঃখিত্বাদি খণ্ডন না করিয়া, লোকসিদ্ধ
অনুবাদ পূর্ব্বক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কেবল দেহাদি হইতে
আত্মার অনুমান করা হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয় হ
এইমাত্র বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন,
য়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহাদি
নহে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মা
জ্ঞান-সুখাদির আশ্রয়। আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা। আত্মা দেহাদি ভিন্ন ইহা
বুঝিতে পারিলে, বোদ্ধা কিয়ৎ পরিমাণে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অবগত হন। ইহা
আত্মতত্ত্ব অবগতির প্রথম-ভূমি বা অবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, সাংখ্য
ও পাতঞ্জল আচার্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত
এবং দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ও ভোক্তা বটে। পরন্তু আত্মা কর্ত্তা নহে,
আত্মা জ্ঞান-সুখাদির আশ্রয় নহে, আত্মা নিত্য জ্ঞানস্বরূপ। ইহাই দ্বিতীয়
ভূমি। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে বেদান্ত বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহ-
ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নহে, আত্মা এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা ভোক্তা নহে, আত্মা
ভোগসাক্ষী, ইত্যাদি। যাহারা বিষয়ী, ভোগী, স্থূলদর্শী এবং সংসারাসক্ত
তাহারা সূক্ষ্ম আত্মজ্ঞান অবধারণ করিতে পারিবে না বলিয়াই, তাহাদিগকে
একেবারে অদ্বৈতজ্ঞান প্রদান করা হয় না। এইজন্য বিভিন্ন দর্শনের ও
শাস্ত্রের সৃষ্টি। শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

আত্মা নিষ্প্রপঞ্চং ব্রহ্মৈব। তথাপি কর্ম্মসঙ্গিনে ন তথা বাচ্যম্। ন বুদ্ধি-
ভেদং জনয়েদ জ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।"

অর্থাৎ, নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মই আত্মা। তথাপি যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই
অর্থাৎ বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয় নাই, তাহাদিগকে আত্মা নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম
বলিবে না। কারণ, যাহারা অজ্ঞ অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব অবগত নহে, তাহাদিগের
বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না,—ইহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। এই জন্য

বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন যে, অজ্ঞ কিম্বা অর্দ্ধ প্রবুদ্ধকে সূক্ষ্ম ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিবে না। তাহাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে বলিয়া ঋষিরা অধিকারি-ভেদে উপদেশ দিয়াছেন। নানা মুনির নানা মত হইলেও যে সকলের উদ্দেশ্য এক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঋষিরা লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সোপানারোহণের রীতিতে পাঠকদিগকে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতত্ত্বে উপনীত করিয়াছেন। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের বিবর্ত্তন কি প্রকার হইয়াছে, এইবার তাহার আলোচনা করা যাউক।

দুইটী বিভিন্ন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়া, আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে পারি। প্রথম হইতেছে, বৈদিক বা পৌরাণিক ভিত্তি এবং দ্বিতীয় হইতেছে, দার্শনিক ভিত্তি। বৈদিক ও পৌরাণিক সৃষ্টি মনুষ্যজীবনের পূর্ব্ব-কার ঘটনাসমূহ মীমাংসিত করিয়া থাকে। পদার্থ সকল কিরূপে উৎপন্ন হইল এবং কিরূপে বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, তাহাদিগের উৎপন্ন করি-বার অথবা বর্ত্তমান আকার প্রদান করিবার হেতু বা অভিপ্রায় কি,—এই সকল কথার আন্দোলন বা মীমাংসার নাম বৈদিক বা পৌরাণিক সৃষ্টি। বিষয়টী মনুষ্যবুদ্ধির অতীত হইলেও, শ্রুতি ইহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পরে বর্ণিত হইবে। কিন্তু দার্শনিক সৃষ্টি অন্য প্রকার; আমরা ইত-স্ততঃ যে সকল পদার্থকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করিতেছি, সেই সকল পদার্থ কি প্রকারে এবং কিরূপ পর্য্যায় আমাদের বোধ বা জ্ঞান হইতে ক্রমশঃ আবির্ভূত বা অভিব্যক্ত হয়; কিরূপে আমাদেরই জ্ঞান বাহ্যপদার্থ বা স্থূলীভূত হইয়া থাকে, তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। এই সৃষ্টি অহরহ প্রত্যেক নরনারীর দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে। প্রত্যেক মনুষ্যের সৃষ্টিক্রিয়া তাহার জীবনের সহিত আরম্ভ হয় এবং তাহার মৃত্যুর সহিত শেষ হয়। মনুষ্য-জীবনের পূর্ব্বের কোন ঘটনার সহিত এই সৃষ্টি ব্যাপারের কোনও সম্পর্ক নাই। দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব মনোবিজ্ঞানের অন্তর্গত, আমরা ইহার আলোচনায় ক্ষান্ত রহিলাম।

সৃষ্টি দুই প্রকার, কারণ সৃষ্টি ও কার্য্য সৃষ্টি। জীবসৃষ্টির নাম কার্য্য সৃষ্টি এবং জীবের উপাদান সৃষ্টির নাম কারণ সৃষ্টি। প্রতি কল্পে এই দুই প্রকার সৃষ্টি হইয়া থাকে। আদি সৃষ্টির কথা শ্রুতিতে নাই এবং উহার মতে আদি সৃষ্টি নাই। সৃষ্টির প্রবাহ অনাদি। এখন দেখা যাউক, জগতের উপাদান কয় প্রকার।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে পদার্থ সকল 'এটম' বা পরমাণু (atoms) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানমতে যে ভৌতিক পদার্থ অবলম্বন করিয়া, পরমাণু শব্দ ব্যবহৃত হয়, হিন্দুশাস্ত্রে তাহাকে ভৌতিক পদার্থ বলে না। হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত ভৌতিক পদার্থ ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যাহা কেবলমাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এবং অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাকে অনুভব করিতে পারা যায় না, তাহাকে 'আকাশ' বলে। যাহা শ্রবণ এবং স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তাহাকে 'বায়ু' বলে। যাহা শ্রবণ, স্পর্শন এবং দর্শন ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাকে 'অগ্নি' বলে। যাহা শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন এবং রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাকে 'জল' বলে। যাহা শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন এবং ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাকে 'পৃথিবী' বলে। সুতরাং যাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ অনুভূত হয়, তাহার নাম (১) ক্ষিতি। যাহাতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস পাওয়া যায়, তাহা (২) জল। যাহাতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ আছে, তাহাকে (৩) অগ্নি বলে। যাহাতে শব্দ ও স্পর্শগুণ লক্ষিত হয়, তাহার নাম (৪) বায়ু। যাহাতে কেবল শব্দের সঞ্চার হয়, তাহাকে (৫) আকাশ বলে।

পদার্থ সমূহের যে পঞ্চবিধ গুণের কথা বলা হইল, বিশেষ প্রণিধান করিলে অবগত হওয়া যায় যে, লঘু-মধ্যম-তীব্রতার তারতম্যানুসারে শব্দ-স্পর্শাদির গুণের তারতম্য হইয়া থাকে এবং সেইজন্য শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সকল বিভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। শব্দ গুণটীর ঐ ত্রিবিধাবস্থা রূপ আধিক্য বাদ দিলে, যে কেবল ঘাস শব্দমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে (৬) শব্দ তন্মাত্র বলা হয়। এই প্রকার (৭) স্পর্শ তন্মাত্র, (৮) রূপ তন্মাত্র, (৯) রস তন্মাত্র এবং (১০) গন্ধ তন্মাত্র পাওয়া যায়। শব্দ স্পর্শাদি গুণের লঘুতার চরম সীমাকেই শব্দ স্পর্শাদি তন্মাত্র বলা হয়। গুণের লঘুতার শেষ সীমাকে তন্মাত্র বলা হয়।

স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে দশটী তত্ত্ব নির্ণয় করা গেল। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ, এই পাঁচ বিষয় অবলম্বন করিয়া পাঁচ মহাভূত পাওয়া যায়। বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী, এই চারি ভৌতিক পদার্থ পরমাণু দ্বারা সংগঠিত। পরমাণু দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া এইকয় পদার্থ নির্দ্দিষ্ট স্থান অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে। এই চারি পদার্থের গুরুত্ব আছে; কিন্তু আকাশ পরমাণু দ্বারা সংগঠিত নহে বলিয়া, ইহা ব্যাপক এবং ইহার গুরুত্ব নাই।

আকাশ কেবলমাত্র শব্দের আধার; বায়ু কেবলমাত্র শব্দ ও স্পর্শের আধার। অগ্নি কেবলমাত্র শব্দ, স্পর্শ ও রূপের আধার। জল কেবলমাত্র শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রসের আধার। পৃথিবী পাঁচ বিষয়েরই আধার। এই সকল বিশুদ্ধ ভূতের লক্ষণ। আমরা যাহাকে পৃথিবী, জল, ইত্যাদি বলি, তাহারা মিশ্র পদার্থ। ইহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকের পাঁচ ভূতের অংশ আছে। ইহারা পঞ্চীকৃত অবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছে।

আমরা আমাদের দেহের বাহিরে পূর্ব্বোক্ত দশটী তত্ত্বনির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়া থাকি। দেহটী যে ঐ দশবিধ তত্ত্বের অন্তর্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। তথাপি দেহের অভ্যন্তরে ঐ দশটীর অতিরিক্ত আরও কিছু তত্ত্ব নিরূপণ করা যাইতে পারে; যথা—সঙ্কল্পাদি বিকল্পাদিক্রমে চিন্তা করা, শ্রবণ করা, স্পর্শ করা, দর্শন করা, স্বাদ লওয়া, গন্ধ পাওয়া, বাক্য বলা, বস্তু গ্রহণ করা, গমন করা, রতি অনুভব করা, মল নিঃসরণ করা,—এই সকল প্রকার ক্রিয়া একাদশ বিভিন্ন তত্ত্বের কার্য্য। সাধারণ ব্যক্তির ধারণা আছে যে, শরীরের যে সকল বাহ্যাঙ্গের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদিত হয়, সেই সেই বাহ্যাঙ্গ উক্ত ক্রিয়াসম্পাদক ইন্দ্রিয়। কিন্তু প্রকৃত হিসাবে উহারা ক্রিয়া প্রকাশের দ্বার স্বরূপ। কেননা, দেখা যায় যে, মৃত শরীরে সেই সকল অঙ্গ বিদ্যমান থাকিতেও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সম্পাদিত হয় না। সুতরাং ঐ সকল ক্রিয়াসম্পাদক ইন্দ্রিয়গুলি বাহ্যাঙ্গের অতিরিক্ত পদার্থ বলিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রকার ক্রিয়াসম্পাদক একাদশটী ইন্দ্রিয়কে একাদশটী পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া মানিয়া লইতে হইতেছে। তাহাদের নাম এই—(১১) বাক্, (১২) পাণি, (১৩) পদ, (১৪) উপস্থ ও (১৫) পায়ু,—ইহাদিগকে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় বলা হয়; (১৬) চক্ষু, (১৭) কর্ণ, (১৮) নাসিকা, (১৯) জিহ্বা ও (২০) ত্বক্;—ইহাদিগকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। ইহা ভিন্ন (২১) মনও আছে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় বলে। মনকে অন্তরিন্দ্রিয় বলে।

সুতরাং আমরা জানিতে পারিতেছি যে, ইন্দ্রিয় অঙ্গবিশেষ নহে। ঐ সকল অঙ্গ ইন্দ্রিয়ের দ্বারস্বরূপ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন ক্রিয়াশক্তির নাম ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় সকল নিরাকার, উহারা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল স্থানে বিদ্যমান, কিন্তু উহাদের ক্রিয়া প্রকাশের উপযুক্ত দ্বার সর্ব্বত্র প্রস্তুত নাই। মৃত শরীরে দ্বার নির্ম্মিত থাকিলেও, দেহ

তমসাচ্ছন্ন থাকায়, ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। মস্তিষ্ককে কখনও ইন্দ্রিয়ের আধার বলিতে পারা যায় না। ইন্দ্রিয়গুলি সকল স্থানে বিদ্যমান থাকিলেও কেবল মস্তিষ্ক নামক পাঞ্চভৌতিক পদার্থ প্রতিফলিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়া পরিচালন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ের পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বব্যাপক সমষ্টি ভাবকে দেবতা ও ব্যক্তিগত ব্যষ্টি ভাবকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে।

আমরা আরও দেখিতে পাই যে, আমাদের দেহ, যাহা বাহ্যজগতের কিয়দংশের দ্বারা গঠিত, এবং দেহে প্রকাশিত ইন্দ্রিয়ের সঞ্চার, এই উভয়কে লইয়া 'আমি' ইত্যাকার অভিমান হইয়া থাকে। অথচ ঐটী পূর্ব্ববর্ণিত কোন তত্ত্বের অন্তর্গত নহে। অতএব এই অভিমানবৃত্তির আধারকে একটী পৃথক তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার নাম (২২) অহঙ্কার। যে তত্ত্বটীর অস্তিত্ব দ্বারা, তাহার বৃত্তি প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন দেহে 'আমি' এই ভাবটী সঞ্চার করে, সকল দেহে অবস্থিত সেই তত্ত্বটীর সমষ্টিগত নাম 'অহঙ্কার'। যাহাতে দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাহার নাম অহঙ্কার।

অহঙ্কারের কোন মূল আছে কি না, ইহা আলোচনা করিলে আমরা অবগত হই যে, অহঙ্কার তত্ত্বটী প্রথমে নিশ্চিত হইয়াছিল, পরে স্বীয় কার্য্যে ধাবিত হইয়াছে, সুতরাং নিশ্চয়াত্মক ভাববিশেষকে অহঙ্কারের মূল বলা যাইতে পারে। এই নিশ্চয়াত্মক ভাবের নাম বুদ্ধিবৃত্তি। অহঙ্কারের মূলস্বরূপ নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি বিশিষ্ট এই মহান্ তত্ত্বটীর নাম (২৩) মহত্তত্ত্ব। ইহার অপর নাম বুদ্ধি তত্ত্ব। মনুষ্যদেহে যে এই নিশ্চয়াত্মক ভাবের সন্ধান পাওয়া যায় না, এমন নহে। অন্তঃকরণ মধ্যে মন নানাবিধ চিন্তা করিয়া থাকে, কিন্তু নিশ্চয় করা তাহার কার্য্য নহে, ইন্দ্রিয় অথবা অহঙ্কারেরও কর্ম্ম নহে, অথচ নিশ্চয় হয় কোথা হইতে? ইহাকেই মহত্তত্ত্বগত নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি বলিয়া চেনা যাইতে পারে। আজকাল অনেকে ইহাকে বিবেকের বাণী, প্রত্যাদেশ প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ উহা বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্বের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। ব্যষ্টি দেহ সম্বন্ধে ইহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব ও সমষ্টি সৃষ্টি সম্বন্ধে মহত্তত্ত্ব বলা যাইতে পারে।

যে উপায়ে অহঙ্কার তত্ত্বের কারণ বলিয়া মহত্তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করা গিয়াছে, সেই উপায়ে মহত্তত্ত্বের কারণ নিরূপণ করা অসম্ভব প্রতীয়মান হয়। একমাত্র নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি ধরিয়া মহত্তত্ত্ব স্থির হইয়াছে, সুতরাং

যতদূর পর্য্যন্ত নিশ্চয়ের সত্ত্বা স্বীকার করা যাইবে, ততদূর মহত্তত্ত্বই থাকিবে। সুতরাং নিশ্চয়ের বাহিরে আর অনুসন্ধান চলে না। সর্ব্বশুদ্ধ এই ২৩টী তত্ত্বের দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের মিশ্রণই সমস্ত সৃষ্টি। জগতের যাহা কিছু বল, উহার একটী না একটীর মধ্যে পড়িবেই। এই ২৩টী তত্ত্বের অতিরিক্ত কোন সৃষ্টি থাকিতে পারে না। ক্ষিতি হইতে মহত্তত্ত্ব পর্য্যন্ত ২৩টী তত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উহারা সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতার দিকে ধাবিত হইয়াছে। ক্ষিতি স্থূলতার এবং মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্মতার চরমসীমা। আমরা শাস্ত্রাদি হইতে অবগত হই যে, মহত্তত্ত্ব সাম্যাবস্থা নহে, পরিবর্ত্তনের প্রারম্ভ মাত্র। এই সাম্যাবস্থাই মহত্তত্ত্বের মূল। সুতরাং মহত্তত্ত্বের মূল নিশ্চয়ের বাহিরে। এই তত্ত্বের নাম (২৪) অব্যক্ত প্রকৃতি, অর্থাৎ যাহা কোন প্রকারেই নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। আমরা এই ২৪ তত্ত্ব হইতে তত্ত্বাতীত পুরুষে আসিয়া উপস্থিত হই। এই পুরুষপ্রলয়ে একরূপ ও সৃষ্টি সময়ে বহুরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়। পুরুষ লোকদৃষ্টিতে জীব বা ভোক্তা, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিতে অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্র।

আমরা এই প্রকারে সমস্ত জগতকে বিশ্লেষণ করিয়া ২৪ ভাগ পাইয়া থাকি। আমরা অন্য প্রকারে অর্থাৎ গুণের বিচারের দ্বারাও সৃষ্টিতত্ত্বে উপনীত হইতে পারি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সকল পদার্থই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অন্তর্ভূত।

(১) সত্ত্ব—"সত্ত্বং লঘু প্রকাশকম্।"

(২) রজঃ—"চলস্ অবষ্টম্ভকঞ্চ রজঃ।"

(৩) তমঃ—"গুরু বরণকমেব তমঃ।"

অর্থাৎ, যাহা লঘু এবং প্রকাশক, তাহা সত্ত্ব, যাহা চঞ্চল এবং প্রেরক, তাহা রজঃ, যাহা গুরু এবং আবরণকারী, তাহা তমঃ। প্রকৃতি এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা এবং মহৎ সেই সাম্যাবস্থার প্রথম বিচ্যুতি—মহৎ প্রকৃতির প্রথম অভিব্যক্তি। রজঃ ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মহত্তত্ত্বের বিকার হইয়াছিল এবং সেই বিকার হইতে তমঃপ্রধান দ্রব্যজ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক অহঙ্কারতত্ত্বের উদয় হইয়াছিল।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সাত্ত্বিক অহঙ্কার-জ্ঞান-শক্তি-সম্পন্ন, রাজসিক ক্রিয়া-শক্তি-

সম্পন্ন এবং তামসিক দ্রব্যশক্তিসম্পন্ন। আকাশাদি মহাভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র তামসিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা দ্রব্যশক্তি-সম্পন্ন। আকাশাদি ত্রিগুণাত্মক হইলেও তমোগুণই তাহাতে অধিক। এই জন্য সত্ত্বাদি গুণের কার্য্যপ্রকাশাদি ধর্ম্ম আকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় না। আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের এক একটী সাত্ত্বিক অংশ হইতে এক একটী জ্ঞানেন্দ্রিয় সৃষ্ট হইয়াছে। ইহাদিগকে অহঙ্কার তত্ত্বের রাজসিক ভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিতে পারা যায়; ইহারা ক্রিয়াশক্তি-সম্পন্ন। আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিক অংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনা এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশের রজোহংস হইতে বাক্, বায়ুর রজোহংস হইতে পাণি, তেজের রজোহংস হইতে পাদ, জলের রজোহংস হইতে বায়ু এবং পৃথিবীর রজোহংশ হইতে উপস্থ সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল কর্ম্ম ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এক একজন অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছেন। তাঁহারা সকলে এবং মনও অহঙ্কার তত্ত্বের সাত্ত্বিকাংশ। ইহারা জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন। শ্রোত্রের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা দিক্, ত্বকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সূর্য্য, রসনার অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বরুণ এবং প্রাণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অশ্বিনীকুমার। শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে দিক্ প্রভৃতি পাঁচটী দেবতা কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইরা শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান সম্পাদন করে। বাকের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অগ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, বায়ুর যম এবং উপস্থের প্রজাপতি। যথাক্রমে ইহাদের কার্য্য—বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ। আকাশাদিগত রজোহংশগুলি মিলিত হইয়া প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের সৃষ্টি সম্পাদন করিয়াছে! প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—ইহাদিগকে পঞ্চবায়ু বলা হয়। ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুর নাম প্রাণ, উহা নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহা পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী। সর্ব্বতোগামী বায়ুর নাম ব্যান, উহা সমস্ত শরীরবর্ত্তী। কণ্ঠস্থানবর্ত্তী উৎক্রমণ বায়ুর নাম উদান। যে বায়ুর সাহায্যে ভুক্তপীতবস্তু, রস, রক্ত ও শুক্রাদি রূপে পরিণত হয়, তাহার নাম সমান; উহা নাভিস্থানবর্ত্তী।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয় সূক্ষ্মতত্ত্ব বিশেষ। উহা নিরাকার

ও সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে। ইন্দ্রিয়ের এই সর্ব্বব্যাপক সমষ্টি ভাবকে দেবতা বলে এবং ব্যক্তিগত ব্যষ্টি ভাবকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্বে যে সকল ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা সকলের কথা উল্লিখিত হইল, উহারা সর্ব্বব্যাপক সমষ্টি ভাব মাত্র। নির্দ্দিষ্ট স্থান ও নির্দ্দিষ্ট নাড়ীর সহযোগে কোনও সূক্ষ্মতত্ত্ব কোন বিশেষ কার্য্য ও জ্ঞানের উৎপাদন করে। নির্দ্দিষ্ট স্থান ও নির্দ্দিষ্ট নাড়ীর দ্বারা সীমাবদ্ধ সেই সূক্ষ্মতত্ত্বকে ইন্দ্রিয় বলে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যাহার দ্বারা কর্ম্ম হয়, তাহাকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে এবং যাহা দ্বারা বাহ্য পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। সকল বাহ্যজ্ঞান ও সকল কর্ম্মের গ্রাহক ও পরিচালক সূক্ষ্ম পদার্থকে মন বলে। মনুষ্যের অহংজ্ঞান অবলম্বন করিয়াই মন। মন সাত্ত্বিক অহংকার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। নিম্নোক্ত তালিকা হইতে এই সকল বিশেষরূপ অবগত হওয়া যাইবে।

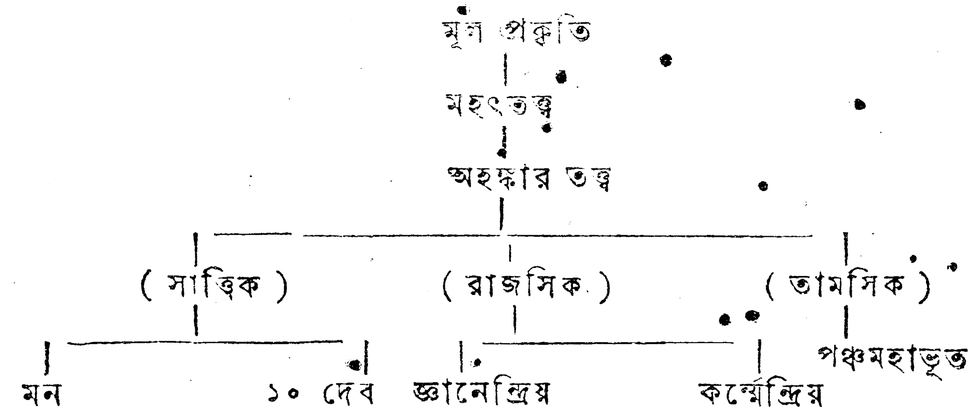

পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া, আমরা ২৩ প্রকার তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি। ইহাদিগের মূল কারণ হইতেছে প্রকৃতি। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দ্বারা জগৎকারণ নির্দ্দেশ করিলেও অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। সেইজন্য উদয়নাচার্য্য লিখিয়াছেন যে,—

"ইত্যেষা সহকারী শক্তিরসনা মায়া দুরূন্নীতিতোমূলত্বাৎ প্রকৃতিঃ প্রবোধভয়তোঽমিত্যেতি যস্যোদিতা।"

অর্থাৎ ঈশ্বর অদৃষ্ট সহকারে জগৎ সৃষ্টি করেন। জগৎসৃষ্টিবিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী। এই অদৃষ্টের নামান্তর সহকারি শক্তি (ন্যায়মতে)। মায়ার স্বরূপ দুর্জ্ঞেয়, অদৃষ্টও দুর্জ্ঞেয়, এইজন্য মায়া শব্দও অদৃষ্টের নামান্তর মাত্র (বেদান্তমতে)। অদৃষ্ট জগৎ সৃষ্টির মূল বলিয়া, অদৃষ্ট প্রকৃতি বলিয়া

কথিত হয় (সাংখ্যমতে)। বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হইলে অদৃষ্ট বিনষ্ট হয়, এইজন্য অবিদ্যা শব্দ অদৃষ্টের নামান্তর (বেদান্ত মতে)। সুতরাং সকলেরই মতে জগতের মূল কারণ হইতেছে প্রকৃতি। প্রকৃতি জড়ময়ী, চৈতন্য না থাকিলে জড়ের কখনও বিকাশ হইতে পারে না। পরমাত্মা বা পুরুষ অব্যক্ত (Unmanifested) ও চৈতন্যময়। ইহাদিগের সংযোগে সংসার ব্যক্ত (Manifested) হইয়া থাকে। শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সংযোগ ঈশ্বরের দ্বারা সংসাধিত হইয়া থাকে।

পরমেশ্বরকে শাস্ত্রে পরব্রহ্ম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। তিনি গুণাতীত (Undifferentiated) অব্যক্ত (Unmanifested) ও অনাবৃত (Unknowable) তাঁহাকে "একমেবা দ্বিতীয়ং" বলা হয়। বাক্য ও মন তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারে না,—তিনি বাক্য দ্বারা উদিত নহেন এবং তাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না। তিনি কেবল শুদ্ধ চৈতন্যযুক্ত। তিনি যদি নির্গুণ ও অব্যক্ত হন, তাহা হইলে সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েব"—অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, আমি বহু হইব এবং প্রকৃষ্টরূপে জায়মান হইব। পরে তিনি মায়ার দ্বারা জগৎ রচনা করেন। মায়ার অপর নাম প্রকৃতি। কালশক্তি দ্বারা (Periodicity) দ্বারা মায়ার গুণ সকল ক্ষুভিত হইলে মহত্তত্বাদি উদ্ভূত হইতে থাকে। মায়োপাহিত হইয়া তিনি সগুণ হন এবং নিজেকে গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেন। এই গণ্ডির ভিতর বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় গঠিত হইতেছে; তাঁহাতেই এই বিশ্বের অস্তিত্ব রহিয়াছে, বিশ্বের প্রত্যেক অণুতে তিনি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি বিশ্বের উৎপত্তি ও ধ্বংশের কারণ। তিনি সকল ভূতে অবস্থিত এবং সকল ভূত তাঁহাতে অবস্থিত। তিনিই কারণ সৃষ্টি করেন, অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ তত্ত্ব সকল তাঁহার ঈক্ষণে উদ্ভূত হয়। তিনি তত্ত্ব সকলের আত্মা ও ঈশ্বর। তাঁহাকে শাস্ত্রে প্রথম পুরুষ (First Logos) বলা হইয়া থাকে। তিনি মহত্তত্বের স্রষ্টা। প্রলয়কালে সৃষ্টপদার্থ বীজভাবে মূল প্রকৃতিতে অবস্থিত করেন। যে শক্তির দ্বারা দিনের পর রাত্রি এবং রাত্রির পরদিন আসিয়া থাকে, তাহাকে কালশক্তি বলে। সেই কালশক্তির দ্বারা সৃষ্টির পর প্রলয় এবং প্রলয়ের পর সৃষ্টি সংঘটিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে পুরুষের তিন প্রকার বিভাবের (Aspects) কথা উল্লিখিত

হইয়াছে। এই তিন বিভাব অনুসারে তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হন। অশরীরী প্রথম পুরুষ, কারণ সৃষ্টির অর্থাৎ তত্ত্ব সমূহের আত্মা। সৃষ্টি রচনা হয় না বলিয়া, ঈশ্বরের এই উপাধি গ্রহণ। ইহাই পুরুষের প্রথম বিভাব। তত্ত্ব সকল উদ্ভূত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে জীব সংস্থান হয় না বলিয়া, পুরুষ অন্য বিভাব ধারণ করিয়া দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রকাশ পাইলেন। তিনি মূল প্রকৃতিরূপ শরীরবিশিষ্ট হইয়া কার্য্য সৃষ্টি করেন অর্থাৎ জীবদেহ রচনা করেন। দ্বিতীয় পুরুষের নাম বিরাট পুরুষ বা নারায়ণ। যে শক্তি দ্বারা তত্ত্ব সকল স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত হইতে পারে, তাহাই প্রথম পুরুষের শক্তি এবং যে শক্তি দ্বারা তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিভিন্নদেহ ও বিভিন্ন লোক রচনা করিতে সমর্থ হন, তাহাই দ্বিতীয় পুরুষের শক্তি। দ্বিতীয় পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডের আত্মা ও ঈশ্বর। তৃতীয় বিভাব অনুসারে পুরুষ প্রতি জীবের আত্মা ও ঈশ্বর। তিনি ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করেন, বিষ্ণুরূপে পালন করেন এবং রুদ্ররূপে প্রলয় করেন।

নির্গুণ ব্রহ্মের দ্বারা সংসার সৃষ্টি হয় না বলিয়া তিনি মায়োপাধিক হইয়া প্রথম পুরুষরূপে বিরাজ করেন, তিনি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের আত্মাও ঈশ্বর। তৎপরে তিনি দ্বিতীয় পুরুষরূপে সেই তত্ত্ব সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া কার্য্য সৃষ্টি বা জীবগণের সমবেত সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় পুরুষ সমগ্র জীবের আত্মা (Atma Budhi)। তিনি কূটস্থ। তিনি পুরাণে বিরাট পুরুষ, উপনিষদে প্রজাপতি এবং বেদে সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ পুরুষ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি কল্পের ঈশ্বর। তিনি কল্পের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বিধান করিয়া থাকেন। যখন কূটস্থ ভাব ত্যাগ করিয়া জীব সকল পৃথক্‌ভাবে প্রাদুর্ভূত হয়, তখন তিনি তৃতীয় পুরুষ হইয়া প্রতি জীবের আত্মা বলিয়া পরিগণিত হন। তিনি সকল ভূতের অন্তস্থ হইয়া সকল ভূতকে যন্ত্রের ন্যায় চালাইতেছেন। তাঁহারই প্রেরণায় জীব সকল উদ্ভিদাদি বিভিন্ন আকার ধারণ করে এবং তাহারই চিৎশক্তি প্রভাবে জীবের দৈহিক ব্যাপার ও ইন্দ্রিয়জনিত সংজ্ঞা লাভ হয়। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই তিনরূপে বিরাজিত। তাঁহারা তিন হইয়াও এক। তাঁহাদিগকে ত্রিমূর্ত্তি বলে। কেবল বিভিন্ন কার্য্যের জন্য এক পুরুষকে তিন হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত তিন পুরুষ ব্রহ্মের তিন বিভাব মাত্র।

একমাত্র চৈতন্য বিভিন্ন উপাধিযোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত হইয়াছেন; বস্তুগত্যা ইহাদের কোন ভেদ নাই।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থূল বা মিশ্রভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চীকরণের প্রথা এইরূপ;—প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতকে সমান দুই ভাগ করিবে, পরে প্রত্যেক পঞ্চ মহাভূতের প্রথম ভাগকে সমান চারিভাগ করিয়া অন্য ভূতের প্রত্যেক প্রথমাংশে ঐ চারি অংশের এক এক অংশ যোগ করিলে পঞ্চীকৃত হইবেক। সুতরাং পঞ্চীকৃত আকাশের অর্দ্ধাংশ আকাশ, দুই আনা পরিমাণ বায়ু, দুই আনা তেজ, দুই আনা জল ও দুই আনা পৃথিবী আছে। এই প্রকার বায়ু ও অন্যান্য সকল ভূত গঠিত হয়। প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের অংশ সমাবেশ থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই ভূত বলিয়া কথিত হয়।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে সপ্ত পাতাল,—অতল, বিতল, ভূতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এবং উপর্য্যুপরি অবস্থিত ভূর্লোক (Physical plane) ভুবর্লোক (Astral plane) স্বর্লোক (Mental plane), জনলোক (Budhic plane), মহলোক (Nirvan plane), তপলোক (Pari-Nirvan Plane), এবং সত্যলোক (Maha-Parinirvan plane) রচিত হইয়াছে। প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবস্থাভেদে এই সপ্তলোক গঠিত। এই সপ্তলোকের সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। এই সপ্তলোকের সমযোগী মনুষ্যের সাত অবস্থা হয়,—জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয়, নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ ও মহা পরিনির্ব্বাণ। এক এক অবস্থায় সংবিৎ এক এক লোক ভোগ করে। সপ্ত বা পাতালকে অনেকে ভূলোকের মধ্যে পরিগণিত করেন।

প্রাকৃত ও বিকৃতভেদে সৃষ্টি দুই প্রকার। প্রাকৃত সৃষ্টিব্যাপক, ইহা একুকালে সকল জীবে থাকিতে পারে। প্রাকৃত সৃষ্টি ছয় প্রকার। যথা,—

(১) মহত্তত্ত্ব,
(২) অহঙ্কার তত্ত্ব,
(৩) পঞ্চ তন্মাত্র,
(৪) জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়,
(৫) ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বৈকারিক দেব সকল এবং মন,

(৬) পঞ্চ অবিদ্যা,

ষষ্ঠ ভিন্ন আর পাঁচটী প্রথম পুরুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রাকৃত উপাদান সকল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া জীবশরীর রচনা করে এবং প্রাকৃত দেব সকল জীবের ইন্দ্রিয়বৃত্তির অধিনায়ক হয়।

বৈকৃত সৃষ্টি তিন প্রকার। ইহারা আবার নানা ভাগে বিভক্ত। যথা,—

(৭) ঊর্দ্ধ স্রোতঃ। যাহাদিগের আহার ঊর্দ্ধে সঞ্চালিত হয়। ইহারা ছয়ভাগে বিভক্ত;—

(ক) বনস্পতি,
(খ) ঔষধি,
(গ) লতা,
(ঘ) ত্বক্‌সার,
(ঙ) বীরুধ,
(চ) দ্রুম।

(৮) তির্য্যক স্রোতঃ। যাহারা আহার করিলে ভক্ষিত দ্রব্য বক্রপথে শরীর মধ্যে প্রবেশ করে। ইহারা ২৮ ভাগে বিভক্ত। যথা,—

১। স্থলচর;—

(ক) দ্বিশক (অর্থাৎ দুইটী ক্ষুর বিশিষ্ট)। যেমন;—

(১) গো, (২) ছাগ, (৩) মহিষ, (৪) কৃষ্ণসার, (৫) শূকর, (৬) গবয়, (৭) রুরু, (৮) মেষ, (৯) উষ্ট্র।

(খ) একনখ;—

(১০) গর্দ্দভ, (১১) অশ্ব, (১২) অশ্বতর, (১৩) গৌর, (১৪) শরভ ও (১৫) চানরী।

(গ) পঞ্চনখ;—

(১৬) কুক্কুর, (১৭) শৃগাল, (১৮) ঋক্ষ, (১৯) ব্যাঘ্র, (২০) বিড়াল, (২১) শশক, (২২) শল্লক, (২৩) সিংহ, (২৪) বানর, (২৫) হস্তী, (২৬) কচ্ছপ ও (২৭) গোধা।

২য়। (২৮) জলচর ও পক্ষী।

(৯) অর্ব্বাক স্রোতঃ। যাহাদের আহার সঞ্চার নিম্নগামী। এই সৃষ্টিকে মনুষ্য সৃষ্টি বলে।

(১০) কুমার সৃষ্টি। যাহাদিগকে প্রাকৃত কিম্বা বৈকৃত বলা চলে না,

এমন উভয়াত্মক সৃষ্টিকে কুমার সৃষ্টি বলে। সনৎকুমারাদি ঋষিগণ এই সৃষ্টির অন্তর্গত। ইহাঁরা দেবতাদিগের ন্যায় অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট। ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বদেহের ভিতর যাইতে পারেন। ইহাঁরা মৃত্যুসীমার বহির্ভূত। তাঁহাদের শক্তিবলে আমরা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে পারি। সনৎ আদি কুমারগণ ব্রহ্মকল্পে সৃজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মনুষ্যসৃষ্টি প্রতি কল্পেই হইয়া থাকে। সনৎ আদি কুমারগণ এক কল্প হইতে অন্য কল্প পর্য্যন্ত সৃষ্টির অনুসরণ করিয়া থাকেন।

ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন লোকের সমাহারকে ত্রৈলোকী বলা হয়। জীব সকলের ভোগের জন্য ত্রিলোকী রচিত হইয়াছে। কামনা দ্বারা জীব সকল ত্রৈলোক্যে চালিত হইতেছে। প্রতিকল্পে ত্রিলোকীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্যান্য লোক সকল প্রতিকল্পে সৃজিত হয় না। ব্রহ্মার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত উহাদের স্থিতি। নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ঐ সকল লোক লভ্য হয়। নিষ্কাম ধর্ম্মই উহাদের জীবন। নিষ্কাম ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে ঐ সকল লোক লভ্য হয় না। জনলোকের অধিবাসিকে কুমার বলা হয়। কর্ম্মফলে মনুষ্য যখন জনলোকে উপনীত হইবে, তখন তাহার কুমার পদবী হইবে।

পূর্ব্বে যে সকল বৈকারিক বা অধিদেবতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদিগকে বৈদিক দেবতাও বলা যায়। কার্য্য সৃষ্টি অর্থাৎ মনুষ্যসৃষ্টির পূর্ব্বে উহাদিগের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল দেবতা ভিন্ন শাস্ত্রে বৈকৃত দেবেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রাকৃত সৃষ্টির অন্তর্গত নহেন। ইহারা দেবযোনি। ইহারা আট ভাগে বিভক্ত। যথা ;—

(১) স্বর্গ-লোকবাসী দেবগণ,
(২) অগ্নি বাত্বাদি পিতৃগণ,
(৩) অসুরগণ,
(৪) গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা,
(৫) যক্ষ ও রাক্ষস,
(৬) সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর,
(৭) ভূত, প্রেত ও পিশাচ,
(৮) কিন্নর, কিংপুরুষ ইত্যাদি।

প্রাকৃত দেব অপেক্ষা এই সকল দেব ন্যূনশক্তিসম্পন্ন, এই জন্য

ইহাদিগকে বিকৃত দেব বলা যায়। কিন্তু দেবতা বলিয়া ইহা প্রকৃত দেব-সৃষ্টির অন্তর্গত।

মৃত্যুর পর মনুষ্য ভূবর্লোকে (Astral world) যায়। তথায় তাহারা ভূত, প্রেত কিম্বা পিশাচ হয়। সেখানে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া তাহারা স্বর্গলোকে (Divachan) উপস্থিত হয়। সেখানে তাহারা দেবতা হন,—ইহাঁরা প্রাকৃত দেবসৃষ্টির দেবতা নন, ক্ষণিক দেবভাবাপন্ন দেবতা। কর্ম্মফল ক্ষয় হইলে ইহারা মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিবার জন্য দেবলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবরোহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্য যদি নিষ্কাম কর্ম্ম করেন, তাহা হইলে স্বর্লোক হইতে মহর্লোকে উপস্থিত হন। মহর্লোকের অধিবাসিকে প্রজাপতি আখ্যা প্রদান করা হয়। এইরূপে মনুষ্য একলোক হইতে অন্যলোকে গিয়া থাকেন এবং ব্রহ্মার শেষ দিনে নিষ্কামী পুরুষেরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় নিষ্কাম ধর্ম্ম আচরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

এইবার দেবসৃষ্টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। এই ত্রিলোকীর মধ্যে জীব ও জন্তুগণের যেমন ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে এবং তাহারা যেমন এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ দেবগণেরও ভূরাদি সপ্তলোকের মধ্যে ক্রমবিকাশ হইয়া থাকে। সপ্ত-লোকের মধ্যে যে লোকে দেবতাগণ যে নামে অভিহিত হন এবং যে লোকে তাঁহাদের যেরূপ স্বভাব ও শক্তি হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভূলোকে এবং পাতালে দেবজাতীয় ও অসুর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, কিংপুরুষ, যক্ষ, রাক্ষস, ভূত, প্রেত, পিশাচ, অপস্মারক, অপ্সর, ব্রহ্মরাক্ষস, কুষ্মাণ্ড ও বিনায়কগণ বাস করে। ইহাদিগের মধ্যে দেবতা ও মনুষ্য পুণ্যফলে যথাক্রমে দেবতা ও মানবজন্ম লাভ করিয়াছে। সুমেরু পর্ব্বত দেবগণের বিহার স্থান; তাঁহাদিগের সভার নাম সুধর্ম্মা, তাঁহাদিগের পুরের নাম সুদর্শন, প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত। ভুবর্লোকের অপর নাম অন্তরিক্ষ লোক; এখানে জ্যোতিঃবিশিষ্ট গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ অবস্থিত। স্বর্লোকের অপর নাম মহেন্দ্র লোক। তথায় ছয় প্রকার দেবতা বাস করেন, যথা—ত্রিদশ, অগ্নিষ্বাত, যাম্য, তুষিত, অপরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী ও পরিনির্ম্মিত বশবর্ত্তী। ইহাঁরা সকলেই সঙ্কল্পসিদ্ধ, অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে উপভোগ করিতে সক্ষম, অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যযুক্ত, কল্প পরিমাণ

ইহাদিগের আয়ুঃ কাল। ইহারা ঔপাধিক দেহ অর্থাৎ পিতামাতার শুক্র শোণিত ব্যতিরেকে উৎকট পুণ্যফলে দিব্যশরীরধারী। মহর্ল্লোকের অপর নাম প্রাজাপত্য লোক। তথায় কুমুদ, ঋভব, প্রতর্দ্দন, অঞ্জনাভ ও প্রচিতাভ, এই পাঁচ প্রকার দেবজাতিবিশেষ বাস করেন। মহাভূত সকল ইহাদের বশীভূত অর্থাৎ ইহাদের অভিলাষ অনুসারে মহাভূতের পরিণাম হয়। ইহারা ধ্যানাহারী, ধ্যানমাত্রেই পরিতৃপ্ত, কল্পসহস্র ইহাদের আয়ুঃ। জন, তপঃ ও সত্যলোককে ব্রাহ্মলোক বলা হয়। জনলোকে চারি প্রকার দেবজাতি বাস করে। ব্রহ্ম পুরোহিত, ব্রহ্মকায়িক, ব্রহ্মমহাকায়িক ও অমর, ইহারা ভূত ও ইন্দ্রিয়ের প্রভু। পূর্ব্বোক্ত দেবগণ কেবল ক্ষিত্যাদি-ভূতের পরিচালক কিন্তু ইহারা ভূত ও ইন্দ্রিয় উভয়ের নিয়ামক। তপঃ-লোকে অভাস্বর, মহাভাস্বর ও সত্য মহাভাস্বর নামে ত্রিবিধ দেবজাতির বাস; ভূত, ইন্দ্রিয় ও প্রকৃতি ইহাদের অধীন, ইহাদের ইচ্ছামত প্রকৃতিরও পরিণাম হয়। ইহারা যথোত্তর দ্বিগুণ আয়ুঃ। ইহারা সকলে ধ্যানমাত্রেই পরিতৃপ্ত, ঊর্দ্ধ অর্থাৎ সত্য লোকেও ইহাদের জ্ঞানের অবিষয় নাই। সমস্ত লোকে ইহাদের জ্ঞান অপ্রতিহত। সত্যলোকে চারি প্রকার দেবতার বাস। অচ্যুত, শুদ্ধনিবাস, সত্যাভ ও সংজ্ঞা সংজ্ঞী। ইহাদের গৃহবিন্যাস নাই, সুতরাং স্বপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ নিজেই নিজের আশ্রয়। অচ্যুত দেবগণের উপর শুদ্ধনিবাস দেবগণের বাসস্থান, এইরূপে যথোত্তর ঊর্দ্ধে উহাদের বাসস্থান। ইহারা সকলেই প্রধান চালনায় সমর্থ, ইহাদের আয়ুঃকাল সৃষ্টিকালের সমান; সৃষ্টির বিনাশে অর্থাৎ মহা প্রলয়ের সময় ইহাদের নাশ হয়। অচ্যুতগণ সবিতর্ক ধ্যানে পরিতৃপ্ত, শুদ্ধনিবাসগণ সবিচার ধ্যানে রত, সত্যাভগণ সানন্দমাত্র ধ্যানে সুখী ও সংজ্ঞা সংজ্ঞিগণ অস্মিতামাত্র ধ্যানে নিরত। এই সপ্তলোক মিলিত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার মধ্যে এই সকল ভুবন অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, ধারণার অতীত অতি বৃহৎ সেই ব্রহ্মাণ্ডও প্রকৃতির একটী ক্ষুদ্র অবয়ব মাত্র। যেমন আকাশে খদ্যোত অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত।

পূর্ব্বে যে সকল প্রাকৃত দেবতাগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তাহাদের সাহায্যের দ্বারা আমাদিগের ইন্দ্রিয়ব্যাপার সম্পাদিত হয়। তাহারা ব্যক্তিগত দেবতা বিশেষ নহে, তাহাদিগকে বৈকারিক বা অধিদেবতা বলা হয়। সপ্তলোক-

বাসী দেবতাগণ সম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা তাহাদের পক্ষে প্রযুজ্য নহে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত সপ্তলোকবাসী দেবতাগণের মধ্যে এখন অনেক দেবতা আছেন, যাহাদের সহিত ত্রিলোকবাসী জীবগণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। এমন অনেক দেবতা আছেন, যাহাদের উপর মনুষ্যগণ অলৌকিক শক্তি প্রভাবে প্রভুত্বলাভ করিতে পারে, কিম্বা কর্ম্মবলে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারে। শাস্ত্রে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, এই সকল দেবতার ভিতর কেহ কেহ মনুষ্যের পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়। তাহারা মনুষ্যদিগকে আপনার সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করে। তাহারা চায় না যে, মনুষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করুক। তাঁহারা যখন সন্তুষ্ট হন, তখন মনুষ্যদিগকে যথাসাধ্য রক্ষা করেন। তাঁহারা মনুষ্যদিগকে এরূপ বুদ্ধি প্রদান করেন যে, সেই বুদ্ধির দ্বারা মনুষ্যগণ ইষ্টলাভ করিতে পারে। এই সকল দেবতাগণ ক্রমবিকাশের সোপানে অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। মনুষ্য যে কালক্রমে ক্রমবিকাশের সোপানে আরোহণ করিয়া দেবত্বপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচিত হইল, এইবার প্রলয়ের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতেছে। সৃষ্টি পদার্থ বিনাশের নাম প্রলয়। প্রলয় চতুর্ব্বিধ; নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। সুষুপ্তির নাম নিত্য প্রলয়, কারণ সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টা হইতে পৃথক্‌ভূত অন্য কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ থাকে না। তখন তাহার নিকট সমস্ত কার্য্য প্রলীন হয়। ইহাকে নিত্য প্রলয় বলে। বিরাট পুরুষের দিবাবসানে ত্রৈলোক্যের যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। তাঁহার শয়নকাল সৃষ্টিপদার্থের প্রলয় কাল। নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি পুনর্ব্বার সমুদয় জগৎ সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসানে সমস্ত কার্য্যের যে বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রকৃত প্রলয়। তাহার সহিত ব্রহ্মাণ্ড, তদন্তঃবর্ত্তী চতুর্দ্দশলোক, অদন্তর্বর্ত্তী স্থাবর জঙ্গমাদি প্রাণিদেহ, ভৌতিক ঘট পটাদি এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ সমস্তই প্রলীন হয়। মূল কারণ রূপ প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াতে সমস্ত প্রলীন হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। এই প্রলয় মায়াতে সম্পন্ন হয়, পরব্রহ্মে হয় না। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিমিত্তক সর্ব্ব জীবের মুক্তির নাম আত্যন্তিক প্রলয়। একটী দুইটী করিয়া জীব মুক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। তৎপরে এমন সময় আসিবে, যখন সমস্ত জীব মুক্ত হইবে, একটী

জীবও বদ্ধ থাকিবে না! ইহার নাম আত্যন্তিক প্রলয়। ইহার অপর নাম মহা প্রলয়।

সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত হইল, ইহাকে বৈদিক সৃষ্টি বলে। দার্শনিক সৃষ্টি অন্য প্রকার। উহার মতে বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছুরই অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বস্তুই কল্পনা-প্রসূত বলিয়াই আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইয়া বাহ্য জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এই জগৎ আমাদের জ্ঞানের উপাদানে ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে। সংসারের জ্ঞানকে রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় বা শুক্তিতে রজতজ্ঞানের ন্যায় ভ্রম জ্ঞান বলিয়া বর্ণনা করা হয়; কিন্তু সর্পের স্থানে যে একটা রজ্জু আছে এবং রজতের স্থানে যে একটা শুক্তি আছে, তদ্বৎ সংসারের স্থানে যে একটা কিছু আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই একটা কিছুকে দর্শন বলেন, পরব্রহ্ম। সেই পরমাত্মা স্বভাবতঃ চৈতন্যময়, তাহা যে কিরূপে প্রকৃতি বা মায়ার সহিত সংযোজিত হইল, তাহা দার্শনিক যুক্তির বাহিরে।

সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্য কি? সৃষ্টিতত্ত্ব পর্য্যালোচনার দ্বারা জীব বুঝিতে পারে যে, ভগবান সর্ব্বভূতে বিরাজ করিতেছেন, তিনি তাহার অন্তরেও বিরাজ করিতেছেন এবং জীব ভ্রমে পতিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই এত কষ্ট পাইতেছে। এই জ্ঞানের নাম আত্মজ্ঞান। সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের চিন্তা, সংসারগতি পর্য্যালোচনা এবং বিষয় দোষ দর্শনাদির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। সাংখ্যকারিকাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে,—

"পুরুষার্থং জ্ঞানমিদং গুহ্যং পরমর্ষিণা সমাখ্যাতম্।
স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়াশ্চিন্ত্যন্তে যত্র ভূতানাম্॥"

অর্থাৎ যে পুরুষার্থ সাধন আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, সেই গোপনীয় আত্মজ্ঞান পরমর্ষি বলিয়াছেন। এই স্থলে স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের চিন্তা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আলোচনা করিতে করিতে জীব জানিতে পারে যে, সকলই মিথ্যা, কেবল এক সেই ভগবানই সত্য। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন।

শ্রীআশুতোষ দেব।

কবিবর হেমচন্দ্র

ইহসংসারে নাই! গত ১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০ সাল রবিবার আমাদের সাহিত্য-চন্দ্র হেমচন্দ্র অস্তগত হইয়াছেন! উদয়ের অধোদিকে অস্ত, কথা বলিলেই যেন স্বভাবসিদ্ধ মনে হয়, কিন্তু হেমচন্দ্রের অস্ত ঊর্দ্ধদিকে। কলিকাতায় যখন হেমচন্দ্রের অস্তসংবাদ প্রচারিত হয়, সেই প্রসঙ্গে একস্থানে যেরূপ সুন্দর কথোপকথন হইয়াছিল, কাহার কর্ণে প্রিয়, কাহার কর্ণে অপ্রিয় বোধ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, অগ্রে আমরা সেই কথাটির উল্লেখ করিব।

সহরের একটি সাধারণ পুস্তকালয়ে পাঁচটি বাবু বসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি বাবু সহসা হাই তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওহে, শুনেছ! কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মারা গেছেন?"

গম্ভীর বদনে আর একটি বাবু বলিলেন, "দূর মূর্খ! মারা গেছেন কে বল্লে? হেমচন্দ্র বেঁচেছেন? ভব-সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা সমস্তই নির্ব্বাপিত হয়েছে! হেমচন্দ্র এখন নিত্যধামে নিত্য প্রেমিকের পদপ্রান্তে অনবরত শান্তি-সুধায় অভিষিক্ত হচ্ছেন?"

এই সদ্‌বক্তার কথাগুলি সব ঠিক। হেমচন্দ্রের প্রতিভা, হেমচন্দ্রের সৎ শিক্ষা, এবং হেমচন্দ্রের গুণাবলি, সমস্তই আমরা জানি। হেমচন্দ্র হিন্দুকালেজের ছাত্র ছিলেন, ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, স্বাধীন পদগৌরবে হাইকোর্টের একজন প্রধান উকিল। তিনি অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, সৎকার্য্যে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, এ সকল পরিচয় নিতান্ত অনন্যসাধারণ নহে, বিশেষ নূতন পরিচয় অবশ্য প্রকাশ্য; সেই পরিচয়টি সমস্ত বুদ্ধিমান বঙ্গসন্তানের আদর্শস্থলে আইসে, ইহাই আমাদের বাসনা। পরিচয়টী নিম্নে প্রদান করিতেছি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশপ্রেমিক, স্বদেশপ্রিয়, স্বদেশভক্ত, স্বদেশের হিতব্রতে অকপট অনুরক্ত ছিলেন; মাতৃভূমির ন্যায় মাতৃভাষার প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। প্রতিভা প্রসাদে তিনি একজন সুকবি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বীরকরুণাদি সমস্ত রসের কল্পনাতেই তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় আছে; ছন্দসারল্য, শব্দলালিত্য এবং ভাব-সৌন্দর্য্য, সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার সমধিক প্রশংসা। অধিকাংশ কাব্যেই

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁহার স্বদেশ অনুরাগীতার পূর্ণবিকাশ। "ভারত-সঙ্গীত" "ভারত-ভিক্ষা" "চিন্তা-তরঙ্গিণী" "চিত্ত-বিকাশ" "আশা-কানন" প্রভৃতি গীতিকাব্যে আন্তরিক অকৃত্রিম স্বদেশপ্রিয়তা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; মহাকাব্যাংশে বীরবাহু এবং বৃত্রসংহার। মনোভাবের সহিত কবিত্বের মিলন, ইহা সোণার উপর সোহাগা। জগতে যাঁহার কীর্ত্তি থাকে, তিনি অমর। কবিবর হেমচন্দ্র চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, শেষজীবনে চক্ষু হারাইয়া জীবিকার জন্য পর-প্রত্যাশী হইয়াছিলেন, ইহসংসার ত্যাগ করিয়া, সেই দুঃসহ যন্ত্রণার হাত এড়াইয়াছেন, সেই কারণে তিনি বাঁচিয়াছেন বলা যায়, বলাতেও দোষ হয় না, বাস্তবিক তাঁহার কীর্ত্তিই তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিল, তাহাতেই তিনি বাঁচিয়া রহিলেন; তিনি অমর!

এত কথা বলা হইল, একবারও আমরা কাঁদিলাম না, ক্রন্দনের সুরে একটা কথাও বলিলাম না, নিশ্বাস ফেলিয়া একবার 'হাঁয় হায়' ও করিলাম না, শোকসভা-সমূহের কোন সভ্য হয় ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জন্মভূমি কি এতই নিষ্ঠুরা!—এতই অকৃতজ্ঞ! জন্মভূমি নিষ্ঠুরা না হউন, জন্মভূমির পরিচালকেরা এতাদৃশ ঘটনায় সত্যই নিষ্ঠুর। আমরা নিষ্ঠুর কিন্তু অকৃতজ্ঞ নহি। এদেশে সভা করিয়া কাঁদিবার পদ্ধতি কতদিন প্রবৃত্ত হইয়াছে? বোধ হয় ২০।২৫ বৎসরের অধিক হইবে না। মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুতে শোকসভা হয় নাই, কেহ কেহ সংবাদ পত্রাদিতে কালি-কলমে কাঁদিয়াছেন, একথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু বক্তৃতায় 'ভেউ ভেউ' করিয়া কেহই কাঁদেন নাই। কবিবর হেমচন্দ্রের বিয়োগে আমরা তবে কেন কাঁদিব? ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে আমরা হাসিব। রঙ্গভূমির কবিরত্ন অমৃতলাল বসু জ্যোতিঃবিহিত শুষ্কনেত্রে নির্ভয়ে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন, "হেমচন্দ্রের মরণে আমি আনন্দিত হইয়াছি।" এই কথাই পাকা কথা। কাঁদিব কেন? বিয়োগ কোথায়! নশ্বরদেহ, নশ্বরজীবন, আসে আর যায়, যাঁহারা বাঁচিয়া থাকে, তাঁহারা পরম উৎসাহে বাঁচিয়া থাকিবার আশা করে, মহাভারতের মহাকবি বলিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সংসারে আশ্চর্য্য আর কি!

আর একটি কথা আমাদের। যাঁহাকে অমর বলিলাম, (কীর্ত্তিমান মহাপুরুষগণকে সকলেই অমর বলেন) যাঁহারা অমর, তাঁহাদের জন্য কি কাঁদিতে হয়? পূর্ব্বকথা স্মরণ করুন, বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতিকে দূরে রাখুন, জয়দেব গোস্বামীর জন্য কে কবে কাঁদিয়াছেন!

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, এই সকল দেশ-বিখ্যাত কবির লোকান্তরগমনে কে কবে সভা করিয়া কাঁদিয়াছিলেন, কেহই কাঁদেন নাই, নূতন নূতন কতিপয় আত্মীয়-বন্ধু মনে মনে কাঁদিয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার্য্য নহে, কিন্তু কেহই সভা করিয়া কাঁদেন নাই। তাহা বলিয়া কি সেই সকল অমর কবি আমাদের স্মৃতিপথ হইতে সরিয়া গিয়াছেন, বঙ্গের কাব্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহাদের স্মরণীয় নামগুলি কি বিলুপ্ত হইয়াছে? বিলুপ্ত হয় নাই,—বরং আরও অধিকতর জ্যোতির্ম্ময় হইয়া সমুজ্জ্বল রহিয়াছে। তবে আমরা হেমচন্দ্রের জন্য কেন কাঁদিব! যাঁহাদের কীর্ত্তি বিদ্যমান, তাঁহারা চিরজীবী; কীর্ত্তি অবিনশ্বর; কীর্ত্তিমান চিরজীবীর জন্য কাঁদিতে নাই।

আজকাল কেবল দেশের বড়লোকের বিয়োগে শোকসভা করিয়া রোদন করা হয়, এমন কথাও নহে; দেশী বিদেশী একজন কেহ প্রসিদ্ধ লোক মরিলেই শত শত লোক মিলিয়া সভায় সভায় রোদন করা হয়, ইয়োরোপের এবং আমেরিকার একজন মিষ্টভাষী বক্তার মরণে বড় বড় সভায় এদেশে ক্রন্দন-কোলাহল উত্থিত হইয়া থাকে। কেবল ক্রন্দনেই লোকের নিবৃত্তি হয় না, স্মরণার্থ চিহ্ন রাখিবার রকম রকম প্রস্তাব হয়। কেহ বলেন, একটা মুরদ খাড়া কর; কেহ বলেন, একখানা চিত্রপট ঝুলাও, কেহ বলেন, সেই নামে একটা লাইব্রেরী স্থাপন কর, ইত্যাদি ইত্যাদি উৎসাহসূচক ইচ্ছামত প্রস্তাব। সে সকল প্রস্তাবে কি ফল, তাহা আমরা বুঝি না।

মনে করুন, যাঁহারা দেশের উপকার করিয়াছেন, উপকারের উদ্দেশে যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন, বঙ্গের সাহিত্য-সংসারকে—কাব্য-সংসারকে যাঁহারা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহার কি স্মরণচিহ্ন আছে! রাজা রামমোহন রায়ের একখানি ছবি আছে, কলিকাতার পাবলিক লাইব্রেরী গৃহে এক পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্ত্তি আছে। বিদ্যাসাগরের ছবি আছে, কেশব চন্দ্রের ছবি আছে—এই প্রকার কতিপয় প্রসিদ্ধ লোকের এক একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে, বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়। আচ্ছা, বঙ্গের সাত-কোটি লোকের মধ্যে সেই সকল ছবি ক'জন লোকের চক্ষে পড়ে? কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোড সঙ্গমস্থলে কৃষ্ণদাস পালের এক কদর্য্য প্রস্তর মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; বঙ্গের ক'জন লোক সেই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃষ্ণদাসকে চিনিতে পারে?

এরূপ দৃষ্টান্ত অল্প হইলেও কলিকাতায় নিতান্ত অল্প বলা যায় না। অনেকগুলি বড় লোকের ছবি আছে, দু-একজনের পাষাণমূর্ত্তিও আছে; কিন্তু সে সকল মূর্ত্তি দেখিয়া কবি-মহিমা স্মরণ করা অনেক দূরের কথা! কবি-মহিমা কিসে প্রকাশ? কবি-বিরচিত কাব্য-গ্রন্থে। ভারতচন্দ্রের ছবি নাই, মূর্ত্তি নাই, অন্নদামঙ্গল বিদ্যাসুন্দর তাঁহার রত্নময়ী প্রতিমা, জয়দেবের গীতগোবিন্দ তাঁহার রত্নময়ী প্রতিমা, মাইকেলের মেঘনাদ বীরাঙ্গনা রত্নময়ী প্রতিমা, সেইরূপ আমাদের হেমচন্দ্রেরও ভারত-সঙ্গীত ছায়াময়ী বৃত্রাসুর প্রভৃতি তাঁহার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ, কবির কবিতা অক্ষয়রত্ন লোকের ঘরে ঘরে সে রত্ন বিরাজ করিতে পারে, সেই রত্ন অনন্তকাল স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন। সে রত্ন দর্শনে কবিকুলকে যাঁহারা স্মরণ করিতে না পারেন, একদিনের বক্তৃতা কখনই তাঁহাদিগের স্মৃতিতে সুমার্জ্জিত করিতে পারিবে না, একথা নিশ্চয়। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শোকসভায় যাঁহারা রোদন করেন, তাঁহাদের কাহারও চক্ষে এক ফোঁটা জল আইসে না। ভক্তিভাবে যাঁহাদের চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দৃষ্ট হয়, বক্তৃতা ফুরাইলেই তাহা শুকাইয়া যায়। তাদৃশী ভক্তি চিরস্থায়িনী, এমন কথা বলিতে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হয়।

স্মরণীয় চিত্রপট কাহাদের স্মরণের জন্য? যে সকল চিত্রপট বাজারে পাওয়া যায়, তাহা বরং পাঁচজনের নজরে পড়ে, যে সকল চিত্রমূর্ত্তি অথবা ধাতুমূর্ত্তি একটি ঘরে অথবা একটি স্থানে সংরক্ষিত, তাহা কদাচ সাধারণের চক্ষে পড়ে না, কবিকুলের কল্পনা-প্রসূত কাব্যরত্নগুলি সর্ব্বসাধারণের কণ্ঠহার হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ বিরল। কাব্য-সাহিত্যের রসাস্বাদনে যাঁহারা বঞ্চিত, সহস্র চিত্রপট তাঁহাদের চিত্ত টলাইতে অথবা মহাপুরুষগণকে স্মরণ করাইতে অসমর্থ।

চিত্রপট এককালেই আবশ্যক নাই, গঠিত প্রতিমায় সংসারের কোন উপকার হয় না, এমন কথাও আমরা বলিতেছি না, পাত্রবিশেষ আছে, যাঁহাদিগকে আমরা দেখি নাই, দেখিবার সম্ভাবনা নাই, ভক্তিপ্রকাশের জন্য তাঁহাদের প্রতিমা প্রয়োজন। কালী দুর্গা কৃষ্ণচন্দ্র রামচন্দ্র প্রভৃতি দেবদেবীগণের প্রতিমা বাঞ্ছনীয়। তাঁহাদের ফটোগ্রাফ নাই, কোন্ কোন্ মূর্ত্তি তাঁহাদের, কিরূপ মূর্ত্তি তাঁহারা ধারণ করেন, নিরূপণ করা মনুষ্যের অসাধ্য; কবিকল্পনায়—কবিকল্পিত শ্লোকানুসারে চিত্রকরের শিল্প-

নৈপুণ্যে সেই সকল মূর্ত্তি সুচিত্রিত; প্রকৃত মূর্ত্তি না জানিয়াও, চিত্রমূর্ত্তি না জানিয়াও চিত্রমূর্ত্তি দর্শনেও আমরা ভক্তি করি, সেই মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করি। মানুষের প্রতিমায় সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, গুণীপুরুষবিয়োগে যাঁহারা শোকসভা আহ্বান করেন, তাঁহাদের ক্রন্দন-সূচক বক্তৃতাগুলিকে কেবল 'ফাঁকা আওয়াজ' মনে করাও ঠিক নহে, বক্তৃতার উপসংহারে সকল সভাতেই স্মরণচিহ্ন রাখিবার জন্য চাঁদার প্রস্তাব হয়; কোন কোন প্রস্তাব কাজে লাগে, কোন কোন প্রস্তাব ভাসিয়া যায়; পুরাতন হইলে প্রস্তাবের কথা প্রায়ই মনে থাকে না। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ, পূর্ণচন্দ্র মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বিদ্যানুরাগী নীতিজ্ঞ পুরুষগণের ধাতুমূর্ত্তি অথবা চিত্রমূর্ত্তি অ-প্রার্থনীয় বোধ হয় না, কিন্তু যাঁহারা কবি, তাঁহাদের বিরচিত কাব্যগ্রন্থগুলির আদর ও সংরক্ষণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার স্মৃতি-চিহ্ন আমরা ততটা আবশ্যক মনে করি না। বিনা স্মৃতি চিহ্নে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কবিগণ সকলেই স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, স্মরণীয় হইয়াই সজীব রহিয়াছেন, অমূল্য কাব্যগুলি তাঁহাদের জীবন; কাব্যগুলিই তাঁহাদের অক্ষয়-স্মরণস্তম্ভ। ধরণী জলশায়িনী না হইলে অনন্তকাল পর্য্যন্ত কবিগণ স্মরণীয় হইয়া সজীব রহিবেন, এ কথায় বিসম্বাদ নাই। না কাঁদিয়া হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে আমরা সেই কথা বলিতেছি। শেষ জীবনে বহুকষ্ট ভোগ করিয়া হেমচন্দ্র স্বর্গধামে পশিয়াছেন, হেমচন্দ্র মরেন নাই, হেমচন্দ্র বাঁচিয়া আছেন, তাঁহার কাব্যগুলি দর্শন করিয়া নিত্য আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিব, নিত্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিব, ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া নিত্য আমরা তাঁহার পূজা করিব; কাঁদিব না।

এই কি রে সেই বৃন্দাবন ?

(১)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কোথা সেই বংশীবট, কোথা সে যমুনাতট,
পুলিন-বিহারী কোথা সে রাধারমণ ?
কোথা বা সে জলকেলি, গোপিনীর সনে মেলি,
কোথা সে কদম্বমূলে মুরলীবাদন,
কোথা সে রাখাল সনে গোষ্ঠবিহরণ ?

(২)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কাল জল যমুনার, বহে না উজান আর,
আকুলি পরাণ বাঁশী বাজে না এখন ;
তমালের কাল শাখে, আর না পাপিয়া ডাকে,
রসাল মুকুলে পিক করে না কূজন,
কোথা বা সে নিধুবনে নিধু-বিনোদন ?

(৩)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কোথা সে মা পুণ্যবতী, নন্দরাণী যশোমতী,
কোথা বা সে হলধর রেবতীরমণ ?
শ্রীদাম সুদাম দাম, কই বা সে বসুদাম,
কোথা বা সে সুবল-সখা কৃষ্ণের জীবন,
ধবলী-শ্যামলী-ধেনু কোথায় এখন ?

(৪)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
গগনে উঠিতে ভানু, আয় ভাই আয় কানু,
বেলা হ'ল গোঠে চল, যাবি রে কখন ?
কোথা গো মা নন্দরাণী, সাজায়ে দে নীলমণি,
রাখালের রাজা মাগো তোর কৃষ্ণধন,
কই ডাকে আসি এবে সে রাখালগণ ?

(৫)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
রূপসী আভীর বালা, নাচায়ে মেখলামালা,
মন্থন করিত দধি উঠিত মাখন,
কই সে মাখনলাল, ননী-চোরা নন্দলাল,
কই সে ব্রজের সখা ব্রজের জীবন,
কই গোপী কোথা আজি দধির মথন ?

(৬)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
নন্দালয়ে গোপ সব, কই করে মহোৎসব,
কই বা সে দধি-কাদা উল্লাস নর্ত্তন ?
কাঁপাইয়া ব্রজপুরী, কই সে নন্দের ভেরী,
আয় আয় ব'লে আর বাজে না এখন,
কই দধি ভারে ভারে আনে গোপগণ ?

(৭)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
সেই গোবর্দ্ধন গিরি, আছে শির উচ্চ করি,
কোথা সেই গিরিধারী শ্রীমধুসূদন ?
কালিন্দীর কাল জল, করিতেছে কল কল,
কই সে কালীয় কোথা কালীয়দমন,
কই সে রাখাল প্রাণ নীরদ-বরণ ?

(৮)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
গোপের তরুণী নিয়ে, যমুনায় তরী বেয়ে,
কই সে নবীন "নেয়ে" * যায় কি এখন ?
ঝিকেতে কাঁপিত "নায়" † দুলিত গোপিনী কায়,
পড়িত উছলি দধি ভিজিত বসন,
কই সে নাগর মাঝি রসিক-রতন ?

---

* "নেয়ে" নাবিক শব্দের অপভ্রংশ।
† "নায়" নৌকা শব্দের চলিত কথা।

(৯)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কোথা সেই রাধাকুঞ্জ, শোভিত কুসুমপুঞ্জ,
কোথা বা সে কালভৃঙ্গ মধুগুঞ্জরণ ?
কোথা সে মানিনী রাধা, কোথা পায় ধ'রে সাধা,
কই সে শ্যামের শিরে শ্রীরাধাচরণ,
নবীন পল্লব স্মর গরল খণ্ডন ?

(১০)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কোথা চারু চন্দ্রাবলী, ফুটন্ত কুসুমকলি,
কই কৃষ্ণসনে কুঞ্জে নিশি জাগরণ ?
কপালে সিন্দূরমাখা, কই সে ত্রিভঙ্গ বাঁকা,
কোথা সে প্রভাতে রাধাকুঞ্জে আগমন,
ঘুমঘোরে ঢুলু ঢুলু বঙ্কিম নয়ন ?

(১১)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
ললিত কমলমুখী, কই সে ললিতা সখী,
অঞ্জনে রঞ্জিত কিবা খঞ্জন নয়ন ?
চারুচিত্র লেখা কোথা, কোথা সে লবঙ্গলতা,
অনঙ্গমঞ্জরী কোথা চারু দরশন,
ভ্রূভঙ্গে যাহার কামধনুর ভঞ্জন ?

(১২)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কদম্ব-যুগল বক্ষে, নীলোৎপল দুই চক্ষে,
কই সে বিশাখা সনে কৃষ্ণ সম্ভাষণ ?
পরিধানে কালবাস, মুক্ত কাল কেশপাশ,
কাল আঁখি পাশে কাল কাজল কেমন,
কই আসে কাল সখী কালার সদন ?

(১৩)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কই বৃন্দা রসবতী, কামদূতী কলাবতী,
কই সে ঘটায় আজি বল অঘটন ?
দেখাইয়ে দাসখত, কৃষ্ণনাম দস্তখত,
কই কৃষ্ণে আনে রাইরাজার সদন,
কোথা সেই নাক-খত দোষের মার্জ্জন ?

(১৪)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কোথা রাইরাজা হায়, কৈ সে দ্বারী শ্যামরায়,
বাঁশী ছাড়া অসিধারী মুরলীবদন ?
করিয়ে দস্তক জারী, ভাঙ্গিতে শ্যামের জারী,
পরোয়ানা লয়ে বৃন্দা আসে কি এখন,
রাজার হুকুমে ধূর্ত্তে করিতে বন্ধন ?

(১৫)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
রাধার মানের দায়, কই বা সে শ্যামরায়,
যোগিবেশে দ্বারে দ্বারে করেন ভ্রমণ ?
কটিতে কৌপিন ধটী, চাঁচর কেশেতে জটি,
ত্যজিয়ে চন্দন অঙ্গে ভস্ম বিলেপন,
"জয় রাধে" বলে আসি কই সম্বোধন ?

(১৬)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কটিতে বসন আঁটা, বিষম বুকের পাটা,
কোঁদলে তুফান ব'য়ে যায় অনুক্ষণ ?
ফলাইয়ে সতীপনা, ধরা দেখে সরাখানা,
গরবে মাটীতে নাহি পড়িত চরণ,
সে জটিলে সে কুটিলে কোথায় এখন ?

(১৭)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কই সে নাগরী হাট, নারীকুঞ্জরের নাট,
ধরিতে সে কালাচাঁদে নাগর রতন ?
কই সে গোপের নারী, আনিতে যমুনাবারি,
ছল করে দলে দলে করে বা গমন,
"শাশুড়ী ননদী অরি" কোথায় এখন ?

(১৮)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কোথা বা সে বনমালী, বনমাঝে কৃষ্ণ-কালী,
রাধা হেতু আয়ানেরে করিতে বঞ্চন ?
কোথা রাধা-বিনোদিনী, কাঁচাসোণা কমলিনী,
রাঙ্গা-জবা-রাঙ্গাপদে করে গো অর্পণ,
নয়নগলিত নীরে পাখলি চরণ ?

(১৯)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
রাধার কলঙ্ককালী, মুছাইতে বনমালী,
বৈদ্যবেশে ব্রজে আর কই আগমন ?
জটিলার সতীগর্ব্ব, সকলি করিয়ে খর্ব্ব,
পোড়ামুখী কুটিলার পোড়ায়ে বদন,
কে গায় মধুর পালা কলঙ্ক-ভঞ্জন ?

(২০)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কই বা সে শুকশারী, নিকুঞ্জ কাননচারী,
পড়ে না ত রাধাকৃষ্ণ পড়িত যেমন ?
দ্বন্দ্ব করি শারীসনে, শুকমুখে এইক্ষণে,
শুনি না "আমার কৃষ্ণ মদনমোহন",
শারীমুখে রাধা বিনা শুধুই মদন ॥

(২১)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কই বা সে রাসেশ্বর, বাঁকা শ্যাম মনোহর,
শিখিচূড়া বামে হেলা সে পীতবসন ?
নবীন নীরদ পাশে, কই সৌদামিনী ভাসে,
রাধাসতী রাসেশ্বরী কষিত কাঞ্চন,
অথবা তমালে স্বর্ণ-লতিকা যেমন ?

(২২)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কই সে গোপিনীকুল, তুলি আনি বনফুল,
বিনা সূতে গাঁথি মালা সুচারু চিকণ ?
দোলায়ে শ্যামের গলে, প্রেমানন্দে কুতূহলে,
চাঁদের জোছনা মাখি করয়ে নর্ত্তন,
কই বা সে রাখালের মধুর কীর্ত্তন ?

(২৩)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
গগন আসনে বসি, কই বা সে রাকাশশী,
কালশশী অঙ্গে করে সুধা বরিষণ ?
রাসে গোলোকের হরি, বামে রাধা প্রাণেশ্বরী,
হেরিবারে সে মধুর যুগল-মিলন,
কই বা বিমানপথে আসে দেবগণ ?

(২৪)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
হেরি হরি মহারাসে, কই সে উদ্ধব ভাসে,
নয়ন-সলিলে আহা প্রেমে নিমগন ?
বীণায় তুলিয়া তান, গাই হরিগুণ গান,
কই দেব-ঋষি ব্রজে করে আগমন,
হেরিতে যুগলরূপ মধুর মিলন ?

(২৫)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
সেই ত বসন্তোদয়, সেই ত মলয় বয়,
সেই ত গগনে রাকাশশী সুশোভন,
কই শ্যাম কই দোলে, লয়ে কিশোরীরে কোলে,
শ্রীঅঙ্গে আবির রাগ কুঙ্কুম লেপন,
কালিন্দীর জলে যথা কিংশুক কাঞ্চন ?

(২৬)

এই কিরে সেই বৃন্দাবন ?
কই সে গোপের নারী, শৃঙ্গকে (১) কুঙ্কুম বারি,
শ্যাম অঙ্গে প্রেমরঙ্গে করে প্রক্ষেপণ ?
ত্রিযামার শেষ যামে, কই বা এ ব্রজধামে,
দেবদোলে আগমন করে দেবগণ,
দোলাইতে রাধাসনে শ্রীমধুসূদন ?

(২৭)

আর কিগো আছে বৃন্দাবন !
যেদিন অক্রূর আসি, কাঁদাইয়া ব্রজবাসী,
ল'য়ে গেল কৃষ্ণধনে মথুরা ভুবন,
কাঁদিল গোপের বালা, সাধের মধুক মালা,
হইল জপের মালা ভাসিল নয়ন,
উঠিল জুড়িয়া ব্রজ আকুল রোদন ?

(২৮)

তদবধি সেই বৃন্দাবন,
চিরতরে ডুবে গেল, ফিরে কৃষ্ণ নাহি এল,
কৃষ্ণ ব'লে ব্রজবাসী ত্যজিল জীবন।
এখন সে স্বপ্নকথা, জাগায় মরমে ব্যথা,
আর কি জীবনে পাব কৃষ্ণ দরশন।
কৃষ্ণ বিনা বৃন্দাবন শুধু এবে বন ॥

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

(১) "শৃঙ্গক"—পিচকারী।

"বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি।"

কথাটা আমাদের অভয়দাতা ভয়ত্রাতা মধুসূদনের বিরাট হৃদয়াকাশে একদিন জলদগম্ভীরনাদেই নিনাদিত হইয়াছিল। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রেই ইহার মহাপ্রসঙ্গ,—ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রেই ইহার প্রথম ধ্বনি।—প্রতিধ্বনি—নৈমিষারণ্যের মহাবেদিকায়,—মহর্ষি ব্যাসদেবের বিশাল হৃদয়ে। নারায়ণ-চরিত্র মহর্ষি মহানন্দে গাহিলেন,—"বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি!"—গানে তান সংযোজনা করিতে গিয়া, আর্য্য-ঋষি-মণ্ডলীর পবিত্র হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল,—"বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি!" সমগ্র আর্য্যভূমির দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিল, "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি!" আমাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্বপুরুষগণ এই মহাবাক্যের মহামর্ম্ম মর্ম্মগত করিয়াছিলেন। মর্ম্মগত করিয়াছিলেন বলিয়াই—বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমরা জগতীতলে আর্য্য-সন্তান নামে অভিহিত হইতেছি,—আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরবাচলের উচ্চ-চূড়ে অধিরূঢ় রহিয়াছি। আমাদের কন্দমূলফলাশী বনবাসী তপস্বী সেই স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষগণই এই গৌরবগিরি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, আমরা ইহা রক্ষা করিতে—এই পবিত্র গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে কতদূর সমর্থ হইতেছি,—পূর্ব্বপুরুষগণের এই অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ সুদৃঢ় করিতে কতটুকু আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি, তাহা কি একবার ভাবিয়া দেখা আমাদের উচিত নয়? মুখে উচ্চবংশীয় বলিলেই কি বংশমর্য্যাদা রক্ষা হয়? কখনই নহে। কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে—পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিতে হইলে, কুলগত আচার-পদ্ধতির প্রতি অকৃত্রিমভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে,—অকৃত্রিম ভাবে কুলগত আচার-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে হইবে, তবেই জন্ম সার্থক হইবে—জীবন কৃতার্থ হইবে। এখন, "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি" কথাটা বুঝিয়াছিলেন আমাদের প্রাচীন আর্য্যসমাজ,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ। সেই মনস্বীগণের পবিত্র বংশোদ্ভব,—সেই জগৎপূজ্য আর্য্যকুলের ধুরন্ধর আমরা এই কথাটার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে কি সমর্থ হইয়াছি?

কথাটা বুঝাইবার জন্য একদিন শ্রীধর স্বামী বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধি নাশাৎ মৃত্যু তুল্যো ভবতি।" অর্থাৎ বুদ্ধিনাশ হইলে জীবিত থাকিয়াও মানব মৃতরূপে পরিগণিত হয়। আর্য্যসন্তান আমরা, আমাদের পিতৃপুরুষ-

...নের মহাপদ "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি" আজ এই কথাটার ... নিমগ্ন হইলে, হৃদয় কেন চমকিয়া উঠে?—মন কেন বিস্মিত হয়?—প্রাণ কেন কম্পিত হয়? এ কথার উত্তর কে দিবে?—কার কাছে গেলে অশান্ত প্রাণে বিমল শান্তি লাভ করিব? হায়! কুটিল কাল-চক্রের অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনে আমরা যে আজ এ গীতধ্বনি হইতে অনেক দূরে আসিয়াছি। আবার একটু সূক্ষ্মরূপে ভাবিয়া দেখিলে, পবিত্র আর্য্য-সন্তান আমরা আজ এই কথাটার দৃষ্টান্তস্থলে উপনীত হইয়াছি বলিয়াই বিবেচিত হয়। তাই আজ আমাদের প্রাণ কাঁপিয়া উঠে,—মন উত্তাল-তরঙ্গপূর্ণ বিস্ময়সাগরে পতিত হয়,—হৃদয়—দামিনী-চমকে চমকিতে থাকে। বৈদান্তিক মীমাংসাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, একটা গুরুগম্ভীর বচন আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারি,—মর্ম্মে মর্ম্মে আমরা তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। "বেদান্ত বলিতেছেন, "নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তি বুদ্ধিঃ।" অন্তঃকরণের সেই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিটুকু আমরা পদে পদে ধারণা করিতে পারি। আমরা নিশ্চয় জানি যে, আমরা আর্য্যকুলধুরন্ধর, আমরা নিশ্চয় জানি যে, আর্য্যরীতি, নীতি, আর্য্যাচার পদ্ধতি ত্রিজগতের সাদরগ্রাহ্য। রাজনীতি বল, ধর্ম্মনীতিই বল, সমাজনীতিই বল,—এ নীতিমালা কে প্রসব করলে? কিম্বা কোন্ সৌধ অট্টালিকায় ইহার উদ্ভব হইয়াছে! কিম্বা রাজনীতি,—সমাজনীতি—ধর্ম্মনীতি কোন্ রাজার মস্তিষ্কচালনার ফল? রাজনীতি—সমাজনীতি—ধর্ম্মনীতি আমাদের কন্দমূলফলাশী বনবাসী তপস্বী সেই আর্য্য মনস্বীগণের—আমাদেরই পূজ্যপাদ পিতৃপুরুষগণের বিমলহৃদয়জাত চিন্তালতার চিরঅম্লান কুসুম। এ কুসুম অগ্রে তপোবনেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—সৌরভে সমগ্র মেদিনীমণ্ডল আমোদিত করিয়াছে। এ কথা জানি বলিয়াই মনে মনে গৌরবানুভব করি। কিন্তু কার্য্যে কি তাহা দেখাইতে পারিতেছি,—কার্য্যে কি সে গৌরব প্রকাশ করিতে পারিতেছি! আমরা মুখে বলিতেছি, আর্য্য-সন্তান,—অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি-বলে মনে প্রাণে আমাদের আচার-প্রণালী অবগত আছি। কিন্তু তত্ত্ব আমাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। তাহাতে আমরা এতদূর বিকৃত হইয়াছি যে, "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি" কথাটার দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে আমাদের ন্যায় সনাতন আর্য্য-কুলোজ্জ্বল ভিন্ন দ্বিতীয় কাহারও প্রতি লক্ষ্য হইবে না। ইংরেজ আমাদের

রাজা,—ইংরাজ আমাদের দণ্ডমুণ্ডের অধিকারী। কিন্তু বল দেখি ভাই, আমাদের শাসন করিতে হইলে ইংরেজকে কি পৃথক কোন রাজনীতির সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়? সেই কন্দমূলফলাশী বনবাসী তপস্বী ব্যাসদেব, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা মনু প্রভৃতি মনীষীগণ নির্জ্জন অরণ্যে গগনাচ্ছাদিত মৃণ্ময়বেদিকায় বসিয়া বৃক্ষশাখায়—বৃক্ষনির্য্যাসে—বৃক্ষপত্রে যে শাসননীতির প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, ইংরাজরাজ সেই মহানীতির অনেকাংশ সসম্মানে শিরোধারণ করতঃ আজ মণিময় প্রাসাদে—মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আমাদের উপরেই তাহার সদ্ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু হিন্দু আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, সেই পিতৃনীতি পদে পদে লঙ্ঘন করিতেছি। আজ চৌর্য্যপরাধে রাজা আমায় কারাবাসে দিলেন, প্রহার করণাপরাধে অর্থদণ্ড করিলেন, অসদ্ব্যবহারাপরাধে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। বল দেখি ভাই, এ দণ্ডগুলি কি সেই আমাদেরই স্বর্গীয় পূজ্যপাদগণের মহান্ আদেশ নহে? আবার তাঁহাদের এই দণ্ডনীতির মধ্যে যে সমস্ত গুরুতর দণ্ড নিহিত রহিয়াছে, দয়াময় ইংরাজরাজ তাহার মধ্যে অনেকগুলি পরিহার করিয়াছেন। অবশ্য এজন্য ইংরাজরাজ আমাদিগের নিকট ধন্যবাদার্হ; কিন্তু আমাদের একি ব্যবহার! পদে পদে পিতৃবাক্য লঙ্ঘন করিতেছি, পদে পদে দণ্ডনীয় হইতেছি। তাহার পর আমাদের সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির কথা। ইংরাজ আমাদের রাজা, ইংরাজ ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন সমাজের সেবক হইয়া আমাদের সমাজনীতি ও আমাদের ধর্ম্মনীতির উপর অনুমাত্রও রাজশক্তির সঞ্চালন করেন নাই, করিতেছেন না,—আবার এ হেন সুযোগ্য রাজাদ্বারা যে কখনও আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইবে, তাহা কখনই মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য—এমনই হীনবীর্য্য যে, এমন রাজসুযোগ প্রাপ্ত হইয়াও স্বেচ্ছাক্রমে আমাদের সেই সনাতন ধর্ম্মনীতি,—সেই উৎকৃষ্টতম সমাজনীতি বিস্মৃতির অতলজলে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি! মনে আমরা আর্য্যসন্তান বলিয়া গৌরবানুভব করিতেছি,—কিন্তু প্রাণ হইতে এই সমস্ত মহানীতির মহাতত্ত্ব মুছিয়া ফেলিতেছি। কথায় কথায় এখন আমাদের পাশ্চাত্য অনুকরণ। পাশ্চাত্য সভ্যতা না দেখাইতে পারিলে—পাশ্চাত্য বিদ্যা না শিখিতে পারিলে, পাশ্চাত্য ধর্ম্ম না ধরিতে পারিলে, এখন আর আমাদের বিজ্ঞানলিপ্সা পরিতৃপ্ত হয় না,—ঈশ্বরানুকূল্য পাওয়া যায় না, এইরূপ একটা

বিকৃত ধারণা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু যাঁহাদের আচারপদ্ধতির অনুকরণ করিবার জন্য আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়াছি,—আমাদের ইহপরলোকসাধ্য কর্ম্ম-ধর্ম্ম অসঙ্কুচিতচিত্তে পরিবর্ত্তন করিতেছি, অকুণ্ঠিতভাবে অশন বসন পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিতেছি, বিলাসব্যসনে বিব্রত হইতেছি, তাঁহারাই কি আমাদের সসম্মানে স্বসমাজভুক্ত করিতেছেন? মূলে—এই বিজাতীয় অনুকরণ ফলে আমাদের প্রকৃষ্ট নীতিতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া প্রাণে অশেষবিধ অশান্তি ভোগ করিতেছি। বল দেখি ভাই, শতকের মধ্যে কয়টী ব্রাহ্মণসন্তান আপনাদের ব্রহ্মাণ্য বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন! অন্য কথা দূরে থাক্, শতকের মধ্যে কয়টী ব্রাহ্মণ ত্রৈকালীন সন্ধ্যাবন্দনায় মনোনিবেশ করিয়া থাকেন? ক্ষত্রিয়ের কথা ত এক প্রকার আলোচনা না করিলেও অত্যুক্তি হয় না! উপস্থিত যাঁহারা রাজদণ্ড ধারণ করিয়া দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কতজন ক্ষত্রিয় পাশ্চাত্য ভাব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন? বৈশ্য, শূদ্র, কায়স্থ প্রভৃতি সমাজেই বা শতকরা কতজন আর্য্যনীতি রক্ষণে পরিন্যস্ত রহিয়াছেন? লাভে হইতে আমরা কালক্রমে আমাদের হৃদয়রত্ন হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছি, মাথার মণি পদদলিত করিতেছি। ইহাই কি বুদ্ধিনাশের পরিচায়ক নহে? বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষির জননী আর্য্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া—বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষিশিক্ষার জন্য এখন প্রবাস বাসে দিনযাপন করিতেও আমরা কুণ্ঠিত নহি। এইরূপ আমরা শারীরিক, সংসারিক, সামাজিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক নীতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া কি পূজ্যপাদ শ্রীধরের অধর বিধূনিত সেই "মৃত্যুতুল্যো ভবতি" কথার দৃষ্টান্তস্থলে দণ্ডায়মান হই নাই? ভাই, বিনাশ আর কাহাকে বলে? ইহারই নাম বিনাশ,—ইহার নাম বুদ্ধিনাশ। জগন্ময় জনার্দ্দন এক অর্জ্জুন উপলক্ষে অনন্তকোটীর প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন,—এক অর্জ্জুন উপলক্ষে অনন্তকোটীর প্রতি "বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি" বাক্যে মহোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আর্য্যসন্তান আমরা, মনে আমাদের এখন গৌরবের সীমা নাই, কিন্তু কার্য্যে আমরা কি—

"সম্ভাবিতস্যচাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে।"

এই কথাটার বর্ণে বর্ণে সত্যতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদান করিতেছি না!

শ্রীজলধর সেন।

আশা-প্রসূন।

কোথা হ'তে কেবা আনিল বীজটী
পাখীতে অথবা বাতাসে ;
গজায়ে শিকড় ধরিল সাপটি
—রহিল বাঁধা বাঁধিয়া সে।
কত খেটে খেটে, মুখ চেয়ে চেয়ে
বাড়ানু তাহারে যতনে ;
আসক্তি-সলিলে ভালবাসা ছায়ে
সান্ত্বনার বেড়া বেড়নে।
কতই ভাবনা—দেখিতে মুকুল
ঐ ধরে ধরে ধরে না ;
কতকাল পরে, যদি বা ধরিল
ঐ ফুটে ফুটে ফুটে না !
অই সে ফুটিল, মধু লুটি যাই
নিয়ে গেল হায় ! পেনু না ;
প্রবল ঝটিকা, ফেলে মোরে অই
শোক-কূপে, দিয়ে বেদনা !
প্রকৃতি সুন্দরী, ধরি দিবানিশি
ভাসিলে নয়ন-সলিলে ;
জাগ কুমুদিনী, হাসি হাসি হাসি
(যেন) জুড়াতে যাতনা-অনলে।
তথা ভাবি ভাবি, সারাদিন ধরি
লুটাইয়া পড়ি যখনি,
কোথা হ'তে আসি, যায় উঁকি মারি
মরি মরি সেত ভুলেনি !

"শ্রীঃ——"

জন্মভূমির জন্মোৎসব।

আজি দেখিতে দেখিতে একাদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইল। আমাদিগের সর্ব্ব-কল্যাণদায়িনী জন্মভূমি দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। দ্বাদশবর্ষ, বড় সাধারণ কথা নহে ; গণিতশাস্ত্রানুসারে দ্বাদশ বর্ষে এক যুগ হয়, এই যুগকালের মধ্যে পৃথিবীর কত পরিবর্ত্তনই দেখিলাম। যাহারা বাল-সুলভ-চপলতাপূর্ণ ছিল, তাহারা এক্ষণে যৌবনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, গম্ভীরভাবে সংসার-ভার বহন করিতেছে। উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা বহুদর্শী উপদেষ্টার পদে সমাসীন। চপলা বালিকারা মাতৃভাবপূর্ণা। অর্থবোধ অসাধ্য ভাবিয়া, বিদ্যালয়ে ছাত্রগণ যে সকল পুস্তক স্পর্শ করিতেও ভয় করিত, এই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে তাহারাই আবার সেই সকল গ্রন্থের উৎকৃষ্ট সমালোচক। বঙ্গের সূর্য্যস্বরূপ কত প্রাচীন লেখক চিরদিনের মত অস্তমিত, কতই অপ্রতিথনামা নবীন লেখক নবানুরাগে সাহিত্যসংসারে অভ্যুদিত হইতেছেন। এই দ্বাদশ বর্ষের মধ্যে কতশত পত্রিকারই অভ্যুদয় বিলয় দেখিলাম। কিন্তু জগন্মাতার কৃপায় "জন্ম-ভূমি" সমভাবেই রহিয়াছে, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মূর্ত্তিই দেখিতেছি। যাঁহা-দের কৃপায় পত্রিকাখানি যুগান্তস্থায়ী হইল, সেই পরমশ্রদ্ধাভাজন জন্মভূমির প্রিয় পুত্রগণের নিকট কেবলমাত্র আমরা নহে, প্রত্যেক ভারতবাসীই ঋণী। তাই আজি নববর্ষের প্রারম্ভে গ্রাহকগণের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়াছি। যাঁহাদিগের কৃপায় "জন্মভূমি" যুগান্তস্থায়ী হইল, আশা করি, তাঁহাদেরই অনুগ্রহবলে পত্রিকাখানি অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।

আর যে সকল মাতৃভক্ত মহাত্মা, জন্মভূমিকে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পাদি দ্বারা ভূষিতা করিতেছেন, যাঁহাদিগের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমে জন্মভূমি ক্রমশঃই পুষ্টকলেবরা হইতেছে, আজি বর্ষারম্ভে তাঁহাদিগকে আমরা যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ ও অভিবাদনান্তে নিবেদন করিতেছি যে, তাঁহাদিগের নিজস্ব বলিয়া জন্মভূমির প্রতি চিরদিনই যেন তুল্যদৃষ্টি থাকে। আরও বলি, আমাদিগের পৃষ্ঠপোষক ও লেখকগণ সকলেই প্রথিতনামা ; জন্মভূমির সেবায় তাঁহা-দিগের যশোরবি উজ্জ্বলতর না হইলেও নিজস্ব বলিয়া মাতৃসেবায়, কর্ত্তব্য পালন হইবে, সন্দেহ নাই।

পাঠক পাঠিকাগণ! এস দেখি একবার সকলে মিলিয়া সমস্বরে বলি, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" একবার মনশ্চক্ষে আর্য্যপূজিতা,

শস্যশ্যামলা, মাতৃভূমির মনোমুগ্ধকর বিরাটরূপ ভাব দেখি, মস্তকে তুষার-মণ্ডিত, ধূর্জ্জটি-বাঞ্ছিত, মণিরত্নোজ্জ্বল হিমাদ্রি; পাদদেশে চিরনীলিমাময়, তরঙ্গসঙ্কুল রত্নাকর; সর্ব্বস্থানই পুণ্যময়, ধর্ম্মময়, তীর্থময়, এমন আর কোথাও দেখিয়াছ কি? শৌর্য্য বীর্য্যের আবাসস্থল, পাণ্ডিত্যের আকর, ধর্ম্মের লীলাভূমি এমন আর কোথাও দেখিয়াছ কি? এমন অলিকুলগুঞ্জিত, কোকিল-কূজিত, নববসন্তের মারুত হিল্লোলের মত মনোমুগ্ধকরী ভাষা আর কোথাও কি আছে? আর কোথাও কি এমন প্রতিভাপ্রদীপ্ত, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক, অনন্তজ্ঞানপরিচায়ক, অপূর্ব্ব কৌশলময় ষড়দর্শনের গভীর রহস্য বিস্তার আছে? আমাদের জন্মভূমিতে যাহা খুঁজিবে, তাহাই পাইবে। রাজার আদর্শ বল, বীরের আদর্শ বল, জ্ঞানীর আদর্শ বল, ভক্তের আদর্শ বল, সতীর আদর্শ বল, নাহি কি? আমরা অকৃতজ্ঞ, তাই এমন বিবিধ জ্ঞানময়ী জন্মভূমির দিকে ফিরিয়াও দেখি না; মাতৃসেবার জন্য অত্যল্প স্বার্থও ত্যাগ করিতে পারি না। ভাষা পাই না, যাহাতে আমাদের জন্মভূমির বিরাট-মূর্ত্তির স্বরূপ প্রকাশ করি। তাই মা, আমাদিগের অভাব বুঝিতে পারিয়া, ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে তাঁহার দীন সেবকদিগের নিকট পত্রিকারূপে প্রকটিতা হইয়াছেন। শ্রাবণ মাসে পরিপূর্ণ বরষায় আমাদিগের চির সরসা জন্মভূমির অঙ্কুরোৎপত্তি। মাঠ, ঘাট, বিল বর্ষার জলে নিমগ্ন; জন্মভূমির সন্তানগণ আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রতি বর্ষে এমনি ভাবে আমরা মায়ের নূতন কলেবর দেখিতে পাই; দেখিতে পাই, মা আমার ঈষৎ বিকশিতা হইয়া সন্তানগণের জন্য সারা বর্ষের মঙ্গল প্রসব করিতেছেন। এস ভাই, মাতৃসেবকগণ! আমরা সকল সন্তান মিলিয়া, আমাদের রাজরাজেশ্বরী জন্মভূমির অর্চ্চনা করি। এস ভাই সকল! পূরাতন ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, নূতন ভাবে নব কলেবরা, মঙ্গলদাত্রী জননী জন্মভূমির জন্মোৎসব করি। একবার সমস্বরে বলি,—

"বন্দে মাতরং
সুজলাং সুফলাং
শস্য শ্যামলাং
মলয়জ শীতলাং
বন্দে মাতরং॥"

শ্রীদেবব্রত কবিরত্ন।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

দ্বাদশ বর্ষ। } ভাদ্র, ১৩১০ সাল। { ২য় সংখ্যা।

মানবের ভবিষ্যৎ। *

কাল অনন্ত! এই বিঘূর্ণিত অনন্ত কালচক্রে পতিত মানব! তুমিও অনন্তকাল ঘূরিতেছ। লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া, লক্ষ লক্ষবার বহুরূপী সং সাজিয়া মানব! তুমি এই মানবরূপ ধারণ করিয়াছ। এই মানবত্বই অনন্ত জীবজগতের স্পৃহনীয়, চরম লক্ষ্য। এক্ষণে একবার ভাবিয়াছ কি, এই মানবত্বই লক্ষ লক্ষ যোনি ভ্রমণের, লক্ষ লক্ষবার সং সাজিবার চরম লক্ষ্য। যাহার জন্য কত আয়াস, কত ক্লেশস্বীকার, কত আকাঙ্ক্ষা করিয়াছ, তাহাই ত এক্ষণে প্রাপ্ত হইয়াছ। তবে কেন এই মানবদেহ ধারণের উদ্দেশ্য ভাব ভুলিয়া আছ? অসার সংসার-রসে মজিয়া মুগ্ধের ন্যায়—বাতুলের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছ? প্রবৃত্তি যাহা শুনায়, তাহাই শুন; যাহা দেখায়, তাহাই দেখ; যাহা করায় তাহাই কর। এই প্রবৃত্তি-সুন্দরীর প্ররোচনায় বিমুগ্ধ হইয়া এতকাল ত তাহারই অভীপ্সিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছ। তবু কি তোমার এ মোহমায়া ঘুচে না, আশু মনোহরা তৃপ্তিসুখ-দানে তৎপরা প্রবৃত্তির প্রলোভন বুঝিয়াও বুঝ না কেন? চিরশান্তিময়ী নিবৃত্তির শান্তিময় ছবি, প্রশান্ত মূর্ত্তি, চাকচিক্যহীন সরল প্রতিমা দেখিয়া তোমার মনঃপ্রাণ মুগ্ধ হয় না কেন? নিবৃত্তির চরণে তোমার মস্তক নত হয় না কেন? নিবৃত্তির পিচ্ছিল মার্গে গমন করিতে তোমার অনভিলাষ কেন?

* দত্তপাড়া হরিসভায় প্রদত্ত পণ্ডিত শ্রীভবানীচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ।

মরীচিকা ভ্রান্ত মৃগ তৃষ্ণা নিবারণার্থ যেমন বৃথা ছুটিয়া আক্রান্ত হইয়া প্রাণ হারায়, প্রোজ্জ্বল দীপশিখার অপরূপ রূপ দেখিয়া তদালিঙ্গনে পতঙ্গ যেমন দগ্ধ হয়, ব্যাধিগীতির মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া হরিণ যেমন ফাঁশে আবদ্ধ হইয়া জীবন হারায়, মানব! তুমিও তেমনই প্রবৃত্তির প্রলোভনে—কামিনী-কাঞ্চনের মোহমন্ত্রে ভুলিয়া বৃথা প্রাণ হারাইতেছ! এই দুর্লভ মানবজন্মের সাফল্য, উদ্দেশ্য,—ভাব না বুঝিয়া, না ভাবিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছ! পশ্বাদি প্রাণিপুঞ্জের অপেক্ষা আপনাকে অধিক সুখী ভাবিয়া বৃথা আনন্দ প্রকাশ করিতেছ। প্রবৃত্তি-প্রদত্ত সুখ বর্ত্তমান-কালে উপভোগ করিতেছ ভাবিয়া, আপনাকে কত সুখী বোধ করিতেছ। প্রকৃতপক্ষে ইহাই কি তোমার প্রকৃত সুখ? ইহাই কি তোমার মানব জন্মগ্রহণের মূল উদ্দেশ্য—চরম লক্ষ্য? ইহাই যদি তোমার প্রকৃত সুখ হয়, তবে সুখের পর দুঃখভোগে ব্যথিত হও কেন? তথঙ্গোচ্ছলিত সমুদ্রে পতিত ব্যক্তি যেরূপ মধ্যে মধ্যে মুখোত্তলনজন্য ক্ষণিক সুখ প্রাপ্ত হয়, পরক্ষণেই আবার অপর তরঙ্গ আসিয়া যেমন তাহাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ দুঃখ-তরঙ্গ-সঙ্কুলিত সংসার-সমুদ্রে ভাসমান মানব! তুমি মধ্যে মধ্যে যে মুখোত্তলন করিতেছ, তাহা একটী দুঃখতরঙ্গের পর অপর আর একটী দুঃখ-তরঙ্গ আসিবার মধ্যবর্ত্তী অবকাশ কালমাত্র। ইহা প্রকৃত সুখ নহে, ইহাকে সুখাভাস কহে। এজন্য বিবেকী মহাত্মগণ ঈদৃশ ক্ষণস্থায়ী নশ্বর দুঃখবিমিশ্রিত সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া গণনা করেন না। এই দুঃখসম্বিদ্ধ সংসারে অমিশ্রসুখ বা অমিশ্র দুঃখ নাই। সুখ দুঃখ বিমিশ্রিত ভাবে যেন সমবায়ে মিলিত অবস্থায় রহিয়াছে। এই বিমিশ্রিত সুখ প্রকৃত সুখ নহে বলিয়াই তুমি পুনঃ পুনঃ গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছ। প্রকৃত সুখ কি? তোমার এ জন্মের উদ্দেশ্য—লক্ষ্য কি? যদি জানিতে চাও, তবে তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের প্রকৃত তথ্য কি, তাহা আলোচনা কর। তুমি যে পশ্বাদি নীচ প্রাণিদিগের অপেক্ষা মহান্, বিবেকবুদ্ধি দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার কর। তাহা হইলে মানব! তোমার এই মানবজন্মগ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য, চরম লক্ষ্য কি, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, নীচপ্রাণী অপেক্ষা উচ্চ, মহান্ কেন, তাহা বুঝিতে পারিবে, প্রবৃত্তির নিয়োজিত কার্য্য যে তোমার অকার্য্য, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

এই যে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম পঞ্চভূতসমষ্টি অনন্ত প্রকৃতি, এই যে

প্রোজ্জ্বল সূর্য্যচন্দ্রগ্রহাদি সমুদ্ভাসিত অসীমজগৎ, এই যে পরিদৃশ্যমান বিশাল বিরাট ব্রহ্মাণ্ড, ইহা অনন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাণীপুঞ্জ পরিপূরিত। ইহা দেখিলে, ভাবিলে হৃদয় মহদ্ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে, ভাবে দেখিলে ইহা চারি প্রকার প্রাণীর সমষ্টি মাত্র বলিয়া প্রতীতি হয়। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ, এই চারি বিভাগে প্রাণীপুঞ্জ বিভক্ত। যে সকল প্রাণী ভূমিভেদ করিয়া উর্দ্ধে উত্থিত হয়,—তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ কহে। তরু, গুল্ম, লতা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ প্রাণী। ইহাদিগের কিঞ্চিৎ পরিমাণে আভ্যন্তরিক জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। মূলদেশে জল সেচন করিলে অঙ্কুর শাখাপল্লবাদি উদ্গম হয়। এতন্নিবন্ধন আভ্যন্তরিক প্রীতি-উল্লাস প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাই ইহাদিগের জীবিতাবস্থা। মূলাদি যখন রস আকর্ষণ করিতে না পারে বা না পায়, সেই সময় ইহাদিগের শাখাপল্লবাদি শুষ্কভাবাপন্ন হয়; সেই সময় ইহাদিগের মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাদিগের বৃদ্ধিকালে যদি কোন কঠিন পদার্থ দ্বারা বাধা পায়, সেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবার যত্ন, চেষ্টা বিলক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, যদি কোন প্রস্তর দ্বারা বাধিত হয়, তখন প্রথমতঃ সেই প্রস্তরকে ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে বিলক্ষণ চেষ্টা করে; ভেদ করিতে না পারিলে প্রস্তরখণ্ডের পার্শ্ব দিয়া উত্থিত হইয়া থাকে। ইহাই ইহাদিগের দুঃখ ও সুখের অবস্থা। কারণ আত্মার বাধিত ও অনর্গল অবস্থাদ্বয়কে দুঃখ ও সুখ বলে। যখন ইহাদিগের আভ্যন্তরিক হর্ষবিষাদ লক্ষিত হইতেছে, যখন ইহারা হাসিয়া প্রকৃতিকে হাসাইতেছে, আবার কাঁদিয়া মৃতপ্রায় হইয়া প্রকৃতিকে কাঁদাইতেছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ইহাদের চৈতন্য আছে! কারণ চৈতন্যই হর্ষবিষাদের একমাত্র অনুভাবয়িতা। কিন্তু উপাধিদোষে চৈতন্যের সম্যক্ প্রকাশ নাই, এইমাত্র। যদিও জীবজগতের জীবনোপায় এই উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিজ্জের অভাবে কোন প্রাণীই প্রাণধারণে সমর্থ হয় না, যদিও জীবজগতের জননী এই উদ্ভিজ্জ, অপর তিন প্রাণী এই উদ্ভিজ্জের পুত্র পৌত্রাদির স্বরূপ, তথাপি ঘোর তমোগুণাচ্ছন্ন বলিয়াই অবজ্ঞাস্পদ হইয়াছে। সাধারণের কল্যাণসাধক এই উদ্ভিজ্জ, সাধারণের সাক্ষাৎ পরম্পরারূপে আহার্য্য এই উদ্ভিজ্জ, সাধারণের প্রাণধারণের একমাত্র উপায় এই উদ্ভিজ্জ হইলেও এত আগ্রহের, এত আদরের বস্তু হইলেও হেয় হইয়াছে। বাস্তবিক কেবল লৌকিক হিতসাধক হইলেই আদরের বস্তু হয় না, সদ্গুণের প্রকাশিতাবস্থার অপেক্ষা করে।

যে সদ্‌গুণাবলি চৈতন্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, স্ব স্ব কার্য্যকরণে পটুতর হয়, আপনাদিগকে জানিতে পারে, যে সদ্‌গুণাবলি দ্বারা চৈতন্য সম্যক্ প্রস্ফুরিত, প্রকাশিত হয়, সেই জীব সকলই আদরের বস্তু। ভবিষ্যৎ মঙ্গল সংসাধিত করিতে পারে বলিয়াই আদরের বস্তু। এতদ্‌গুণাবলি বর্জ্জিত বলিয়াই উদ্ভিজ্জ প্রাণিজগতের মধ্যে নিকৃষ্ট হইয়াছে।

যাহারা স্বেদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে স্বেদজ বলে। মশক, মৎকুণ প্রভৃতি স্বেদজ। ইহাদিগের আত্মার শক্তি পরিচালনার যন্ত্র,—ইন্দ্রিয়শক্তি স্বল্প পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। কারণ বিষয়গ্রহণে স্বল্প পরিমাণে সমর্থ দেখা যায়। ইহারা ইতস্ততঃ গমনাগমন করে, আহার্য্য দ্রব্যের অন্বেষণ করে ও আহার করিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জের ন্যায় সাধারণের হিতসাধন না করিলেও উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা চৈতন্যের প্রকাশাধিক্য দেখা যায়। কারণ ইহারা ভবিষ্যতে দেহপুষ্টিসাধনার্থ ইতস্ততঃ গতাগতি, আহারাদির অন্বেষণ প্রভৃতি ভবিষ্যৎ মঙ্গলসাধক কার্য্য করিয়া থাকে বলিয়াই উদ্ভিজ্জ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলা যায়।

যাহারা অণ্ড হইতে উৎপন্ন, তাহাদিগকে অণ্ডজ বলে। পক্ষী সর্পাদি ভেদে অণ্ডজ নানা প্রকার। স্বেদজ প্রাণী অপেক্ষা অনেক প্রকারের বিষয় জ্ঞান ও বাহ্যেন্দ্রিয় অধিক। স্বেদজ অপেক্ষা ইহাদের অল্প অল্প বিচার-শক্তি লক্ষিত হয়। ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত পরিশ্রম করিয়া, প্রসবের জন্য যত্নের সহিত উপযুক্ত স্থান নির্ণয় ও কুলায় নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্যাবলি দ্বারা জানা যায় যে, ইহাদের শরীরে স্বেদজ হইতে অধিক পরিমাণে চৈতন্যের প্রকাশ দেখা যায়। এই নিমিত্তই ইহারা স্বেদজ প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ।

জরায়ুতে যাহাদিগের উৎপত্তি, তাহারাই জরায়ুজ। সর্ব্বপ্রকার বিষয় গ্রহণোপযোগী ইন্দ্রিয়গণ আছে বলিয়াই সর্ব্ববিধ বিষয় সুখানুভবে ইহারা সক্ষম। যে যে উপকরণে জরায়ুজ দেহ গঠিত, সেই সেই উপকরণ ইন্দ্রিয়-শক্তি পরিচালনের সম্যক্ উপযুক্ত, তাহা পূর্ব্বোক্ত জীবত্রয়ের দেহ হইতে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন। অন্যান্য প্রাণীর শরীর অপেক্ষা জরায়ুজ দেহে অধিক ইন্দ্রিয়শক্তি বর্ত্তমান থাকায় চৈতন্যের সম্যক্ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং পূর্ব্ব প্রাণীদিগের অপেক্ষা জরায়ুজ প্রাণী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জরায়ুজ দুই প্রকার;—পশু ও মনুষ্য। যাহারা চারিপদে গমনাগমন করে, অব্যক্ত ধ্বনি করে, অজ্ঞতাবশতঃ যাহা ইচ্ছা তাহাই করে,

ক্ষুধিত কিম্বা তৃষ্ণার্ত্ত হইলে স্বীয় বা পরকীয় বস্তু বিচার না করিয়াই পান ভোজনাদি করে, ভবিষৎ কালের নিমিত্ত সংগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা করে না, তাহারাই পশু। আর যাহারা প্রায়শঃ দুই পদে গতাগতি করে, ব্যক্ত শব্দ উচ্চারণে পটু, বিবাহ করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করে, তৃষ্ণা বা ক্ষুধার উদ্রেকের পূর্ব্বে ভবিষ্যতের জন্য পানীয় আহারের সংস্থান করিয়া রাখে, তাহারই মনুষ্য। পশু অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যের প্রাধান্য সকলেই উচ্চৈস্বরে গাহিয়া থাকে। সমস্ত শাস্ত্রে মনুষ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, অনন্ত প্রাণীজগতে মনুষ্যকে সর্ব্বোচ্চস্থান দিয়াছেন। মনুষ্য প্রাণীদিগের রাজা, প্রাণীগণ প্রজা; মনুষ্য প্রভু, প্রাণীগণ দাস। বাস্তবিক জীব মানবদেহ প্রাপ্ত হইল যেন আপনাকে ধন্যজ্ঞান করে, অনন্ত প্রাণীজগতের প্রকৃত তথ্য না জানিলেও, অন্যান্য প্রাণীগণের প্রকৃতিগত অবস্থা অপেক্ষা বিশেষত্বের উপলব্ধি না থাকিলেও যেন আপনাতেই আপনি প্রীতিলাভ করে। কিন্তু কি নিমিত্ত মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কি নিমিত্ত আপনাকে ধন্যজ্ঞান করে, কি নিমিত্ত আপনাতে আপনিই প্রীত, তাহাই একবার অনুশীলন করিয়া দেখা যাউক।

পশুগণ অব্যক্ত ধ্বনি করে, ব্যক্তশব্দ উচ্চারণ করিতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য ব্যক্ত শব্দোচ্চারণ করিয়া মানসিক ভাব প্রকাশে সম্যক্ সমর্থ বলিয়াই কি মনুষ্য শ্রেষ্ঠ? তাহা হইতে পারে না। কারণ, ব্যক্তশব্দোচ্চারণ-পটু মানব যত অনিষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। ব্যক্ত শব্দই যত অনর্থের কারণ। কারণ অপ্রিয় ভাষণ, অসত্য কথন, পরনিন্দা, অন্তরে অন্তরে শেল বেদন অপেক্ষা যাতনাদায়ক চিরক্ষতপ্রদ আঘাত, গালিবর্ষণ, বাচালতা, বিষয়ের অযথা গুণ বর্ণনে বন্দন কারণ, আসক্তি প্রভৃতি ঘোরতর অনর্থের মূলীভূত কারণ ঐ ব্যক্তশব্দ, কিন্তু ব্যক্ত শব্দ না থাকায়, অপ্রিয়ভাষণ অসত্য কথন, গালিবর্ষণ প্রভৃতি দোষ সকল পশুদিগের নাই, তাই স্বজাতীয় পশুগণ একস্থানে পরম সুখে কালাতিপাত করে। এই বিষয়ে ব্যক্তশব্দ অভাবে পশুরাই সুখী, মনুষ্য নহে।

পশুগণ কুৎসিত স্ত্রী উপভোগ করে, তৃণবিষ্ঠাদি ভক্ষণ করে ও মৃজ্জলাদিতে শয়ন করিয়া থাকে। আর মনুষ্যগণ পরমা সুন্দরী স্ত্রী সম্ভোগ, রসনাতৃপ্তিকর নানাবিধ পায়সমিষ্টান্নাদি ভক্ষ্য ভোজন ও দুগ্ধফেনসংকাস শয়নে শয়নাদি করিয়া বিষয় সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে বলিয়াই

কি মনুষ্য শ্রেষ্ঠ? তাহা হইতে পারে না; বরং পশুই শ্রেষ্ঠ। কারণ এই সকল বিষয় সুখ পশুজাতি যেরূপ নির্বিঘ্নে ভোগ করিয়া থাকে, মনুষ্যের সেরূপ ঘটিয়া উঠে না। পশুরা ইচ্ছামাত্রেই কামনা চরিতার্থ করিতে পারে,—কালাকাল বা স্থানাস্থানের বাধা নাই। কিন্তু মনুষ্য, রাজার শাসন, সমাজের শাসন, ব্যক্তিবিশেষের শাসনাদির ভয়ে ইচ্ছামাত্রেই ঈপ্সিত কার্য্য করিতে পারে না। এমন কি, সময় বিশেষে গমনাগমনেচ্ছা হইতে বিরত থাকিতে হয়। যথায় ইচ্ছার প্রতিঘাত, তথায় বিষয়সুখ তিষ্ঠিতে পারে না; পরন্তু দুঃখেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। আত্মার অনর্গল অবস্থাই সুখ, আর বাধিত অবস্থাই যখন দুঃখ, প্রত্যুতঃ তখন ইচ্ছার প্রতিঘাতে দুঃখানুভবই হইয়া থাকে। আরও দেখা যায়, স্বজাতীয় কামিনীর প্রতি সকলেরই প্রীতি। রাজার রাণীতে যে প্রীতি, শূকরের শূকরীতেই সেই প্রীতি। শূকরের নিকট শূকরী ও সুন্দরী রমণী উপনীত হইলে শূকর সুন্দরী রমণীকে উপেক্ষা করিয়া শূকরীকে প্রীতির চক্ষে দেখে; সুতরাং পশুদিগের কামবৃত্তি চরিতার্থ যেরূপ অনর্গল অবস্থা দেখা যায়, মনুষ্যদিগের সে প্রকার নহে। পূর্ব্বে আহারাদি সঞ্চয় না করিলে মনুষ্য ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে পারে না, আবার স্বেচ্ছানুযায়িক আহারে সমাজভয়ে অনেক সময় বিরত থাকিতে হয়, কিন্তু পশুগণ স্বেচ্ছামত সকল সময়েই সকল স্থানেই কোমল তৃণাদি ভোজনে তৃপ্তি সুখানুভব করিয়া থাকে। উপার্জ্জনের ক্লেশানুভব করিতে হয় না, প্রকৃতি স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আবার মনুষ্য মিষ্টান্ন আহার করিয়া যেরূপ আনন্দ পায়, শূকরাদি প্রাণী বিষ্ঠাদি ভোজনেও সেরূপ আনন্দ উপভোগ করে। বিষ্ঠা ও মিষ্টান্ন একস্থানে থাকিলে বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া শূকর কখনও মিষ্টান্ন ভক্ষণে উন্মুখ হয় না। সুতরাং পশুগণ বিনাক্লেশে আহারে তৃপ্তিসুখ অনুভব করে; মনুষ্য ক্লেশ স্বীকার করিয়াও সকল সময় ইচ্ছামত আহারসুখ পায় না। কাজেই এই বিষয়ে পশুরাই মনুষ্য অপেক্ষা অধিক সুখী বলিতে হইবে। মানুষ গৃহের ভিতরে পরিচ্ছন্ন কোমল শয্যা ব্যতীত নিদ্রাসুখে-বঞ্চিত হয়,—অধিকন্তু নিদ্রাকর্ষণে দুঃখই পাইয়া থাকে। কিন্তু পশুরা নিদ্রাদেবীর আহ্বানমাত্রেই যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে পরমনিদ্রা সুখভোগ করে। আরও দেখা যায়, মানুষ স্ত্রীপুত্রাদির সুখের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তায় উদ্বিগ্ন, স্ত্রীপুত্রাদির পীড়ার জন্য, স্ত্রীপুত্রাদির আহার বিহারের জন্য

প্রভৃতি অসংখ্য চিন্তাবিষে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত। কিন্তু উদরপূর্ত্তি হইলে পশুগণকে কোন চিন্তাই ব্যাকুলিত করিতে পারে না। সুতরাং পশুরা যেমন নির্ব্বিবাদে বিষয় রস আস্বাদন করে, মানুষের ভাগ্যে সেরূপ সুখ কোথায়? প্রকৃতপক্ষে বিষয়সুখ পশুজাতিরই অধিক।

যদি বিষয়সুখ পশুজাতিরই অধিক হইল, তবে জীবজগতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কেন? জীবজগতে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ কেন, মানব! এই প্রশ্ন যেদিন তোমার হৃদয়ে উদয় হইবে, সেই দিনই—সেইক্ষণই তোমার জীবনের একটানা স্রোত ফিরিবার হইল,—ধর্ম্মজীবন গঠনের সূত্রপাত হইল। এই প্রশ্নের উত্থাপনের জন্য জীবজগতের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক একটু স্থিরচিত্তে সাত্ত্বিক বুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখিলে ইহার প্রকৃততত্ত্ব প্রকট হইয়া পড়িবে, সন্দেহ নাই। পশুজাতির প্রায়ই ভবিষ্যৎ চিন্তা নাই; মনুষ্য একমাত্র ভবিষ্যৎ চিন্তাদ্বারাই চিত্তবৃত্তিকে বিজড়িত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তি ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ লাভার্থ সর্ব্বদাই ব্যাকুল। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া পশু তৃপ্ত ও সুখে নিদ্রা যায়, অন্য চিন্তায় আকুল হয় না। কিন্তু ধনধান্যে গৃহপূর্ণ রহিয়াছে, আহারে তৃপ্তিলাভ করিয়াছে; তবুও মনুষ্য ভবিষ্যতের জন্য অতিরিক্ত ধনাদি সঞ্চয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যাকুল। একমাত্র মানবপ্রকৃতিই ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত সর্ব্বদা চেষ্টামান। আর বর্ত্তমান সুখের ইচ্ছাই পশুপ্রকৃতির নিদর্শন। মানুষ বর্ত্তমান সুখের অভিলাষী নহে, একমাত্র ভবিষ্যৎ সুখ লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমানে অধিকতর ক্লেশ স্বীকার করে; কত আয়াস, কত যত্ন, কত পরিশ্রম করে। ইহাতে বরং দুঃখানুভব না করিয়া ভবিষ্যৎ সুখ-চিন্তার আনন্দই উপভোগ করে। গৃহনির্ম্মাণ দারগ্রহণ, পুত্র প্রার্থনা প্রভৃতি যাবতীয় ইচ্ছা, যাবতীয় যত্ন, যাবতীয় চেষ্টা যাবতীয় কার্য্যই ভবিষ্যতের নিমিত্ত করিয়া থাকে। কারণ কার্য্যমাত্রেই বর্ত্তমানে ক্লেশ ভিন্ন আর কিছুরই অনুভূতি হয় না। কিন্তু পশুজাতিতে, মনুষ্য ব্যতীত সমস্ত প্রাণীতেই ইহার বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়।

কাল অনন্ত হইলেও ক্রিয়ার আরম্ভ, সমাপ্তি আদির দ্বারা বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীত, এই তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। যে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে, এখনও সমাপন হয় নাই, তাহাকেই বর্ত্তমান বলে। এবং যে ক্রিয়ার আরম্ভ হয় নাই, তাহারই নাম ভবিষ্যৎ; আর যে ক্রিয়ার সমাপন হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই অতীত কাল বলে।

আমাদের দেহে গর্ভাধানকালিক অর্থাৎ শুক্রশোণিতের প্রথম মিলন সময়ে যে ক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছে, যাহা এখনও পর্য্যন্ত সমাপ্তি হয় নাই, যে ক্রিয়ার সমাপ্তি হইলে দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া জড়ভাবে পতিত রহিবে, সেই কালের নামই বর্ত্তমান। যেমন কালমান যন্ত্রে (ঘড়ীতে) দম দিলে যে ক্রিয়ার আরম্ভ হয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত দম থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘড়ী চলে, দম ফুরাইলে ঘড়ী নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া থাকে, আর চলে না; কিন্তু যাবৎ স্প্রীঙে দম থাকে, বার বার ১২টা বাজিলেও তাহার সেই সমস্ত কালই বর্ত্তমান থাকে। এই সময়কে যেমন ঘড়ীর বর্ত্তমান কাল বলা যায়; এবং ঐ ক্রিয়ার সমাপন হইলেই উহার অতীতকাল হইল; আর যে ক্রিয়ার আরম্ভ হয় নাই, তাহাকেই ভবিষ্যৎ বলে; সেই প্রকার যে পর্য্যন্ত এই দেহের ক্রিয়া থাকিবে, তাবতই ইহার বর্ত্তমান কাল; আর এই ক্রিয়া সমাপন হইলে পর ইহাকে অতীত, আর এই ক্রিয়ার শেষ হইলে যে কাল আসিবে, তাহাকে ভবিষ্যৎ বলে, অর্থাৎ এই শারীর ক্রিয়ার নিবৃত্তির পর যে একটী কাল আসিবে, তাহাই আমাদের ভবিষ্যৎ, শাস্ত্রে যাহা পরকাল বলিয়া কথিত আছে। জল যদি না থাকিত, কখনই আমাদের পিপাসা হইত না, অন্ন যদি না থাকিত, কখনই ক্ষুধার উদ্রেক হইত না, সেইরূপ যদি ভবিষ্যৎ—পরকাল না থাকিত, কখনই তাহার নিমিত্ত ব্যাকুল হইতাম না! ভবিষ্যতের নিমিত্তই,—পরকালের নিমিত্তই আমাদিগের সঞ্চয়;—পরকালের নিমিত্তই আমাদিগের এত ভয়; সে সময়ে কি হইবে, কোথায় যাইব বলিয়াই সর্ব্বদাই উদ্বেগ, সর্ব্বদাই যেন উন্মনা; এই নশ্বর জগতে যাহাদের জন্য, যে স্ত্রীপুত্রাদির জন্য, এত ক্লেশস্বীকার করেতেছি, যাহাদিগকে আত্মনির্ব্বিশেষে যত্ন করিতেছি, যাহাদের সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ অনুভব করিতেছি, যাহাদের সুখের নিমিত্ত শত শত অকার্য্য করিয়া ধনের সঞ্চয় করিতেছি, হায়! ভবিষ্যতে—এই দেহের কার্য্যাবসানে ইহাদের কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, বা কেহই সঙ্গে যাইবে না। এমন যে এই দেহ, যাহাকে এতকাল আত্মা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া এত যত্নে, এত সন্তর্পণে সেবা করিতেছি, ইহাও সঙ্গের সাথী হইবে না, যত্নের জিনিষ ধূলায় পড়িয়া রহিবে। ধর্ম্ম ভিন্ন ভবিষ্যতের সাথের সাথী আর কিছুই নাই। মনু বলিয়াছেন,—

"এক এব সুহৃদ্ ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি হি।
শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যচ্চ গচ্ছতি॥"

ধর্ম্মই একমাত্র বন্ধু, কারণ মৃত্যুর পরেও পরলোকে গমন করে; তদ্ভিন্ন পুত্রকলত্র, গৃহধনাদি শরীর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ শরীর ধ্বংসের পর তাহাদের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না।

অতএব এক্ষণে বুঝা গেল, যাঁহারা ভবিষ্যতের নিমিত্ত অর্থাৎ পরকালের নিমিত্ত হিতকর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সঞ্চয় করেন, তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য। যাহারা কেবল ঐহিক সুখের অভিলাষী, তাহারাই পশু—মানবাকৃতি পশু। শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন,—"পশুর্বৈ স নরাণাম্।" যাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন বিষয়-সুখ-রসপানে আসক্ত, উন্মত্ত, তাহারাই মনুষ্যের মধ্যে পশু। বাস্তবিক চক্ষু-কর্ণ-হস্তপদাদি-বিশিষ্ট মানবাকারে আকারিত জড়পিণ্ডবিশেষকে মনুষ্য বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলে মনুষ্যাকার পুত্তলিকাও মনুষ্যপদবাচ্য হইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতির অনুসারে মনুষ্য ও পশু পৃথগ্বিধ হইয়াছে। ধর্ম্ম ও জ্ঞানই মনুষ্য ও পশুতে পার্থক্যের মূলীভূত কারণ। ধর্ম্মের ক্ষয়ে মনুষ্যত্বের হ্রাস ও ধর্ম্মের বৃদ্ধিতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি হইয়া থাকে। তাই প্রকৃত মনুষ্য পূর্ব্বতন আর্য্যগণ বর্ত্তমান সুখে অনাসক্ত হইয়া নিবৃত্তিমার্গে বিচরণ করিতেছেন, ভবিষ্যতের—পরকালের কল্যাণের নিমিত্তই কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদাই চেষ্টমান থাকিতেন, ইহকালের নিমিত্ত তাঁহারা কিছুই করিতেন না। তাঁহাদের বিলাসিতার জন্য গৃহ ছিল না, অতিথিসৎকারাদি পঞ্চযজ্ঞ পালনের নিমিত্ত গৃহনির্ম্মাণ করিতেন, পাশবাচার চরিতার্থের জন্য দারপরিগ্রহ করিতেন না, বিলাসের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতেন না;—কিন্তু পারলৌকিক ধর্ম্মসাধনার্থ স্ত্রীগ্রহণ ও অর্থসঞ্চয় করিতেন। তাঁহারা পুত্রকে পশুধর্ম্মচরিতার্থতার ফলস্বরূপ জ্ঞান করিতেন না, পরলোকের সুখের নিমিত্ত পুত্র প্রার্থনা করিতেন এবং সেই পুত্রকে পুন্নাম নরকের পরিত্রাতা জ্ঞান করিতেন ও পুত্রের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতেন। বর্ত্তমানের নিমিত্ত তাঁহারা কিছুই করিতেন না। চুম্বকের আকর্ষণীশক্তি যেমন দিঙ্‌নির্ণয় যন্ত্রের বাহুকে কেবল উত্তরদিকে স্থগিত রাখে, জাহাজ পুনঃ পুনঃ ঘুরিলেও উহা সেই উত্তরদিকে থাকে, সেই প্রকার পূর্ব্বতন আর্য্যগণের লক্ষ্য ভবিষ্যতের দিকে নিয়তই স্থাপিত থাকিত, বর্ত্তমানে যে সকল ক্রিয়া করিতেন, সে সমস্তই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের নিমিত্ত। তাই তাঁহাদিগের বাক্য মিথ্যায় কলুষিত ছিল না, মন মিথ্যাবিষয়ে ধাবিত হইত না, ইন্দ্রিয়গণ পাপপথে

বিচরণ করিত না। তাই তাঁহাদের অলৌকিক প্রভাবে হিংস্রক শ্বাপদগণও মুগ্ধ ও নতশিরে আজ্ঞাপালন করিত; তাই সংসারে থাকিলেও তাঁহাদের মনে স্বর্গসুখানুভূতি ছিল, তাই তাঁহাদের হৃদয়ে পারমাত্মিক জ্যোতি বিরাজ করিত। সেই ভবিষ্যৎ সুখান্বেষী প্রকৃত মানব জগদ্‌গুরু আর্য্য-জাতির বংশধর আমরা, তবে কেন পশুদিগের ন্যায় বর্ত্তমান সুখেচ্ছায় বিহ্বল হইয়া আছি! পশুদিগের ন্যায় বিষয়-সুখ-রসপানে পরিতৃপ্তির বাসনায় উন্মত্ত হইয়া আছি! মানব-প্রকৃতি যাহাতে তৃপ্ত হইবার নহে, তাহাই পুনঃ পুনঃ গ্রহণে সর্ব্বদাই প্রয়াসী হইতেছি। যাঁহাদের সন্তান আমরা, যাঁহাদের ধর্ম্মশক্তির সূক্ষ্মবীজের অনুলোমস্বরূপ আমরা, ভবিষ্যৎ সুখার্থ তাঁহাদের চিরাভ্যস্ত নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন না করিলে প্রকৃত সুখী হইতে পারিব না। অতএব ভবিষ্যৎ সুখেন্বেষী পিতৃগণের পথানুসরণই কর্ত্তব্য।

দুইবিন্দু অশ্রু।

আজ কতকাল গেছে, তবু সেই দুইবিন্দু অশ্রু ভুলিতে পারি নাই,—কে জানে, কখনো পারিব কি না!

কৈশোরে যখন নবদূর্ব্বাদলে শয়ন করিয়া আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতাম, যখন কত ছুটাছুটী করিয়া সমবয়স্কদিগের সঙ্গে ক্রীড়া কৌতুকে মাতিতাম, নবোন্মাদনায় কত কিছু করিতাম, তখন একটা কোমলতাময়ী দৃষ্টি লইয়া দুটী শান্ত, তৃষিত চক্ষু আমার পানে চাহিয়া থাকিত। কত-দিন দেখিয়াছি, সেই নয়নযুগল নীরবে কত কাতরতা প্রকাশ করিয়াছে; কিন্তু একদিনও আমি তার মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে পারি নাই। শেষ এক দিন পারিয়াছিলাম,—সেই যে দিন সেই নয়ন-যুগল বহিয়া দুইবিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সেই দুইবিন্দু অশ্রু আজিও ভুলিতে পারি নাই, এ জীবনে কখনও পারিব না।

বসন্তের প্রারম্ভে নদীসৈকতে 'ঝির্‌ঝিরে' বায়ে বসিয়া স্রোতস্বতীর তরঙ্গভঙ্গে অস্তগমনোন্মুখী তপনের শতখণ্ড প্রতিবিম্ব দেখিতেছিলাম। সেই মধুরকালে, সেই গলিত স্বর্ণধারার শোভা ম্লান করিয়া, সৌন্দর্য্য-

সাগর মন্থনপূর্ব্বক কে সেই দৃষ্টি ও সেই অশ্রুবিন্দুদ্বয় লইয়া আসিয়া পাশে দাঁড়াইল!

হায়! সেদিন গিয়াছে; সে তপন ডুবিয়া ডুবিয়া আবার কতবার আকাশপথে ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই কলপ্রবাহিনী কল্লোলিনীক্রোড়ে কত শত শত ঢেউ মিশিয়া যাইয়া আবার তরঙ্গ উঠিয়াছে,—কিন্তু সেই স্মৃতি, সেই অশ্রুজল আজিও হৃদয় ছাড়িয়া যায় না কেন? সেই চিত্র সেইরূপই রহিয়াছে; হৃদয়পটের কোণে আঁধার জমিয়া আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

অশ্রুবিন্দুদ্বয় অঞ্চলে মুছিয়া একটী ক্ষুদ্র বালিকা আমায় কহিতেছিল, "দেখ, তোমার মুখ চাহিয়া আমি এত বড় হইয়াছি। আমি একদিন তোমায় না দেখিয়া থাকিতে পারি নাই। তোমায় সর্ব্বদা না দেখিলে কোন্‌দিন আমি মরিয়া যাইতাম। শৈশবে ভাবিতাম, বুঝি সর্ব্বদাই তোমায় এইরূপে দেখিব। কয়দিন আগে বুঝিয়াছিলাম, বুঝি বাকি জীবন ভরিয়া তোমায় আরও ভাল করিয়া দেখিব,—হৃদয় ভরিয়া, হৃদয়ে ভরিয়া দেখিব। কিন্তু তুমি আমার সুখে বাদ সাধিলে। তুমি অন্যের হইতে চলিয়াছ, আমার হইলে না। বলে দাও, আমি কি করিব? তোমায় না দেখিয়া আমি বাঁচিব না,—মরিব কি?"

তখন কে জানিত, এত কোমলতায় এত কঠোরতা আছে; কে জানিত, এমন মধুর ভাষায় এমন দৃঢ়তা মিশিয়া রহিয়াছে?

অনেকক্ষণ কথাগুলি ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু তখন আমার কৈশোর-জীবনোদ্যানের নবমুকুলিত কুসুমসৌরভে বিভোর ও দিক্‌ভ্রষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ ছুটিতেছিলাম। দূরে দৃষ্ট পলাশের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া গোলাপকে পদদলিত করিয়া গেলাম। সেই পদদলনে চরণে কণ্টক বিদ্ধ হইল, সে যাতনার, আজ কতকাল গেছে, তবু অবসান হইল না। কখনও হইবে কি প্রভো!

নির্জ্জনে, প্রান্তরে বসিয়া কতদিন এই প্রশ্ন করিয়াছি। বৃক্ষোপর হইতে পাখী ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গিয়াছে—"কু—উ—উহুঁ—।" পবন বিদ্রূপভঙ্গিতে আমার বস্ত্ররাশি নাচাইয়া হাসিতে হাসিতে ধাবিত হইয়াছে,—সা—সা—সা—না—না।

আমি অশ্রুবিন্দু লইয়া নিরস্ত হইতাম। যুবক হইলে হয় ত এতটা

ঘটিত না। আমি ভাবিয়াছিলাম, সংসারে এমন কত অশ্রু ঝরে, কত শুকাইয়া যায়; দুদিনে তার অস্তিত্ব ও স্মৃতি লোপ পাইবে। হায় কৈশোর! যৌবন হইতেও তুমি অধম। যৌবন মানব-জীবনের প্রবেশিকা, দ্বারে দাঁড়াইয়া তখন জীবনরহস্য অনেক বুঝিতে পারা যায়। জ্ঞানের আলোকে, চাঞ্চল্যের তমসা অনেক নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু তুমি কৈশোর, কেবলমাত্র চাঞ্চল্যের অধিকারী—কর্ত্তব্যজ্ঞান তোমার নাই। থাকিলে যৌবনের কে আদর করিত?

আমি কি উত্তর করিয়াছিলাম, সে কথা কহিব না। তাহা স্মরণ করিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমার উত্তর শুনিয়া, আবার দুইবিন্দু অশ্রুসহ অভাগিনী টলিতে টলিতে প্রদোষকালীন আঁধারে মিশিয়া গেল,—সেই যাওয়া!—জগদীশ্বর, আর কখনো দেখিব কি? সেই কাতরতা, সেই সেই কি ভাব,—আপনারা ক্ষমা করুন, আমি বুঝাইতে পারিলাম না—সে আজ কত বছরের কথা!

সংসারে যখন যাহা চাওয়া যায়, তখন তাহা পাওয়া যায় না। বিধাতার এ এক মহান্ অবিচার। অসময়ে কত সুন্দর সামগ্রী আমাদের হাতের মুঠো দিয়া কত স্থানে চলিয়া যায়, তার সৌন্দর্য্য কে দেখে? কর্ম্মস্থানে আসিয়া বিবাহের দুইবৎসর পরে পত্নীবিয়োগান্তে শুনিলাম, তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কৈশোরে যাহা হেলায় হারাইয়াছিলাম, যৌবনে তাহা পাইলাম না। বলিয়াছি, রত্ন চিনিলে রত্ন পাওয়া যায় না।

একদিন শুনিলাম, তার স্বামী আমাদের জেলায় বদ্‌লী হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ৫০০৲ টাকা বেতনের উচ্চ কর্ম্মচারী—ডেপুটী বাবু। অনেক কষ্টে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। দেখিলাম, দিব্য লোক,—দেখিবার সামগ্রী বটে। অল্পবয়স। চমৎকার চেহারা, বেশ হাসিখুসী। তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি তাহাকে সঙ্গে আনিতে পারেন নাই। সে বাটীতে আছে। বিবাহের পর আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

অল্পদিনের মধ্যেই ডেপুটী বাবুর সুবিবেচনা ও সহৃদয়তার কথা জেলায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহার কিছুকাল পরেই আমি স্থানান্তরে বদ্‌লী হইয়া আসিলাম। ভগবান্ জানেন, এ সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি সুখী হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, এতদিন পরে সেই দুইবিন্দু অশ্রু শুকাইয়া যাইবে!

তার দুই বৎসর পরে আজ বাটী আসিয়াছি। অনেকদিন বাটী আসি নাই। দেখিলাম, অনেক ঘর দালান হইয়াছে, অনেক মাঠ পুষ্করিণী হইয়াছে, অনেক জঙ্গল ময়দান হইয়াছে।

বৈকালে ভাল করিয়া গ্রাম দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া শেষটা সেই নদীতটে উপস্থিত হইলাম। সেই স্থান! সেই কত বছরের পরিচিত মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা নদীতট! একখণ্ড শিলাতলে বসিয়া গত-জীবনের দু-একটা কথা ভাবিতেছিলাম। একটু একটু করিয়া চাঁদের আলো ছুটিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে ইতস্ততঃ উদাসভাবে চাহিতেছিলাম। হঠাৎ দেখিলাম, অদূরে বৃক্ষতলে শুভ্রবস্ত্রাবৃত পদার্থ। সেইদিকে চাহিয়া, সেই কত বছরের কথা মনে হইল। মনে হইল,—সেই অশ্রুমাখা মুখখানি। স্মৃতির আকর্ষণে ধীর পাদক্ষেপে সেই স্থানে উপস্থিত হইলাম। কি আদরের তীর্থস্থান! কিন্তু জগদীশ্বর, একি! কি দেখিলাম,—একি স্বপ্ন! সেই মুখখানা! সেই দুইবিন্দু অশ্রু!!

কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলাম,—"শৈল!" সেই মুখখানা, সেই দুইবিন্দু অশ্রু লইয়া, ঠিক তেমনি ভাবে আবার আমার দিকে চাহিল, কিন্তু সে এক মুহূর্ত্ত। তারপর আকাশচ্যুত নক্ষত্রবৎ ধীরে ধীরে কোথায় উঠিয়া গেল। দেখিলাম, শৈল বিধবা!!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল।

অমরতা।

কত ইচ্ছা মনে মনে হইরে অমর
এ দেহ সুযোগে, হায় অব্যাধি অজর—
ভুঞ্জিরে এ ধরণীর অভিনবাস্বাদ
ইন্দ্রিয়ের সুখচয়! আনন্দে অবাধ
সাঁতারে সাঁতারে শুধু সুখের সাগরে
বেড়াইরে নিরন্তর! অন্তরে অন্তরে—
বিলাসের সে মাধুরী অনন্ত বিস্তারি,
বেড়া'ক খেলিয়া সদা প্রাণ ফুল্ল করি,
এমনি চলুক আহা চলুক এমনি
বড় আশা মনে মনে! শিয়রেতে শনি

মহাকালে অট্টহাসি,
পরায়ে গলায় ফাঁসি,
বিষয়বিদগ্ধচিত্ত মানবেরে ল'য়ে,
কালচক্রে দেয় ছাড়ি, আকুল হৃদয়ে
সেই চিত্তভার লয়ে জনম জনম
ভুগে জীব হায় হায় দুঃখের চরম!

অনাদৃত।

বসন্তেরে ভালবেসেছিনু—
সে গিয়াছে চলি;
চক্কিতে থামিয়া গেছে যত
পাখীর কাকলি।
কুসুম ফোটে না কুঞ্জে আর,—
কুঁড়িগুলি ধীরে
ঝরে' গেছে তপ্ত বৈশাখের
চঞ্চল সমীরে।
আমি যারে আজীবন ধরে'
করিনু সাধনা—
সে বারেক এসে, চলে গেল
করিয়ে ছলনা!
বসন্ত-প্রসূনে গাঁথা মোর
প্রণয়ের হার,
বড় যত্নে রচে'ছিনু আমি
আশায় তাহার,
তা'রে মালা নারিনু পরাতে,—
মালা গেছে ঝরি;—
এবে তাই চক্ষে মোর সদা
অশ্রু আছে ভরি'।

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

ষড়ঋতু বর্ণন।

বর্ষা।

আইল প্রাবৃট্ কাল মনোহর-সাজে।
কৃষিজীবি তৎপর হইল কৃষি-কাজে॥
দশদিক্ আবরিয়া জলদ-পটল।
বরিষে মুষলধারে বৃষ্টি অবিরল॥
বারি-ভরে বারিবাহ হয়েছে সুধীর।
গগনে গভীর নাদে গরজে গভীর॥
নাই সে প্রখর ঝড় নাই শিলাপাত।
নাই সে শ্রবণভেদী ভীম বজ্রাঘাত॥
আর না তড়িৎ তেজে ঝলসে নয়ন।
বহে না দহে না আর তপন পবন॥
ফুটেছে কদম্বফুল গন্ধ মনোহর।
সুগন্ধ রজনীগন্ধ কাঞ্চন তগর॥
যূঁই বেলি চামেলী ভূ-চম্পক সুঠাম।
কামিনী যামিনী-শোভা গন্ধ অনুপাম॥
নব পল্লবিত তরু নবীনা প্রকৃতি।
ধরণী ধরিল নব শ্যামলা আকৃতি॥
ললিতা লতিকা নব সোহাগে গলিয়া।
জড়ায়ে বিটপ-গলে নাচিছে দুলিয়া॥
তৃণভোজী পশুকুল পরিপুষ্ট কায়।
কিন্তু কষ্ট বড় দুষ্ট মশক-জ্বালায়॥
পরিপূর্ণ হইয়াছে হ্রদ জলাশয়।
নদ-নদী দেব-খাত—পল্লল-নিচয়॥
নিদাঘের দরিদ্রতা নাহিক এখন।
কূলে কূলে পূর্ণ জলে খেলে মীনগণ।
তরঙ্গে তরঙ্গে রঙ্গে ছুটে তরঙ্গিণী।
নবীন যৌবনে যেন নবীনা রঙ্গিণী॥

কর্দ্দমে পূর্ণিত পথ তৃণপূর্ণ দেশ।
নরনারী যাতায়াতে পায় কত ক্লেশ॥
নিবিড় নীরদাবলী আবরি আকাশ।
বিরল করিল রবি কিরণ প্রকাশ॥
নিশিদিশি সমান গগন মেঘময়।
নাহি তারাবলী নাহি শশীর উদয়॥
প্রভাত মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা ভেদাভেদ নাই।
নিশায় প্রকৃতি যেন আঁধারে মিশায়॥
প্লাবনে প্লাবিত দেশ সমুদ্র আকার।
পথিকের গতায়াতে সাধ্য নাহি আর॥
বরিষার ক্লেশ যত সুখের আগার।
যাহার অভাবে দেশে উঠে হাহাকার॥
হেন ঋতু যেন কভু নাহি হয় ক্ষীণ।
যাহাতে নির্ভর সদা জীবের সুদিন॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।

সাং এক্তারপুর মদনমোহন বাড়, বাসুদেবপুর।

শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১২৪৯ সালে ৬ই শ্রাবণ জন্ম। ইহাঁর বাল্যজীবনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ সংগ্রহ করা দুর্ঘট, তবে এই পর্য্যন্ত শুনা হইয়াছে, বালকসুলভ কোন ক্রীড়াতে তাঁহার আসক্তি ছিল না। ধূলাখেলা করেন নাই, দাণ্ডাগুলি, চোলকপাটি, লুকাচুরি ইত্যাদি খেলেন নাই, ছিপে মৎস্য ধরেন নাই, ঘুড়ি উড়ান নাই, বালকে বালকে বিবাদ করেন নাই, দশপঁচিশ, তাস পাশা ইত্যাদি খেলাতেও কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না।

বাঙ্গালা পাঠশালা, গবর্ণমেণ্ট সাহায্য-কৃত স্কুল এবং মিশনারী স্কুল প্রধানত ইহাঁর শিক্ষার স্থল, বিশেষতঃ মিশনারী স্কুলেই বেশী দিন অধ্যয়ন করা হইয়াছিল। জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী দক্ষিণ বারুইপুরের সন্নিহিত শাসন নামক গ্রামে ইহাঁর মাতামহাশ্রম। শিক্ষা সমাপ্তির পর সর্ব্বপ্রথমেই তিনি বারুইপুরের সাহায্যকৃত ইংরাজীস্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের

পদে আটমাসকাল প্রতিনিধিত্ব করেন, তাঁহার পর ইহাঁর এক মাতুলের জমিদারী সেরেস্তায় সম্ভবমত জমিদারির কাজকর্ম্ম শিক্ষা করেন; সেই সময় বারুইপুরের নূতন মহকুমা হয়, ষ্টুওয়ার্ড বেলি সাহেব * প্রথম আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া যান, ফৌজদারি আদালতের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা করিবার অভিলাষে ভুবনচন্দ্র তাঁহার নিকট দরখাস্ত করিয়া সেই সেরেস্তায় শিক্ষানবীশ হন, কিছুদিন পরে মৌলবী জলাল উদ্দিন হোসেন ঐ মহকুমার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে ভুবনচন্দ্র প্রায় সাতমাসকাল অঙ্ক-বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলেন।

এইরূপ অস্থায়ী বিবিধ কার্য্যে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিয়া ১২৬৯ সালের মাঘ মাসে হঠাৎ ডাকযোগে তিনি একখানি পত্র প্রাপ্ত হন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন পুস্তকাধ্যক্ষ (আধুনিক প্রধান তান্ত্রিক গুরু) পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কলঙ্কার মহাশয় তৎকালে মহানুভব কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের চিৎপুরস্থ "সারস্বতাশ্রমে" সাহিত্য-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ঐ পত্র ঐ তর্কলঙ্কার মহাশয়ই লেখেন। নির্ঘণ্ট এইরূপ যে, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় আপনাকে একবার দেখিতে চাঁহিতেছেন, শীঘ্র একবার তাঁহার চিৎপুরের "সারস্বত-আশ্রম" উদ্যানবাটীতে আগমন করিলে আমি আহ্লাদিত হইব, * * *।

তর্কলঙ্কার মহাশয়ের সহিত তখন কি প্রকারে ভুবনচন্দ্রের জানা শুনা হইয়াছিল, তাহাও আমরা শুনিয়াছি। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে পণ্ডিত জগন্মোহন এবং শান্তিপুরের মদনগোপাল গোস্বামী উভয়ে "পরিদর্শক" নামে একখানি দৈনিক সমাচার পত্র প্রচার করিয়াছিলেন, ভুবনচন্দ্র আদর পূর্ব্বক সেই সংবাদপত্রের আদ্যোপান্ত রীতিমত পাঠ করিতেন, মধ্যে মধ্যে সেই পরিদর্শকে প্রকাশ করিবার জন্য এক একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার কবিতা লেখায় কিছু কিছু অভ্যাস ছিল, তাঁহার প্রথম যৌবনের গুটিকতক কবিতা বেনামীতে সংবাদপ্রভাকরপত্রে

---

* এই ষ্টুয়ার্ড বেলিসাহেব ক্রমশঃ উচ্চপদে উন্নিত হইয়া, পরিশেষে সার ষ্টুয়ার্ড বেলি কে, সি, এস, আই, উপাধি ধারণ পূর্ব্বক বঙ্গের মহামান্যবর লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর হইয়াছিলেন।

প্রকাশিত হইয়াছিল। সে কথা যাউক, তর্কলঙ্কার মহাশয় তাঁহার রচিত কবিতাগুলি দর্শন করিয়া লেখককে ভালবাসিয়াছিলেন, সেই সূত্রেই ঐ নূতন আহ্বান পত্র।

পত্র প্রাপ্তির একদিন পরেই ভুবনচন্দ্র চিৎপুরে উপস্থিত হইয়া কালী-প্রসন্ন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কালীপ্রসন্ন বাবু এক দিনেই যেন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেখানে তিনি শুনিলেন, কালীবাবু উক্ত পরিদর্শক পত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন, তর্কলঙ্কার মহাশয়ই সম্পাদক থাকিবেন, আকার বৃহৎ হইবে, একজন সম্পাদকের দ্বারা চলিবে না, অতএব ভুবনচন্দ্রকে প্রথম সহকারীরূপে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় স্থির হইল!

কেবল কবিতা এবং দুই একটা সামান্য সামান্য সংবাদ ব্যতীত কোন সংবাদ পত্রে কোন প্রবন্ধাদি লেখা ভুবনচন্দ্রের তখন অভ্যাস ছিল না, অধিকন্তু সে পদ তিনি গ্রহণ করিবেন কি না, অনেক ভাবিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবক হইলেও তাঁহার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। উকীল হইবার লালসায় তিনি অনেকগুলি আইন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু কমিটি পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। ঘন ঘন আইনের রদ মতান্তর দর্শনে এবং উকীলকে অজ্ঞানে কিছু না কিছু অসদাচরণ করিতে হয়, একারণেও বটে, ওকালতীর প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল না, এই সময় বাবু কালী-প্রসন্ন সিংহের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির আশ্রয় প্রাপ্তির আশা পাইয়া তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। বেতনের কথা বলিতে নাই, আমিও বলিব না।

"পরিদর্শক" চলিতে লাগিল, চারিদিকে সুনাম হইল, কিন্তু তিন মাসের অধিক বাঁচিল না। ১২৬৯ সালের মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, এই তিন মাস মাত্র পরিদর্শকের পরমায়ু ছিল, চৈত্র সংক্রান্তির সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত।

"পরিদর্শক" উঠিয়া গেলেও সদাশয় সিংহ মহোদয় ভুবনচন্দ্রকে সর্ব্বদা নিকটে রাখিবার আকিঞ্চন পাইয়াছিলেন, ভাল করিব বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিবেন, এমন আশা ও ইচ্ছা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু ঘটে নাই। সোমপ্রকাশের সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সেই সময় একজন যোগ্য সহকারী চান, বিদ্যাভূষণের একজন আত্মীয় (মহাভারতের পণ্ডিত) সেই কথা ভুবনচন্দ্রকে বলেন। সাহিত্যের অধিক চর্চ্চা হইবে ভাবিয়া ভুবনচন্দ্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিদ্যাভূষণের

পল্লীগ্রামের বাটীতে * উপস্থিত হন, দুই ঘণ্টা আলাপ পরিচয়ের পর সেই কর্ম্ম তাঁহারই হয়, "সোমপ্রকাশে" দেড় বৎসর। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ভ্রাতা বাবু রামচন্দ্র গুপ্ত "সংবাদ-প্রভাকর" পরিচালনের নিমিত্ত উপযুক্ত সম্পাদক অন্বেষণ করিতেছিলেন, ভুবনচন্দ্রের নাম শ্রবণ করিয়া বিদ্যা-ভূষণের অভিমত গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। ভুবনচন্দ্র "সংবাদ-প্রভাকরের" সম্পাদক হন। প্রভাকরে ২২ বৎসর।

প্রভাকর সম্পাদনের প্রথম অবসরেই তিনি "এই এক নূতন" শিরোনাম দিয়া এক আশ্চর্য্য উপন্যাস প্রকাশের সূত্রপাত করেন, চলিত ভাষায় পুস্তক রচনার প্রথা টেঁকচাঁদ ঠাকুরের হুতুম পেচার পর, উহা এক প্রকার আদর্শ, অনেকে বলেন, টেঁকচাঁদ ঠাকুর অপেক্ষা এ ভাষা প্রাঞ্জল। পুস্তকের নাম "আমার গুপ্তকথা, অতি আশ্চর্য্য!" নায়কের নাম হরিদাস। এই জন্য সাধারণ আজকাল নাম দিয়াছে, হরিদাসের গুপ্তকথা! টাইটেলের শিরোনাম "এই এক নূতন।"

শোভাবাজারের রাজকুমার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ঐ পুস্তকের দু' এক ফর্ম্মা পাঠ করিয়া ভুবনচন্দ্রকে আহ্বান করেন, পূর্ব্বের পরিচয় ছিল, ভুবনচন্দ্র দেখা করিতে যান, তদুপলক্ষে উপেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর "রেণল্ডের জোসেফ্ উইলমট" নামক সুবিখ্যাত রহোদ্যাস পুস্তকের নাম করেন, সেই প্রণালীতে বিরচন করিতে বলেন, তাহাই ধার্য্য হয়।

গুপ্তকথা লিখিবার সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের অনুবাদক বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছয় মাসের বিদায় গ্রহণ করাতে প্রেটিয়ট সম্পাদক বাবু কৃষ্ণদাস পালের অনুরোধে ভুবনচন্দ্র ঐ ছয় মাসের জন্য তৎপদে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। সেই সময় বাবু কৃষ্ণদাসের দ্বারা তিনি শ্রীযুক্ত বাবু (এক্ষণে মহারাজা বাহাদুর কে, সি, এস, আই) যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর মহানুভবের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়।

গুপ্তকথা লিখিবার অগ্রে সমাজ কুচিত্র নামে তিনি একখানি সামাজিক নক্সা প্রণয়ন করেন, সেখানি হুতমের ভাষার অনুকরণ, বিজ্ঞ

* মাতলা রেলওয়ে সোণারপুর ষ্টেশনের নিকটাবর্ত্তী চিঁংড়িপোঁতা গ্রাম হইতে তখন "সোমপ্রকাশ" প্রকাশ হইত। জং সং।

লোকে তাহা পাঠ করিয়া প্রকৃত চিত্র বলেন, হুতম নিজেও প্রশংসা করিয়াছিলেন। গুপ্তকথা লিখিবার পর এ পর্য্যন্ত তৎপ্রণীত অনেকগুলি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে। বাবু বরদাকান্ত মিত্র কোম্পানি যৎকালে শোভাবাজার গ্রে ষ্ট্রীট হইতে রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমের ২য় সংস্করণ প্রকাশ করেন, তৎকালে একখানি নূতন পুস্তক লিখিত হয়, তাহার নাম "রহস্যমুকুর" পরিমাণ প্রায় ৭০ ফর্ম্মা, তৎপরে পঞ্জাবের ইতিহাস অবলম্বনে আর একখানি পুস্তক হয়, তাহার নাম "তুমি কি আমার!" সেখানি প্রায় ৭০ ফর্ম্মা, টালিগঞ্জের মণ্ডল জমিদারেরা তাহা প্রকাশ করেন। চিনেবাজারের ডি, সি, দাস কোম্পানি এই গ্রন্থকারের একখানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার নাম "আশা চপলা" গদ্য পদ্য উভয় ছন্দে বিরচিত, পরিমাণ প্রায় দুইশত ফর্ম্মা। ইংরাজী ১৮৯০ সালে রেগল্ডের জোসেফ উইলমটের অবিকল বঙ্গানুবাদ প্রকাশ হয়, নাম বিলাতী গুপ্তকথা, পরিমাণ রয়েল আট পেজি দুইশত ফর্ম্মা। অনন্তর বঙ্কিমবাবুর গুপ্তকথা, তাহার পরিমাণও প্রায় ৮০ ফর্ম্মা। তদ্ব্যতীত ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সকলগুলির নামসংগ্রহ করিতে পারা গেল না। স্থূলতঃ ভারতবিলাস, যাত্রাবিলাস, বঙ্গবিলাস, দারোগাবিলাস, বাঁশরী, নবদুর্গা, সর্ব্বনাশী, পারুল, পারস্য উপন্যাস, তুরস্ক উপন্যাস, আশাচপলা, ঠাকুরপো প্রহসন, ইত্যাদি অনেক আছে। যে দিন মাইকেল মধুসূদন দত্তের মৃত্যু হয়, সেই দিন বাবু কৃষ্ণগোপাল ভক্ত এবং বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর অনুরোধে দুই ঘণ্টার মধ্যে তিনি একখানি অমৃতাক্ষর কাব্য রচনা করেন, কাব্যের নাম মধুবিলাপ। জগন্নাথক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে একটি শবদেহ উপলক্ষ করিয়া তিনি আর একখানি অমৃতাক্ষর কাব্য লেখেন, নাম—"তুমি কে?" নশ্বর নরদেহের পরিণাম কি? অল্প কথায় বিশদরূপে সেই পুস্তকে তাহা বর্ণিত আছে।

হুগোর্লকুড়িয়ার গোপালচন্দ্র রায় নামক এক ব্যক্তি হরিবংশ প্রকাশ করিতে অভিলাষী হওয়ায়, ভুবনচন্দ্র বিশেষ উৎসাহ দেন। কুইন্স কলেজের পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন অনুবাদ করেন, ভুবনচন্দ্র বিশেষ যত্নপূর্ব্বক তাহার ভাষা অলঙ্কৃত করিয়া দেন, বাওয়ালির জমিদার বাবু কালীকৃষ্ণ মণ্ডল কাশীখণ্ড প্রকাশে ব্রতী হইলে নবদ্বীপের একজন পণ্ডিতের সাহায্যে ভুবনচন্দ্র প্রাঞ্জল বঙ্গভাষায় তার অধিকাংশের অনুবাদ করেন। তৎপ্রণীত সমস্ত

পুস্তকের প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন, কেবল "তুমি কি আমার!" পুস্তকখানির প্রকাশক তিনি স্বয়ং। প্রভাকর সম্পাদন সময়ে কুষ্টিয়ানিবাসী সৈয়দ মীর মসারফ হোসেন নামক এক মুসলমান যুবক দুইখানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া তাঁহাকে দেখাইতে আনেন, তিনি তাহা উত্তমরূপে শোধন করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় সজ্জিত করেন, একখানির নাম "বসন্তকুমারী" ২য় খানির নাম বিষাদসিন্ধু। শেষোক্ত পুস্তকখানি মহরমের শোকসূচক ঘটনার মূল, তাহা পাঠ করিয়া বঙ্গের সাহিত্যসমাজ যথার্থই অশ্রুপাত করিয়াছেন, বিষাদসিন্ধু নাম সার্থক হইয়াছে, পণ্ডিতেরাও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

"পরিদর্শক" "সোমপ্রকাশ" "প্রভাকর" এই তিনখানি সংবাদপত্র ব্যতীত সমাচারচন্দ্রিকা, সময়, বিশ্বদূত ও ভারতমিহির প্রভৃতি কয়েকখানি সাময়িক ও সপ্তাহিক পত্রেও তাঁহার অনেক লেখা ছিল। বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কোম্পানী যৎকালে পাথুরিয়াঘাটা হইতে বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের এক সংস্করণ প্রকাশ করেন, ভুবনচন্দ্র সেই সময় সেই কার্য্যালয় হইতে "পূর্ণশশী" নামে গদ্য পদ্যময়ী একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একখানি বাঙ্গালা অঙ্কপুস্তক এবং "কুমারী শিক্ষা" নামে বালিকা বিদ্যালয়ের একখানি পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শিক্ষাবিভাগের পুস্তক নির্ব্বাচনের দুর্দ্দশা দর্শনে সে দুখানি তিনি প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই, আদর্শ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার প্রণীত আর কয়েকখানি পুস্তক আছে, সে সকল পুস্তকে তাঁহার নাম নাই, লিখন-প্রণালী দেখিয়া যাঁহারা বুঝিতে পারেন, কেবল তাঁহারা ভিন্ন সাধারণে তাহা অবগত নহেন। আর একটি কথার উল্লেখ আবশ্যক হইতেছে, বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত একখানি নূতন নাটক "মায়াকানন।" কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই নাটকখানি লিখিতে লিখিতে অসম্পূর্ণ রাখিয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন, নাটকের একটি অঙ্ক লেখা বাকি ছিল, সেই অঙ্কেই উপসংহার কি হইবে ভাবিয়া থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা ব্যাকুলিত হন, শেষ অঙ্কে কি কি থাকিবে, বাবু শরৎচন্দ্র ঘোষ বুদ্ধিপ্রভাবে মৃত্যুশয্যাশায়ী নাট্যকারের মুখ হইতে তাহার স্থূলভাব শুনিয়া রাখিয়াছিলেন, শরৎবাবুর মুখে গল্প শুনিয়া ভুবনচন্দ্র সেই নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

১৩০৩ সালে বসুমতী নামিকা নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা, আলুথালু-

কার্য্যের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় কয়েকখানি ডিটেক্‌টিভ ইতিহাস ও অন্যান্য উপন্যাস বিরচিত হয়, তন্মধ্যে আমিনাবাই, গলিভার্স ট্রাভল" নামক ইংরাজী পুস্তকের বঙ্গানুবাদ ছিল না, রজত-কুমারীতে তিনি সেই অত্যাশ্চর্য্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত বঙ্গভাষায় আনয়ন করিয়াছেন। সমস্ত বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সময়ে হয় ত আর কাহার দ্বারা তৎসমস্ত বিবৃত হইতে পারিবে, এমন আশা করা যাইতে পারে। বাস্তবিক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে সুপরিচিত হইবার যোগ্যপাত্র। নিজে তিনি নামলুব্ধ অথবা প্রশংসাকাঙ্ক্ষী নহেন বলিয়া নামটির ততদূর প্রচার নাই, কেবল তৎপ্রণীত পুস্তক সমূহের প্রকাশকগণ আপনাদের আগ্রহ সহকারে কোন কোন পুস্তকের টাইটেল পেজে তাঁহার নাম দিয়াছেন, এইমাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্বয়ং ভুবনচন্দ্রের মুখেই আমরা এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি। আশা আছে, পুনরায় আর একবার আমরা এই সাহিত্য-বন্ধুকে স্মরণ করিব।

প্রতিহিংসা।

প্রথম কাণ্ড।

(এমন সতীন কাহার হয় !!!)

যে দেশে জ্যৈষ্ঠ মাসে বসন্তকাল আরম্ভ, বঙ্গের পলাসীর যুদ্ধের একশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, দিল্লীশ্বর জাঁহাঙ্গীর সাহর রাজত্বকালে সেই দেশের একটি যুবতী কামিনী কোন এক ঘটনাসূত্রে ভারতের রত্নকোট রাজ্যে উপস্থিত হন। সেই কামিনী ধবলবর্ণা নহেন, শাশ্মীরী মহিলার ন্যায় গৌরাঙ্গি। রত্নকোটের রাজা সূর্য্যকেতু সেই কামিনীর রূপলাবণ্য দর্শনে প্রেমানুরাগে বিমোহিত হইয়া, গন্ধর্ব্ব-বিধানে তাঁহাকে বিবাহ করেন। কামিনী প্রকৃত নাম পাওয়া যায় নাই, রাজপুরী মধ্যে তাঁহার নাম হইয়াছিল "প্রাঞ্জল বঙ্গরাণী।" ধর্ম্মশাস্ত্রমতে বিবাহিতা পট্টমহিষী ছিলেন, সুতরাং

এই দ্বিতীয়া পত্নীর নাম "ছোট রাণী।" এখানে এই পর্য্যন্ত থাকুক, দুই বৎসর পরে যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই এক্ষণে গল্পচ্ছলে পাঠক-পাঠিকা মহাশয়কে শোনাইব।

ছোট রাণীর পরিচ্ছদ এক একবার বিলাতী ধরণের গাউন, এক একবার হিন্দুস্থানী ধরণের পেসওয়াজ এক একবার বিদেশী ধরণের সাড়ী কাঁচুলী। বয়স অনুমান একবিংশতি বৎসর।

একদা ফাল্গুন মাসের শেষে সূর্য্যদেবের অস্তগমনের পর রাজা সূর্য্যকেতু আপন প্রাসাদের অন্তঃপুরস্থ শয়নকক্ষে পর্য্যঙ্কোপরি একাকী শয়ন করিয়াছিলেন, গৃহের দ্বারগবাক্ষ সমস্তই অনাবৃত ছিল, শীতল বসন্ত সমীরণ ধীরে ধীরে রাজগৃহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতেছিল, সুখসমীরণ স্পর্শে রাজা তন্দ্রাভিভূত হন, সন্ধ্যা হইয়া গেল, রাজার তন্দ্রাঘোর ক্রমশঃ অল্পে অল্পে একটু গাঢ় হইয়া আসিল, নিদ্রা নহে—তথাপি আচ্ছন্ন। প্রদোষকালে একজন কিঙ্করী আসিয়া সেই কক্ষের দুই দেলগিরিতে বাতি জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, রাজা তাহা জানিতে পারে নাই।

খানিকক্ষণ পরে গৃহমধ্যে হঠাৎ একটা ঝঞ্ঝনা শব্দ হয়, সেই শব্দে রাজার তন্দ্রাঘোর ভাঙ্গিয়া যায়। সচকিতে উঠিয়া বসিয়া রাজা যেন দেখিতে পান, একটি নারী ছায়াকঞ্চুকবেষ্টিত বাসনাঞ্চলে বদ্ধকটি, এলোকেশী, যেন গৃহ হইতে ছুটিয়া পলাইল।

পরক্ষণেই কক্ষান্তর দ্বারে সাত অঙ্কনারী কণ্ঠে চীৎকার উঠিল; "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! কি হবে মা! বড় রাণী আজ আমাদের রাজাকে কাটিবার মৎলবে এইমাত্র গৃহমধ্যে গিয়াছিল, রাজা ঘুমাইতেছিলেন, তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠাতে বড়রাণী তাঁহাকে কাটিতে পারে নাই, ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছে!"

চীৎকারের বাক্যগুলি হিন্দিভাষায় উচ্চারিত হইয়াছিল, বাঙ্গালায় তরজমা করিয়া দেওয়া গেল। নারীকণ্ঠের মিত্রস্বরা ছোটরাণীর দুটি সখী সর্ব্বাগ্রে কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে ছোট রাণীরও কণ্ঠস্বর বিমিশ্রিত, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন, আতঙ্কে, সংশয়ে, বিস্ময়ে প্রবেশদ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, বৃহৎ একখানা খড়্গ দ্বারদেশে পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিয়াই রাজার সর্ব্ব শরীরে কম্প উপস্থিত হইল।

কি ব্যাপার, জানিবার জন্য রাজা অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেছিলেন, আলুথালু-

বেশে ছোট রাণী ছুটিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আতঙ্ককম্পিতকণ্ঠে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি ব্যাপার? গৃহমধ্যে কে আসিয়াছিল? এ খড়্গ কে ফেলিয়া গেল? কিসের খড়্গ?"

কণ্ঠস্বর কাঁপাইয়া ছোটরাণী উত্তর করিলেন, "চাপিয়া যাও রাজা, চাপিয়া যাও! ঘরের কথা বাহির হইলে কলঙ্ক প্রচার হয়। আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? আমি কিছু বলিব না, আমি বলিলে দোষ দাঁড়াইতে পারে। জানি অনেকটা, কিন্তু বলিব না। বাপরে! (শিহরিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া নেত্রমার্জ্জন করিয়া) মেয়েমানুষের কি বুকের পাটা! আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? সখীরা আছে, পরের মেয়ে, বেতন পায়, রাজার কাছে তাহারা সত্যগোপন করিবে না।"

রাজা অতিশয় উন্মনা হইয়া ছোট রাণীর সখীগণকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সখীরা আসিল। দুইজন সখী। প্রশ্নের উত্তরে তাহাদের মুখে রাজা শুনিলেন, বড় রাণী অষ্টাহকাল কর্পূরার সঙ্গে মন্ত্রণা করিতেছিলেন, রাজাকে কাটিয়া আপনার বড় ছেলেটিকে রাজা করিবেন, আপনি এই রাজসংসারে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া থাকিবেন, ছোট রাণীকে অকূলে ভাসাইবেন। সেই মন্ত্রণার ফল আজ ফলিতেছিল, ভগবান রক্ষা করিয়াছেন।

বড় ছোট দুটি রাণীর প্রতিই রাজার সমান ভালবাসা। তবে কেন বড় রাণীর তেমন কুমতি হইয়াছিল? রাজা এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে ছোট রাণীর মুখপানে চাহিয়া সখীরা বলিল, "কর্পূরার সহিত বড় রাণীর পরামর্শ তাহারা শুনিয়াছে, বড় রাণী বলিয়াছিলেন, "সতীনকে পদতলে দলন করিলে ধর্ম্মার্থকাম সিদ্ধ হয়।

"ছোট রাণীর গর্ভে সন্তান জন্মে নাই, রাজা বাঁচিয়া থাকিলে সতীনের গর্ভে যদি সন্তান জন্মে, তবে আমার নিজের পুত্রগণের রাজ্যের অংশীদার হইবে, তাহা সহ্য হইবে না, অতএব রাজাকে নিপাত করিব, ছোট রাণীকে বাঁদী করিব।" বড় রাণীর এই সিদ্ধান্তে কর্পূরাও মাথা নাড়িয়া সায় দিয়াছিল। বড় রাণীর প্রাচীনা সহচরির নাম কর্পূরা।

এই গল্পটীকে যদি কেহ নাটক বলিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভাবুন, এই

দ্বিতীয় কাণ্ড।

নির্ব্বাসন ও বিচ্ছেদ।

এই গল্পটীকে যদি কেহ নাটক বলিতে ইচ্ছা করেন, তিনি ভাবুন, এই হইল নাটকের প্রথম অঙ্ক। এক্ষণে দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের অবতারণা। রঙ্গভূমি রাজসভা। পারিষদবর্গের নিকটে পরদিন প্রাতঃকালে গত রজনীর ভীষণ ঘটনা বর্ণনা করিয়া রাজা এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন যে, বড় রাণীর শিরশ্ছেদন উচিত দণ্ড। রাজসভার বিজ্ঞ বিজ্ঞ মন্ত্রীগণ নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন, এখনকার বড় বড় ভুড়িওয়ালা বাবু লোকের প্রসাদভোজী মোসাহেবের ন্যায় সেই সভায় যে কয়জন হনুমান ছিলেন, তাঁহারা রাজার বাক্যে আনন্দে প্রতিধ্বনি করিয়া সরফরাজী দেখাইলেন। শেষকালে প্রধান মন্ত্রীর সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া রাজা মহাশয় স্ত্রীহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন, বিচারে অথবা অবিচারে রাজ্য হইতে বড় রাণীর নির্ব্বাসনের আজ্ঞা হইল। সভাভঙ্গের পর নিশাকালে ছোট রাণীর সহিত রাজার গুপ্তমন্ত্রণা। ছোট রাণী বলিলেন, "শিকড় রাখিয়া গাছ কাটিলে আবার বড় গাছ জন্মিতে পারে, সতীনের কথা নয়, শাস্ত্রের কথা। যাহাদের গর্ভধারিণী পতি বধ করিয়া সতীনকে বাঁদি করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, তাহারা যে মাতার সঙ্কল্পিত কার্য্যসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবে না, এমন কথা কে বলিতে পারে? সেইজন্য আমি বলি, মায়ের সঙ্গে ছেলে দুটোকেও দেশত্যাগী করা কর্ত্তব্য। আমার বুদ্ধিতে ত এই আইসে, এখন দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা তুমি, তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, তাহাই কর।"

এই মন্ত্র গুরুমন্ত্র অপেক্ষাও প্রবল। ছোট রাণী যাহা বলিলেন, রাজা তাহাই করিলেন। বড় রাণীর দুটী পুত্র, সে দুটীকেও জননীর সঙ্গে নির্ব্বাসিত করা হইল। ছেলে দুটী নাবালক।

দ্বাপর কলির ছলনে পুণ্যশ্লোক নলরাজা যখন দময়ন্তী সতীর সহিত বনবাসী হইতে যান, সেই সময় দ্যূতজেতা সহোদর পুষ্কর এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, রাজ্যাধিবাসী প্রজাবর্গের মধ্যে যদি কেহ নলদময়ন্তীকে আশ্রয় দেয়, পুষ্কর তাহার সর্ব্বনাশ করিবেন। সেই কারণে নলরাজা রাজ্য সীমা মধ্যে এক রাত্রিও স্থান না পাইয়া, পত্নীর সহিত বনবাসী

হইয়াছিলেন। এই নাটকের নায়ক রাজাটিও পুষ্করের ন্যায় আদেশ প্রদান করিলেন। নির্ব্বাসিত বড়রাণী দুটি নাবালক পুত্র লইয়া এক রাত্রিও সে রাজ্যে থাকিতে পাইলেন না, পররাজ্যে প্রবেশ করিতেও অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইল। প্রবেশ করিয়াই বা কি করিবেন? রাজরাণী দাসীবৃত্তি করিতে পারিবেন না। রাজকুলে জন্ম, রাজকুলের গৃহলক্ষ্মী, অভিমান সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে, পরের সেবা করিতে কিছুতেই প্রবৃত্তি হইবে না। ছেলেরাও দাসত্ব করিতে পারিবে না, কারণ তাহারা রাজপুত্র।

তবে আর পর-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কি ফল? ভিক্ষা করিয়া চলিতে পারে। পতিব্রতা রাজরাণী তাহাতেও সন্দেহ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, মানুষ বড় দুরন্ত, মানুষের কাছে ভিক্ষা করা অপমানে মরিয়া যাওয়া। ভিক্ষা কিন্তু চাই। রাণী স্থির করিলেন, মানুষের কাছে ভিক্ষা না করিয়া কাননের তরুলতার কাছে ভিক্ষা করা ভাল। কাননের তরু লতারা কৃপণ হইতে জানে না। দাতার কাছে ভিক্ষা করাতে মান আছে। মান প্রাণ দুই বাঁচে। ছেলে দুইটিকে বাঁচাইতে হইবে।

দৃঢ়সঙ্কল্প। ছেলে দুটির হাত ধরিয়া বস্ত্রালঙ্কারবিহীনা ভিখারিণী রাজরাণী বনবাসিনী হইলেন। বৃক্ষলতার কাছে ফল ভিক্ষা করেন, নদী নির্ঝরের সুস্বাদু নির্ম্মল জল পান করেন, তরুতলে শয়ন করেন, বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করেন, তরুপল্লবেরা তাঁহাদের মাথায় ছত্র ধারণ করে, নিশাকালে নক্ষত্রশোভিত আকাশমণ্ডল তাঁহাদের মস্তকোপরি নীলচন্দ্রাতপরূপে শোভা পায়, সমীরণ তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুগতিতে বিচরণ করে, তাহাই তাঁহাদের স্বর্গসুখ বলিয়া মনে হয়; রাজ্যসুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। আর বেশী সুখ, মানুষের মুখ দেখিতে হয় না। রাণী মনে করেন, মানুষের সঙ্গে তুলনায় কাননের হিংস্রপশুবৃন্দ দেবতুল্য বলিলেও চলে।

বলা হইল, বনে বনে—পর্ব্বতে পর্ব্বতে রাজরাণীর পরিভ্রমণ। সর্ব্বক্ষণ ছেলে দুটির হাতধরা। দুদিকে দুটি ছেলে, মধ্যস্থলে রাণী। যশোদার দুই হস্ত ধারণ করিয়া কৃষ্ণ বলরাম যখন সারি সারি দাঁড়াইতেন, গোকুলের গোপগৃহে তখন যেমন শোভা হইত, গিরিকাননে জননীর করপল্লবধারি দুটি সুন্দর সুন্দর রাজপুত্রের সেইরূপ শোভা!

এই ভাব এক বৎসর। যোগীরা যেমন অল্পে অল্পে যোগাভ্যাসে অভ্যস্ত

হন, সেই বনবাসী রাজরাণীও সেইরূপে পরিব্রাজিকার ক্রীড়া অভ্যাস করিলেন। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা অনাবৃত শরীরে স্বচ্ছন্দে সহিয়া গেল, ছেলে দুটিও ঋতুপ্রতাপ সহ্য করিতে শিখিল। জ্যেষ্ঠ কুমারের বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষ, কনিষ্ঠের দশম বর্ষ।

আর দুই বৎসর। সর্ব্বক্ষণ তিনটিতে একত্র। লহমার জন্যও ছাড়াছাড়ি হয় না। ভ্রমণ অবসরে রাণী সর্ব্বদাই ছেলে দুটির হাত ধরিয়া থাকেন। বার বার এই কথা বলা হইতেছে, ইহার একটি কারণ আছে। বিচ্ছেদ যাহা ঘটিবার, রাণীর অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়াছে, এখন প্রাণসর্ব্বস্ব এই ছেলে দুটি। ইহাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিলে, তিনি জগৎ সংসার অন্ধকার দেখিবেন, মহাশোকে হয় ত জীবন হারাইবেন, অতুল্য মাতৃস্নেহ বার বার যেন সেই কথাই বলিয়া দেয়, রাণীও কেবল তাহাই ভাবেন, সেই ভাবনাতেই হাত ছাড়িয়া দেন না।

দৈবের ঘটনা বিচিত্র! কেবল বিচিত্র হইয়াই যদি মিলাইয়া যাইত, তবে দৈবের নামে মানুষকে এত ভয় পাইতে হইত না, দৈব যেমন মঙ্গল ঘটাইতে পারে, তেমনি শত শতবার ঘোরতর ভয়ঙ্করী বিভীষিকা সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারে। ঐ বনবাসিনী রাণীটি তিন বৎসরকাল গিরিকাননে কাটাইলেন, ছেলে দুটি প্রাণের সঙ্গে গাঁথা, কোন ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই বোধ ছিল না। অকস্মাৎ বজ্রাঘাত! প্রচণ্ড নিদাঘকাল সমাগত, বৈশাখ মাস অবসান, একদিন অপরাহ্ণে আকাশের একধারে হস্তীবর্ণের একটা মেঘ উঠিল, সন্ধ্যাকালে সেই মেঘ সমস্ত গগন ব্যাপিয়া ছায়িল, ঘোর অন্ধকার। বায়ু নিরোধ। কোনদিকে কোন শব্দ নাই, অত ঘোর মেঘেও গর্জ্জন নাই, প্রকৃতি যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। সেই ঠাণ্ডা অন্ধকারে তবে আছে কি? আকাশে পলকে পলকে নিঃশব্দ চপলার খেলা, ধরাতলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খদ্যোতপুঞ্জের মোহনমেলা।

রাত্রি চারিদণ্ডের সময় ঘনঘটায় গভীর গর্জ্জন আরম্ভ হইল, দশদিক স্তব্ধকারি ঘন ঘন বজ্রনিনাদ, প্রশান্ত, শীতল ব্রহ্মাণ্ড যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল, যাদুকরি প্রকৃতি এই রঙ্গের সময় এই রণরঙ্গভূমিতে নাচিতে আরম্ভ করিলেন। ঝড় উঠিল,—তুমুল ঝড়। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি! ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের চক্‌মকির সঙ্গে বিভীষণ বজ্রধ্বনি!

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই দুঃখিনী মাতা ছেলে দুটিকে বুকে করিয়া

ভয়ঙ্কর প্রকৃতির সঙ্গে জুঝিয়াছিলেন, শেষে আর পারিলেন না। বৃষ্টির ঝাপ্টায়, ঝড়ের তাড়নে, জলদের গর্জ্জনে, বজ্রের হুঙ্কারে অভাগিনী অবশাঙ্গী হইয়া পড়িলেন, হৃদয় হইতে হৃদয়ের উজ্জ্বলমণি দুটি দুইদিকে খসিয়া পড়িল, কে কোন্‌দিকে গড়াইয়া গেল, রাক্ষসী তমসী তাহা দেখিতে দিল না। "মা! মা! মা কই! মা কোথায়?" দুইদিকের এইরূপ দুরন্ত আর্ত্তনাদ দুঃখিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল না, ভীমগর্জ্জনে জলধর সকল কর্ণকে বধির করিয়া রাণীকে সে আর্ত্তনাদ শুনিতে দিল না। যিনি পবন, তিনিও এই সময় জলধরপটলের রণবাদ্যের তালে নাচিয়া নাচিয়া জগতের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, যুদ্ধে হত হইয়া কাননের বড় বড় বৃক্ষ মড়্‌মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, এত শব্দ একত্র! এ শব্দসাগরে ভাসমান কাহার ক্রন্দন, কাহার কর্ণবিবরে প্রবেশ করিতে পারে? অরণ্যে রোদন!

রোদন তিনদিকে। "মা কোথায়? দাদা কোথায়? আমি কোথায়?" এইরূপ রোদন একদিকে, "আমার প্রাণ পুতলি কোথায়? হাত কোথায়? প্রাণ কোথায়? বিধাতা কোথায়? হায় হায় হায়!" এইরূপ রোদন একদিকে। "মা কোথায়? ভাই কোথায়? যাই কোথায়? বজ্রাঘাত!" এইরূপ রোদন একদিকে। তিনটি দিক দূরে দূরে। এ সময়ের মাতৃবিলাপ কতদূর সম্ভবে, কল্পনায় আনয়ন করিয়া তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। ভ্রাতৃদ্বয়ের বিলাপও হৃদয়বিদারক।

সমস্ত রাত্রি ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত। তিনজনের কে কোন্‌দিকে গেল, কেহই জানিতে পারিল না, তিনজনেই কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্বেষণ করিল, সে দুর্য্যোগে, সে অন্ধকারে অন্বেষণ বিফল, বরং আরও ভয়ঙ্কর ফল হইল, বৃথা অন্বেষণে তিনজনেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনির্দ্দিষ্ট বহুদূরে গিয়া পড়িল। রজনী প্রভাতে তিনজনেই ঠাঁই ঠাঁই। কোথায় কে, কেহই জানিতে পারিল না, দু এক বিঘা বন নহে, অসীম অরণ্য, বহুদূরব্যাপি পর্ব্বতমালা, সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া অবশাঙ্গে কে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে, অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা সহজ কথা নহে, প্রভাতের অন্বেষণও বৃথা হইল।

তৃতীয় কাণ্ড।

রাজা করা হাতী।

দুইদিন, পাঁচদিন, দশদিন, দেখিতে দেখিতে এক মাস কাটিয়া গেল। রাণী কোথায় রহিলেন, রাজপুত্রেরা কোথায় গেলেন, উদ্দেশ হইল না, তিনজনেই তিন স্থানে কাঁদেন, তিনজনেই সমান শোকে আচ্ছন্ন। এ বিচ্ছেদ অসহ্য। স্নেহকাতরমনে অমঙ্গল আশঙ্কা অগ্রবর্ত্তিনী। জননীর মনে ক্ষণে ক্ষণে উদয় হয়, ছেলে দুটি বুঝি জন্মের মত হারাইলাম! পৃথিবীতে তাহারা আছে কি নাই, এই চিন্তাই প্রবলা।

ছয়মাস অতীত। রাণীর কনিষ্ঠ পুত্রটি ক্রন্দন করিতে করিতে একদিন প্রাতঃকালে একটা বনপ্রান্তে উপস্থিত। সম্মুখে অদূরে দিব্য একটি শ্বেত হস্তি। রাজকুমার সেই হস্তী দর্শনে ভীত হইয়া অন্যদিকে পলাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, হস্তি দ্রুতগতি নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে শুণ্ডে জড়াইয়া, পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। শিশু রাজকুমার উচ্চ রবে কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দনে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া হস্তি তাঁহাকে সুদূরবর্ত্তী এক নগরে লইয়া গেল। নগরের মধ্যস্থলে রমনীয় প্রাসাদ, সেই প্রাসাদের প্রথম তোরণের প্রবেশদ্বারের সম্মুখে অনেক লোক। তাঁহাদের মধ্যে শুভ্র পরিচ্ছদধারি দুইজন ভদ্রলোক সানন্দে অগ্রবর্ত্তী হইলেন, হস্তী তাঁহাদের নিকটে শান্ত হইয়া শয়ন করিল, তাঁহাদের একজন হস্তীপৃষ্ঠ হইতে রাজপুত্রকে কোলে করিয়া লইয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন, অপর লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে চলিল, পুরীমধ্যে শঙ্খধ্বনির সহিত বিবিধ মঙ্গলবাদ্য নিনাদিত হইতে লাগিল। যিনি রাজপুত্রকে কোলে করিয়া আনিলেন, শেষে প্রকাশ পাইল, তিনি তথাকার রাজমন্ত্রী, প্রাসাদটীও রাজপ্রাসাদ। মন্ত্রী মহাশয় সেই পুত্রকে রাজবেশে সাজাইয়া, ফুলের মালা গলায় পরাইয়া, রাজমুকুট মাথায় দিয়া, রাজসিংহাসনে বসাইয়া দিলেন, শ্বেত হস্তী সম্মুখে আসিয়া, শুণ্ড দ্বারা পুতসলিলপূর্ণ মঙ্গল কলস উত্তোলন পূর্ব্বক অভিষেক করিয়াছিল, রাজপুত্র রাজা হইলেন। সমবেত লোকের জয়ধ্বনির সহিত পুনরায় মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে মঙ্গল সংকীর্ত্তন।

রাজ্যে তখন রাজা ছিলেন না। রাজ্যের নিয়ম এই যে, রাজবংশে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকিলে রাজার শ্বেত হস্তী যাঁহাকে নির্ব্বাচন

করিয়া পৃষ্ঠে করিয়া আনিত, তিনিই রাজা হইতেন। এই অভিষেকও সেই প্রথানুসারে সম্পাদিত হইল।

রাজা সূর্য্যকেতুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম পুষ্পকেতু, কনিষ্ঠের নাম কুমারকেতু। শ্বেত হস্তি এই কুমারকেতুকে গজেন্দ্রপুর রাজ্যের রাজা করিল। কুমারের বয়ঃক্রম তখন ত্রয়োদশ বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিক।

কুমার কুমারকেতু গজেন্দ্রপুরীর রাজা হইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিলেন। রাজকার্য্য করিতেছেন, রাজভোগ ভুঞ্জিতেছেন, কুমারের মনে কিন্তু সুখ নাই। দিবারাত্রি তাহার অন্তরসাগরে বিষাদতরঙ্গের ক্রীড়া, জননীর চিন্তা, জ্যেষ্ঠ সহোদরের চিন্তা সর্ব্বদা জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করে, কি কারণে এ বিষাদ, লোকে তাহা বুঝিতে পারে না।

একদিন নিশাকালে নবরাজ কুমারকেতু আপন শয়নগৃহে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, তাঁহারা কোথায়? মনে মনে বলিতেছেন, তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, বাঁচিয়া না থাকিলে প্রাণের উদ্বেগ আর এক প্রকার হইত। বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু কোথায়? আর কি দেখা হইবে না? রাজরাণী হইয়া মা আমার হয়ত পথের ভিখারিণী, রাজপুত্র হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা আমার আজ হয় ত দীনহীন কাঙ্গাল! তাঁহাদের তপ্তকাঞ্চনসদৃশ বর্ণ হয় ত কালী হইয়া গিয়াছে, দেহ হয় ত কঙ্কালসার হইয়াছে, যদি দেখা পাই, হয় ত তাঁহাদিগকে আমি চিনিতেই পারিব না, তাঁহারাও হয় ত আমাকে চিনিতে পারিবেন না। চেনা অচেনা ত পরের কথা, এখন দেখা পাইবার উপায় কি? চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে একটি উপায় অবধারিত হইল। সে রাত্রে নিদ্রা হইল না, কতক উল্লাসে, কতক আশ্বাসে, কতক জাগিয়া জাগিয়া তিনি নিশাযাপন করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজসভায় বসিয়া রাজা কুমারকেতু সভাজনগণকে আজ্ঞা দিলেন, রাজ্যমধ্যে, দূরস্থ রাজ্যেও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হউক, আমি একটা দীর্ঘিকা খনন করাইব, দুর্দ্দশাপন্ন যেখানকার যে কেহ মাটি কাটিতে জানে, মাটি বহিতে জানে, অথবা সামান্য সামান্য কার্য্য করিতে সমর্থ, এক মাসের মধ্যে তাহারা এই রাজ্যে আসিয়া কার্য্য আরম্ভ করুক, এ কার্য্যে স্ত্রী পুরুষ ভেদ করা হইবে না, কার্য্যটি শীঘ্র শীঘ্র সমাধা করা চাই, হাজার হাজার লোক প্রয়োজন, প্রত্যেকে প্রতিদিন এক টাকা করিয়া বেতন পাইবে। খোরাকী রাজসংসার হইতে স্বতন্ত্র দেওয়া হইবে।

ঘোষণা প্রচারিত হইল, নিত্য নিত্য শত শত শ্রমজীবী উপস্থিত হইতে লাগিল, অনেকগুলি স্ত্রীলোকও আসিল, রাজবাটীর সম্মুখভাগে সুপ্রশস্ত ময়দানে বৃহৎ এক দীর্ঘিকা খনন আরম্ভ হইয়া গেল। লোকেরা কার্য্য করে, প্রতিদিন অপরাহ্ণে প্রাসাদের অলিন্দে বসিয়া রাজা তাহা দর্শন করেন। কি দেখেন, রাজা তাহা জানেন, অপরে তাহা জানে না।

একমাস দর্শনে রাজার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল না। একদিন তিনি হুকুম দিলেন, লোকেরা যখন ছুটি পাইয়া বাসায় যাইবে, তখন তাহাদের সকলকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আমার সম্মুখে দাঁড় করাইবে, আমি তাহাদিগকে ভাল করিয়া দেখিব, যতক্ষণ বিলম্ব হইবে, ততক্ষণের জন্য প্রত্যেককে এক এক টাকা করিয়া অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

সেই দিনই হুকুম তামিল হইল। লোকেরা সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইল, একদিকে পুরুষ—একদিকে স্ত্রীলোক। রাজা নামিয়া আসিয়া একে একে সকলের অবয়ব নিরীক্ষণ করিলেন, যাহা দেখিবার আকিঞ্চন, তাহা দেখিতে পাইলেন কি না, বুঝিতে পারিলেন না। দশদিন পরে রাজা আবার হুকুম দিলেন, বড় বড় শ্রেণী না করিয়া দশ দশ জনকে আমার সম্মুখে হাজির করিও। তাহাই হইল। রাজা তাহাদের সম্মুখে গমন করিয়া একে একে প্রত্যেককে নাম ধাম ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, সকলেই স্ব স্ব পরিচয় দিল, পুরুষদলের কেবল একজন মাত্র আত্মপরিচয় দিল না, প্রশ্ন শুনিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। স্ত্রীলোকদলের ঐ প্রকার, একটি স্ত্রীলোক অধোবদনে নীরবে চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল। সকল লোককে পুরস্কার দিয়া, বিদায় করিয়া, রাজা কেবল ঐ দুইজনকে আপন প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যত্নপূর্ব্বক রাখিবার আদেশ দিলেন। হুকুম হইল, উহাদিগকে আর কার্য্য করিতে দিবে না, দাসদাসী নিযুক্ত করিয়া দিবে, উত্তম বস্ত্র, উত্তম ভোজ্য ও উত্তম শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিবে, ছয় মাস রাখিবে, ছয় মাস পরে আমি উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যাহাদিগকে ঐরূপে রাখিবার হুকুম, বাস্তবিক তাহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ কালিবর্ণ, সহসা চিনিতে পারা সুকঠিন, সেই কারণেই ছয় মাস রাখিবার আদেশ। এইটি এই নাটকের তৃতীয়াঙ্ক, ভিতরে ভিতরে দুই একটি গর্ভাঙ্কের সমাবেশ। (ক্রমশঃ)

পরমকল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

বিবিধ মতামত।

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ আপনাপন অবস্থানুসারে অর্থাৎ পরমার্থ-বিষয়ে যাহার যে পর্য্যন্ত বোধ হইয়াছে, তিনি সেইরূপ প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্র ও সম্প্রদায়াদি করিয়া গিয়াছেন। যে সকল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জগতের উপকারার্থ শাস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াছেন, উহা বহির্মুখে পৃথক পৃথক বোধ হইলেও অন্তর্গত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। সত্য বস্তু পরমাত্মার প্রতি লক্ষ্য না রাখায়, প্রভেদ বোধ হইয়া থাকে।

সকল শাস্ত্র-কর্ত্তাই বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মা ছিলেন, তাঁহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ বলেন, পরমাত্মা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্তই পরমাত্মার রূপ। কেহ বলেন, ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই ব্রহ্মরূপ। কেহ বলেন, বীজ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্তই বীজরূপ। কেহ বলেন, চৈতন্য হইতে সৃষ্টি হইয়া, চৈতন্যরূপই আছে। কেহ বলেন, কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া, কারণরূপই আছে। কেহ বলেন, আল্লা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্ত আল্লার রূপ বা আল্লার সৃষ্টি। কেহ বলেন, গড্ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সকলই গড্রূপ বা গডে এই জগৎ অভাব ছিল। গড জগৎভাব প্রকাশ করেন। কেহ বলেন, পরমেশ্বর হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্তই পরমাত্মার রূপ। কেহ বলেন, প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্ত প্রকৃতিরূপ। সৃষ্টির বিষয়ে ইত্যাদি নানামত বহির্মুখে ভিন্ন বোধ হইতেছে কিন্তু সকলরই ভাবার্থ এক। কেবল বুঝিবার প্রভেদে ভিন্ন বোধ হয়। যেমন, জল এক পদার্থ হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও ভাষা-বিশেষে ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু বস্তু একই। এই প্রকার পরমার্থ সম্বন্ধেও অন্তর্গত সারভাব এক হইলেও সত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, শব্দের প্রতি লক্ষ্য রাখায়, ভেদ দৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন, যে জল হইতে মেঘ, বরফ, বৃষ্টি আদি হইতেছে, অতএব মেঘ, বরফ বৃষ্টি সকলই জলরূপ। কেহ বলিতেছেন, পানি হইতে মেঘাদি হইয়াছে। কেহ বলেন, ওয়াটার হইতে মেঘাদি হইয়াছে, সমস্ত ওয়াটার রূপ বা ওয়াটারে মেঘ, বরফাদি অভাব ছিল, ওয়াটার এই সকল সৃষ্টি বা ভাবরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই প্রকার নানা ভাষা-বিশেষের শব্দ পৃথক পৃথক হইলেও অন্তর্গত ভাব একই আছে। সেই প্রকার একই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে চরাচর লইয়া বিরাজমান আছেন। ইঁহাকেই নানা দেশ, ভাষা ও মতে নানাপ্রকার বর্ণন করিয়াছেন; এবং ইহার সৃষ্টি-বিষয়েও সমর্থানুযায়ী কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে ভক্তিপূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা সকলেই শান্তিলাভ করে, ইহা জ্ঞানী ব্যক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য। যেমন, জলপদার্থকে পান করিলেই তৃষ্ণা নিবারণ হয়, উহা ভাষা ও নামের বিভিন্নতা হেতু উহার কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না,—সেই প্রকার পূর্ণপরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন নাম হেতু সত্য উপাসনার ও শান্তির ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সত্য বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে নামেই উপাসনা করুক না কেন, তাহাতেই শান্তি পাইবে। নচেৎ কেবলমাত্র নামের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে শান্তি লাভ হয় না। যেমন, জল দেখিলে কিংবা জল জল করিয়া চীৎকার করিলে পিপাসা যায় না।

জগতে দ্বৈত, অদ্বৈত, আস্তিক, নাস্তিক, সাকার, নিরাকারবাদী ও সৃষ্টি প্রকরণ, পুনর্জন্ম কর্ম্মফলাফল, মুক্তি উপাসনার নিয়মাদির বিষয় সম্প্রদায়-ভেদে কত প্রকার মত আছে, তাহার সীমা নাই। যথা, কেহ বলিতেছেন, ঈশ্বর পরব্রহ্ম, স্বয়ংই জগতরূপে বিস্তার হইয়া নানাপ্রকার লীলা করিতেছেন। ব্রহ্মই সত্য এবং জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ পরব্রহ্ম হইতেই জগৎ প্রকাশ হইয়াই পরব্রহ্মরূপই আছেন। পরব্রহ্ম হইতে জগত বলিয়া যে পৃথক ভাবনা, তাহা মিথ্যা। ঈশ্বর হইতে মনুষ্যের পৃথক বোধই বিশেষ। ইহার নাম পুনর্জন্ম এবং যাহা করা যায়, তাহার নাম কর্ম্ম। কর্ম্ম করিলে যে সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ফলাফল। পরমাত্মা সকলের মাতা পিতা, তাঁহাকে অদ্বৈতভাবে উপাসনা করা উচিত। মৃত্যুর পরেও কর্ম্ম ফলাফল ভোগ হয়। বাসনা-রহিত হইলেই মুক্তি, নচেৎ পুনর্জন্ম আছে। স্বর্গ ও নরক বিশেষ স্থান আছে।

আর কেহ কেহ বলেন, যখন পরমাত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় কেহই নাই, তখন জন্ম পুনর্জন্ম কাহার হইবে? যখন ঈশ্বরই একমাত্র আছেন, তখন জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক ভাবিলেও জীব যাহা, তাহাই থাকেন। অর্থাৎ পরব্রহ্ম স্বয়ংই থাকেন। তখন ঈশ্বর হইতে পৃথক জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, কর্ম্ম,

নাই। আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক, আত্মজ্ঞান হইলেই মুক্ত স্বরূপ হয়। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টি স্বাভাবিক অর্থাৎ আপনা হইতেই হইতেছে। ইহার বিশেষ ঈশ্বর অর্থাৎ কর্ত্তা নাই। জীবের পুনর্জন্ম নাই, যতদিন জীবিত থাকা যায়, ততদিন সুখ ভোগ করাই শ্রেয়ঃ। যাহা কিছু সুখ দুঃখ ইহজীবনেই ভোগ হয়। মৃত্যুর পরে, জন্ম বা সুখ, দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, এই চারিভূত অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান আছে। পৃথিবীতে কণ্টকাদিকে নরক, এবং সুখকর ভোগপদার্থকে স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করে। এতদ্ভিন্ন স্বর্গ নরক নাই। দেহের নামই আত্মা, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা নামে কোন পদার্থ নাই; এবং মৃত্যুর পর কর্ম্মফলাফল নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, পরব্রহ্ম কতকগুলি দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা জগতের কার্য্যাদি করাইতেছেন। কেহ কেহ পরমাত্মাকে দ্বৈত, কেহ অদ্বৈত, কেহ নিরকার, কেহ সাকার, কেহ নিরাকার সাকারে অখণ্ডাকারে পূর্ণ বলিয়া পরমাত্মাকে নির্দ্দেশ করেন। কেহ বলেন, ঈশ্বর ও সয়তান আছেন। কেহ বলেন, একমাত্র সূক্ষ্ম পরমাত্মাই আছেন। কেহ বলেন, চিৎ ও অচিৎ এই দূতত্ত্ব আছে, ইহার দ্বারা সৃষ্টি আদি হয়।

মুক্তিবিষয়ে কেহ বলেন, তৃষ্ণা নিবারণ হইলেই মুক্তি হয়। কেহ বলেন, অজ্ঞান ও বাসনা বিনিষ্ট হইলে জ্ঞান হয়। কেহ বলেন, মুক্তি বলিয়া কোন অবস্থা নাই। কেহ বলেন, জ্ঞানস্বরূপ আত্মাজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ও কিঞ্চিৎ অভিন্ন। কেহ বলেন, পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ এবং জীবাত্মা মায়াযুক্ত। কেহ বলেন, ঈশ্বরই জীবরূপ, জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহেন, মায়া দ্বারাই জীবভাব বোধ হইতেছে, নচেৎ ব্রহ্মভাবেই আছেন। কেহ বলেন, জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন পদার্থ, ঈশ্বর জীবকে আপনরূপ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অথবা ঈশ্বরে জগৎ ও জীব অভাব ছিল, ঈশ্বর, জগৎ ও জীব ভাবরূপে প্রকাশ করেন। কেহ বলেন, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। কেহ বলেন, ঈশ্বর ও কর্ম্ম অনাদি। কেহ বলেন, পুনর্জন্ম নাই। কিন্তু কর্ম্ম ফলাফল ও অনাদি স্বর্গ ও নরক আছে। কেহ বলেন, নিরাকার ব্রহ্ম, দেবতা সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের দ্বারায় জগতের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। কেহ ঈশ্বরকে সাকার মনুষ্য-আকৃতি

জগৎ সৃষ্টি, পালন, লয়-কর্ত্তা মনে করেন। কেহ বেদকে ঈশ্বরবাক্য, কেহ কোরাণকে, কেহ পুরাণকে, কেহ তন্ত্রকে, কেহ বাইবেলকে, ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মনে করে। কেহ কৃষ্ণকে, কেহ যীশুখৃষ্টকে, কেহ মহম্মদকে এবং কেহ বুদ্ধকে ঈশ্বর-প্রেরিত মনে করিয়া তাঁহাদিগের বাক্যের দোহাই দিয়া থাকেন।

এই প্রকার জগতে আউলিয়া, পীর, পেগম্বর, যিশুখৃষ্ট, ঋষি, মুনী, অবতার, মৌলবি, পাদরী, পণ্ডিত, জ্ঞানী, অজ্ঞানীগণ কত প্রকার শাস্ত্র করিয়া, কত প্রকার মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহার সীমা নাই। এই সকল মতের মধ্যে কোন্ মত সত্য এবং কোনটী মিথ্যা, স্বরূপ বোধ না হইলে তাহা কি প্রকারে বুঝিবেন।

পাঠকগণ! আপনারা আপনাপন মান, অপমান, জয়, পরাজয়, সামাজিক মিথ্যা, স্বার্থ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ করতঃ বিচারপূর্ব্বক নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তে এই সকল বিষয়ের সারভাব গ্রহণ করিয়া পরস্পর মিলিত হইয়া, পরমানন্দে থাকিতে চেষ্টা করুন। যেমন, দশ ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় দশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বপ্ন দেখিতেছেন, যথা কেহ দেখিতেছেন যে, আমি মহান্ পণ্ডিত, আমি সকলকে পরাস্ত করিতেছি, কেহ দেখিতেছেন যে, আমি মহান্ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়াছি। কেহ দেখিতেছেন যে, আমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী, ধনী, কেহ নাই। কেহ দেখিতেছেন যে, আমার ন্যায় মূর্খ, নীচ, দরিদ্র, কেহ নাই, ইত্যাদি নানালোকে নানা প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছেন। কিন্তু তখন তাঁহাদিগের এ প্রকার বোধ থাকে না যে, সকলে যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা সকলই অমূলক মাত্র। এবং স্বপ্নদর্শকদিগের মধ্যে পরস্পর কেহ কাহারও স্বপ্নের ভাব বুঝিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু যিনি সকলকে স্বপ্ন-লীলা দেখাইতেছেন, তিনি সকলের স্বপ্নের ভাব (যে কে কি প্রকার স্বপ্ন দেখিতেছে) ও তাহার সত্যাসত্যের বিষয় জানেন (যে স্বপ্ন সত্য কি মিথ্যা) এবং যখন ঐ স্বপ্নাবস্থাপন্ন দশ ব্যক্তিই জাগ্রতাবস্থাপ্রাপ্ত হন, তখন তাঁহারা আপন আপন স্বপ্নকে মিথ্যা জানিয়া তাহাতে আসক্তি হওয়ার জন্য লজ্জিত হন; এবং তখন আপন আপন অমূলক স্বপ্ন প্রতিপাদনের যে দৃঢ় চেষ্টা ও মিথ্যা স্বার্থ তাহা পরিত্যাগ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

সমালোচনা।

রাণী ভবানী।—শ্রীযুক্ত রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত দ্বারা প্রণীত। কালিকাযন্ত্রে মুদ্রিত; কাগজ, ছাপা, বাঁধাই, সমস্তই উৎকৃষ্ট, মূল্য ২৷৷০ টাকা। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

এখানি নূতন পুস্তক। মূলাংশে সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও এই পুস্তকে বিস্তর নূতনত্ব আছে। নাটোরের রাজলক্ষ্মীরূপিণী রাণী ভবানীর নাম, যশ, খ্যাতি, কীর্ত্তি, ধর্ম্মশীলতা, দয়াশীলতা, দানশীলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিষয় ভারতপ্রসিদ্ধ;—ভারতপ্রসিদ্ধ না বলিয়া আমরা অবশ্য পৃথিবীব্যাপ্ত বলিতে পারি। আমাদের প্রেমাস্পদ রায় সাহেব অতি বিশদরূপে সেই দেবীপ্রতিমা রাণী ভবানীর জন্মকাল অবধি অন্তকাল পর্য্যন্ত জীবনচিত্রটী চিত্র করিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াই তিনি এই পুস্তকের আখ্যা দিয়াছেন—উপন্যাস। নামটি ঠিক হইয়াছে। বাস্তবিক পৌরাণিক উপন্যাসের ধরণে প্রশংসনীয়রূপে অতি সুকৌশলে এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত লিখিত। দেবদেবীর আবির্ভাব, অপূর্ব্ব স্বপ্ন, দৈববাণী ইত্যাদি প্রকৃত পৌরাণিক প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শিশুর বাল্যক্রীড়া আর নারীমণ্ডলীর বাক্যালাপগুলি যথার্থ, প্রকৃতিসিদ্ধ সুন্দর হইয়াছে। বিশেষতঃ, পুস্তকের উপসংহারে অতি সংক্ষেপে আমাদের সুভাবুক রায় সাহেব ভীষণ ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের যেরূপ লোমহর্ষণচিত্র চিত্র করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা তাঁহাকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। এইখানে তিনি সুনিপুণ চিত্রকর হইয়াছেন,—চিত্রকরও কবি। ভাষা অতি মধুর, অথচ পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপাত হয়, রোমাঞ্চ হয়, অঙ্গেও কম্প হয়। রায় সাহেব এক-খানি ক্ষুদ্র পটের উপর হৃদয় কাঁপাইয়া ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রকৃত ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন। দয়াময়ী রাণী ভবানী সেই মহা দুর্ভিক্ষের সময় আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়া কোটি কোটি লোকের জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। পুস্তকের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরমসুখী হইলাম।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

দ্বাদশ বর্ষ। } আশ্বিন, ১৩১০ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

এস মা!

এস মা, বৎসরান্তে এই দীন বঙ্গভূমে এস মা! তোমার কোটি কোটি ভক্ত সন্তান প্রীতিবিকশিতনেত্রে তোমার শুভ পথ চাহিয়া আছে মা! কত কোটি কোটি ক্ষীণকণ্ঠ ক্ষীণোন্নতস্বরে দুঃখহরা দুর্গা দুর্গা করিয়া ডাকিতেছে মা! তাই বলি, এস মা, তোমার ভক্ত সন্তানগণের প্রতি দয়া করিয়া এস মা! দেখিয়া যাও, তোমার সন্তানগণের আজ কি দশা হইয়াছে মা!

দেখিবে কি মা, আমরা তোমায় দেখাইব কি মা! সেই চিরপ্রফুল্ল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির আজ কি দশা হইয়াছে মা! অন্নাভাবে শীর্ণকায়, বসনাভাবে নগ্নপ্রায়, তোমার কত সন্তান আজ নরদেহে প্রেত-লীলার অভিনয় করিতেছে মা! আধি-ব্যাধি-সমাকুল তোমার ভক্তবৃন্দ আজ নৈরাশ্যের বিকট তমঃস্তোমে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিদারুণ কুহেলিকা সমাবৃত, অকূলবারিধির দিগভ্রান্ত অর্ণবপোতের ন্যায় প্রতিমুহূর্ত্তে চির-নিমজ্জনের শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে মা! যে গৃহে কত শত কমনীয় শিশুর আধবিকসিত যূথিকা-কলিকার ন্যায় দন্তসমূহের শুভ্রত্বের বিকাশ অন্তস্তল হরণ করিত, আজ দেখ মা, সে গৃহে ঘোর নৈরাশ্য-শোকোচ্ছ্বাস বিকট-মুখব্যাদানে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া দর্শকের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করিতেছে মা! যে শৈশ-রোদ্ভিন্নাযৌবনা নববিকসিত কমলমাধুরী লইয়া, গৃহতল আলোকিত করিত, যাহার নবকিশলয়সঙ্কাশ আতাম্র অধর-পল্লবে মধুময়ী স্মিতকান্তি বিকশিত হইয়া যাহাকে গৃহের ললামভূতা করিয়াছিল; আজ দেখ মা, সেই অনতীত-

যৌবনা-মাধুরী প্রতিমা নিরলঙ্কৃতা হইয়া মুক্তকেশে চিরগত প্রাণাধিকের জন্য নেত্রজল বর্ষণ করিয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছে মা! পুত্রশোক-বিধুরা স্থবিরা জননীর আর্ত্তনাদে গৃহভিত্তি ঘন ঘন বিকম্পিত হইতেছে মা! তাই বলি, এস মা একবার! দেখিবার আর কিছুই নাই, দেখাইবার আর কিছুই নাই; তবু মা তোমায় দেখিব বলিয়া বর্ষ যাবৎ আশা করিয়া আছি মা! অই রাতুলচরণ প্রাণ ভরিয়া দেখিব বলিয়া, আশা করিয়া আছি মা! বুকে পাষাণ দিয়া, অতীত ব্যথা ভুলিয়া গিয়া, একবার মা তোর শ্রীপদে জবা বিল্বদল দিব বলিয়া, আশা করিয়া আছি মা! তাই ডাকি মা, আয় মা, দুঃখহরে দুর্গে, আয় মা একবার, প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লই মা! জানি না, মা আর কবে দেখিব, তাই সাধ মিটাইয়া, আশা পুরাইয়া মাতৃ-মুখ দেখিব বলিয়া ডাকিতেছি মা! আয় মা ভবরাণি! একবার এই দুঃখভূমি বঙ্গভূমে আয় মা!

মা, আজ তোমার সাধের বঙ্গ ত একপ্রকার শ্মশানবৎ হইয়া পড়িয়াছে; তবু মা তোর দুর্গা নামে কি সঞ্জীবনী সুধা আছে, তাই আজ প্রেতভূমিতেও ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে জীবনের সঞ্চার হইতেছে মা! ঐ দেখ মা, মেঘাস্তরিত শারদাকাশে শোভিত শারদশশাঙ্কবিচ্ছুরিত শারদকৌমুদীধবলিত বসুমতীর বিমলাস্য শুভহাস্যরেখাপ্রোদ্ভাসিত হইয়া আজ যেন তোমার আগমনানন্দ বিজ্ঞাপন করিতেছে মা! ঐ দেখ মা, বর্ষাসলিলকলুষিতা স্রোতাবহা তোমার ঐ সুরগণবন্দিত অনিন্দিত পদযুগল ধৌত করিবার আশায়, যেন আজ স্বচ্ছ শ্যাম দেহে ধীর কলনাদে প্রধাবিত হইতেছে! ঐ দেখ মা, অবাষ্পকলুষিত স্বচ্ছোজ্জ্বল দর্পণাভ সরসীসলিলে সরসিজকুল তোমার শ্রীপদসেবার জন্যই যেন আজ পূর্ণানন্দে বিকশিত হইয়া রহিয়াছে; স্থলে স্থলশোভিনী স্থলনলিনী সরসীবালা সরোজিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার ছলেই যেন রক্তোজ্জ্বলবর্ণ সম্পত্তি বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ মা, শারদপ্রকৃতি শেফালিকার সৌরভসম্ভার লইয়া, তোমার চরণে ডালি দিবার জন্যই আজ যেন শুভ্রোজ্জ্বল মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছেন! ঐ দেখ মা, তরুলতাকুঞ্জে বিহগবধূ তোমার আগমনী সঙ্গীতে সুধাধারা বর্ষণ করিয়া বর্ষাভিমিত বঙ্গ জগতের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। দুঃখক্লেশভারনম্র তোর সন্তানগণও আজ প্রাণের সঞ্চিত আশা, মাতৃপদদর্শন পূর্ণ করিবার জন্যই যেন ধীরে ধীরে সুপ্তোত্থিত হইতেছে! তাই বলি মা, আয় মা, এই বঙ্গভূমে

একবার আয় মা! আয় মা, হরগৃহিণী বিশ্বজননি! তোর ঘরে তুই আয় মা! ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো ছড়াইয়া দে মা! ভাঙ্গাকুঞ্জে পুঞ্জকুসুম ফুটাইয়া দে মা! ভাঙ্গা বীণায় স্বরের লহরী তুলিয়া দে মা! ভাঙ্গা প্রাণে আশার বাসা বাঁধিয়া দে মা! দুঃখের মর্ত্ত্যভূমি কৈলাস করিয়া দে মা! তোর আশায় প্রাণ ধরিয়া আছি যে মা!

জননি! তুই আসিবি বলিয়া, গিরিরাণী দ্বারে দ্বারে পূর্ণঘট ফলপল্লবাদি সাজাইয়া রাখিয়াছেন। বিল্বমূলে বোধন করিয়াছেন, চণ্ডীপাঠে শুভাবহ স্বস্ত্যয়ন করিয়াছেন মা। আমরাও মা তোর জন্য কত শুভ বিধির আয়োজন করিয়াছি, হৃদয়-সিংহাসনে তোর রাজীবপদ রাখিব বলিয়া, তাহা দুঃখান্ধকারমুক্ত করিয়া দিয়াছি। উচ্চকণ্ঠে মা মা রবে স্বস্ত্যয়ন করিতেছি। আশা-কুম্ভে নয়নবারি পূর্ণ করিয়া পূর্ণঘট সাজাইয়াছি। মা! তুই আসিবি বলিয়া, অভাব দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছি; তোর শ্রীপদকমল দেখিব বলিয়া, নেত্রযুগল নীরমুক্ত করিয়াছি; এখন তাই ডাকিতেছি, আয় মা—

"দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে।
যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব॥"

ভগবতি! আমাদের এমন দিন কি আর হবে মা! এমন জগদ্ব্যাপী মহানন্দ আর কোথাও কি পাব মা! তাই ডাকি মা! আয় একবার। বর্ষ যাবৎ যত আশা করিয়া আছি, এক এক করিয়া সকল আশার কথা তোর কাছে বলি মা! মা বই সন্তানের আর কে আছে মা? একবার আয় মা, প্রাণ ভরিয়া—

"দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিয়াং
সর্ব্বলোক প্রণেত্রীঞ্চ প্রণমামি সদা শিবাং॥
মঙ্গলাং শোভনাং শুদ্ধাং নিষ্কলাং পরমাং কলাং।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহং॥"

বলিয়া তোর পায় কুসুমাঞ্জলি দিব মা! আর—

"আয়ুরারোগ্য বিজয়ং দেহি দেবি নমোহস্তুতে।
আয়ুর্দদাতু মে কালী পুত্রান্দেহি সদা শিবে॥
ধনং দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশোমম॥"

এই বলিয়া আয়ু আরোগ্য বিজয় ধন চাহিয়া লইব।

প্রার্থনাস্তুতি।

ভাই হিন্দু! এস ভাই, আজ সকলে মিলিয়া সমস্বরে "মা মা" বলিয়া ডাকি। এমন শুভদিন আমরা আর পাইব না; আজ শুভদিনে শুভক্ষণে প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া, হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া, সমপ্রাণতায় মাতিয়া গিয়া মহামায়ার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া বলিতে থাকি,—

"পুত্রান্ দেহি ধনং দেহি দারাণ দারিদ্র্যহারিণি।
কংসাসুরযুদ্ধেষু কৃষ্ণরক্ষণকারিণী॥
রক্ষ রক্ষ সদা দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমোঽস্তুতে।
আন্ধং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণং।
বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিং।
হর পাপং হর ক্লেশং হর শোকং হরাশুভং।
হর দুখং হর ক্ষোভং হর দেবি হরপ্রিয়ে॥

আর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিতে থাকি—

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবী নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণাম প্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
হংসযুক্তবিমানস্থে ব্রাহ্মণী রূপধারিণি।
কৌশাম্ভঃক্ষরিকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ত্রিশূলচন্দ্রিহধরে মহাবৃষভবাহিনি।
মাহেশ্বরীস্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
ময়ূরকুক্কুটবৃতে মহাশক্তিধরেঽনঘে।
কৌমারীরূপসংস্থানে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গ গৃহীত পরমায়ুধে।
প্রসীদ বৈষ্ণবীরূপে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
গৃহীতোগ্রমহাচক্রে দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরে।
বরাহরূপিণি শিবে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

নৃসিংহরূপেণোগ্রেণ হন্তং দৈত্যান্ কৃতোদ্যমে।
ত্রৈলোক্যত্রাণ সহিতে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্রনয়নোজ্জ্বলে!
বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শিবদূতীস্বরূপেণ হতদৈত্য মহাবলে।
ঘোররূপে মহারোধে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
দংষ্ট্র করালবদনে শিরোমালাবিভূষণে।
চামুণ্ডে মুণ্ডমথনে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
লক্ষ্মিলজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধেধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
মেধেসরস্বতি বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি।
নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বেশে সর্ব্বশক্তি সমন্বিতে।
ভয়েভ্য স্ত্রাহিনো দেবি দুর্গেদেবি নমোঽস্তুতে॥
এতত্তেবদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতং।
পাতু নঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তুতে॥
জ্বালাকরাল মত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনং।
ত্রিশূলং পাতুনো ভীতের্ভদ্রকালি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

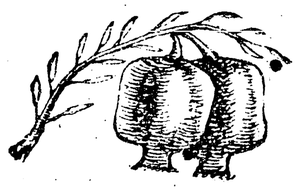

আর আমার আশা কি মা!

কাহাকে আর বিশ্বাস করি, যাহারা এত বুকভরা—প্রাণভরা আশা দেখাইয়াছিল, স্বর্গ দিয়াছিল, মরুতে জলসেচন করিয়াছিল, প্রাণটা স্নিগ্ধ স্নেহরসে আর্দ্র করিয়া রাখিয়াছিল, আমার যেন সব ছিল, আশা ছিল, ভরসা ছিল, ভাবিবার ছিল, করিবার ছিল, বলিবার ছিল, এখন কি তারা আছে মা? তবে আর কাহাকে বিশ্বাস করি? যেন সব ছিল, এখন কিছুই নাই, কুলায় বাঁধিতে বাঁধিতে ভাসিয়া পড়িল, আশার ভরা পূরিতে না পূরিতে নৌকা ডুবি হইল, আমার আবার ভরসা! দুঃখের জীবন দুঃখে কাটিয়াছিল, একটু আলোক, একটু আঁধার, একটু আশা, একটু ভরসা, একটু খেদ, একটু সুখ, ক্ষণিক হাসি, ক্ষণিক কান্না, এই করিয়া বাল্যাবস্থা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছি, কখনও স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্যুত হই নাই, ছিল না কি, সব ছিল, মায়া ছিল, দয়া ছিল, স্নেহ ছিল, মমতা ছিল, আপনার ছিল, পর ছিল, এখন আর কি রাখিয়াছ মা! যাহারা হাসিতে হাসিতে আসে, তাহারা হাসিতে হাসিতে যায়, কিন্তু আমার কান্না ফুরায় না। আর আশার বাকি কি? কতজন আসিয়াছিল, কতজন গিয়াছে, কতজন আসিতে আসিতে ফিরিয়াছে, কিন্তু আমার আর ফিরিয়া যাওয়া হয় নাই। মাগো! বলিতে পার কি, কেন আমার এরূপ হয়? যখন বাসন্তি রজনীতে জগৎ হাসে, যখন প্রকৃতিদেবীর মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে প্রাণ মন বিমোহিত হয়, যখন ওই নীল নভে ফুল্ল জ্যোৎস্নায় ভরিয়া যায়, যখন ওই তমালে বসিয়া পিকবধূ পঞ্চমে ঝঙ্কার দেয়, বল অন্তর্যামিনি! তখন কাহাকে মনে পড়ে, কেন প্রাণ এত হু হু করে। কত ছোট বড় ঘটনা, কত পরিচিত মুখ, কতদিনের সুখ-সম্ভোগ এ চিত্তসরোবরে উদয় হয়, আবার সংসার তাড়নে সব ভুলিয়া যাই। একদিন মনে হইত, আমার এমনি দিনই যাইবে, এই সুখভালবাসা, এই নশ্বর সংসারের আনন্দ-স্বচ্ছন্দ আমায় চিরকাল একভাবে রাখিবে। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিল, আশা ফুরাইল, দীপ নিভিল, সেই আমার জন ঘোর আঁধারে কে কোথায় চলিয়া গেল, কই, কেহ ত আর ফিরিয়া আসিল না। হায়! যাহারা যায়, তাহারা কি আর ফিরিয়া আসে, কই আসে? তাহারা আসে না, কিন্তু আশার আশায় রাখিয়া যায়। পৃথিবী পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু

আমার পরিবর্ত্তন নাই। এ নশ্বর সংসার পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু আমার পরিবর্ত্তন নাই। আমার দশা কি হইবে? জগৎ হাসিবার সময় হাসে, বিষাদে অশ্রুপাত করে, এখন আমার হাসি কান্না ফুরাইয়াছে, এখন আমার হাসিও নাই, কান্নাও নাই, তবে আমি কি পাষাণ, তবে আমার কি অস্তিত্ব নাই। অস্তিত্ব আছে বই কি? অস্তিত্ব না থাকিলে মানুষ এত ভাবিতে পারে? যাহাদের জন্য ভাবিতাম, যাহাদের বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতাম, তাহারা নাই, তবে কাহার জন্য ভাবি? কেন জানি না, তাঁহাদের স্মৃতি এখনও আমায় উতলা করে, কেন জানি না, কাহারা আসিয়া মাঝে মাঝে অন্তরের অন্তরাল হইতে তাহাদের বিষাদভারাক্রান্ত মুখগুলি বাহির করিয়া উঁকি মারিয়া তাহাদের পূর্ব্বস্মৃতি জাগাইয়া দেয়। আমার সোণার দেউটি নিভিয়াছে, আমার বড় সাধের জীবনে বিরাগ হইয়াছে, তবে আর বাঁচি কেন? যাহাদের জন্য বাঁচিতে সাধ করিতাম, তাহারা গেল, আমায় সাথি করিল না। তাহারা আমার কে? তাহারা ত আমার প্রাণ ভরিয়াছিল, যখন চলিয়া যায়, কই, আমায় ত কোন কথা কহে নাই। তাঁহারা কাঁদিলে আমি যাঁহাদের অশ্রু মুছাইতাম, কই, তাহারা ত এখন আমার অশ্রু মুছায় না। তাহাদের সংসারে আসিতে দেখিলাম, তাহাদের আগমনে সংসার নন্দন-কানন হইল, জগৎ হাসিল, এক একটি করিয়া শুভ্র প্রাণগুলি উদয় হইল, আবার কে কোথায় বিলীন হইয়া গেল। তাহারা একে একে মরতের আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া লইয়া, কোন স্বপ্নের রাজ্যে চলিয়া গেল। যেমনটি চলিয়া গেল, তেমনটী আর আসিল না। যাহাদের পথে কুড়াইয়া পাই, ঘরে আনিয়া সোহাগে—আদরে বুকে ধরি, কিন্তু সময় হইলে আর তাহাদের রাখিতে পারি না,—ক্রমে দারুণ জ্বালা, এ প্রাণের দাবানল কিসে শান্তি হইবে, এ দারুণ অন্তর্বহ্নি কিসে নির্ব্বাপিত হইবে? বল মা শুভে! বল মা কালিকে! কিসে আমার এ হৃদয়স্থিত জ্বলন্ত বহ্নির শান্তি হয়। তুমিই হরণকর্ত্রী, তুমিই পালনকর্ত্রী। মহামায়ে! কোন্ পাপে আমায় এ গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে? কোন গ্রহের গ্রহচক্রে আজ আমার এ দারুণ মনস্তাপ? কাহার অভিশাপে আজ আমায় এ কুটিলচক্রে ঘুরাইতেছে? আমি অন্ধ, অজ্ঞ মানব, আমি তোমার এ চক্র কি বুঝিব মা! তুমি যাহা করাইতেছ, তাই করিতেছি, তুমি যাহা বলাইতেছ, তাহাই বলিতেছি; কিন্তু মা, আমি

সামান্য মূর্খ মানব, আমার মন যে বুঝে না মা! হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইতেছে, শোণিত শুষ্ক হইতেছে, হৃদ্‌পঞ্জর এক একখানি খসিয়া যাইতেছে, ইহাতে আমার মঙ্গল না অমঙ্গল মা! চক্ষের উপর দিয়া অসম্ভব সম্ভব হইতেছে, যুগ পরিবর্ত্তন হইতেছে, অঘটনিয় ব্যাপার ঘটিতেছে, অলৌকিক ব্যাপার চক্ষের উপর দিয়া হইয়া যাইতেছে। কোন্‌টা বিশ্বাস করি, কোনটায় আস্থা স্থাপন করি, কোন্‌টা ন্যায্য, কোন্‌টা অন্যায্য, কোন্‌টা হিত, কোনটা বিপরীত, কিছুই ত বুঝি না মা! মনের বাঁধ ছুটে নাই, প্রাণের গোলমাল এখনও মিটে নাই, তাই আজ তোর শরণাপন্ন। বল্ মা দীনদয়াময়ি! আমার এ মনের গোল, এ হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাত, কিসে স্তব্ধ হইবে? কবে প্রাণে শান্তি আসিবে, কবে তোর ওই রাঙ্গা চরণে এ নশ্বর জীবন বিকাইতে পারিব? কবে মরার মত মরিতে পারিব? কবে এ তুচ্ছ জীবনের বলিদান শিখিব? আমার এমন দিন কি আসিবে মা? আমার যাহা ছিল তাহা নাই, আমার আমিত্ব নাই, দেহে জীবন নাই, প্রাণের অস্তিত্ব নাই, হৃদয় শুষ্ক, নয়নে অশ্রু নাই, উদ্যম ছুটিয়াছে, আমার উপায় কি? বল, কিসে এ পাপী তাপী তরিবে, বল কিসে এ পাতকি জনের উদ্ধার হইবে।

নববর্ষের শারদীয় দুর্গোৎসব।

মা! মাগো! আনন্দময়ি! বৎসরান্তে আমাদের এই বঙ্গধামে আসিতেছ, মা আনন্দময়ি! আনন্দ বিতরণ করিয়া আসিতেছ! আসিবার পূর্ব্ব হইতেই আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মে লক্ষ লক্ষ প্রণিপাত করিতেছি।

মা! হিমালয়ের গিরিরাজগৃহে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে, বিবাহের পর অবধি কৈলাসের শিবধাম তোমার বিরামধাম হইয়াছিল, বৎসরান্তে তিনটী দিন মাত্র গিরিরাজ তোমাকে নিজধামে আনয়ন করিয়া স্নেহভক্তি-সংযোগে অর্চ্চনা করিতেন। অধুনা এই বঙ্গধাম তোমার আনন্দধাম। মা! এই আনন্দধামে শরৎকালে তোমার আগমন, তিন দিনের জন্য বঙ্গবাসী-হৃদয় দুর্গানন্দে মহানন্দে পরিপূর্ণ!

মা ক্ষমা চাই! আমরা একটা মিথ্যা কথা কহিলাম। সে আনন্দের দিন আর এখন নাই! মা গিরিরাজকুমারি! গিরিরাজ তোমার নিজ

ভবনে আনয়ন করিয়া, কন্যাভাবে পূজা করিতেন। মা! তুমি জগতের মা! ভক্ত বঙ্গবাসী এখন মাতৃভাবে পূজা করেন। তুমি তখন গিরি-রাজের কন্যা ছিলে, এখনকার গিরিরাজারা তোমারে মা বলিয়া মুক্তি কামনা করেন। যে সকল ভাগ্যবানের ভবনে তোমার পদার্পণ হয়, তাঁহারা সকলেই গিরিরাজা।

মা! তুমি আসিতেছ। শরৎকাল আসিয়াছে, নদীর ধারে, বিলের ধারে, ক্ষেত্রের ধারে, পল্লীগ্রামের পথের ধারে, কাশকুসুম (কেশে ফুল) ফুটিয়াছে, কণ্টকী কাননে কণ্টকময়ী কেতকী হাস্যমুখে প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধ বিতরণ করিতেছে, বর্ষার মেঘাচ্ছন্ন গগনমণ্ডল নির্ম্মল হইয়াছে, সরোবরে সরোবরে নব নব পদ্মফুল ফুটিয়াছে, শুক্লপক্ষের নিশাকালে আকাশে শরচ্চন্দ্র হাসিতেছে, শরতের নির্ম্মলচন্দ্রের সেই হাসি দেখিয়া, জলের কমলিনী রূপের লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া মুদিত হইয়া যাইতেছে। এবার বর্ষা হয় নাই, তথাপি বর্ষাকাল বিদায় লইয়াছে, শরৎকাল আসিয়াছে; মা তুমি আসিতেছ।

মা দুর্গে! মা ত্রিনয়নে! ত্রিনয়নে তুমি যেমন বিশ্বসংসার সন্দর্শন কর, অভ্যাসের নয়নে আমরাও সেইরূপে দর্শন করিতেছি, দশভূজামূর্ত্তিতে পুত্রকন্যা লইয়া বঙ্গে তুমি আসিতেছ, তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য দুর্জ্জয় মহিষাসুর আসিতেছে, মহিষাসুরকে দংশন করিবার জন্য পশুপতি সিংহ তোমার পদতল শোভিত করিয়া আসিতেছে, কার্ত্তিককে বরণ করি-বার জন্য ময়ূরবিহঙ্গ আসিতেছে, গণেশের পূজা আগে হয়, অগ্রপূজার তণ্ডুলগুলি ভক্ষণ করিবার জন্য গণেশের পদ্মের নীচে গুঁড়ি মারিয়া ক্ষুদ্র একটী ইঁদুর আসিতেছে; এই সব আমরা যেন পথে চক্ষের উপর দর্শন করিতেছি। মা তুমি আনন্দময়ী! কই মা! কই মা আনন্দময়ি! বঙ্গে এখন পূর্ব্বের মত আনন্দধ্বনি কই শুনা যায় মা?

মা পূর্ব্বে পূর্ব্বে শরৎকালে তুমি যখন আসিতে, বঙ্গ তখন আনন্দ-সাগরে ভাসিত, বঙ্গবাসী তখন দুর্গানন্দে হাসিত। হিন্দু তোমার ভক্ত; কেবল হিন্দুই আনন্দে ভাসিত, আনন্দে হাসিত, এই কথাই কি আমরা বলিতেছি? তা নয় মা! তোমার আগমনে সর্ব্বজাতির আনন্দ হইত। মুসলমান, মা দুর্গা বলিয়া তোমারে প্রণাম করে না; রসনার দোষে তোমার পবিত্র নামটিও ভাল করিয়া উচ্চারণ করিতে জানে না, তথাচ

তাহারাও তোমার আগমনে নূতন কাপড় পরিয়া, নূতন টুপী মাথায় দিয়া, চিত্র করা নূতন নূতন লাল রুমালে কোমর বাঁধিয়া, নূতন আনন্দ উৎসাহে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিত, গৃহস্থ মুসলমানের স্ত্রীকন্যারাও সাজিয়া গুজিয়া, ছেলে কোলে করিয়া ভাগ্যবানের বাড়ী বাড়ী, মা তোমার প্রতিমা দেখিয়া বেড়াইত, পূজাবাড়ীতে লাড়ুভুজা, পকান্ন প্রভৃতি আনন্দে অঞ্চল পুরিয়া বাঁধিয়া লইত, ছোট বড় সকলের মুখেই আনন্দপ্রভা প্রভাসিত হইত। কই মা! এখন আর সে আনন্দ কই মা? বঙ্গে তোমার ভক্ত অনেক, তোমার প্রসাদে কমলার কৃপায়, যাঁরা এখানে ধনপতি নামে কথিত, তাঁদের মনে এক প্রকার আনন্দ থাকা সম্ভব। সে আনন্দও কিন্তু বোধ হয় নিরস; তথাপি ধনপতিগণের বদনে অহঙ্কারের সঙ্গে অল্প অল্প আনন্দের ছায়া দৃষ্ট হয়; কিন্তু মা, তোমার ধনী সন্তান অপেক্ষা দীনহীনদরিদ্র সন্তান সহস্র সহস্রগুণে বেশী। মা আনন্দময়ী মা! সেই সকল অভাগা দরিদ্র সন্তান তোমার আগমনে সেই আনন্দামৃতপানে অধিকারী হয় কই মা! মা, তোমার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র পুত্রকন্যা, তোমার আগমনে মনের দুঃখে কি প্রকার আর্ত্তনাদ করিতেছে, শ্রবণ কর!—স্তবধ্বনি, জয়ধ্বনি, আনন্দধ্বনি, ক্রন্দনধ্বনি, রোদনধ্বনি সমস্ত ধ্বনিই মা তোমার জগদ্ব্যাপ্ত কর্ণে প্রবেশ করে, দরিদ্র সন্তানেরা কি বলিয়া কাঁদিতেছে, শ্রবণ কর!—শ্রবণ কর!

কমলিনী।

কমলিনী একটি গৃহস্থকন্যা। কমলিনীর তিনটি মেয়ে, একটি ছেলে। দুর্গাপূজা আসিতেছে, ছেলেমেয়েগুলি ম্লানবদনে মায়ের গায়ে ঝাঁপাইয়া ঝাঁপাইয়া উঠিতেছে। কাপড় মা, চুড়ি মা, জুতা মা, এই সব কথা বলিয়া মায়ের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, কমলিনী কাঁদিতেছে।

কমলিনী কাঁদিতেছে কি দুঃখে? ছেলে মেয়ে আব্দার করিতেছে, তাহাদের আশাপূরণে ক্ষমতা নাই, সেই দুঃখেই কি কমলিনীর ক্রন্দন? তা নয়। কমলিনী ভাবিতেছে, "এ সংসারে কেন আমার জন্ম হইয়াছে?

যদিই হইয়াছিল, বিধাতা আমারে পুত্রকন্যা কেন দিলেন? বাছাদের মুখে দুবেলা দুটি অন্ন দিতেও আমি অক্ষম, এক একখানি সূত্রবস্ত্রে লজ্জা ঢাকিয়া দিতেও অক্ষম, আমার ঘরে কৃষ্ণের জীবের জন্ম কেন, স্তনে যতদিন দুগ্ধ ছিল, অনশনে অর্দ্ধাশনে দুগ্ধও ঠিক জোগায় না, ততদিন তথাপি বিন্দু বিন্দু যাহা কিছু ছিল, যতদিন স্তনপান সাঙ্গ না হয়েছিল, স্তন্যদানে ছেলেগুলিকে পোষণ করিয়াছিলাম, স্তন ছাড়িবার বয়স হওয়া অবধি বাছাদের অনন্ত দুরবস্থা! ক্ষুধার জ্বালায় বাছাদের মুখে একটু হাসি দেখা যায় না, শরীর অস্থিচর্ম্মসার! অহরহঃ আমি ইহা দেখিতেছি! বুক যেন ফাটিয়া ফাটিয়া যায়, প্রাণ যেন ছুটিয়া বাহির হইতে চায়, কেন বাহির হয় না, জানি না। বিধাতার বিড়ম্বনা! যাহার ঘরে ধন কড়ি নাই, সংসারের সমস্তই তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা!"

কমলিনী বিধবা নহে, কমলিনী সধবা। তবে কেন কমলিনীর এত আক্ষেপ? কারণ আছে। স্বামী যিনি, অথর্ব্ব হইবার বয়স না হইলেও স্বভাবতঃ তিনি কিছু অথর্ব্ব! তিনিও গরিবের সন্তান, দস্তুরমত লেখা পড়া শিক্ষা হয় নাই, একটি কারবারি বাবুর চাউলের আড়তে মুহুরীগিরি চাকরি করেন, আড়তের পাকা খাতায় খরিদ বিক্রয়াদির জমা খরচ লেখেন, মাসে পাঁচটী টাকা বেতন পান, উপরি অঙ্কে বাবু অনুগ্রহ করিয়া একবেলা অন্নদান করেন। ধরুন, একটি লোক, একটি পরিবার, তিনটী কন্যা, একটি পুত্র, এই পাঁচটী; লোকটীর একবেলা বাদ দিলে মোটের উপর সাড়ে পাঁচটি জীবন হয়; মাসে পাঁচটি টাকায় কি সাড়ে পাঁচটী প্রাণির সম্ভবমত ভরণপোষণ চলিতে পারে? কায়স্থের ঘরে জন্ম, কমলিনীর স্বামী একজন কুলিন কায়স্থের সন্তান, অল্পবিদ্যায় ঐ রকম মুহুরিগিরী ভিন্ন অন্য কোন প্রকার নীচ কার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। বাজারের গতিকে আজকাল নীচ কার্য্যে পয়সা হয়, তাহা তিনি জানেন, কিন্তু কুলাভিগত জাত্যাভিমান তাঁহাকে তাদৃশ পথে পদার্পণ করিতে নিষেধ করে। কাজে কাজেই ঐ পাঁচটি ভরসা,—কাজে কাজেই সংসারে অনন্ত দুরবস্থা।

দুর্গাপূজা আসিতেছে, গৃহস্থলোকের ছেলেমেয়েরা নূতন নূতন বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে, কমলিনীর ছেলে মেয়ে ধূলিধূসরিত অঙ্গে কাঁদিয়া কাঁদিয়া মায়ের কাছে বাহানা লইয়াছে, ছোট

ছেলেটি আধ আধ বুলিতে "কাপড়" বলিতে অক্ষম হইয়া "পাপল পাপল" বলিতে বলিতে দুঃখিনী জননীর মুখ চুম্বন করিতেছে, কমলিনী অমনি দুটি চক্ষের জলে ভাসিয়া যাইতেছে!

অসহ্য!—কমলিনীর পক্ষে এ যন্ত্রণা অসহ্য! স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম! সেই ধর্ম্মে এই দারুণ দুর্দ্দশার সময় কমলিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া মা দুর্গার নিন্দা করিতেছে। বিবাহের অগ্রে পিতৃগৃহে কমলিনী কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছিল, দুঃখের দশায় এখন আর সে সব চর্চ্চা হয় না, কিন্তু পুরাণ শাস্ত্রের কতকগুলি ভাল কথা কমলিনী মনে করিয়া রাখিয়াছে; পুরাণের দৃষ্টান্ত দিয়া কথা কহিতে জানে। মা দুর্গার নিন্দা করিয়া কমলিনী করুণ-কণ্ঠে মা দুর্গাকেই বলিতেছে, "মা! তুমি নাকি সকলের মা, এ মিথ্যা কথা কেন বলাও? পাষাণের মেয়ে তুমি, পাষাণে হৃদয় ধর! তোমারে যাহারা দয়াময়ী বলে, তাহারাও মিথ্যাবাদী। চক্ষু তোমার তিনটি, কাহার প্রতি কোন্ চক্ষে তুমি কখন চাও, কেহই বলিতে পারে না; তোমার চক্ষু, কেবল তুমিই তাহা জান, আমি ত মনে করি, একচক্ষে তুমি চাও, বাকি দুটি চক্ষু কেবল শোভার জন্য, সে দুটি চক্ষু তুমি বুজাইয়া রাখ। একচক্ষে যেদিকে তুমি চাও, সেই দিকটি হাসে, মুদ্রিতনেত্রের দিকে যাহারা থাকে, তাহারা কাঁদে। কাহাকে হাসাও, কাহাকে কাঁদাও, এই তোমার খেলা। দূর সর্ব্বনাশী! তুই একচোখী, তোর রাজ্যে বিচার নাই! গরীব সন্তানের প্রতি তোর মায়াদয়া কিছুই নাই। গোটাকতক টাকার মানুষকে আকাশে রাখিয়া বেশ বলা যায়, এটা আমাদের গরীবের দেশ, রণময়ী দশভূজামূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ডাকিনী-যোগিনী সঙ্গে, সপরিবারে এ গরীবের দেশে আর তুই কেন আসিস্? গরীব কাঁদাইতে আনন্দময়ীর আগমন! মাগো! পাষাণনন্দিনি! মা, তোর আনন্দময়ী নামেও ধিক, আর যারা তোকে আনন্দময়ী বলে, তাহাদের মস্তকেও শতসহস্র ধিক!"

আপন মনে কমলিনী এই সব কথা বলিতেছে, মা দুর্গাকে ধিক্কার দিতেছে, এমন সময় পাড়ার একটি প্রৌঢ়া রমণী সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্পর্কে তিনি কমলিনীর দিদি হন। কেবল কমলিনীর দিদি, এমন কথাও নয়, পাড়ার সকলের মুখে তাহার সরকারি ডাকনাম তিনু দিদি; ছোটবড় সকলেই তাঁহাকে তিনুদিদি বলিয়া মান দান করে, আসল নাম শ্রীমতি তিনকড়ি দাসী।

তিনুদিদি লম্বে প্রায় সাড়েচার হাত, প্রস্থে প্রায় দেড় হাত। সারাকালী কত হয়, পাঠক মহাশয় রাত্রিকালে নির্জ্জনে হিসাব করিয়া দেখিবেন। তিনুদিদি গৌরবর্ণা, সুরূপা, সর্ব্বালঙ্কারবর্জ্জিতা, কিন্তু লালকস্তার চওড়া-পেড়ে শুভ্র শাড়ী পরিহিতা, বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। বিধবা। চেহারা ভাল, খুঁতের মধ্যে উপর ওষ্ঠের তিনটি দাঁত খুব বড় বড়।

পুত্রকন্যাবিজড়িতা কমলিনী ক্রন্দন করিতেছে, তর্দ্দশনে তিনুদিদি কাতরা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁদছিস কেন কমল? মহামায়া আনন্দময়ী আসিতেছেন, এমন আনন্দের দিনে কি চক্ষের জল ফেলতে আছে? অকল্যান হয়। চুপ কর?"

একহস্তে নেত্রজল মার্জ্জনা করিতে করিতে কমল বলিল,—

দুঃখের দহনে দিদি, দহিতেছে হিয়া গো—
দহিতেছে হিয়া।
বাছাদের চক্ষুজল মুছাই কি দিয়া গো—
মুছাই কি দিয়া।
আসিছে আনন্দময়ী আনন্দের দিনে গো—
আনন্দের দিনে।
আমার বাছারা কাঁদে অন্নবস্ত্র বিনে গো—
অন্নবস্ত্র বিনে।
বাবুদের ছেলে সব কত সাজ পরে গো—
কত সাজ পরে।
উলঙ্গ বাছারা মোর, অন্ন নাই ঘরে গো—
অন্ন নাই ঘরে!
চায় না পোষাক টুপী বাহানা না করে গো—
বাহানা না করে।
বিলাতী কাপড় পেলে হেসে হেসে পরে গো—
হেসে হেসে পরে।
টাকা টাকা তিনখানা, ফেরিওলা ডাকে গো—
ফেরিওলা ডাকে।
তাও পেলে বাছাগুলি খুসি হয়ে থাকে গো—
খুসি হয়ে থাকে।

তাও নাহি জোটে দিদি, তাও নাহি জোটে গো—
তাও নাহি জোটে!
বিষাদে আমার বুক গুমে গুমে পোড়ে গো—
গুমে গুমে পোড়ে!
এ হেন পূজার নামে আনন্দের দিনে গো—
আনন্দেব দিনে,
আসিছেন মহামায়া, কাঁদাইতে দীনে গো—
কাঁদাইতে দীনে!
কি প্রবোধ দিবে মোরে কি প্রবোধ দিবে গো—
কি প্রবোধ দিবে?
আমি যদি না কাঁদিব, কে আর কাঁদিবে গো—
কে আর কাঁদিবে?

নিশ্বাস ফেলিয়া তিনুদিদি বলিলেন :—

তাই বটে! কমলিনি তাই বটে দিদি!
গরীবের ভাগ্যদোষে বাম হল বিধি!
কি ভরসা গরীবের বিধি যারে বাম?
বৃথা এই দুর্গাপূজা, বৃথা দুর্গা নাম!
একা তুমি নহ দিদি, একা তুমি নও,
চারিদিকে চেয়ে দেখে ধৈর্য্য ধরে রও?
কে করে দুর্গার নাম, কে আনন্দ করে?
হা অন্ন! হা অন্ন রব, অনেকেরি ঘরে!
দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, নাম শুনি কানে,
অন্ন বিনা হাহাকার! ব্যথা লাগে প্রাণে!
মা দুর্গা করুণাময়ী, করুণা ভুলিয়ে,
রয়েছেন ত্রিনয়না নয়ন মুদিয়ে?
মায়ের ত দোষ নয়, আমাদেরি পাপ।
পাপেতাপে পাইতেছি এতই সন্তাপ।
লেগেছে সংসার-বনে জ্বলেছে আগুন,
সে আগুনে গরীবেরা পুড়ে হ'ল খুন?

নগরে আগুন যবে ধূ ধূ করে জ্বলে,
বাঁচে না পীরের ঘর, সর্ব্বলোকে বলে।
কি করিবে? শান্ত হও, মুছ চক্ষুজল,
মঙ্গলা সদয় হয়ে দিবেন মঙ্গল।

তিনুদিদি বিধবা। বিধবা—কিন্তু তিনুদিদির টাকা আছে, হৃদয়ে দয়াও আছে। সকালবেলা তিনি কমলকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া বৈকালে পাঁচখানি কাপড় আনিয়া কমলের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনটি কন্যার জন্য তিনখানি ধোওয়া শাড়ি, ছোট ছেলেটির জন্য একখানি কোরমাথা কালাপেড়ে ধুতি, আর কমলের নিজের জন্য একখানি কস্তাপেড়ে শাড়ী। এইগুলি তিনি দিলেন, এবং সন্দেশ মিঠাই কিনিয়া খাইবার জন্য ছেলেদের হস্তে একটি সিকিও প্রদান করিলেন; বুঝাইয়া বলিলেন, অনেকের ঘরেই এই দশা। এইদশা চক্ষে দেখিয়া নিষ্ঠুর হৃদয়া গিরিকুমারী কেন যে এই অভাগা দেশে আসেন, কেন যে দুর্গতি-নাশিনী আমাদের মত গরীবের দুর্গতি নাশ করেন না, কেবল তিনিই সে কথা বল্‌তে পারেন। আমার ওপাড়ার মহাপ্রসাদ সেদিন বলছিলেন, মা আমাদের ভিখারিণী, শশ্মানবাসী ভিখারীর রাণী, নিজের ছেলেদের জন্য তিনি একটা সুবন্দোবস্ত করিতেও পারেন না! কার্ত্তিকের একটি ঘোড়া নাই, বনের একটা পাখি অমন সোণার কার্ত্তিককে উড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। গণেশটির ভুঁড়ি বড়, ঘোড়ায় সওয়ার হওয়া গণেশের দুঃসাধ্য, একটা হাতি থাকলেই ভাল হ'ত। গণেশের মাথায় হাতী আছে, কিন্তু বাহন একটা ইন্দুরছানা! ভুঁড়ি দুলাইয়া গণপতি যদি একটু চাপ দিয়ে বসেন, কোঁক্ করে ইন্দুরের পো অক্কা পায়। এই ত ব্যবস্থা। নিজে চড়েন একটা সিংহি, শিব চড়েন একটা ষাঁড়! মা আমাদের দশভূজা, রজত কাঞ্চনের অভাবে ডাকের গহনা অঙ্গে পরেন! ভেবে দেখ, কৈলাসবাসিনী হর-রাণীর এই দশা! যাঁর নিজের সংসারে এই দশা, তিনি আর আমাদের সুখের জন্য কি সুব্যবস্থা কর্ত্তে পারেন? ঐ যে, কথায় বলে, আপনার নহ তুমি, পরে কি করিবে?" মায়ের আমাদের তাই হয়েছে!

মহাপ্রসাদের ঐকথাগুলি আমার প্রাণে লেগেচে। সত্য ভাব, ঐ কথাগুলি গরীবের প্রবোধ। ঐসব কথা মনে করে মনে মনে প্রবোধ পাও, আর তুমি কেঁদনা! চিরদিন মানুষের দুর্দ্দিন থাকে না, মা যদি

কোনদিন দয়াময়ী নামটি সার্থক করেন, তাহলেই শুভদিনের উদয় হবে, এদিন তোমার থাকবে না।

দুঃখের হাসি হাসিয়া, নয়ন মার্জ্জন করিয়া, কমলিনী একটু প্রবোধ পাইল, স্বহস্তে ছেলেগুলিকে নূতন কাপড় পরাইয়া, কমলের বিশুষ্ক মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে, মুখে দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে তিনুদিদি বিদায় হইয়া গেলেন।

ভট্টাচার্য্যের ভাবনা।

হাতিবাগানের একখানা টোলবাড়ী। গালে হাত দিয়া শিবু শিরোমণি উপবিষ্ট। শিরোমণি মহাশয় ভাবিতেছেন, "এইবার সব গেল! আকাশে বৃষ্টি হ'ল না, চাষারা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে, বাজারে চাউলের দর দিন দিন বাড়িতেছে, আবার এক নূতন দুর্ভিক্ষ আকাশের এক কোন হইতে উঁকি মারিতেছে, এইবার সব গেল! আমি শিবনারায়ণ শিরোমণি, তণ্ডুলের বাজারের খবর আমাদের রাখিতে হইত না, যজমান মহলের কল্যাণে নির্ভাবনায় বৎসরটা ফিরিয়া যাইত; এবার আর উপায় নাই? দশঘর যজমানের বাড়ীতে দুর্গা পূজা। দশঘরের মধ্যে যে ঘরটা খুব জাঁকাল, সেই বাড়ীতে আমি নিজে থাকিতাম, বাকি বাড়ীগুলিতে এক এক প্রতিনিধি পাঠাইতাম। এবার দেখিতেছি, জমা খরচ কাটা। দশঘর জমা, সাত ঘর খরচ, বাকি থাকে তিন, সেই তিন ঘরের মধ্যেও বড় ঘরটি বাদ পড়িতেছে। সে বাড়ীতে এ বৎসর মায়ের আগমন হইবে না; আমি তবে উপবাস করিয়া মরিব! ছোট ঘরেও যেমন হা অন্ন, অনেক বড় বড় বনিয়াদী ঘরেও সেইরূপ হা অন্ন, হা অন্ন! আমি তবে আর যাই কোথা? মা অন্নপূর্ণার আগমনে এবার আমার নিশ্চয়ই উপবাস! দেশের চারিদিক হইতে সংবাদ পাইতেছি, দুর্গাপূজা এবার অনেক কম হইবে, অনেক দালান চণ্ডীমণ্ডপ খাঁ খাঁ করিবে, এক এক পল্লীতে একটা ঢাকের বাদ্যও শোনা যাইবে না। ফল কি হইবে? গোটাকতক ছাগলছানা বাঁচিয়া যাইবে। ছাগল বাঁচিবে, কি মানুষ মরিবে। সেই সঙ্গে আমিও হয় ত মরিব! (দীর্ঘনিশ্বাস)

(তারক তর্কালঙ্কারের প্রবেশ।)

তারক।—কিহে শিরোমণি ভায়া! অমন করিয়া বসিয়া ভাবিতেছ কি?

শিবু।—(ঊর্দ্ধদৃষ্টে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া) এস তর্কালঙ্কার! কোথা হইতে এখন আগমন।

তারক।—নারায়ণ নারায়ণ! আগমন পিঠস্থান হইতে। তুমি ভাবিতেছ কি?

শিবু।—ভাবিতেছি, আমার মাথা আর মুণ্ডু! দুনিয়া ফাঁক! সব ফাঁক, সব ফাঁক! আমার সাত ঘর যজমানের বাটীতে দুর্গাপূজা বন্ধ! তোমার মুখখানি যে, দিব্য হাসি হাসি দেখিতেছি, ব্যাপার কি?

তারক।—ব্যাপার এবার খুব ভাল! তোমার সাত ঘর যজমানের বাড়ীতে পূজা বন্ধ, আমার এক ঘরে এবার নূতন পূজা। চমৎকার ঘটা!

শিবু।—চমৎকার ঘটা কি রকম?

তারক। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণু সশরীরে সেই বাড়ীতে মা দুর্গার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন।

শিবু।—(বিস্ময়ে চাহিয়া) একি তর্কালঙ্কার? কি বলিলে? আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীতে বিষ্ণুশয়ন করেন, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশীতে গাত্রোত্থান; চারি মাস নিদ্রা। বিষ্ণু তবে আশ্বিন মাসে তোমার যজমান বাড়ীতে সশরীরে কিরূপে দর্শন দিবেন? কথাটা তোমার ক' ছিলিমের কাজ?

তারক।—ছিলিম নয়, ছিলিম নয়, পাকা সত্য, অখণ্ড সত্য, অভ্রান্ত সত্য!

শিবু।—নিদ্রিত বিষ্ণু অসময়ে দুর্গা দর্শনে আসিবেন, এটা তোমার কি প্রকার অভ্রান্ত সত্য?

তারক।—তা বুঝি জান না? আষাঢ়ী একাদশীতে কলমীদলে বিষ্ণু শয়ন করেন, ভাদ্রিয় একাদশীতে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন; এই ত কথা? শুন তবে। এ বৎসর দস্তুরমত বৃষ্টি হয় নাই, কলমীদল বাড়িতে পায় নাই; বিষ্ণুর বিছানার ওসার বড় কম হইয়াছিল, পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের সময় ঠাকুরটি ঝুপ করিয়া জলে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তদবধি আর নিদ্রা হয় নাই, বিষ্ণু এখন জাগিয়া রহিয়াছেন। ভগবতীর অধিবাসের সময় ষষ্ঠী রজনীতে

বিষ্ণু আমার যজমান বাড়ীতে আসিবেন, তিনদিন থাকিবেন, বিজয়ার দিন বৈকুণ্ঠে যাইবেন।

শিবু।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) পরম ভাগ্য! পরম ভাগ্য! তোমার নূতন যজমানটির পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা তর্কালঙ্কার! বৃষ্টি এবার হ'ল না কেন? মিথুনে ভাস্করে রাজে, গজশ্চক্র বিধীয়তে। দেবীর গজে আগমন। পঞ্জিকার ফল—"গজে চ জলদা দেবী, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।" হায় হায়! কোথায় বা জল, কোথায় বা শস্য?

তারক।—হবে হে হবে, বর্ষা এবার নিশ্চয়ই হবে? পঞ্জিকার গণনায় ভুল হয় না।

শিবু।—গণনায় ভুল যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, ভাদ্র মাস বিদায় হইয়াছে! কি জান তর্কালঙ্কার ভায়া! একালে আবার অমৃতভাণ্ড মাথায় লইয়া সমুদ্রগর্ভ হইতে ধন্বন্তরি উঠিবেন, অকালে বারিবর্ষণে বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা হইবেন, এমন দুরাশাকে তুমি হয় ত হৃদয়ে স্থান দিতে পার, আমি গরীব শিরোমণি, আমি পারি না।

তারক।—দুরাশা নয় শিরোমণি ঠাকুর, পঞ্জিকার ফল ঠিক হইবে। জলধর জলবর্ষণ করিবেন, হলধর হলকর্ষণ করিবেন, শশধর সুশীতল করবর্ষণ করিবেন, কমলা পদ্মহস্তে শস্যবর্ষণ করিবেন, ভয় নাই?

শিবু।—(মস্তকে করাঘাত করিয়া) ভয় আমার এই কপাল ফাটাইয়া বাহির হইতেছে! ঘর কতক যজমান ছিল, এ বৎসর তাহাও গেল? গুটিকতক আতপ-তণ্ডুলের ভিখারি আমি, দুগানাম করিয়া সেই তণ্ডুলের আশায় প্রতিদিন আমি পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দিন গণনা করি, আশ্বিন মাস কতদূর, আশ্বিন মাস কবে আসিবে, সম্বৎসর ধরিয়া সেই হিসাব আমি রাখি। এ বৎসর আশ্বিন মাসের নামে জগৎ সংসার আমি আঁধার দেখিতেছি? আতপতণ্ডুল পাইব না! তর্কালঙ্কার ভায়া! আতপতণ্ডুল পাইব না, কেন আর তবে বাঁচিয়া থাকিব? কি খাইয়া বাঁচিব? এক একবার ইচ্ছা হয়, গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসী হইয়া বনে যাই,—আবার ভাবি, পোড়া পেটের দায়ে বনের মধ্যেও আতপতণ্ডুল মনে পড়িবে। বনেও সে বিরহ জাগিয়া উঠিবে, পরিত্রাণ পাইব না! দূর হউক, পৃথিবী হইতেই চলিয়া যাই! পরকালের কাজ কিছুই করিলাম না, ইহকালেও অনাহারে প্রাণ যায়! কি করিতে আসিয়া

ছিলাম, কি করিতে রহিয়াছি, যেখানে যাইতে হইবে, সে স্থান এ স্থান হইতে বহুদূর, অজ্ঞাত পন্থা; পথের সম্বল কিছুই নাই, পেটের সম্বল পর্য্যন্ত ফুরাইল! আর কেন? তবে আর কর্ম্মভোগ কেন? অনাহারে মরণের অগ্রে বজ্রাঘাতে অথবা সর্পাঘাতে যদি প্রাণ যায়, তাহাও আমার পক্ষে মঙ্গল! ভাই তর্কালঙ্কার! তোমারেও বলি, দিন ফুরাইল! প্রস্তুত হও!

তারক।—একি শিরোমণি ঠাকুর! অকস্মাৎ এমন বৈরাগ্যভাবের হেতু কি?

শিবু। বৈরাগ্য? হো হো হো! ভায়া হে;—ভাবিয়া দেখ, গণিয়া দেখ, নয়ন মুদিয়া একবার চিন্তা কর, পথের সম্বল কোথায় পাবে? দিন ফুরাইল; দিন ফুরা——

(দূরে পূরবী রাগিণীতে গীত।)

"দিবা অবসান হলো কি কর বসিয়ে মন।
উত্তরিতে ভবনদী, করেছ কি আয়োজন?
আয়ুঃ সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে না দেখ ভায়,
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান,—
যদি নিজ হিত চাও, তাঁহারি শরণ লও,
ভবকর্ণধার যিনি, নিত্য সত্য সনাতন॥"

দূর হইতে গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তর্কালঙ্কারকে সম্বোধন পূর্ব্বক সচকিতে শিরোমণি মহাশয় কহিলেন, "ঐ—ঐ,—ঐ শুন ভায়া, মধুর ঝঙ্কার করিয়া, এই গোধূলি সময়ে পূরবী রাগিণী কি মধুর ধ্বনি—মধুর অথচ ভয়ঙ্কর ধ্বনি করিতেছে! 'উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন?' তোমারে, আমারে, আর এই মায়াময় ভব-সংসারের সবাকারে ঐ গীতধ্বনি এই ভীষণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে!

(বাতাসে কর্ণপাত করিয়া) আবার ও কি?

(দূরে পুনর্ব্বার গীতধ্বনি।)

"মনের বাসনা শ্যামা, শবাসনা, শোন মা বলি।
অন্তিমে রসনা যেন সদাই বলে কালী কালী॥

অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে,—
কেহবা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী ;—
তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে,
মাথায়ে ভক্তিচন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি ।”

পুনর্ব্বার ঐ গীত শ্রবণ করিয়া শিবচন্দ্র শিরোমণি আকাশ পানে চাহিয়া আপন মনে কি বলিলেন, তাহার পর চুপি চুপি তর্কালঙ্কারকে কহিলেন, “ভায়া হে! ঐ আবার শোন!—কে একজন এই দিকে আসিতেছে। পথের সম্বল কি করিয়াছি, আমরা জানি না, ঐ লোকটী জানিয়াছে। পথের সম্বল কালী নাম। দুর্গা পূজা আসিতেছে, এই সময় আমরা কালীনাম স্মরণ করিয়া গঙ্গাজলে শয়ন করিব!

(গীত গাহিতে গাহিতে কালাচাঁদ তর্কবাগীশের প্রবেশ।)

কালা।—(উভয়কে দেখিয়া) এই যে! দুই মূর্ত্তি এক ঠাঁই! কথাটা বলিতেছিল কে? কালীনাম স্মরণে গঙ্গাজলে শয়ন, এ কথাটা কাহার বদনে উচ্চারিত হইতেছিল? তর্কালঙ্কারের বুঝি?

তারক।—আমার মুখে অমন কথা বাহির হয় না। দুর্গাপূজার আনন্দে আমি মাতোয়ারা, দুর্গাপূজার সময় দুর্গানন্দে আমার শরীর পরিপূর্ণ,—অমন কথা আমি বলি না; এই শিরোমণি ভায়া এই শুভদিনে গঙ্গাজলে শয়ন করিতে চাহেন!

কালা।—(শিরোমণির প্রতি) কি হে শিবচন্দ্র! দুর্গা নামে গঙ্গাজলে শয়ন করা তোমার কি ইচ্ছা নয়?

শিবু।—দুর্গার উপর আমার রাগ হইয়াছে। দুর্গা আমার উদরের অন্ন কাড়িয়া লইয়াছেন। দশ ঘর যজমানের মধ্যে সাত ঘর দেউলে হইয়াছে! দুর্গার এমনি দয়া! দুর্গা নাম আমি লইব না। তুমি তো গাহিতেছিলে, অন্তিমে রসনা যেন সদাই বলে কালী কালী।” তোমার পন্থাই আমার পন্থা। আমার এই অন্তিম কাল!

কালা।—তবে ভাই তোমার গঙ্গাজলে স্থান হইবে না। দুর্গানাম ভিন্ন, কালী নাম ভিন্ন, কৃষ্ণনাম ভিন্ন, শিবনাম ভিন্ন, এই জ্ঞান তোমার যত দিন থাকিবে, ততদিন গঙ্গা তোমারে দয়া করিবেন না।

তারক।—না হে তর্কবাগীশ, শিরোমণি আমাদের সে কথা বলেন না, ইনি বলেন, বৃষ্টি হইল না, আতপ তণ্ডুল হইবে না, যজমান বাড়ীর পূজা

বন্ধ, সেই দুঃখে ইনি আপনার প্রাণ আপনি বাহির করিবেন। দুর্গানাম লইবেন না।

কালা।—তবেই বটে! তবেই বটে! সব দোষ দুর্গার! শিরোমণির যোগ্য বাক্যই বটে! কিসের শিরোমণি? পাঁজী পুঁথি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অনুকরণ করা কর্ত্তব্য হইতেছে।

হাতীবাগানের টোল বাড়ীতে বিবাদ বাধিয়া উঠিল। তর্ক শাস্ত্রের ভট্টাচার্য্যেরা, ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত মহাশয়েরা গলাবাজি করিয়া কলহ করিতে বিলক্ষণ পটু!

শিবচন্দ্র শিরোমণি—দশকর্ম্মান্বিত ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, স্মৃতিশাস্ত্রের দুটি পাঁচটি শ্লোক পড়া আছে, উচ্চারণ অশুদ্ধ, ব্যাকরণে দৃষ্টি কম, উপাধিতে তবু তিনি একজন শিরোমণি! ভট্টাচার্য্য মহলে এমন শিরোমণি নিতান্ত অল্প নাই, ভট্টাচার্য্য মহলে উপাধির ভাণ্ডার মুক্ত, টিকি আর উপাধি—অনেক ভট্টাচার্য্যের ভূষণ। পরস্পর বৃথা তর্কে বিবাদ করা সেই সকল ভট্টাচার্য্যের বিদ্যার ফল। ভট্টাচার্য্যের অজ্ঞানতা, যজমানের অনাচার, এই দুই কারণে দেবদেবীর পূজার অঙ্গহানি হইতেছে, কালধর্ম্মে পৃথিবীতে পাপ বৃদ্ধি হইতেছে, রাজা প্রজা সকলই এখন পথ ভুলিয়া অন্য পথে যাইতেছেন, কাজে কাজেই অনাবৃষ্টি, কাজে কাজেই দুর্ভিক্ষ, কাজে কাজেই প্রাণিক্ষয়। পাপের ফলভোগ অনিবার্য্য,—ইহা বিস্মৃত হইয়া তিনজন ভট্টাচার্য্য দুর্গানামে বিরোধ বাধাইলেন—তিনটি মাথায় ঘন ঘন টিকি ঘুরিল, শিরোমণির কাছা খুলিয়া গেল, বাক্যযুদ্ধ বিলক্ষণ চলিল, বাকি রহিল কেবল হাতাহাতি, মুষ্টামুষ্টি।

একটু শান্ত হইয়া কালাচাঁদ তর্কবাগীশ মধ্যস্থ হইলেন। যে দুটি গীত তিনি পূর্ব্বে গাহিয়াছিলেন, সেই দুটি গীতের এক এক চরণ পুনরুক্তি করিয়া কহিলেন, “শিবচন্দ্র! তুমি মরিও না, মা দুর্গা তোমারে অকালে মরিতে বলেন না। তুমি মরিলে দুর্গা আর আমাদের দেশে আসিবেন না, এমন কথা তুমি ভাবিও না। এ দেশে হিন্দুনাম যতদিন থাকিবে, ততদিন ভিন্ন ভিন্ন নামে—ভিন্ন ভিন্ন রূপে মা দুর্গা আসিবেন, শরৎকালে দশভূজা-রূপে মা দুর্গা আসিবেন, তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরিলে, বজ্রাঘাতে অথবা সর্পাঘাতে মরিলে, মা দুর্গার আসা বন্ধ হইবে না, বর্ষে বর্ষে তিন দিনের জন্য মা যেমন আসিয়া থাকেন, সমভাবেই আসিবেন, আসাই মঙ্গল।

অনাবৃষ্টি হইতেছে, দুর্ভিক্ষ হইতেছে, মারীভয় হইতেছে,—নিবারণ করেন কে? দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা জীবের সমস্ত দুর্গতিমোচন করেন তোমার প্রাণ অতি ক্ষুদ্র, যজমানের বাড়ীতে দুর্গাপূজা বন্ধ; দুর্গার জন্য নয়, যজমানের অভক্তির জন্য। হৃদয় দৃঢ় কর, দুর্গানাম জপ কর,—দুর্ভাবনা দূরে যাইবে; যজমান ছুটিয়া গিয়াছে; মা দুর্গা আবার তোমার যজমান ঘর বজায় করিয়া দিবেন, যজমানের সুমতি হইলেই তোমার আতপ তণ্ডুল অক্ষয় থাকিবে, দুর্গা নাম জপ কর, দুর্গানাম জপ কর!"

মাথায় হাত দিয়া, দীর্ঘ এক নিশ্বাস ফেলিয়া শিরোমণি কহিলেন, "দুর্গার যত কৃপা, এই দুর্ব্বৎসরে তাহা আমি বুঝিয়াছি। যজমানটি আমার সর্ব্বাপেক্ষা বড়, সেই ঘরটি আগে মজিয়া গিয়াছে, একটিমাত্র উপযুক্ত পুত্র ছিল, আষাঢ় মাসের রথের সময় সেটী মারা গিয়াছে, নিজের মুচ্ছুদ্দিগিরি চাক্‌রিটী ছুটিয়া গিয়াছে, পূজা হইবে না। কেবল আমি কাঁদিতেছি তাহা নহে, বাবুর বাড়ীর পূজা বন্ধের নামে চৌরঙ্গী রাস্তার অনেক সাহেব বিবিও কাঁদিতেছেন! মহাষ্টমী পূজার দিন রজনীযোগে সাহেব বিবিরা বাবুর নাচঘরে চতুর্ব্বিধ ভোজ্যপেয় সেবা করিত, মনোমোহিনী বাইজীগণের চরণভঙ্গী দর্শন করিয়া প্রেমানন্দে করতালি দিত, এ বৎসর সে আনন্দ বন্ধ! অনেকেই কাঁদিতেছে।

কালা।—যাহারা কাঁদিবার তাহারা কাঁদুক, তোমাকে কাঁদিতে হইবে না। তোমার যজমানের বাড়ীতে আমার গতিবিধি আছে। হাঁ, বড় যজমানটির নাম কি ভাল?

শিবু।—স্বর্ণকান্ত বটব্যাল।

কালা।—অহো হো! স্বর্ণকান্তকে আমি ভাল চিনি। পূজা আমি আনাইব, তোমার মনের দুঃখ ঘুচাইব, তুমি আমার সঙ্গে চল।

শিবু।—সঙ্গে চলিয়া কি করিব? দিন কই? কি করিয়া পূজা আনাইবে! প্রতিমা হয় নাই! দালান অন্ধকার!

কালা।—প্রতিমার অভাব হইবে না, কুমারটুলিতে অনেক প্রতিমা আছে।

শিবু।—টাকার অভাব হইবে!

কালা।—টাকার অভাব হইবে না। যাহা তুমি শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা কথা, স্বর্ণকান্ত সত্য সত্য দেউলে হয় নাই, জুয়াবাজিতে হারিয়া

কিছু দেন্‌দার হইয়াছে মাত্র। পূজার রাত্রে বাই নাচাইতে পারিবে না, টুপীওয়ালাদের সেবা লইতে পারিবে না, সেই দুঃখে স্বর্ণকান্ত পূজা বন্ধ করিতে চাহে। আমি পরামর্শ দিব। বাজে অঙ্ক কমাইয়া দিলে, কম টাকায় বেশ সাত্ত্বিক পূজা হইবে, তোমার আতপ চাউলের পরিমাণ বাড়িবে, দক্ষিণাও কম হইবে না।

শিবু।—(আহ্লাদে) যদি পার, তুমি রাজা হইবে, আমার ব্রাহ্মণী তোমাকে দুই বাহু তুলিয়া আলি—না—না, আশীর্ব্বাদ করিবেন। (কাঁদ কাঁদ মুখে) কিন্তু—কিন্তু—প্রতিমা নাই।

কালা।—হায়! হায়! আমার নাম কালাচাঁদ, আমিই ত কালা, তুমি কেন কালা হও? প্রতিমা আমি আনাইয়া দিব, গোকুলদাঁর ঠাকুরের সাজের মত বিলাতী কলকায় মা দুর্গাকে সাজাইয়া দিব, মহিষাসুরকে বলিদান করিব, মহিষের রক্ত মাখিয়া নবমী পূজার দিন নাচিয়া নাচিয়া তুমি কাদা মাটি করিবে। দুর্গা এখন খেলিবার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছেন, খেলা করিবার জন্য অনেক লোকে এখন দুর্গা আনয়ন করে, তাহাতে আমাদের পেট ভরে, আমি তোমার পেট ভরাইব। চল তুমি আমার সঙ্গে।

আপোষ হইয়া গেল। বিবাদ বাধিয়াছিল, বিবাদ থামিল। শিবচন্দ্র শিরোমণি কালাচাঁদ তর্কবাগীশের সঙ্গে স্বর্ণকান্তের ভদ্রাসনে চলিলেন। তারকনাথ তর্কালঙ্কার মনে করিলেন, তামাসা; সুতরাং তামাসা দেখিবার মৎলবে তিনিও তাঁহাদের অনুবর্ত্তি হইলেন। ইহার নাম দুর্গাপূজায় ভট্টাচার্য্যের গড্ডলিকা প্রবাহ!

বঙ্গে দুর্গোৎসব।

জগতে যাহারা শক্তিশালী, তাহারাই শক্তির পূজা করিয়া থাকে, শক্তির প্রীতি তাহাদিগের উপর অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তাহারা শক্তিকে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়, শক্তিকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সহস্র সহস্র নরবলি প্রদান পূর্ব্বক জগতের চক্ষে সম্মান লাভ করে, নরশোণিতে ধরাতল সিক্ত করিয়া আত্মমর্য্যাদায় স্ফীতবক্ষঃ হয়। ইংরাজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী জাতি, তাই সে দিন দক্ষিণ আফ্রিকার সমর-

যজ্ঞে সহস্র বুয়ারের মস্তক বলি দিয়া, ষোড়শোপচারে শক্তিপূজার সাধন করিলেন, উত্তপ্ত বুয়র রক্তে সমরযজ্ঞক্ষেত্র প্লাবিত হওয়ায় ঘোররূপা চামুণ্ডা সন্তুষ্ট হইয়া ইংরাজকে ট্রান্সভাল রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন, ইংরাজের শক্তিপূজা সার্থক হইল। আবার গত পূর্ব্ব বৎসর ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ চীন সাম্রাজ্যকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত মধ্যএসিয়াক্ষেত্রে সমর-যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন, চীনও শক্তিপূজায় নিতান্ত অদীক্ষিত ছিলেন না, তাই সামান্য রুধিরপাতে সমর-যজ্ঞের নিবৃত্তি হইল, কয়েক সহস্র নরবলির উপর দিয়া এসিয়া ও ইউরোপের শক্তিপূজার উপকরণের তারতম্য বুঝিতে পারা গেল। ফলে এই হইল যে, আজ চীনদেশবাসী আপনাদিগের প্রতি শক্তির পূর্ব্ব অনুগ্রহের অভাব বুঝিয়া, ষোড়শোপচারে শক্তিপূজার আয়োজন করিবার জন্য এসিয়াখণ্ডস্থিত শক্তির বরপুত্র জাপানকে পুরোহিত পদে বরণ করিয়াছেন। মহোল্লাসে চীনবাসী জাপানবাসীর সহিত মিলিত হইয়া শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগে চতুর্দ্দিকে শক্তিপূজার আয়োজনে জগতের সকল জাতিই ব্যতিব্যস্ত—সকলেই মহাশক্তির অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষায় অক্লান্ত উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শক্তির নানা মূর্ত্তি—কেহ বাণিজ্যাদি দ্বারা মায়ের কমলামূর্ত্তি পূজায় মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়াছেন—কেহ বা মায়ের প্রলয়কারিণী রণদুর্গামূর্ত্তি পূজার জন্য লোকক্ষয়কারী নানাবিধ অগ্নেয়াস্ত্রের আবিষ্কারে জগতকে চমকিত করিতেছেন, কেহ বা শিল্প ও বিদ্যাচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া মায়ের প্রসাদনে যত্নবান হইয়াছেন। তাই বলিতেছিলাম, জগতে যাহারা শক্তির বরপুত্র, তাহারাই শক্তিপূজা করিয়া থাকে, শক্তির পূজায় তাহাদিগের মনে আনন্দ হয়, রণযজ্ঞে শত্রুর সহিত আপনার মস্তক বলি দিয়া, অপার আনন্দ অনুভব করে। এই নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্রে বীরসাধকের এত গৌরব, বীরাচার সাধকই শক্তিসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। আজ জাপান জাতি জগতের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান ও বুদ্ধিমানজাতি বলিয়া প্রখ্যাত হইতেছেন;—কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে জাপানবাসীর অবস্থা স্মরণ কর দেখি? অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া অসভ্য জাপান সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছে। ফলতঃ শক্তিপূজা কখনও ব্যর্থ হয় না এবং শক্তির বরপুত্রেরাই শক্তিপূজায় আনন্দ এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। আর যাহারা

ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সপ্তশত বৎসর বিধর্ম্মীদিগের দ্বারা শাসিত হইতেছে, যাহারা কাপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া জগতের চক্ষে প্রতিভাত এবং "বাবু" নামে অভিহিত হইয়া বিদ্রুত, যাহারা শক্তি-সঞ্চয়ের মূলমন্ত্র একতার মস্তকে পদাঘাত করিয়া আত্মবিগ্রহে তৃপ্তিলাভ করে, সেই বঙ্গবাসীর গৃহে শক্তিপূজার আয়োজন—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে? বস্তুতঃ বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের প্রচলন কতদিন হইতে হইয়াছে, তাহা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, বোধ হয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতে বঙ্গে শারদীয়া পূজার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে যে দুর্গোৎসব হইত না, ইহা বলা যায় না, কারণ বঙ্গের ইতিহাসে সে কথা লেখা নাই। কিন্তু যে জাতি কাপুরুষ বলিয়া জগতের চক্ষে ঘৃণিত হইতেছে, তহারা শারদীয়া পূজার সময় আত্মবিস্মৃত হয় কেন? এই বিস্মৃতির মধ্যে কি কোন তত্ত্ব নিহিত নাই? এক্ষণে শারদীয়া পূজা কি এবং শারদীয়া পূজা কোন্ সময়ে, কি জন্য বঙ্গে প্রচারিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে ইহার প্রকৃত তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।

যে সময় প্রবল পরাক্রান্ত রক্ষোপতি রাবণ শক্তিপূজায় সিদ্ধিলাভ করিয়া, দেব নর যক্ষ রক্ষঃ সকলকে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন, পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে ধনরত্ন লুণ্ঠন পূর্ব্বক স্বদেশ লঙ্কাপুরীকে দ্বিতীয় স্বর্ণপুরীতে পরিণত করিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ সতীর সতীত্বরত্ন হরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আপনার বিলাসিতার উপকরণরূপে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই সময় শারদীয়া পূজার প্রথম প্রচার হইয়াছিল,—এ কথা বাল্মীকির মূল রামায়ণে না থাকিলেও আমরা কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে দেখিতে পাই। কিন্তু বাল্মীকির মূল রামায়ণখানির মধ্যে এত প্রকার মতভেদ আছে যে, কোন্ খানি যে মূল, তাহা বলা যায় না। যাহা হউক, সে সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, যদি মূল রামায়ণে শারদীয়া পূজা ও অকাল বোধনের কথা না থাকে, তবে কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণে শারদীয়া পূজার কথা নিহিত হইল কেন?

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখিতে পাই, ভগবতী আদ্যাশক্তি স্বয়ং বলিতেছেন,—

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্যাং মমৈতন্মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা ভক্তি সমান্বিতঃ॥

সর্ব্বা বাধা বিনির্ম্মুক্তো ধনধান্য সুতান্বিতঃ।
মনুষ্যো মৎ প্রসাদেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ইত্যাদি

অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রতি বৎসর শরৎকালে মহাপূজার সময় আমার মাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, সে সর্ব্ববিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধনধান্য সুতান্বিত হয়। কেবল তাহাই নহে, ইহার পরে যে শ্লোক আছে, তাহাতে দেখা যায়, শক্তি পূজার ফলে যুদ্ধে পরাক্রম বৃদ্ধি পায়, শত্রু বিনষ্ট হয় এবং তাহার মঙ্গল হয়।

বাল্মীকির মূল রামায়ণে না থাকিলেও চণ্ডীতে দেখা যায় যে, শরৎকালে মহাপূজা হইয়া থাকে। কিন্তু সেই মহাপূজায় বোধনের আবশ্যকতা আছে, বোধন না হইলে শারদীয়া পূজা সম্পন্নই হইতে পারে না ইহাই ব্যবস্থা; এবং তাহারই নিমিত্ত ইহাকে অকাল বোধন বলে।

তাঁহার কৃত 'রামায়ণে' এই অকাল বোধনের অবতারণা করিয়া কৃত্তিবাস জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশবাসীর উন্নতির নিমিত্ত তিনি যে সতত চিন্তা করিতেন, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে জগতের মধ্যে একটী শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হইবে, সেই উপায়ের আবিষ্কার একমাত্র কৃত্তিবাসই করিয়া গিয়াছেন। সে উপায় আর কিছুই নয়, তাহা অসময়ে শক্তিপূজার প্রচার, এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা। যদি কৃত্তিবাসের নিয়োজিত পথে বাঙ্গালী চলিতে পারিত, তবে এতদিনে বাঙ্গালী জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় জাতি হইত, বাঙ্গালীর বীরদর্পে মেদিনী বিকম্পিত হইত। কিন্তু বাঙ্গালার মাটীর এমনি গুণ যে "শিব গড়িতে বানরের" উৎপত্তি হইয়াছে। শরৎকালের মহপূজায় বাঙ্গালীরা ছাগরক্তে দেবীর সন্তোষ উৎপাদনের চেষ্টা করিয়া সেই ছাগমাংসেই নিজের রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, আত্মীয় স্ত্রীপুত্রকে মনের সাধে নববস্ত্রালঙ্কারাদিতে ভূষিত করিয়া শক্তিপূজার সার্থকতা সম্পাদন এবং কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিকলাপ কলুষিত করিতেছে। বাঙ্গালী জাতির দ্বারা তাঁহার রামায়ণ-নির্দ্দেশিত শরৎকালের মহাপূজার পরিণাম এইরূপ হইবে জানিলে, বোধ হয় কৃত্তিবাস কৌশলে শক্তিপূজার অবতারণা করিতেন না।

রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, দুর্ব্বৃত্ত দশানন বুদ্ধে ও বাহুবলে ত্রিজগতে অজেয় হইয়া উঠিলে, রাক্ষসগণ দেবদ্বিজের উপর মহা উৎপীড়ন আরম্ভ

করিল। তাহারা দেবতাদিগকেও আপনাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিয়া কৃতদাসবৎ তাঁহাদিগের দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইতে লাগিল। কি দেবতা, কি মানব, কি দানব, কাহাকেও তাহারা গ্রাহ্য করিত না, সুন্দরী রমণীমাত্রেই রাক্ষসের উপভোগ্যা বলিয়া বিবেচিত হইত, কাহারও গৃহে ধনরত্ন থাকিলে লঙ্কেশ্বরের বাহুবল-প্রদীপ্ত রাক্ষসেরা তাহা লুণ্ঠন করিয়া লঙ্কাদ্বীপে লইয়া যাইত। এদ্ব্যতীত, দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষসেরা ঋষিদিগের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতেও ছাড়িত না, মারিচ প্রভৃতি রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ-পীড়নের ভারগ্রহণ করিয়াছিল, যজ্ঞে বিঘ্নদান করাই ইহাদিগের কার্য্য হইয়াছিল। পরিশেষে রাক্ষসদিগের অত্যাচারে জগৎ (ভারতবর্ষ) সন্তাপিত এবং সন্ত্রাসিত হইয়া উঠিল; দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর এবং মনুষ্যগণ সকলেই অস্থির হইল, কিসে রাবণের ধ্বংস হয়, সকলে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। পরিশেষে অযোধ্যাপতি দশরথের পুত্র রামচন্দ্র বনগমন করিলে দুর্ব্বৃত্ত রাবণ তাঁহার পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করিল। এতদুপলক্ষে রামের সহিত রাবণের যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

মহাবলশালী রাবণ যে স্বীয় কৌশলে ও ভুজবলে দেবতা ও দানবদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, সে রামকে গ্রাহ্য করিবে কেন? বিশেষতঃ নিরস্ত্র বানর সৈন্যদিগের সাহায্যে রামচন্দ্র নানাবিধ অস্ত্রবল বিভূষিত দুর্দ্ধর্ষ রাবণকে দমন করিয়া অপহৃতা সীতাকে উদ্ধার করিতে গিয়াছিলেন, ইহা রাবণের নিকট বড়ই ধৃষ্টতা বলিয়া বোধ হইল। নর এবং বানরজাতি রাক্ষসদিগের আহার্য্য পদার্থমধ্যে পরিগণিত হইত। আবার তাহারাই রাক্ষসকুল বাহুবলে ধর্ষণ করিতে গিয়াছে, সুতরাং রাক্ষসেরা সকলেই রামচন্দ্রকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল, সকলেই মনে করিল, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই পত্নীর শোকে উন্মত্ত হইয়া গিয়াছেন। শেষে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল, উভয় পক্ষে শক্তির পরীক্ষা আরম্ভ হইল—দলে দলে রাক্ষস মরিতে লাগিল, দলে দলে বানরও মরিতে লাগিল। সশস্ত্র রাক্ষসকুল নিরস্ত্র বানরদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, রক্ষোসৈন্য নিক্ষিপ্ত নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্র বানরদিগের বৃক্ষ ও প্রস্তরের গতিরোধ করিতে পারিল না, নিরস্ত্র বানরগণ প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে এবং ভীষণ পদপ্রহারে সশস্ত্র রাক্ষসদিগের ধ্বংস সাধন করিল। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ ব্যতীত সশস্ত্র রাক্ষসকুলের মধ্যে কেহই অস্ত্রধারণ করিতেও জানিত না, সকলেই

পশুপদবাচ্য ছিল, সকলেই বন্যপশুর ভক্ষ্যরূপে পরিগণিত হইত। পরিশেষে রামচন্দ্রের নিরস্ত্র বানর সৈন্যদিগের হস্তে রাক্ষসদিগের ধ্বংস হইল।

"এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি।
এক জন না রহিল বংশে দিতে বাতি॥"

এই মহাযুদ্ধে রাবণের বংশ বিনষ্ট হইল, পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়স্বজন সকলেই লঙ্কার মহাসমরে প্রাণত্যাগ করিল, লঙ্কাপুরী বীরশূন্যা হইল, রাবণ ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। তখন রাবণের চৈতন্য হইল, সে বুঝিল, অতি দর্পের ফল আগতপ্রায়। বুঝিল যে, তাহার পরমায়ু ফুরাইয়াছে। আর বুঝিল যে, তুচ্ছ বোধে কাহাকেও ঘৃণা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে। তখন সে দুঃখে ক্ষোভে বলিল, "আর কারে পাঠাইব, যাইব আপনি।" এই বলিয়া রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিল। রাম রাবণে বহুযুদ্ধ হইল। কিন্তু রাবণ কিছুতেই মরিল না। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের গৃহে লুক্কাইত ছিল। সেই বাণের প্রহার ব্যতীত রাবণের মৃত্যু নাই, ইহা রামচন্দ্র যখন জানিতে পারিলেন, তখন সেই বাণ হস্তগত করিবার জন্য তিনি অকালবোধন আরম্ভ করিলেন। অকালবোধনের ফলে রামচন্দ্র শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলেন। রাবণের মৃত্যুবাণ অপহৃত হইল, এবং সেই বাণের প্রয়োগে রাবণের বিনাশ সাধিত হইল। ইহা অবশ্য কৃত্তিবাস প্রণীত রামায়ণেই দেখিতে পাই।

যাহা হউক, এক্ষণে মহাত্মা কৃত্তিবাসকে কবি অথবা সূক্ষ্মদর্শী রাজনৈতিক বলিয়া অভিহিত করিব? কবিতার ছলে এরূপভাবে স্বদেশবাসীকে শক্তিপূজায় প্রণোদিত করিতে জগতে এ পর্য্যন্ত কোন কবি পারিয়াছেন কি? যখন মুসলমানদিগের দারুণ অত্যাচারে বঙ্গদেশে হাহাকার উপস্থিত হইয়াছিল, যখন তাহাদিগের দুর্ব্বৃত্ততায় সহস্র সহস্র সতীর অমূল্য সতীত্বরত্ন বিধ্বস্ত হইতেছিল, যখন তাহাদিগের উৎপাতে হিন্দুর ধর্ম্মকর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময়ে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রবলের হস্তে দুর্ব্বল জাতির নিগ্রহ নিবারণার্থ, বাঙ্গালীর ন্যায় কাপুরুষ জাতিকে বিধর্ম্মীদিগের হস্তে বাহুবলে আত্মরক্ষা পূর্ব্বক বীরজাতির মধ্যে
বা
রামায়ণে ...রিবার জন্য, শারদীয়া পূজার ব্যপদেশে শক্তিপূজার প্রাণ
অজেয় হইয়া উ... ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রণীত রামায়ণের মধ্যে

দুর্গোৎসবের ব্যাপার নিবদ্ধ হইয়াছে। তাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর উল্লিখিত শরৎকালে মহাপূজার কথা বঙ্গবাসী জানিতে পারিয়াছে।

কৃত্তিবাসের নির্দেশানুসারে দুর্ব্বল জাতিই শক্তিসাধনার উদ্দেশে অকাল বোধন পূর্ব্বক পূজা করিবে। তাই বঙ্গের ঘরে ঘরে দুর্গা পূজা হইয়া থাকে। তাই পূজার সময়ে সকল বাঙ্গালী আনন্দে উৎফুল্ল হয়, তাই বিজয়ার দিন শত্রুমিত্র সকলেই পরস্পরে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তিলাভ করে কিন্তু মূঢ় আমরা শক্তিপূজার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। তাই পূজার বিঘ্ন উৎ...দের পরিবর্ত্তে আনন্দানুভব করি। কিন্তু অকাল বোধনের দুর্গোৎ- অনুগ্রহ হ... সময়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। মার্কণ্ডের পুরাণে দেখিতে পাই, ছিল, মূর্খ ...বং সমাধি নামক বৈশ্য গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া বড় দুঃখের কি, বন্যপ...র পূজা করিয়াছিলেন। যখন সুরথ রাজার রাজ্য ও ধন ...ক্রুদ্ধ দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, যখন তাঁহার পুত্র মিত্র সকলেই যবন অরাতিদিগের হস্তগত হইয়াছিল, যখন তিনি রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া পথের ভিখারি হইয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তিনি একান্তমনে শক্তি পূজা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। কৃত্তিবাস বাঙ্গালীজাতির অবনতি দেখিয়া, বাঙ্গালীজাতির বড়ই দুঃসময় দেখিয়া বঙ্গদেশে শক্তি-সাধনার প্রচার করিয়াছেন।

ভারতে দুর্গোৎসবের মধ্যে রাজনীতির অনেক কূটতত্ত্ব নিহিত আছে। মুসলমানদিগের ধ্বংস সাধন করিবার জন্যই দুর্গোৎসবের প্রচলন হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে দেখা যায়, সুরথ রাজার রাজ্য ধনাদি মুসলমানেরা বা ম্লেচ্ছেরা কাড়িয়া লইয়াছিল, এবং দেবতাদিগের রাজ্যাদি মহিষাসুর অধিকার করিয়াছিল। হিন্দুর চক্ষে বিধর্ম্মী মুসলমানগণ অসুর ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যাহারা দেবদ্বিজদ্বেষ্টা, যাহারা যজ্ঞাদির বিনাশসাধনে তৎপর, যাহারা হিন্দুর গৃহে সুন্দরী দেখিলে বলপূর্ব্বক তাহার সর্ব্বনাশ সাধন পূর্ব্বক তাহাকে আপনার বিলাসের উপকরণ করিতে উৎসুক, লুণ্ঠনাদি তস্করবৃত্তির দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে সমৃদ্ধিশালী করিতে অভিলাষী, তাহারা হিন্দুরূপ দেবতাদিগের পক্ষে অসুরবৎ প্রতীয়মান হইত।

ষোড়শ শতাব্দীতে যখন যবনদিগের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, যখন বাঙ্গালায় যবনেরা হিন্দুদিগের প্রতি নানাবিধ নির্য্যাতন করিতে লাগিল, তখন চৈতন্যদেব গীতার প্রচার করিয়া জগতকে বুঝাইয়াছিলেন, ভগবান বলিতেছেন,—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও দেখা যায় স্বয়ং ভগবতী বলিতেছেন,—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্য্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ যে যে স্থানে দানবেরা উত্থানপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যে বাধা প্রদান করিবে, সেই সেই স্থানে আমি অবতীর্ণা হইয়া শত্রুক্ষয় করিব!

ভগবানের দশ অবতার শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃতি চৈতন্য তারও নাই শেষও নাই। তাই কৃত্তিবাস রামায়ণের মধ্যে কোন্ পরমায়ু পূজার সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণিত মূর্ত্তিটীও অতি বুদ্ধিমানের নীতিকভাবে পরিপূর্ণ। পাঠক! একবার প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি দিয়া পাঠাইব, দেখিবেন, মা ত্রিনয়না দশভূজা সিংহোপরি দণ্ডায়মানা আছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষ্মী, বামপার্শ্বে সরস্বতী, লক্ষ্মীর দক্ষিণ দিকে গণপতি এবং সরস্বতীর বামদিকে কার্ত্তিকেয় রহিয়াছেন। ঐ যে মায়ের ত্রিনয়ন—উহার মধ্যে মধ্যের চক্ষুতে মহাশক্তির অন্তর্দৃষ্টি নিহিত আছে। উহাকে ইংরাজী ভাষায় "ডিটেক্‌টিভ"ও বলা যায়। বস্তুতঃ দৈত্যদিগের সহিত বিধর্ম্মী যবনদিগের তুলনা এবং বঙ্গদেশে রামায়ণের প্রচারের সহিত মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রচার প্রয়াস, কৃত্তিবাসের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ সন্দেহ নাই।

ঐ যে দশভূজা মূর্ত্তির দশ হস্তে শত্রু সংহার-চাতুর্য্যরূপ দশবিধ অস্ত্র, ঐ যে আদ্যাশক্তি ভগবতীর উভয় পার্শ্বে ধনরূপা লক্ষ্মী এবং বিদ্যারূপা সরস্বতী দণ্ডায়মানা, ঐ যে লক্ষ্মীর পার্শ্বে সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং সরস্বতী পার্শ্বে মহাবীর শক্তিপুত্র কার্ত্তিকেয় রহিয়াছেন, কৌশলরূপী সর্প, বিক্রমরূপী সিংহ, আধ্যাত্মিকেরা উহার ব্যাখ্যা যেরূপেই করুন না, উহার ভিতর গভীর রাজনীতিক ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে, উহারা এক একটী স্বতন্ত্রশক্তি হইলেও আদ্যাশক্তির রূপভেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহারা প্রত্যেকেই ভগবতীর এক একটি স্বতন্ত্র মূর্ত্তি। মা, আমার সিংহবাহিনী! সিংহের উপর আরোহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরকে দমন করিতেছেন। যবনরূপী মহিষাসুর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী হিন্দুরূপ সুরনরত্রাস এবং অত্যাচারী ছিল বলিয়া শক্তিরূপিণী সিংহবিক্রমে তাহাকে আহত করিয়াছেন, কূটরণচাতুর্য্য এবং কৌশলরূপ নাগপাশে আবদ্ধ না করিলে, দুর্ব্বৃত্ত যবনরূপী মহিষাসুর দমিত হয় না,

এই নিমিত্তই যবনরূপ অসুরকে কৌশলরূপ নাগপাশে বন্ধনপূর্ব্বক আদ্যাশক্তি তাহাকে শাসন করিতেছেন।

যে মূর্ত্তি আমরা পূজা করিয়া থাকি, উহার তথ্য-নিরূপণ করিলে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, বাহুবলের জয় সর্ব্বত্র। শক্তির উন্মেষ হইলে মহিষাসুররূপী দুর্ব্বার শত্রুর দমন এবং দুর্ব্বৃত্তের শাসন অবশ্যম্ভাবী। কৃত্তিবাসের সময় যবন কর্ত্তৃক ধনধান্যাদি সমৃদ্ধিরূপিণী লক্ষ্মীর লুণ্ঠন, বিদ্যারূপিণী সরস্বতীর বিকৃতি, সমাজ বা দেশের মঙ্গলের কার্য্যরূপী গণপতির কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন এবং বীর্য্যরূপী কার্ত্তিকেয়কে বিধ্বস্ত করিয়াছিল। শক্তির অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া বঙ্গসন্তান চিরদারিদ্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, মূর্খ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, দুর্ব্বল হইয়া দস্যুতস্কর, এমন কি, বন্যপশুর হস্তে আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছিল। তাই সে সময় শক্তির উন্মেষ হইবার নিমিত্ত শক্তিপূজার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা এমনি মূর্খ যে, শক্তিপূজার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, পূজার বাজারে আনন্দে উন্মত্ত হই। যদি শক্তিপূজার মর্ম্ম বুঝিয়া অকাল বোধনে ভগবতী আদ্যাশক্তিকে পূজা করিতে পারি, তবে আর আমাদিগের ভাবনা কি? যাহা হউক, মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বত্রই শক্তিপূজার প্রচলন ছিল। শিখ, মহারাষ্ট্র জাতি সকলেই ষোড়শোপচারে শক্তিপূজা করিত। বাঙ্গালী প্রকৃত শক্তিপূজা করিতে জানিত না, তাই অকাল বোধনের দ্বারা কৃত্তিবাস তাহাদিগকে শক্তিপূজায় দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যতদিন বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব প্রচলিত থাকিবে, ততদিন কৃত্তিবাসের অক্ষয়কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যাহা হউক, কৃত্তিবাস বড়ই দুঃখের সময়, বঙ্গবাসীর বড়ই দুর্দ্দিনে বঙ্গে দুর্গোৎসব প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গদেশের মাটির এমনি গুণ, আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, দুর্গোৎসবের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া, "পূজার বাজারে" আনন্দে আত্মজ্ঞানপরিশূন্য হই, শক্তিপূজা উপলক্ষে শক্তির ক্ষয়ই সম্পাদন করি, রোদনের পরিবর্ত্তে আনন্দে উৎফুল্ল হই, ধিক্ আমাদিগের বিবেচনায়।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

আশ্বিন মাস।

আনন্দ কাহার ?

মহাভারতের ধর্ম্মজীবন রাজা যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, রাজ্য কাহার ? বিশ্বরাজের রাজ্য, প্রকৃতি রাণীর রাজ্য, নশ্বর মানব কোন রাজ্যের চিরাধিকারী হইতে পারে না। রাজ্য পড়িয়া থাকে, মানব রাজা চলিয়া যায়, অনন্তকাল মানব সংসারকে পুরুষানুক্রমে ইহা দেখাইয়া দিতেছেন। অতএব আমি তুচ্ছ রাজ্যের নিমিত্ত জ্ঞাতিবধপাপে লিপ্ত হইব না। রাজ্য কাহার নহে।

রাজ্য সম্বন্ধে এ বাক্য অখণ্ড সত্য, কিন্তু আনন্দের কথা সেটি সঙ্গত বোধ হয় না। যদি বলা যায়, আনন্দ কাহার ? চতুর্দ্দিক হইতে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর আইসে, যাহার চিত্ত তাহার আনন্দ ; যাহার সুখ তাহার আনন্দ ; যাহাদের উৎসব তাহাদের আনন্দ ; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আধারে আনন্দের বসতি, কিন্তু ভারতে এই দুর্গাপূজা আসিতেছে, ভারতে যত দেশের যত লোক বাস করেন, এই দুর্গাপূজাতে তাঁহাদের সকলেরই এক এক প্রকার আনন্দ। যিনি যে জাতি অথবা যে ধর্ম্মাবলম্বি হউন না কেন, বার্ষিক দুর্গোৎসবে তাঁহার কোন না কোন প্রকার আনন্দ হয়ই হয়, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। ধর্ম্মানন্দের অধিকারী সকলে নহেন, একথা সত্য, কিন্তু ধর্ম্মাঙ্গের অপরাপর শাখা প্রশাখায় অনেক লোকের আনন্দ দৃষ্ট হয়। এ আনন্দকে বিশ্বজনীন আনন্দ বলিলেও ভুল বলা হয় না।

অধুনা ম্লেচ্ছজাতিগণ আমাদের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা দুর্গাপূজা করেন না, সে অংশে তাঁহাদের আনন্দ আইসে না, কিন্তু মা দুর্গার প্রসাদাৎ পূজার অপরাপর অঙ্গে সকল জাতির অপার আনন্দ। ইংরাজেরা বণিক জাতি, বাণিজ্যের মঙ্গলেই দেশের জন্য মঙ্গল ; এই শরৎকালে শারদীয়া সর্ব্বমঙ্গলার আগমনে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়, বৎসরের কোন দিনে, কোন সময়ে, কোন উৎসবে তাদৃশী শ্রীবৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায় না। দুর্গোৎসব বাণিজ্যের প্রধান লাভাধিকারী। যাঁহার বাড়ীতে দুর্গা পূজা হয়, বাণিজ্যবাজারের সহিত কেবল তাঁহারই সম্বন্ধ এমন কথা নহে, ধনি দীনহীন বিধর্ম্মি বিজাতি সকলেই আনন্দোৎসবে উৎসাহিত হইয়া পূজার বাজারে বাজার করে, সকল প্রকার দ্রব্যই

এ সময় অধিক পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে, নূতন নূতন বিলাসদ্রব্যও দুর্গাপূজায় বিস্তর আমদানি হয়, পূর্ব্বে যাহা ছিল না, ফ্রান্স জার্ম্মাণ ও বিলাতীবণিকের প্রসাদে ভারতে বিদেশীয় বাণিজ্যে তাহারও বিলক্ষণ কাটতি। পাশ্চাত্য বণিকেরা মদ্যকে প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য মনে করেন। ঝাড় লণ্ঠন কাঁচের বাসন এবং সুগন্ধি শিশি বোতলের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গা পূজায় সেই মদ্যেরও অধিক উৎসব হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ইংরাজ মিস্ত্রিরা, ইংরাজ কুলিরা, ইংরাজ বাদ্যকরেরা অনেক প্রকার কর্ম্ম বাহিয়া থাকে ; সকলেরই উপার্জ্জন বেশী হয়। তাহা ছাড়া দুর্গোৎসবে এদেশের বড় বড় সাহেব লোকেরা স্বচ্ছন্দে পর্ব্বতে পর্ব্বতে বিহার করিয়া দীর্ঘকাল আরাম লাভ করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের সাহেব জজেরা এই দুর্গোৎসবে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন ছুটি পান, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান চীন এমন কি, সাওতাল পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেণী লোকেরাই আনন্দময়ীর আগমন উৎসবে কিছু না কিছু আনন্দাংসের অধিকারী হয়, বড়দিনে অথবা মহরমে এ আনন্দের শতাংশের একাংশও অনুভূত হইতে শুনা যায় না। একথা বলিলে বোধ হয় আমরা অপরাধি হইব না।

আগমনী।

(১)

আয় মা ভারতে আয় মা আবার।
মা! বলে তুষিব অন্তর আমার॥
না হেরে তোমায় প্রাণে যে মরি।
বিপদ সময়ে এস মা শঙ্করি॥

(২)

ডেকে ডেকে মাগো হয়েছি নীরব।
পড়ে আছি যেন শ্মশানের শব॥
পাষাণির মেয়ে হৃদয় পাষাণ।
কিছু মায়া নাই আমি যে সন্তান॥

(৩)

এস মাগো এস সম্বৎসর পরে।
সন্তানে ভুলিয়াছিলে মা কি করে ॥
নিয়ত যাতনা দহিছে জীবন।
করে যাও তুমি এসে দরশন ॥

(৪)

লও ভক্তবৃন্দে লও ক্রোড়ে তুলে।
ঐ মা তোমায় ডাকে দুর্গা বলে ॥
কাঁদিছে ভকত গগন ভেদিয়ে।
তুমি কি জননি গিয়াছ ভুলিয়ে ॥

(৫)

যত ভক্ত মিলে নয়নের নীরে।
ভাসিতেছে মাগো চাও চাও ফিরে ॥
আর না ফেলিব নয়নের জল।
এ সঙ্কটে মাগো তুমি গো সম্বল ॥

(৬)

এস জগদম্বে ভারতে আবার।
মাতিব সকলে আনন্দে অপার ॥
কেন মা করুণাময়ী গো করুণা নাই।
সতত আমরা যাতনা পাই ॥

(৭)

বাঁচি না যে আর সংসার-পীড়নে।
দেখা দাও মাগো তব ভক্তগণে ॥
এস মা ভবানি ভবেতে আবার।
আনন্দে মাতুক এ ভবসংসার ॥

(৮)

ধিকি ধিকি জ্বলে মন অনুক্ষণ।
কোটি ফণী যেন করিছে দংশন ॥
সন্তান-যাতনা হেরিয়ে নয়নে।
বল দয়াময়ি রয়েছ কেমনে ॥

(৯)

এস মা অম্বিকে করেছি বোধন।
আনন্দে ছাইল ভারত গগন ॥
অবশ্য হইবে বাসনা পূরণ।
মাতিবে মানস ঘুরিবে বেদন ॥

(১০)

দুর্গা দুর্গা বলে ডাকিছি জননি।
এস এস এস চন্দ্র নিভাননী ॥
অপার করুণা মায়ের হৃদয়ে।
হের ত্রিনয়নে কৃপাময়ী হয়ে ॥

(১১)

দয়াময়ী তুমি পুরাণেতে শুনি।
দয়া করে তুমি এস মা জননী ॥
যদি তুমি দেবী, নাহি দেখা দিবে।
দয়াময়ী নামে, কলঙ্ক রটিবে ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা।

দুর্গে দুর্গতিহরা জননী আমার! আসিয়াছ মা! এস মা, আজ একবার তোমায় প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকি। মা! শ্মশানের চিতাধূমে আজ বঙ্গভূমি তমসাচ্ছন্ন, জীবজগতে মা আজ মহাদুর্দ্দিন! জননি, তাই আজ
প্রাণ ভরি[illegible] তামায় ডাকিয়া লই মা। জগদম্বা! বাল্যকালে অর্দ্ধোচ্চা-
রণের সম[illegible] তেই, মা বলিতে শিখিয়াছি, সেই সময় হইতেই তোমায়
কি[illegible] মাগো, দয়া করিয়া যদি আসিয়াছ, তবে দয়া করিয়া পদরেণু
ণে ধরি[illegible] তো দূর করিয়া যাও মা! এই মহা দুর্দ্দিনে মহামারির
সার্থক ব[illegible]স[illegible] দাই ভীত জননি! তাই ডাকি দুর্গে—"রক্ষ রক্ষ সদা
দুর্গে [illegible] নমস্তুতে"। জননি জগদীশ্বরী মাগো! দয়া করিয়া এই
পতি[illegible] নের উপায় করিয়া যাও মা!

মাগো, ঐ দেখ, চারিদিকে বিপদের ভীষণ ভৈরব ত্রাস! দূরদূরান্ত মহামারির বিকট বিভীষিকা আমাদিগকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ দেখ মা, কত শত দীন দুঃখী, অন্ধ আতুর অন্নাভাবে রাজপথে পড়িয়া কালের কবলে পতনোন্মুখ হইতেছে। ঐ দেখ মা, ঘরে ঘরে কত লোক রোগ শোকে ম্রিয়মাণ হইয়া, তোমারই দুর্গানাম লইয়া তোমারে ডাকিছে জননি! মা আর নিদয় হইও না! দুর্গতি হইতে রক্ষা কর বলিয়াই, মা তুমি দুর্গা; বিপদে রক্ষা কর বলিয়া, মা তুমি অভয়া; সম্পদে বিধান কর বলিয়া, মা তুমি শুভদা, পাপাসুর নাশ কর বলিয়া, মা তুমি মহিষাসুরঘাতিনী; শুভাদৃষ্ট প্রদান কর বলিয়া, মা তুমি শুভঙ্করী; অন্নহীনে অন্ন দাও বলিয়া, মা তুমি অন্নদা; অন্নে তুমি ত্রিভুবন পূর্ণ রাখ বলিয়া, মা তুমি অন্নপূর্ণা! জড় জনে জ্ঞান দাও বলিয়া, মা তুমি চিন্ময়ী; নিরানন্দকে আনন্দ দাও বলিয়া, মা তুমি সদানন্দের গৃহিণী। মা তোমায় যে নামে কেন মনে ডাকি না, মাগো সেই নামেই যে, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় ভগবতি! তবে মা কেন আমাদের এ দুর্দ্দশা। আমরা তোমার পাতকী সন্তান, পাপে জর জর, জরাজীর্ণ কলেবর, তাই বলিয়া তুমি মা নিদয়া হইবে কেন? সন্তানে দয়া মাতার যে নিসর্গ প্রবৃত্তি।

"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কথন নয়" এই ত মা আমাদের বিশ্বাস। জগদম্বিকে কপালিকে ত্রিগুণধারিণী বিশ্বপ্রসবিনী! অমরা মহামহিমাময়ী রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে একবার হৃদয়াসনে সহস্রারে উপবেশন কর মা! একবার প্রাণ ভরিয়া সদানন্দময়ীর সদানন্দমূর্ত্তি দেখিয়া জীবন সার্থক করি মা! মাগো মা! তোমা বই আমাদের আর যে কিছু নাই, আমরা মাটীতে পড়িয়া গেলেও মা বলিয়া কাঁদিয়া থাকি! বিদেশ হইতে ঘরে আসিলে আগে যে মা মা বলিয়া ডাকিয়া থাকি। ওগো, সেই তুমি মা, [illegible]কেন আজি এই অধম সন্তানদিগের উপর নিদয় হইতেছ। কেন মা, এই [illegible] সন্ত্রাসের মধ্যে আমাদিগকে আশার আশ্বাস দিতেছ না? জননী! চর[illegible], ভি[illegible] করি, কাতরে করুণাকণা বিতরণ করিয়া আমাদিগের জীবন [illegible]।

ভ্যাবা-গঙ্গারাম।

(লুচি খাবো!)

সুদরিদ্র ভট্টাচার্য্য হরেন্দ্র-ঠাকুর।
শিষ্য তাঁর গঙ্গারাম রাজা বাহাদুর॥
নামে রাজা গঙ্গারাম ভক্তিলেশ নাই।
জন্মে কভু ক্রিয়াকর্ম্ম দেখিতে না পাই॥
থাকেন থাকুন রাজা, ক্ষতি কিবা তায়।
সই দিন সাহেবের চাঁদার খাতায়॥
রাজাতে আমার আজি নাহি প্রয়োজন।
দেখিব কি করে ঘরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ॥
মহামায়া আনিয়াছে পত্রের কুটিরে।
পুজিতেছে ফলে ফুলে ভাগীরথী-নীরে॥
ক্ষুদ্র বিপ্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য আয়োজন।
ধূমধাম কিছু নাই শুদ্ধ আছে মন॥
সামান্য মাটীর দুর্গা মাটীর ভূষণ।
পরিধান চিত্র করা মাটীর বসন॥
এক ঢোল এক কাঁসি বাজিছে উঠানে।
উথলিছে ভক্তিস্রোত ব্রাহ্মণের প্রাণে॥

ভক্তি সার অনিবার ব্রাহ্মণকুমার।
ভক্তিভরে পূজিতেছে চরণ দুর্গার॥
সপ্তমী হয়েছে সাঙ্গ, অষ্টমী আগত।
সন্ধিপূজা অবসানে সবে নিদ্রাগত॥
লোকজন কেহ নাই, কেন বা থাকিবে?
যাত্রা নাই, কবি নাই, কে কারে ডাকিবে॥
জ্বলিছে প্রদীপ এক, প্রতিমার পাশে।
গাইছে মশকবৃন্দ মনের উল্লাসে॥
ঘোর দ্বিপ্রহর নিশা, স্তব্ধ চারিদিক।
হেনকালে ফুকরিয়া কাঁদিল কাত্তিক॥
ওমা আমি লুচি খাবো, বড় সাধ মনে।
একখানি লুচি নাই ব্রাহ্মণ-ভবনে॥
পাকা নারিকেল লাড়ু শ্রীকৃষ্ণবরণ।
কলা মূলা, ভিজে ছোলা, পূজোপকরণ॥
সরা সরা ধানে ভরা গুড়মাখা খই।
ধবল গঙ্গার জল, বাসি দুর্গা দই॥
এই সব উঞ্ছভোগ, হেরি মা এখানে।
লুচি বিনে চিত্ত মম প্রবোধ না মানে॥
আসি মা তোমার সঙ্গে, তিনদিন তরে।
উপাদেয় দুর্গাভোগ, খেতে সাধ করে॥
লুচি, পাঁঠা, ভাল ভাল সন্দেশ মিঠাই।
ছানাবড়া, মতিচুর, খাজা বালুসাই॥
সরভাজা, ক্ষীরপুরি দিব্য মনোহরা।
সুবাসিত, সুখসেব্য, সর্ব্বমনোহরা॥
সেই সব ভোগ মাগো, খেতে সাধ হয়!
এখানে কিছুই নাই, অন্ধকারময়॥
বাবুদের বাড়ী যাব, লজ্জা করি দূর।
ক্ষীরভোগ, লুচিভোগ, খাইব প্রচুর॥
থাকুন গণেশদাদা, থাকুক ভরসা।
তেড়ে তেড়ে, শুঁড় নেড়ে, তাড়াবেন মশা॥

সকলেই ঘুমাইছে, ডাকিতেছে নাক।
আশা করি, সারারাত, এই ভাবে থাক॥
যাব মা বাবুর বাড়ী, দেহ অনুমতি।
জাগিয়া থাকুন তব, লক্ষ্মী সরস্বতী॥
পারি যদি, কিছু কিছু বাঁধিয়া আনিব।
ভাল ভাল রাজভোগ সবাকারে দিব॥
অনুমতি দেহ মোরে দেবী শুভঙ্করী।
লুচি খুঁজিবারে যাই থাকিতে সর্ব্বরী॥
শুনেছি পাড়াতে এক ভ্যাবারাম আছে।
ভ্যাবারাম অকস্মাৎ বাবু হইয়াছে॥
এ দেশে হঠাৎ বাবু বড় চমৎকার।
তার কাছে বড় বাবু কেহ নহে আর॥
এখানে হঠাৎ বাবু, বাবু ভ্যাবারাম।
বহুদূরে ব্যাপিয়াছে, ভ্যাবারাম নাম॥
কি কব মা, ভ্যাবারাম কত গুণ ধরে।
কেহ যাহা নাহি পারে ভ্যাবা তাহা করে॥
শীতকালে পৌষ মাসে আপন ভবনে।
শাল বিতরণ করে সহস্র ব্রাহ্মণে॥
দু-ডজন মোসায়েব বাবু একজন।
দু-ডজন স্যাম্পিনের নিত্য আয়োজন॥
দু-ডজন বিলাসিনী বাইজী একজোড়া।
মাসে মাসে ঢালে ভ্যাবা, তঙ্কা তোড়া তোড়া॥
এত বড়, বড় বাবু, বাবু ভ্যাবারাম।
সবে চমকিয়া যায়, শুনে তার নাম॥
ভ্যাবারাম আনিয়াছে প্রতিমা তোমার।
ভারী ঘটা করিয়াছে, ভারী চমৎকার॥
ভেজেছে বহুৎ লুচি, পর্ব্বতের প্রায়।
যারা যায়, লুচি তারা, ধামাধামা পায়॥
তারি বাড়ী যাব আমি যত পারি খাব।
যত পারি বেঁধে এনে, তোমারে দেখাব॥

থাকো মা ঘুমায়ে থাকো, আসি আমি ঘুরে।
ভোরবেলা এসে পুনঃ, বসিব ময়ূরে॥

দুর্গার কথা।

যেও না রে যাদুমণি, যেও না সেথায়।
অনাচারী ভ্যাবারাম আমার পূজায়॥
তিন দিন সাহেবের খানা দেয় ভ্যাবা।
সাহেবের এঁটো খেয়ে, হয়ে গেছে ভ্যাবা॥
আর্য্যের দেবতা আমি আমার সন্তান।
তুমি বাছা ষড়ানন সুরের প্রধান॥
যেও না ভ্যাবার বাড়ী, ছুঁইও না সে লুচি।
ভকতের ফল মূল খেয়ে থাকো শুচি॥
এ কালেতে বাবু নামে পরিচিত যারা।
অনেকেই অনাচার করে থাকে তারা॥
বাবু বলে শুধু নয়, রাজা বাহাদুর।
দেশ জুড়ে নাম যশ যাঁদের প্রচুর॥
তাঁহাদেরো কেহ কেহ সাহেবের খানা।
না দিয়া আমার পূজা করিছেন মানা॥
যেও না ভ্যাবার বাড়ী, তারকারি বীর!
ছুঁও না কাহারো পানে নত কর শির॥
গেয়ে বঙ্গের কবি, গীত সপ্ত সুরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥

কার্ত্তিকের কথা।

এতদূর হয়েছে মা, জান যদি মনে।
তবে তুমি কেন আসো বঙ্গনিকেতনে॥
এত যদি অধঃপাতে গেছে বঙ্গদেশ।
রেখো না মা বঙ্গে আর কিছু দয়ালেশ॥
এসো না মা বঙ্গভূমে, এসো না মা আর।
রসাতলে যাবে বঙ্গ, হবে না উদ্ধার॥

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

দ্বাদশ বর্ষ। } কার্ত্তিক, ১৩১০ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

বিসর্জ্জন।

মা দুর্গে! আনন্দময়ি! তুমি আসিয়াছিলে, তুমি চলিয়া গিয়াছ। তুমি আসিয়াছিলে আনন্দ বিতরণ করিতে, তুমি আসিয়াছিলে ভক্তের বদনে হাস্য আনয়ন করিতে। সত্য বটে, কিন্তু মা! তাহা ত তুমি পার নাই; তুমি পার নাই, একথা বলিব না; বলিব এই কথা, যাহা করিতে তুমি আসিয়াছিলে, তাহা তুমি কর নাই।

তবে কি তুমি আনন্দ বিতরণ কর নাই? করিয়াছ। যাহারা আনন্দ উপভোগ করে, তাহারা করিয়াছে। যদি বলি, তোমার আগমনে কেহ হাস্য করে নাই, মিথ্যা বলা হইবে। হাসিয়াছে! যাহারা বার মাস হাসে, তোমার আগমনে তাহারা হাসিয়াছে। যাহারা বার মাস কাঁদে, তাহারা মনে করিয়াছিল, মা, তোমার মুখ দর্শন করিয়া তিন দিন তাহারা হাসিবে। মনে করিয়াছিল মাত্র, হাসিতে পারে নাই; অভাগাদিগকে তুমি হাসাও নাই। আবার একটু মিথ্যা কথা বলিতেছি। অনেকেই হাসিয়াছে। কেহ কেহ মুখে হাসিয়াছে, মনে কাঁদিয়াছে। তাহাদের প্রতি তুমি দয়া কর নাই। ভাগ্যবানের ভবনে তোমার অধিষ্ঠান হয়, আনন্দে ভাগ্যবানেরাই হাস্য করে; অভাগার ভবনে তোমার আগমন হয় না, অন্নদা আসিয়াছেন, এই ভাবিয়া, মুখে হাসিয়া, অন্তরে অন্তরে রোদন করে। বৎসরের তিনটী দিনও তাহারা প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পায় না।

মা! তুমি চলিয়া গিয়াছ। তোমার ভক্তেরা তোমার বিজয়ার আনন্দে বিজয়োৎসব করিয়াছে। আবার কি না, তোমার অজ্ঞান ভক্তেরা তোমার বিসর্জ্জনে দশদিক যেন শূন্যময় দর্শন করিতেছে।

ভ্রান্তি! তোমার কি বিসর্জ্জন আছে মা? তুমি বিশ্বসংসার গঠন কর, আমরা তোমার প্রতিমা গঠন করিয়া পূজা করি, অধিবাস করি, আবাহন করি, আবার দক্ষিণান্ত করিয়া গঙ্গাজলে তোমায় বিসর্জ্জন করি। ভ্রান্তি! আচ্ছা মা, ভ্রান্তিই যদি সত্য, তোমারে বিসর্জ্জন করিয়া তোমার ভক্ত কেন তবে বিজয়ার দিন নিশাকালে নিরানন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করে?

কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন নয়, তোমার একজন ভক্ত তোমার প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া সন্ধ্যার পর গৃহে আসিয়া দেখিল, চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য; চৌকিখানি পড়িয়া রহিয়াছে, চৌকির নীচে পঞ্চশস্যে অঙ্কুর ধরিতেছে, আম্রসারযুক্ত পূর্ণ ঘট শোভা পাইতেছে, দ্বারে পূর্ণকুম্ভ কদলীতরু সজীব রহিয়াছে; তোমার সেই সকল চিহ্ন দর্শন করিয়া, তোমার উদ্দেশ্যে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, মা! তোমার সব রহিয়াছে, তুমি নাই? সব অন্ধকার! মা! তোমার এই পূজার দালান, তিন দিন তিন রাত্রি তুমি এই দালানে ছিলে, দালান আলো হইয়াছিল, অকস্মাৎ আজ কেন এমন অন্ধকার! অকস্মাৎ আজ মা তুমি কোথায় গেলে? কল্য আমার এই দালানে চন্দ্র নক্ষত্র-প্রভ শত শত আলো জ্বলিয়াছিল, আজ মা তোমার ঐ চৌকিখানির উপর ছোট একটি দুর্গাপ্রদীপ জ্বলিতেছে! সব অন্ধকার! সব অন্ধকার!

মা! তোমার ভক্ত কেন ঐ রকমে বিলাপ করে? তুমি বিলাপ করাও, সেই জন্যই তোমার অদর্শনে ভক্তের বিলাপ। মা তুমি গিয়াছ,—বৎসরের মত চলিয়া গিয়াছ; বিলাপ রাখিও না; বর্ষে বর্ষে দর্শন দিও!

মা তোমারে প্রণাম করি! শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। বিল্বপত্রে শ্রীশ্রীদুর্গা লিখিয়া, মস্তকে শান্তিজল ধারণ করিয়া, বন্ধু বান্ধবগণের সহিত বিজয়ালিঙ্গন ও প্রেম সম্ভাষণ বিনিময় করিয়া, এইখানে আমরা বৎসরের মত বিজয়ার উপসংহার করিলাম।

ভক্তের মা।

নদীয়া জেলার কোন একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে রামহরি ভট্টাচার্য্যের বাস। ব্রাহ্মণ নিঃস্ব দরিদ্র, যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, তদুৎপন্ন শস্যাদিতে ও বার্ষিক দু-দশ টাকা বৃত্তি প্রভৃতিতে কষ্টে সৃষ্টে সংসার চলিত, সংসারে এক গৃহিণী আর একটী দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা। অন্য পরিবারের মধ্যে নিত্য সেবার জন্য একটী শালগ্রাম শিলা আর একটী বাণলিঙ্গ, অপর একটী পয়স্বিনী গাভী।

ব্রাহ্মণ নিঃস্ব হইলেও তাঁহার অনেক গুণ ছিল, সাধ্যানুসারে পরের উপকার চেষ্টা পাইতেন, সকলের সহিত অমায়িক ব্যবহার করিতেন, কখন কাহাকেও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতেন না, তদ্ভিন্ন তাঁহার নিষ্ঠাও বিলক্ষণ ছিল। নানা কারণে গ্রামের দশজনে তাঁহাকে যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। ব্রাহ্মণ বয়সে নিতান্ত প্রাচীন না হইলেও এখনকার হিসাবে তাঁহাকে প্রাচীন বলা যায়। ব্রাহ্মণের গৃহিণীও নিতান্ত সাধুশীলা ও পতিব্রতা, কাঁচের চুড়িতে এয়োত রক্ষা করিয়াও কখন বেজারবদন হইতেন না, সদাই সহাস্যবদনে গৃহের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন। পতি-সেবাকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণের সেবায় তৎপর থাকিতেন। বলা বাহুল্য, তখন স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলিত ছিল না, বেথুন কলেজাদিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণের কন্যাটীও "রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।" যেমন রূপ, তেমনি গুণ। কন্যা পিতার পূজার আয়োজন করিয়া দিত, মাতার রন্ধনের সহায়তা করিত, গৃহকার্য্যেও মাতার সঙ্গিনী হইত, পিতা শ্রান্ত হইয়া গৃহে আসিলে, বীজন করিত, পিতার পাদ প্রক্ষালনের জল আনিয়া দিত। বালিকার রূপও ততোধিক, সর্ব্বাঙ্গে শারদ পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ঢল ঢল করিত, শশাঙ্কলাঞ্ছিত সুন্দর বদনে হাস্যকুমুদ সততই ফুটিয়া থাকিত। সুকুমার কপোল যুগলে আরক্ত বনজ পাটলের সৌন্দর্য্য নিয়তই পরিলক্ষিত হইত; সুগোল সুঠাম ললাটপট্টে কুঞ্চিত অলকাবলী কৃষ্ণসর্প শিশুর ন্যায় সূক্ষ্মফণা-গুলি বিস্তার করিয়া খেলা করিত! গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা যে কেহ বালিকাকে দেখিত, সেই বলিত, ব্রাহ্মণের কন্যা মানবী নহেন, কোন শাপ-ভ্রষ্টা দেববালা ভূতলে অবতীর্ণা হইয়া ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ নিঃস্বতা প্রযুক্তই হউক, অথবা একমাত্র স্নেহের কন্যাকে বিবাহ দিলে পরগৃহবাসিনী হইবে ভাবিয়াই হউক, ব্রাহ্মণ এ পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ দেন নাই, অথবা দিতে পারেন নাই।

ব্রাহ্মণ প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব করিতেন! সে পূজায় জাঁক জমক কিছুই ছিল না, ধূমধামও কিছুই ছিল না, নাচ তামাসা রঙ্গরস কিছুই ছিল না, ছিল কেবল রক্তজবা আর গঙ্গাজল, ছিল কেবল সচন্দন বিল্বপত্র আর শরতের নবদুর্ব্বা! আর ছিল সর্ব্বোপরি ব্রাহ্মণের অচলা ভক্তি!! ব্রাহ্মণ স্বহস্তে, মাতৃমূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন, স্বহস্তে চিত্রকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, আর স্বহস্তে মায়ের স্বর্ণ অঙ্গে মৃত্তিকার অলঙ্কার পরাইয়া দিতেন! পূজার তিন দিন ব্রাহ্মণের মৃত্তিকামণ্ডপে যে কেহ চাহিয়া দেখিত, সেই বলিত, স্বয়ং কৈলাসেশ্বরী কৈলাসপুরী পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে অবতীর্ণা হইয়াছেন। পূজা ব্রাহ্মণ নিজেই সম্পন্ন করিতেন! ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করিয়া পূজা করিতেন বটে, কিন্তু মূর্খ আমরা, সে মন্ত্রের অর্থ কেমন করিয়া বুঝিব! কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন মুদ্রিতনেত্রে গললগ্নীকৃতবাসে 'মা মা' বলিয়া ডাকিতেন, আর যখন সেই মুদ্রিত নেত্রের প্রান্ত দিয়া দরধারে অশ্রু-ধারা বিগলিত হইয়া ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিত, তখনই বুঝিতাম, মা বুঝি যথার্থই ব্রাহ্মণের মা! মা বুঝি যথার্থই আজ ব্রাহ্মণের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া সেই মৃত্তিকামণ্ডপেই বিরাজ করিতেছেন! আবার যখন ব্রাহ্মণ, পত্নী ও কন্যার সহিত মিলিত হইয়া, মাতৃমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক "দুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং" বলিয়া মাতৃ-পাদপদ্মে সচন্দন রক্তজবা ও বিল্বদল প্রদান করিতেন, তখনই বুঝিতাম, স্বয়ং বিধি যেন ভক্তি ও প্রীতির সহিত মিলিত হইয়া, ব্রাহ্মণের মণ্ডপ শোভা করিতেছেন! কিন্তু হায়, সে দিন আজ কই! আজ কত দেশে কত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইতেছে, কিন্তু কই মা! তোমার পূজার মণ্ডপ ত দেখিতে পাই না, আবার মা তোমার মণ্ডপ ভগ্ন করিয়া কত বিলাসীর সুরম্যহর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইতেছে, সাধের বৈঠকখানা বানাইয়া কত সাধ মিটাইতেছে; কিন্তু তোমাকে আনিয়া ত সাধ মিটাইতে দেখিতে পাই না। কত গৃহে কত রকমের বিকট উৎসব দৃষ্ট হইতেছে, কিন্তু মা কৈ—তোমার সেই শারদীয় মহোৎসব ত প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না! "কার দোষ দিব মা! দোষ কারো নয়গো মা স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"।

পূজার তিন দিন ব্রাহ্মণের গৃহে গ্রামের প্রায় সমস্ত লোকই প্রসাদ পাইত। ব্রাহ্মণী মাতৃপ্রসাদ সেই শাকান্ন সকলকেই হাস্যমুখে বিতরণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেন, পল্লীবাসী সকল লোকেই মহানন্দে সেই পুণ্য প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিত! সংসার এই রূপেই চলিত। কলহ নাই, বিবাদ নাই, অথচ অভাব নাই, সদ্ভাবও নাই; সর্ব্বত্র পূর্ণশান্তি পূর্ণ সুখ!

কিন্তু কন্যাটীকে দ্বাদশ উত্তীর্ণ করিয়া ত্রয়োদশে পড়িতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কন্যার বিবাহের জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন! পাঠক, হয় ত বলিবেন, সুন্দরী কন্যার বিবাহের আবার ভাবনা কি? কিন্তু আমরা নিশ্চয় জানি, সর্ব্বসুন্দর অর্থের অভাবে সুন্দরী কন্যাও কুৎসিতা। ব্রাহ্মণ বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু উপযুক্ত পাত্র দুর্লভ হইল। পাত্র অনেক জুটিল বটে, কিন্তু কোন্ পিতা প্রাণ ধরিয়া এ হেন স্বর্ণ কমলিনীকে প্রেতের করে উৎসর্গ করিতে পারেন, কোন্ মাতা এ হেন গজমতিহারকে দানবের কণ্ঠাভরণ করিয়া দিতে পারেন? অগত্যা ব্রাহ্মণকে নিতান্ত চিন্তিত হইতে হইল। অবশেষে নিকটস্থ কোন বিখ্যাত ধনী জমীদার ব্রাহ্মণের কন্যাটীকে নিজ পুত্রবধূ করিতে স্বীকৃতা হইলেন, ব্রাহ্মণও উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া বীতচিন্ত হইলেন। শুভ বৈশাখের শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল! কন্যাও শ্বশুরগৃহে প্রেরিত হইল।

[২]

কন্যাকে শ্বশুর গৃহে পাঠাইয়া অবধি ব্রাহ্মণ নিতান্তই বিষণ্ণমনে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন, বিষণ্ণ হইবারই কথা, না হইবেনই বা কেন? শকুন্তলাকে পতি গৃহে পাঠাইবার সময় ভগবান কণ্ব যখন—

বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমাহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ।
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং ন তনয়াবিশ্লেষ দুঃখৈর্নবৈঃ॥

বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন সংসারী ব্রাহ্মণের কথাই ত নাই? বাস্তবিক কন্যাটী ব্রাহ্মণের একমাত্র স্নেহের পুত্তলী, কন্যার বিরহে ব্রাহ্মণের গৃহে কে যেন অন্ধকার ঢালিয়া দিয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী নিতান্তই বিষণ্ণ! ক্রমে গ্রীষ্ম বর্ষা কাটিল, সুখের শরৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বর্ষার মেঘ কাটিয়া গেল, পথ ঘাট শুষ্ক হইল, আকাশে চাঁদ উঠিল,

তারা হাসিল, নদীর জল নির্ম্মল হইল, সরোবরে পদ্ম ফুটিল, কুমুদ বিকসিত হইল, স্থলে বিবিধ স্থলকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া চতুর্দ্দিক সৌরভে আমোদিত করিল। শেফালিপুঞ্জের মৃদু সৌরভে পবন সুরভিত হইল, আমাদের ব্রাহ্মণও মাতৃ-পূজার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভক্তের প্রাণ মাতৃ-পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল! ব্রাহ্মণ স্বহস্তে পূর্ব্ববৎ প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া যথাসম্ভব পূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন। একে একে সব সংগ্রহ হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণের মৃৎমণ্ডপে মৃণ্ময়ী প্রতিমা পূর্ব্ববৎ দিব্য প্রভাবে শোভা পাইতে লাগিল। পূজার দিন আগতপ্রায়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী উভয়ে পরামর্শ করিয়া কন্যাটীকে এই সময় আনিবার সঙ্কল্প করিবেন।

কল্পারম্ভের কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ বৈবাহিকের গৃহে যাত্রা করিলেন, ইতিপূর্ব্বে, কন্যাটীকে আনিবার জন্য বৈবাহিককে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই, আশা করিলেন এবার তাহার অনুরোধ উপেক্ষিত হইবে না। সুখের শরতে মা আসিয়াছেন, কন্যা আসিবে, ব্রাহ্মণের প্রাণ আশা ও আনন্দে যুগপৎ নৃত্য করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ সুখের স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ণে বৈবাহিকের বাটীতে উপনীত হইলেন। বৈবাহিক ধনী, ব্রাহ্মণ দরিদ্র, তথাপি ব্রাহ্মণ অক্ষুব্ধচিত্তে বৈবাহিকের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া যেমন ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি সশস্ত্র দৌবারিক তাহাকে বাধা দিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। ব্রাহ্মণ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেও দৌবারিকের প্রতীতি জন্মিল না। তখন অনেক অনুনয় বিনয়ের পর প্রভুর অনুমতি লইয়া দৌবারিক ব্রাহ্মণের পথ মুক্ত করিয়া দিল, ব্রাহ্মণ সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। ধনীর, বৈঠকখানা, নানা আসবাবে সুসজ্জিত, কত ঝাড়, কত লণ্ঠন, কত ছবি, কত কারুকার্য্যখচিত বিলাসসাধনোপযোগী দ্রব্যসমূহ, শয্যাদির কি চমৎকার পারিপাট্য! ব্রাহ্মণ দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য অজ্ঞান হইয়া গেলেন, আর কন্যার সুখের কথা ভাবিয়া ব্রাহ্মণের নেত্রপ্রান্ত দিয়া আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে বৈবাহিকের শুভাগমন হইল, চক্ষে চক্ষে মিলন ঘটিল! ধনীর নিকট দরিদ্রের যাদৃশ সম্মাননলাভ সম্ভব, ব্রাহ্মণের ভাগ্যে তাহার ত্রুটী হইল না। পরস্পর স্বাগত সম্ভাষণের পর আগমন কারণ

জিজ্ঞাসিত হইলে, আমাদের ব্রাহ্মণ কন্যাটীকে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন! প্রস্তাবের অসম্ভব্যতাটা ধনীর নিকট এতদূর বোধ হইল, তিনি প্রথমে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কি ক্ষেপিয়াছেন, আপনার কন্যা বটেন, কিন্তু এখন তিনি আমার পুত্রবধূ আমি কেমন করিয়া আমার পুত্রবধূকে আপনার কুটীরে পাঠাইয়া দিব? আরো বিশেষ আমার বাটীতেও পূজা—বাই আসিবে, খেম্‌টা নাচিবে, যাত্রা হইবে, কত রকম আমোদ প্রমোদ হইবে, তাহা ফেলিয়া তিনি কি আপনার বাটীতে শাকান্নের পূজা দেখিতে যাইবেন? তাহা কখনই ঘটিবে না, আমি কখনই পাঠাইতে পারিব না, ব্রাহ্মণ বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন, কাকুতি মিনতি করিলেন, ধনীর হৃদয় কিছুতেই গলিল না; শেষে অগত্যা কন্যাটীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া বিষণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, কন্যাও পিতার দুঃখে যারপর নাই দুঃখিত হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিলেন, কি করিবেন, শ্বশুরের বিনা অনুমতিতে ত আসিতে পারেন না!

ক্রমে পূজার দিন নিকটে আসিল। আজ ষষ্ঠীর বোধন। আজ মহামায়ার অকাল নিদ্রা ভঙ্গ হইবে! এই দিনে দাশরথি রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য মায়ের উদ্বোধন করিয়াছিলেন! আমাদের ব্রাহ্মণ কন্যাবিরহে দুঃখিত হইয়াও মহামায়ার বোধনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। নানা প্রকার আয়োজন হইতে লাগিল, বিল্ববৃক্ষমূলে বোধন ঘট স্থাপিত হইল, সূর্য্যদেবও অস্তগত প্রায়, পাখীরাও যেন মহামায়ার উদ্বোধনের জন্য চারিদিক হইতে উল্লাস কলরব করিতে লাগিল। সহসা দশদিক আলোকিত করিয়া অষ্টালঙ্কার ভূষিতা কন্যা ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ কন্যাকে আগত দেখিয়া, আনন্দাশ্রুনয়নে একেবারে মা মা বলিয়া তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিলেন, ব্রাহ্মণীও সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কন্যাকে আসিয়া ক্রোড়ে লইলেন, বোধ হইল, যেন সিংহবাহিনী উমারাণী হিমালয়ের কণ্ঠালিঙ্গিত হইয়াই মেনকার ক্রোড়ে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের মহানন্দ, গৃহে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল!

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পরপিতা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, কেমন করিয়া আসিলি আর একা আসিলিই বা কি করিয়া? তখন আদরিণী কন্যা ঈষৎ সহাস্যবদনে পিতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাবা, তুমি আসার পর আমি আমার শ্বশুরকে আর তোমার জামাইকে বিস্তর বলিয়া কহিয়া—

তিন দিনের জন্য কেবল আসিবার অনুমতি পাইলাম, বিজয়ার দিন ফিরিয়া যাইব বলিয়া আসিয়াছি! সঙ্গে পাল্কী বেহারা—লোকজন ছিল, কিন্তু আমাদের ভাঙ্গা ঘর দেখাইব না বলিয়া তাহাদিগকে খিড়কীর আম্রকানন হইতে বিদায় দিয়া আসিয়াছি, আর বিজয়ার দিনও সেখানে আসিয়া থাকিবে বলিয়া দিয়াছি। ব্রাহ্মণের দুই চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল, মা আমি আর তোরে পাঠাইব না, আমার ভাঙ্গা ঘর—মা আজ আলো হইল, আবার ভাঙ্গা মণ্ডপে মা আসিয়া আলো করিয়াছেন, আর তুই মা আমার ভাঙ্গা ঘর আলো করিলি—তোকে পাঠাইয়া আর আমি থাকিতে পারিব না। তখন মাতা কন্যাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইয়া সকলে মিলিয়া দেবীর বোধন কার্য্যের জন্য ব্যস্ত হইয়া বিল্বমূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা-সময়ে কার্য্য সমাধা হইল।

কন্যার অনুরোধে ব্রাহ্মণ এবার বহুলোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। কন্যা স্বয়ং পাকের ভার গ্রহণ করিয়া রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন, মাতা কন্যাকে নিষেধ করিলেন কিন্তু বালিকা এবার স্বয়ং সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে করিবেন বলিয়া মাতাকে বুঝাইলেন। বালিকা মুহূর্ত্তের মধ্যে রন্ধন-গৃহ অন্ন ব্যঞ্জনে পুরিয়া ফেলিল। বালিকাকে রন্ধন-গৃহে দেখিয়া সকলে মনে করিল, স্বয়ং অন্নপূর্ণা যেন আজ বামনের উপনয়নে কাশ্যপ গৃহে আসিয়া অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন। পূজান্তে সকলেই প্রসাদ পাইল, এমন অপূর্ব্ব অমৃত ভোগ ইতিপূর্ব্বে আর কখন তাহাদের ভাগ্যে ঘটে নাই। শতমুখে সকলে রন্ধনের প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

ক্রমে তিন দিন অতিবাহিত হইল! তিন দিনই ব্রাহ্মণের গৃহ দীয়তাং ভুজ্যতাং রবে প্রতিধ্বনিত রহিল! আজ বিজয়া, আজ আবার কন্যাও শ্বশুর-গৃহে যাইবে, ব্রাহ্মণের হৃদয় আজ নিতান্ত শোক ভারাক্রান্ত। ক্রমে মধ্যাহ্ন অতিবাহিত হইল, কন্যা মাতা-পিতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, আর দুদিন থাকিবার জন্য মাতা কত অনুরোধ করিলেন, পিতাই বা কত বলিলেন কিন্তু তাহা হইলে আর আসা হইবে না বলিয়া, বালিকা তাহাদিগকে নিরস্ত করিল। অগত্যা ব্রাহ্মণ পত্নীও কন্যার প্রস্তাবে আর আপত্তি করিলেন না। কন্যা আম্রকাননাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, ব্রাহ্মণও প্রতিমা লইয়া বিজয়ার জন্য বহির্গত হইলেন।

বিজয়া দশমীর পরদিন পূজা-গৃহ যেন যথার্থই আঁধার। সেই আনন্দ-

ময়ী মহামায়ার অদর্শনে সর্ব্বত্রই যেন নিরানন্দ! আজ পুত্রশোকবিধুরা জননীর শোকাগ্নি দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইল, পতিশোককাতরা বিধবার নেত্রপ্রান্ত দিয়া জলধারা বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল, অন্নপূর্ণার শুভাগমনে যাহারা অন্নের জ্বালা ভুলিয়াছিল, তাহাদের বুভুক্ষানল আজ আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। চারিদিকেই বিষাদ, চারিদিকেই যেন নৈরাশ্যের তমস্তোম! আমাদের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীও আজ নিরানন্দে নিমগ্ন। কন্যাটী তিন দিন মাত্র আসিয়াছিল, ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভাল করিয়া কিছু খাওয়াইতে পারি নাই, ভাল করিয়া একটু আদর করিতে পাই নাই, এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ দম্পতী যেন আরো ম্রিয়মাণ হইলেন। পরিশেষে স্থির হইল, ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া কন্যাকে দেখিয়া আসিবেন।

[৩]

আজ কোজাগরী পূর্ণিমা। ব্রাহ্মণ কন্যাকে দেখিতে যাইবেন বলিয়া সসজ্জ হইলেন। কন্যার স্বহস্ত পক্ক বিবিধ মিষ্টান্নের অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহা লইয়া ব্রাহ্মণ বৈবাহিকের গৃহে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে ব্রাহ্মণ বৈবাহিকের প্রাসাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক এবার বিশেষ আপত্তি করিল না। তথাপি প্রভুর অনুমতি প্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহাকে দ্বারে অপেক্ষা করিতে হইল। অনুমতি আসিলে ব্রাহ্মণ দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈবাহিকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কুশল প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসার পর ব্রাহ্মণ বৈবাহিককে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার দয়ায়—আমি চিরবাধিত হইয়াছি, কি বলিয়া আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না, আপনি আমার কন্যাটীকে পূজার সময় পাঠাইয়া দিয়া আমাকে যেরূপ প্রীত ও বাধিত করিয়াছেন, এ জীবনে আমি আপনার সে দয়া বিস্মৃত হইতে পারিব না। পূজার সময় যদি মাকে না পাঠাইয়া দিতেন, তবে আমার যে কত দুঃখ হইত, তাহা আমি কথায় বলিতে অক্ষম।" ধনী বৈবাহিক ব্রাহ্মণের কথার অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, "মহাশয় কি বলিতেছেন, আপনার কথা ত বুঝিতে পারিলাম না, আমি ত আপনার কন্যাকে পাঠাই নাই, বধূমাতা ত পূজার সময় এখানেই ছিলেন।" ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, হয় ত বৈবাহিক কথাটা গোপন করিতে চাহিতেছেন, তথাপি তিনি বলিলেন, "না মহাশয়! মা আমার ষষ্ঠীর দিন বোধনের পূর্ব্বে গিয়া উপস্থিত হন,

আপনি তাঁহাকে তিন দিনের জন্য যাইতে অনুমতি দিয়াছিলেন, আমি বিজয়ার দিনই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। মা আমার তিনদিন কাল স্বহস্তে বিবিধ মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া দেশের সমস্ত লোককে অমৃত-ভোজন করাইয়া আসিয়াছেন, এমন অমৃত কেহ কখন জীবনে আস্বাদ করে নাই। আমি মাকে ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, ভাল করিয়া আদর করিতে পাই নাই, ভাল করিয়া মাকে কিছু খাওয়াইতে পারি নাই; তাই এই মার আমার স্বহস্তপক্ক যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া আসিয়াছি।" ধনী বৈবাহিক ব্রাহ্মণের বাক্যে যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বধূমাতাকে কি পূজার সময় পিতৃ-গৃহে পাঠাইয়াছিলে?" পুত্র বলিলেন, "কই, না!" তখন তিনি অন্তঃ-পুরে গিয়া পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন মা! তুমি কি পূজার সময় বাপের বাড়ী গিয়াছিলে?" পুত্রবধূ বলিল, "কই না, আমি ত এখানেই ছিলাম।" ব্রাহ্মণ সকল শুনিলেন, ব্রাহ্মণের শরীরে স্বেদ সঞ্চার হইল, ব্রাহ্মণের চক্ষু দিয়া ধারা বিগলিত হইতে লাগিল, ব্রাহ্মণ সেই অমৃতভোগ সকলকেই কিছু কিছু করিয়া বিতরণ করিলেন, সকলেই সে অনাস্বাদিত মধু উপভোগ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিল। ব্রাহ্মণ আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ধনীর হৃদয়েও সন্ত্রাস জন্মিল, এ রহস্যের মর্ম্ম কেহ উদ্ঘাটন করিতে পারিল না, আর পারিবেই বা কি করিয়া? ব্রাহ্মণ সন্ধ্যার পরেই গৃহে উপস্থিত হইয়া পত্নীকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। ব্রাহ্মণ দম্পতী গলদশ্রু-নেত্রে কম্পিতকলেবরে মাতৃমণ্ডপে আসিয়া 'জয় জগদম্বে' বলিয়া উভয়ে শয়ন করিলেন। ত্রিযামার শেষযাম, জ্যোৎস্নায় জগৎ আলোকিত, আকাশে শারদ কৌমুদীর লহর সহস্রধারে প্রধাবিত, শারদ শশধরপূর্ণ মহিমায় দিব্যাসনে উপশোভিত! সহসা শত পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতিতে ব্রাহ্মণের মণ্ডপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। অপূর্ব্বসৌরভসম্ভারে যেন চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া গেল, সহস্র দিব্য বীণা যেন সমস্বরে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল,—কি এক অপূর্ব্ব সুরভি সমীর যেন সন্তানকে সৌরভ বহন করিয়া চতুর্দ্দিক উল্লাসিত করিল। সেই পূর্ণলোকে,—সেই পূর্ণ-সৌরভে,—সেই পূর্ণ সমীরে,—সেই পূর্ণ ঝঙ্কারের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব মোহিনীপ্রতিমা দিব্যপ্রভায় সমুদিত হইয়া ব্রাহ্মণকে ডাকিল,—"উঠ

বাবা উঠ! এই যে আমি তোমার আদরিণী কন্যা, উঠ বাবা!" ব্রাহ্মণ নয়ন উন্মীলিত করিলেন; কিছুই দেখিতে পাইলেন না, চারিদিক নিস্তব্ধ, চারিদিক প্রভাত জ্যোৎস্নায় মৃদু আলোকিত। সহসা পাখী ডাকিয়া উঠিল, প্রভাতী সমীর ছুটিল—পাখীর কাকলী, সমীরের নিস্বনে ব্রাহ্মণের কর্ণে আবার ঝঙ্কার উঠিল, "উঠ বাবা, এই যে আমি তোমার আদরিণী কন্যা!" ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল জলধারায় ভাসিয়া গেল! "জয় জগদম্বে দুর্গে দুর্গতিহারিণি" বলিয়া ব্রাহ্মণ গাত্রোত্থান করিলেন!!

বিজয়া।

(১)

কেন আজি পশে কাণে আর্ত্ত-কোলাহল,
কেন শোক অন্ধকার
ঘেরিয়াছে চারিধার,
কেন শত চক্ষে ধারা বহে অবিরল,
কেন আজি নারী-নর প্রকৃতি বিকল?

(২)

কেন রে বৈষ্ণবী-মুখে হেরি মলিনিমা,
সতেজ শ্যামল ক্ষেত্র
জুড়াইত নর-নেত্র,
কোথা গেল আজি তার শ্যাম মধুরিমা,
শ্যামাঙ্গী বসুধা কেন মরুর প্রতিমা?

(৩)

অসিশ্যাম নভস্তল নেত্র মনোহর,
নিষ্পিষ্ট তুলকপ্রায়
পুঞ্জ শ্বেত অভ্রচয়,
সমুজ্জ্বল ঋক্ষমালা কান্ত শশধর,
কেন আজি কুহেলিকাবৃত কলেবর?

(৪)

শারদ সরসী শ্যাম সলিলবসনা,
শ্বাস বাষ্প অনিবার
কেন করে সমুদ্গার,
কেন কটিতট শূন্য ফেনিল রসনা,
কি বিষাদে মন্দগতি অস্ফুট স্বননা ?

(৫)

শারদ সরসীবালা ফুল্ল সরোজিনী,
অনিন্দ্য সুন্দর কায়
শুকায়ে গিয়াছে হায়,
কিবা মনস্তাপে আজি ! কেন বিষাদিনী,
ফেলিছে নীহার অশ্রু দিবস যামিনী ?

(৬)

পদ্মবনে কেন নাহি অলি গুঞ্জরণ,
সৈকতে মরালমালা
কেন নাহি করে খেলা,
আর ত সে কলধ্বনি হয় না শ্রবণ,
কি দুঃখে ত্যজিল বল মৃণাল ভক্ষণ ?

(৭)

কি বিষাদে বল আজি প্রভু তপন,
পাদপের অগ্রভাগ
নাহি করে স্বর্ণরাগ,
সুষুপ্ত কমলমুখে করে না চুম্বন,
তাই কি মানিনী আজি খোলে না নয়ন ?

(৮)

দোপাটী অপরাজিতা যুথি সেফালিকা,
অতসী করবী জবা
ভূতলে অচিরপ্রভা,
কুন্দকলি কৃষ্ণকলি দ্রোণের বীথিকা,
এরাও সুষমাহারা, শুষ্ক সে কলিকা।

(৯)

শূন্য কেন শরতের রাজসিংহাসন ?
নৃপতি ককুদ ছত্র
সিতাম্ভোজ শতপত্র,
অকস্মাৎ বিগুণ্ঠিত কিসের কারণ,
কেন শুষ্ক কাশগুচ্ছ চামর চিকণ ?

(১০)

বঙ্গের উল্লাস আজি কেন অস্তমিত,
তাড়িত প্রবাহ প্রায়
ফুটেছিল চারি ভায়,
জড়দেহে করি হায় প্রাণ সঞ্চারিত,
কেন সে তাড়িত স্রোত সহসা বারিত ?

(১১)

(অহো) বিজয়া দশমী আজি বুঝেছি কারণ,
ছাড়ি বঙ্গ নিবসতি
চলিবেন হৈমবতী,
মাতৃহারা হবে বঙ্গ—অসহ্য বেদন,
তাই এবে নিরানন্দ শোকে নিমগন !

(১২)

মার চেয়ে এ জগতে আছে কিবা ধন,
মাতৃহীন গৃহ যার
অরণ্যে বসতি তার,
অতুল বিভব বিত্ত সব অকারণ,
মা নামে নিহিত কোটি সুধা প্রস্রবণ !

(১৩)

এ সংসারে মা নামের তুলনা ত নাই,
মা ব'লে ডাকিলে পরে
কোটি শোক দুঃখ হরে,
হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি তখনি ত পাই,
আছে কোথা হেন বল জুড়াবার ঠাঁই।

(১৪)

সন্তানের বল বুদ্ধি ভরসা জননী,
পড়ে যদি যেতে ছুটে
মা বলিয়ে কেঁদে উঠে,
প্রহার করিলে মুখে তবু মা-মা ধ্বনি,
হেন মাতা হারা হোয়ে বাঁচে কি বাছনি ?

(১৫)

তাই বঙ্গভূমি আজি কাঁদে অনিবার,
শোকসিন্ধু হৃদিক্ষেত্র
গোমুখী নির্ঝর নেত্র,
নিশ্বাসে অনল বাষ্প করেছে উদ্গার,
ধৈরজ ধরিতে প্রাণে সাধ্য নাহি তার ?

(১৬)

প্রফুল্লযৌবনা শ্যামা শারদ প্রকৃতি,
অদর্শনে শারদার
ত্যজি পুষ্প অলঙ্কার,
নীহার বসনে মুখ আবরিয়া সতী,
কাঁদে দিক্‌বধূ সনে বিষাদিনী অতি।

(১৭)

দেখ্ চেয়ে বঙ্গে ওমা কি দশা করিলি,
তোর পুত্র কন্যা যত
কাঁদিতেছে অবিরত,
দুঃখহরা হ'য়ে মাগো কেন দুঃখ দিলি,
যদি না রহিবি তারা কেন বা আসিলি ?

(১৮)

আঁধারে অত্যন্ত মোরা ছিলাম আঁধারে,
কেন বা দেখালি আলো
আঁধার যে ছিল ভালো,
কেন বা ফেলিলি পুনঃ আলো অন্ধকারে,
শক্তিশূন্য দৃষ্টি মা গো কিছু না নেহারে।

(১৯)

কই ত মা কোন সাধ হ'ল না পূরণ,
সম্বৎসরের পরে
তিনটী দিনের তরে,
পেয়েছিনু পা-দুখানি করিতে পূজন,
তাতে মা প্রাণের ক্ষুধা মেটে কি কখন ?

(২০)

হারায়ে হৃদয়মণি অভাগী জননী,
নিয়েছিল ধরাতল
চক্ষে ধারা অবিরল,
বহিত দারুণ শোকে দিবস রজনী,
উঠেছিল সেও মাগো শোক নাহি গণি।

(২১)

কিন্তু মা কি দশা আজি করিলি,তাহার,
দারুণ শোকের ভরে
লুঠে পুনঃ ধরা'পরে,
প্রাণের পুতলি স্মরি করে হাহাকার,
এই কি মা দিলি তারে ফল বিজয়ার ?

(২২)

অই যে নবীনা বালা প্রফুল্ল যৌবনে,
হারায়ে প্রাণের পতি
মৃতপ্রায় ছিল সতী,
বহিত দিবস রাতি সলিল নয়নে,
সেও যে মা দিয়েছিল অঞ্জলি চরণে।

(২৩)

ক্ষণিক সে সুখ মাগো ফুরালো যে তার,
পাশরি শোকের জ্বালা
আর কি উঠিবে বালা,
আর কি ঘুচিবে তার হৃদি অন্ধকার,
বিজয়া দশমী যে মা বার মাস তার।

(২৪)

অই যে মা জরাগ্রস্ত অশীতির পারে,
অন্নবিনা অস্থিসার
যষ্টি শ্রিত দেহভার,
ভুলেছিল অন্নক্লেশ হেরিয়ে তোমারে,
কে দিবে মা অন্নপূর্ণা অন্ন আজি তারে।

(২৫)

তব আগমনে মাতা অই যে রমণী,
পাইয়ে প্রবাসী পতি
আনন্দে ভাসিল সতী,
আবার কাঁদিছে আজ আয়ত নয়নী,
ভাবিয়ে বিচ্ছেদ পুনঃ প্রভাতে রজনী।

(২৬)

প্রাণসমা প্রেয়সীর ধরি চারু কর,
কাঁদে পতি মনোদুখে
মুখানি লুকায়ে বুকে,
অপাঙ্গ বহিয়ে ধারা পড়ে নিরন্তর,
প্রভাতে ফুরাবে তার সুখের বাসর।

(২৭)

হসিত মূরতি অই শিশু সুকুমার,
উঠিয়া পিতার কোলে,
ডাকে মৃদুমধু বোলে,
কার কোলে যাদুমণি উঠিবে আবার,
রজনী প্রভাতে মাগো, কি দুঃখ তাহার?

(২৮)

মসীজীবী অন্নহীন বঙ্গের কেরাণী,
কৃতান্ত কিঙ্করপ্রায়
পিঙ্গ চর্ক্ষু শুভ্রকায়,
ভুলেছিল ইঙ্গ প্রভু সেবা শিবরাণি!
ভুলেছিল দুহৃদয় দুরক্ষর বাণী।

(২৯)

রজনী প্রভাতে পুনঃ স্মৃতির উদয়,
আতঙ্কে রহিত স্ফূর্ত্তি
মনে পড়ে ভীমমূর্ত্তি,
স্খলিত চরণন্যাস কম্পিত হৃদয়,
এই কিরে দিলি ও মা বিজয়ার জয়?

(৩০)

ভাসাতে তোমারে ও মা সকলি ভাসিল,
কোথা সে আনন্দরাশি
কোথা প্রাণভরা হাসি,
সুখের মিলনে আজি বিচ্ছেদ ঘটিল,
দারুণ সে চিন্তানল জ্বলিয়া উঠিল।

(৩১)

অই যে মা তোমা শূন্য রয়েছে পঞ্জর,
কোথা রাজরাজেশ্বরী
মূর্ত্তি তব শুভঙ্করী,
হেরিতে আঁখিতে বারি না হয় সম্বর,
মুখে মুখে বিষাদের ছায়া ভয়ঙ্কর।

(৩২)

অধিবাস দীপ যে মা এখনো জ্বলিছে,
ওই যে মা বেদী'পরে
পঞ্চশস্য শোভা করে,
অই যে মা দ্বারে মাল্য এখনো ঝুলিছে,
এখনো মঙ্গলঘট দেখ না শোভিছে।

(৩৩)

কিন্তু মা কোথায় তুমি? তোমার বিহনে
কায়াহীন ছায়াপ্রায়
কিছুই না শোভা পায়,
দহে সব শুধু মাগো স্মৃতির দহনে,
দুখহরা হয়ে দুখ দিলি মা কেমনে?

(৩৪)

বিষাদের তমস্তোমে ঘিরেছে ধরণী,
কোটি শশী পরকাশ
তব মুখচন্দ্র হাস,
ভাঙ্গা ঘর আলো করি শোভিত জননি,
কেন মনে হয় আজি দিবসে রজনী ?

(৩৫)

ব্যথিত প্রাণের কথা জানাতে তোমায়,
কই মা সময় হ'ল
এল দিন চলে গেল,
আঁখি নাহি পালটিতে নবমী পোহায়,
বলা ত হ'ল না ওমা কি হবে উপায় ?

(৩৬)

আশা করে বর্ষ ধরে আছি মা ভবানি !
তিনটি দিনের তরে
এলি মা কেমন করে,
এই কি মায়ের মায়া ওগো শিবরাণি !
পাষাণের মেয়ে বুঝি তাই মা পাষাণী।

(৩৭)

আর কি বলিব ও মা বলা ত হ'ল না,
এবে এই ভিক্ষা চাই
পুনঃ যেন দেখা পাই,
এ দীনসন্তানে মাগো ভুল না ভুল না,
দিও ছায়া মহামায়া বঞ্চিত করো না॥

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

পরম কল্যাণগীতা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিবিধ মতামত।

সেইরূপ এ জগতে স্বপ্নরূপী অজ্ঞানাবস্থাকৃত নানাপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক মত বুঝিয়া লইবেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানরূপ জাগ্রতাবস্থাপন্ন না হইবেন, সে পর্য্যন্ত কোন্ মত সত্য, কোন্ মত মিথ্যা এবং সামাজিক স্বার্থের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া, কে কি প্রকার বুঝিতেছেন, তাহা পরস্পর বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মহামায়ারূপে যাহার অন্তরে যেরূপ অবস্থান্তরে প্রেরণা করিয়া দেখাইতেছেন, এবং তিনি সেই প্রকার বোধ করিয়া প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন এবং সেই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ সেই প্রকার বোধ করিয়াছেন ও করিতেছেন! তাঁহাদিগের এই সকল বিষয়ের সত্যাসত্য বুঝিবার ক্ষমতা নাই। যিনি অন্তর্যামী, সকলের অন্তরে নানাপ্রকার ভাব প্রেরণা করিতেছেন, তিনিই সকলের ভাব ও সত্যাসত্যের বিষয় বুঝিতেছেন। যখন সকল সম্প্রদায়িক মনুষ্যমাত্রেই জ্ঞানরূপ জাগ্রতাবস্থাপ্রাপ্ত হইবেন, তখন তাহারা যে অনর্থক সামাজিক স্বার্থ লইয়া বিষময় দুঃখ উৎপন্ন করিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন, ইহা বুঝিতে পারিবেন এবং এই সমস্ত যে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপের লীলামাত্র, তাহাও বুঝিতে সক্ষম হইবেন।

আউলিয়া, পীর, পেগম্বর, যীশুখ্রীষ্ট, ঋষী, মুনি, অবতার, পণ্ডিত, মৌলভী, পাদ্রীগণ, কেহ অজ্ঞান, কেহ জ্ঞান, কেহ বিজ্ঞানরূপ স্বপ্নে যাঁহারা যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যে প্রকার অনুভব ও বিশ্বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন এবং সেই সেই অবস্থা ও ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ সেইরূপ ভাবকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সত্য ভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ও করিবেন, তাঁহাদিগের ভাবের সহিত কোন সত্যভাবাপন্ন লোকের উপদেশের সহিত কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবেক না। তাঁহারা আপনার ও পরমাত্মার স্বরূপ বোধ করেন এবং জগতের মঙ্গলার্থ একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে উপাসনা করিতে উপদেশ দেন। পরমাত্মাই একমাত্র সত্য এবং এই জগৎ তাঁহার লীলামাত্র,

ইহা সকলের নিকটেই অকপটে প্রকাশ করেন। তাঁহারা পরের দুঃখে দুঃখী ও পরের সুখে সুখী হন। পরোপকার ও জীবের শান্তিলাভকে স্বার্থজ্ঞানে মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া জগতের মঙ্গলার্থ আত্ম সমর্পণ করিয়া থাকেন। জীবের উত্তম ও নিকৃষ্ট গুণ আপনারই গুণ বোধে কাহারও নিন্দা বা গ্লানি করেন না। বরং সৎকার্য্যে উৎসাহ দিবার জন্য লোকের উত্তম গুণ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন, উত্তম গুণ প্রকাশিত হইলে, নিকৃষ্ট গুণ সংশোধিত হইয়া যায়।

হিন্দু, ইংরাজ, মুসলমান, রাজা, প্রজা, বাদসাহ, জমিদার, পণ্ডিত, পাদরী, মৌলভী, আপনারা বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখুন, এই যে নানা-প্রকার বিচিত্র লীলা ও নানাপ্রকার রমণীয় পদার্থ সৃষ্টিরূপে ভাসিতেছে, তাহা কি কখন কেহ জন্মের পূর্ব্বে দেখিয়াছিলেন? কাহারও কি মনে আছে যে, আপনারা স্ত্রী কি পুরুষ, পণ্ডিত কি মূর্খ ছিলেন, এবং তখন কি কেহ কাহাকেও জ্ঞানী, মূর্খ, পবিত্র বা অপবিত্র দেখিয়াছিলেন এবং প্রত্যহ যখন গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত হও, তখন নিজের কৌপীনের খবরও কাহার থাকে না। এবং আমি কে, মূর্খ কি পণ্ডিত, রাজা, বাদসাহ কি দরিদ্র, ঈশ্বর দ্বৈত কি অদ্বৈত, সত্য কি মিথ্যা এবং ঈশ্বর আছেন কি না, ইহাও কাহারও বোধ থাকে না। জাগরিত হইলে বোধের সহিত দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থ, মান, অপমান ইত্যাদি ভাব প্রকাশ পায়; এবং মূর্খ, পণ্ডিত, রাজা, বাদসাহ, দরিদ্র, রোগী, ভোগী, যোগী প্রভৃতি সংস্কার আইসে। অতএব নানাপ্রকার সংস্কারে আবদ্ধ হইয়া, মিথ্যা সামাজিক পক্ষপাত করতঃ সত্য হইতে বিমুখ হইও না। যাহাতে বিচার পূর্ব্বক সত্যভাব গ্রহণপূর্ব্বক সত্যস্বরূপ পরমাত্মাকে চিনিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর।

চারিবেদ বিভাগ।

উত্তম মধ্যম অবস্থাভেদে চারিপ্রকার অবস্থাপন্ন ব্যক্তি জগতে থাকায়, বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। যেমন বালকদিগকে প্রথমে

"ক, খ," তাহার পরে যুক্তাক্ষর এবং ক্রমে বর্ণশুদ্ধি আদি ব্যাকরণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া শেষে নানাবিধ গ্রন্থাদি পাঠ করাইতে হয়। ক্রমে ক্রমে কঠিন পাঠাদি করাই যেমন সুবিধা, সেই প্রকার অবস্থানুসারে ক্রমে ক্রমে এক একখানি বেদ পাঠ ও তদনুসারে কার্য্যাদি করাই মনুষ্যের পক্ষে সুবিধা, এই জন্য ব্যাসদেব এক বেদকে সাম, ঋক্, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারি-ভাগে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন।

সামবেদে উপাসনা বিষয় ও অগ্নি আহুতির বিষয় বিশেষরূপে আছে। ঋক্‌বেদে বিচার ও জ্ঞান কাণ্ডের এবং অগ্নি আহুতির বিষয় বর্ণিত আছে। যজুঃবেদে কর্ম্মকাণ্ড ও অগ্নি আহুতির বিধি বিশেষরূপে আছে। অথর্ব্ব-বেদে মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ইন্দ্রজাল, ও অগ্নিতে আহুতি দিবার বিধি আছে। যখন অবোধ নীচ প্রবৃত্তির ব্যক্তিগণ ইন্দ্রজাল করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহারা অথর্ব্ব বেদের আশ্রয় গ্রহণ করে। যখন এই সকল কর্ম্মের প্রবৃত্তি লয় হইয়া পরমাত্মার উপাসনা করিতে ইচ্ছা হয়, তখন যজুঃবেদ আশ্রয় করিয়া সকামভাবে নানাবিধ আহুতি আদি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইহাতেও মনের পূর্ণশান্তি না পাইয়া সাম বেদানুসারে পূর্ণব্রহ্মরূপ জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণের উপাসনা ও নিষ্কামভাবে অগ্নিতে আহুতি আদি কর্ম্ম করিতে থাকে। জ্যোতিঃর সঙ্গৎ আদি কার্য্য ও পরমাত্মার শরণাগত হওয়ায়, ক্রমে তাহাদিগের মন পবিত্র ও বুদ্ধিশক্তি তীক্ষ্ণ হওয়ায়, সৎ, অসৎ, দ্বৈত, অদ্বৈত প্রভৃতি বিচার করিতে সক্ষম হইয়া একমাত্র পরমাত্মার উপর নির্ভর করায়, ঋক্‌বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। পরে পরমাত্মার কৃপায় যখন স্বরূপ বোধ হয় অর্থাৎ একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্ম অভেদরূপে প্রকাশ পান, তখন মনুষ্য চারি বেদাতীত হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকেন।

বিদ্যাবিষয়।

জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই পরম বিদ্যা বা যে জ্ঞান জ্ঞান দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম বিদ্যা। নচেৎ বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণাদি কণ্ঠস্থ করাকে বিদ্যা বলে না। কারণ শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা দ্বৈত, অদ্বৈতাদি ভ্রম নাশ এবং অপরাজ্ঞান বা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। ব্রহ্ম-

প্রাপ্তি ব্রহ্মের কৃপাই হইয়া থাকে। পরমাত্মাই একমাত্র ভক্তি, নিষ্ঠা, দাতা, সত্য, দৃঢ়তা ও ত্রিতাপমোচনকারী এবং ইহাঁরই কৃপায় বাসনাদি দূর হইয়া যায়, এবং ইনিই মুক্তি ও পরমানন্দের কারণ। ইহাঁর কৃপায় কামনাদি দূর হইয়া যায়।

যেমন অগ্নি ব্যতীত কেহই স্থূল পদার্থ—ভস্ম করিয়া আপন স্বরূপ ও নাম, রূপ, গুণ রহিত নিরাকার করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই, সেই প্রকার বিদ্যারূপ পরমাত্মা জ্যোতিঃস্বরূপ ব্যতীত, জীবাত্মাতে ত্রিগুণাতীত করিয়া আপন নিরাকাররূপে স্থিত করিবার ক্ষমতা কাহার নাই। বিদ্যা-রূপ পরমাত্মাই একমাত্র শান্তির উপায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

প্রতিহিংসা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ কাণ্ড।

পরিচয়।

ছয় মাস অতীত হইল, দীর্ঘিকা খনন সমাপ্ত হইয়া গেল। কার্য্য করিবার জন্য যাহারা যাহারা আসিয়াছিল, পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত প্রচুর পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া তাহারা বিদায় প্রাপ্ত হইল! রাজপুরীর অগ্রভাগ কোলাহলপরিশূন্য।

নবরাজ কুমারকেতু রাজবেশে একদিন অপরাহ্ণে দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন। যে গৃহে সেই জীর্ণা শীর্ণা বিবর্ণা স্ত্রীলোকটিকে রাখা হইয়াছিল, কুমার প্রথমে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রফুল্লবদনে স্ত্রীলোকটিকে বলিলেন, "মা! আমাকে চিনিতে পারেন? কোথাও কোন দিন আমাকে দেখিয়াছেন, এমন কিছু মনে হয়?"

রমণী ভয় পাইয়া কম্পিতস্বরে উত্তর করিল, "না বাবা! তুমি রাজ্যেশ্বর রাজা, তোমাকে আমি কোথায় দেখিব? কেমন করিয়া চিনিব? আমি দুঃখিনী, যখন পুকুর কাটা হয়, সেই সময় মাঝে মাঝে এক একবার তোমায় দেখিয়াছি, এই পর্য্যন্ত চিনি।"

ছয় মাসে স্ত্রীলোকটির অঙ্গ পুষ্ট হইয়া বর্ণ পরিষ্কার হইয়াছিল, সে অবস্থায় তাঁহাকে চিনিয়া লইতে কুমারকেতুর একটুও বিলম্ব হয় নাই। মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, "মা! সেই পর্য্যন্ত চেনা। কিংবা পূর্ব্বের কোনরূপ চেনা, শীঘ্র আপনি তাহা জানিতে পারিবেন। এখন আমি চলিলাম, আবার আসিব।"

রাজা চলিয়া যান, ব্যস্ত হইয়া করুণস্বরে রমণী বলিল, "বাবা! রাজা! মহারাজ! একটু দাঁড়াও! আমার একটি কথা শুনিয়া যাও। এত লোক পুকুর কাটিতে আসিয়াছিল, সকলকে বিদায় দিয়াছ, এই দুঃখিনীকে আটক করিয়া রাখিয়াছ কেন? ছাড়িয়া দিবার হুকুম দিয়া যাও।"

মৃদু হাস্য করিয়া রাজা কহিলেন, "আপনাকে আটক রাখিতে কে পারে? যত্নপূর্ব্বক রাখিবার হেতুটিও শীঘ্র আপনি জানিতে পারিবেন।" বলিয়াই রাজা সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া অন্য একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহে সেই জীর্ণশীর্ণ পুরুষটিকে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। সেটিও রাজভোগে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পূর্ব্বলাবণ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছিল, স্ত্রীলোকটির সহিত রাজার যে প্রকার কথাবার্ত্তা, ইহাঁর সঙ্গেও সেইরূপ কথাবার্ত্তা হইল, অধোবদনে হাসিতে হাসিতে রাজা তথা হইতে বাহির হইলেন।

সপ্তাহ অতিক্রান্ত। রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া গৃহস্থ যুবক বেশে রাজা কুমারকেতু দেবালয়ের সেই রমণীয় গৃহে দ্বিতীয়বার গমন করিলেন। চেনা পরিচয়ের কথা উত্থিত হইবামাত্র রমণী পরমানন্দে অশ্রুপাত করিতে করিতে কুমারকে ক্রোড়ে লইলেন। সে সময় মাতা পুত্রের আনন্দ উচ্ছ্বাস বর্ণনা করা কেবল কবিগণের সাধ্য, আমাদের সাধ্য নহে। এমন মিলন আনন্দ, অথচ সেই আনন্দের ভিতর রাণীর বদনে নিরানন্দধ্বনি; তোমার দাদা কোথায় বাবা? তোমাদের হারাইয়া আমার প্রাণ যে কত কাঁদিয়াছে, আমার মত অভাগিনী জননী না হইলে আর কেহ তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। তোমার দাদা কোথায় বাবা?"

প্রসন্নবদনে কুমার কহিলেন, "অদ্য শুভদিন, অদ্যই আমাদের মিলন হইবে।" এই উত্তর দিয়াই কুমারকেতু জননীর চরণবন্দন

পূর্ব্বক সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া, দাদার গৃহ হইতে দাদাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, জননীর পবিত্রানন্দ পরিবর্দ্ধন করিলেন। পুনঃ মিলন আনন্দের অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ের সুনিপুণ নায়ক নায়িকারাও সেরূপ আনন্দ দেখাইতে পারেন না। এইখানে প্রকাশ হইল, রাজা সূর্য্যকেতুর প্রধানা মহিষী ভীষণ অরণ্য মধ্যে শাবকভ্রষ্টা কুরঙ্গিণীর ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি এই,—তিনি এখন সেই দুটি হারানিধি প্রাপ্ত হইলেন। দেবালয়ে অবরুদ্ধ ঐ যুবাই তাঁহার পুষ্পকেতু, নব রাজাটিই তাঁহার কুমারকেতু।

পঞ্চম কাণ্ড।

তিনটি সখী।

এই নাটকের চতুর্থ অঙ্ক পিতাপুত্রে মিলন। জননীকে আর জ্যেষ্ঠ সহোদরকে উদ্ধার করিয়া, রাজা কুমারকেতু মন্ত্রীর প্রতি সে রাজ্যের কার্য্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক মাতা ভ্রাতা সমভিব্যাহারে ছদ্মবেশে পিতৃরাজ্যে গমন করিলেন। রাজপুরীতে দেখা দিলেন না, নগরের প্রান্তভাগে একখানা বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এক মাস নির্জ্জন বাস। প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৈরিক বসনপরিহিত, নবীন শ্মশ্রুশোভিত একটি লোক খড়ম পায়ে দিয়া রাজবাটীর সম্মুখে এক সরোবর তীরে পরিভ্রমণ করেন। সরোবরে শ্বেত পাথরে বাঁধা ঘাট, ঘাটের দুই ধারে দুইটি চাঁপা ফুলের গাছ। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে লোকটি প্রত্যহ সরোবরতীরে খড়ম রাখিয়া একটি চাঁপা গাছে উঠিয়া বসেন! একদিন তিনি ঐ ভাবে গাছে বসিয়া আছেন, এমন সময় রাজবাড়ীর এক প্রাচীনা কিঙ্করী সেই ঘাটে জল লইতে আসিল, সোপান হইতে উঠিবার সময় চাঁপা গাছের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল। বৃদ্ধা জানে, সন্ধ্যাবেলা আর ভোর বেলা চাঁপা গাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকে;—"বাপ্‌রে! ভুতরে!" বলিয়া বুড়ী তখন কলসী ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইতে লাগিল, বৃক্ষারূঢ় লোকটি তখন লম্ফ দিয়া পড়িয়া ছুটিয়া গিয়া সেই বুড়ীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন, বুড়ী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, লোকটি তাহাকে সবলে টানিয়া টানিয়া রাজবাড়ীর একপ্রান্তে নির্জ্জনে

লইয়া গিয়া প্রবোধ বাক্যে সুমিষ্টস্বরে বলিলেন, "ভয় পাইতেছ কেন? দেখ, আমি মনুষ্য—ভূত নহি, ভয় কি তোমার? গেরুয়া কাপড় পরা ভূতের কার্য্য নয়; আমি সন্ন্যাসী নই—গৃহী, তোমাকে আমার দরকার আছে। তুমি আমাকে দুটি চাকরাণী দিতে পার? বিদেশ হইতে এ সহরে আমি নূতন আসিয়াছি, চাকর পাইয়াছি, দু'জন দাসী না হইলে চলে না, দিতে পার?"

বুড়ী যেন আহ্লাদ করিয়া বলিল, "কোথায় বাবা? কতদূরে বাবা?"

লোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজবাড়ীতে আছ, গরীবের বাড়ীতে তুমি কেন যাবে?"

চক্ষে জল আনিয়া বুড়ী বলিল, "রাজবাড়ী বাবা! দুর্গা দুর্গা! রাজবাড়ীর পায়ে শত শত নমস্কার! আমাদের মা লক্ষ্মী ছেড়ে গেছেন! আমরা এখন এক রাক্ষসীর দাসী হয়ে রয়েছি! আমাদের মত লোকের গরীবের বাড়ীতে থাকাই ভাল, গরীবের বাড়ীতে রাক্ষসী নাই।"

লোকটি বেশ বুদ্ধিমান। আভাষেই অনেক তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া সেই সন্ধ্যাকালেই বুড়ীকে তিনি আপন বাসা-বাড়ীতে লইয়া গেলেন। মাতা ভ্রাতা ছাড়া বাড়ীতে তখন আরও পাঁচ সাত জন অপর লোক ছিল, তাহারা সকলেই দস্তুরমত সম্মুখে বাহির হইবার অনুমতি পাইল, কেবল মাতা ভ্রাতা স্বতন্ত্র একটি গৃহে লুকাইয়া রহিলেন, সম্মুখ দিকের দ্বার অবরুদ্ধ রহিল। উদ্দেশ্য এই যে, বুড়ীর সঙ্গে তাঁহাদের শীঘ্র দেখা সাক্ষাৎ না হয়। এইখানে আর একটু প্রকাশ থাকুক, বুড়ী যাঁহাকে দেখিয়া চাঁপা গাছে ব্রহ্মদৈত্য মনে করিয়া ভয় পাইয়াছিল, তিনি অপর কেহই নহেন, কনিষ্ঠ রাজকুমার কুমারকেতু স্বয়ং।

বুড়ীকে একটি নির্জ্জন ঘরে বসাইয়া কুমারকেতু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের মা লক্ষ্মী কে ছিলেন? মা লক্ষ্মী ছেড়ে গেলেন কেন? রাজবাড়ীর রাক্ষসীটা কে?"

বুড়ী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিল, "রাজা আমাদের পাগল। দ্বিতীয়বার বিবাহ ক'রে রাজার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। মা লক্ষ্মী ছিলেন বড় রাণী, পাটরাণী।—আহা! চাঁদে কলঙ্ক আছে, আমাদের মা লক্ষ্মীর স্বভাবে বিন্দুমাত্র কলঙ্কের দাগ ছিল না, রাক্ষসীর

কুহকে পড়ে রাজা আমাদের 'মা লক্ষ্মীকে বনবাসে দিয়াছেন! রাক্ষসী এখন সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়াছেন। সেই রাক্ষসীর কাছেই আমি দাসী আছি! আমাদের—হাঁ, ভাল কথা! তুমি বাবা দু-জন দাসী চেয়েছিলে, তিনজন নেবে? আমার হাতে আর দু'জন আছে। রাজবাড়ীতেই তারা থাকে, প্রাণে গুম্ খেয়ে রাক্ষসীর সেবা করে! নেবে?"

অন্তরে কি আন্দোলন করিয়া কুমারকেতু কহিলেন, "আসিতে যদি চায়, লইয়া আইস, তোমাদের তিন জনকেই আমি রাখিব!" সে দিনের এই পর্য্যন্ত কথা। পরদিন সন্ধ্যাকালে বুড়ী একবার বাহির হইয়া গিয়া দুটি প্রৌঢ়া সুন্দরীকে লইয়া আসিল। তাহাদের রূপ দেখিয়াই কুমারকেতু সন্দিহান হইলেন, এরূপ রূপবতী নারীরা দাসীবৃত্তি করিবে, ইহা তাঁহার বিশ্বাস হইল না।

আদর অভ্যর্থনা, মিষ্টান্ন প্রদান ইত্যাদি ব্যবহারকল্পে প্রায় এক ঘণ্টা কাটিল। অতঃপর বুড়ীর সাক্ষাতে কুমার তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা রাজবাড়ীতে থাক, আমার এখানে দাসীর কার্য্য করিতে হইবে, তাহাতে কি তোমরা রাজি আছ?" সখীরা উত্তর করিল, "এখানে দাসী-বৃত্তি করিয়া আমরা পরমসুখে থাকিব, রাজবাড়ীর নরককুণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইব।"

কুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজবাড়ী পরিত্যাগ করিতে তোমাদের এত আকিঞ্চন কেন? রাজবাড়ীকে নরককুণ্ডই বা কেন বল?"

বুড়ীর মুখপানে চাহিয়া সখীরা উত্তর করিল, "নরককুণ্ড অপেক্ষা বীভৎসক্ষেত্র যদি কোথাও থাকিত, তাহা হইলে আমরা সেই স্থানের নাম করিতাম। নরকে পিশাচী থাকে, আমাদের রাজবাড়ীতে এখন পিশাচী অপেক্ষাও এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসী রহিয়াছে!"

কুমারের মহাকৌতূহল জন্মিল। বুড়ী বলিয়াছে রাক্ষসী, ইহারাও বলিল, ভয়ঙ্করী রাক্ষসী, ইহার মধ্যে কি যে নিগূঢ় রহস্য আছে, আমাকে তাহা জানিতে হইবে, কুমারের এরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প।

আদালতে যেমন জেরা করিবার প্রথা আছে, সেই প্রথা অনুসারে কুমার কুমারকেতু সেইরূপে সেই সখী দুটিকে নানাপ্রকার জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রশ্ন উত্তরে একজন সখীর মুখে ব্যক্ত হইল, "আমাদের

রাজার দুই বিবাহ, দুই রাণীর প্রতি রাজার ভালবাসা সমান, যিনি মহিষী ছিলেন, তিনি নিষ্কলঙ্ক চাঁদ, সেই কারণে তাঁহার উপর নূতন রাণীর মর্ম্মান্তিক হিংসা, আমরা দুজনে সেই নূতন রাণীর সহচরী। রাণী একদিন সন্ধ্যাকালে এলোকেশী হইয়া, কোমর বাঁধিয়া, একখানা খাঁড়া হাতে করিয়া টিপি টিপি রাজার শয়নঘরের দিকে যাইতেছিলেন, রাজা তখন শয়নগৃহে একাকী নিদ্রিত, রাণীকে খড়্গধারিণী দেখিয়া পথ আগুলিয়া আমরা তাঁহাকে ধরিলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ মূর্ত্তি কেন তোমার?' রাণী চুপি চুপি বলিলেন, 'চুপ কর্ তোরা, ছেড়ে দে! রাজাকে কাটতে যাচ্ছি।' ভয় পাইয়া আমরা তাঁহাকে টানাটানি করিতে লাগিলাম, ছাড়িলাম না। শেষকালে রাণী আবার চুপি চুপি বলিলেন, "ছেড়ে দে, সত্য সত্য কা'টব না, খাঁড়াখানা ঘরে ফেলিয়া ফিরিয়া আসিব, আসিয়াই চীৎকার করিব, 'বড়রাণী খাঁড়া নিয়ে রাজাকে কাট্‌তে গিয়েছিল' এই কথা বলিয়া চীৎকার করিব, তোরা আমার সঙ্গে সেই রকম চীৎকার করবি।" সখী হই আর যাই হই, দাসী আমরা, রাণীর কথায় সায় দিয়া, রাণীকে তখন ছাড়িলাম। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই করিলেন, আমাদেরও দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল, আমারও সেই সঙ্গে যোগ দিলাম। আমাদের রাজাটি গোবর-গণেশ, যাহা শুনিলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিয়া রাজলক্ষ্মী বড়রাণীকে বনবাস দিলেন। বড় রাণীর দুটি ছেলে ছিল, সে দুটিও মায়ের সঙ্গে বনবাসী! সেই ছোটরাণী এখন সর্ব্বেশ্বরী। সংসারে এখন দিবারাত্রি দাবানল জ্বলে। তেমন পুরীতে কি মানুষ তিষ্ঠিতে পারে? সকলেই সেই ছোট রাণীকে রাক্ষসী বলে, আমরাও বলি, কিন্তু সাক্ষাতে বলিতে সাহস হয় না।"

কুমারকেতুর সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। কিয়ৎক্ষণ কি চিন্তা করিয়া, বুড়ীর দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া, সখী দুটিকে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন যদি কোন সুযোগ ঘটে, তাহা হইলে রাজার সাক্ষাতে তোমরা এই সব কথা বলিতে পারিবে কি না?"

সখীরা বলিল, "অভয় পাইলে বেশ পারিব। সত্য কথায় বোধে কে? আমাদের যদি কোন বিপদ না ঘটে, তবে নিশ্চয় আমরা সভার মাঝে ধর্ম্মঢাক বাজাইয়া দিব।"

কুমারের মনে বিজয়ানন্দ। বুড়ীর সহিত সখীরা কুমারকেতুর সেবা

করিতে লাগিল। পাঁচ সাত দিন পরে কুমার একদিন একটি গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়া ঐ তিনটি স্ত্রীলোককে সেই গৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে তাহারা যাহা দেখিল, তাহাতে তাহাদের বিস্ময়ানন্দের সীমা পরিসীমা রহিল না। সে ঘরে ছিলেন বড়রাণী আর তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র পুষ্পকেতু। সখী তিনটীকে দেখিয়া বড়রাণীর চক্ষে জল আসিল, সখীরাও চক্ষের জলে ভাসিয়া গেল। আনন্দের অশ্রু প্রবাহ। আনন্দ মিলনের অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবার অগ্রে বড়রাণীর দুটি হাতে ধরিয়া অশ্রুমুখী বৃদ্ধা সহচরী করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের দুটি রত্নকে দেখিতেছি, আমাদের সেই পরম আদরের ক্ষুদ্র রত্নটি কোথায়? কুমার কুমারকেতুকে কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ?"

রাণী উত্তর দিবার জন্য ওষ্ঠকম্পিত করিতেছিলেন, তাঁহার কথা ফুটিবার পূর্ব্বেই ছদ্মবেশী রাজকুমার শীঘ্র শীঘ্র বলিলেন, "এইখানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। অবকাশ প্রতীক্ষা কর। অগ্রে তোমাদের রাজবাড়ীর বিচার শেষ হইতে দাও।"

সখীরা তখন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। এইরূপ পুনর্ম্মিলনে যেরূপ আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, সেই গৃহে তখন সেইরূপ বিমল স্রোত বহিতে লাগিল।

ষষ্ঠ কাণ্ড।

চন্দ্রোদয়—পাপীর প্রায়শ্চিত্ত।

প্রচলিত নাট্যসমাজে এখন তিন প্রকার নাটকের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এক প্রকার মিলনান্ত, এক প্রকার বিয়োগান্ত, এক প্রকার হর্ষবিয়োগান্ত। এ নাটকের এই পঞ্চাঙ্ক। এ অঙ্কে হর্ষ বিয়োগের অভিনয় হইবে!

একদিন প্রভাতকাল, নির্ম্মেঘ গগনে সূর্য্যদেব সমুদিত হইয়া ধরাধামের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতিদেবীকে হাস্যমুখী করিয়াছেন, রাজা সূর্য্যকেতু পাত্র-মিত্র লইয়া আপন প্রাসাদে সভা করিয়া বসিয়াছেন, এমন সময় সেই সভায় এক সন্ন্যাসী আসিয়া করপুটে নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিলেন।

সন্ন্যাসীর মস্তকে জটাভার, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু।

সন্ন্যাসীদর্শনে সিংহাসন হইতে নামিয়া, রাজা তাঁহাকে প্রণিপাত করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, দণ্ডকমণ্ডলু ভূমে রাখিয়া, রাজার যুগল হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া, ঊর্দ্ধমুখে সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! ভগবান নারায়ণ এ রাজ্যের মঙ্গল করুন!"

প্রণাম করিতে না পারিয়া গদ্‌গদবচনে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভো! কি অভিপ্রায়ে অদ্য এ স্থানে আগমন?"—সন্ন্যাসী বলিলেন, "একটি প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য। প্রশ্ন এই যে, আপনার রাজ্যে সুবিচার আছে কি না?"

চমকিত হইয়া রাজা কহিলেন, "এরূপ প্রশ্নের হেতু কি? পুরুষানুক্রমে এই বংশে রাজা হইয়া আসিতেছে, সকলেই বিচার করিয়া গিয়াছেন, ভাগ্যক্রমে আমার প্রতি এখন রাজ্যভার অর্পিত হইয়াছে, রাজা হইলেই বিচার করিতে হয়, সাধ্যানুসারে আমিও বিচারকার্য্য সম্পাদন করিতেছি, এরূপ স্থলে ঐরূপ প্রশ্ন আনা—"

সন্ন্যাসী।—বিচারে সুবিচার অবিচার দুই থাকে, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সুবিচার আছে কি না?

রাজা।—বহু বিচারের মধ্যে কোনটিতে অবিচার হইয়াছে, তাহা কি প্রকারে নিরূপণ করিব?

সন্ন্যাসী।—নিরূপণ করিতে আপনি অক্ষম, উত্তম একটি দৃষ্টান্ত আমি দেখাইব। যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য উত্তর দিবেন। প্রথম প্রশ্ন—মহারাজের কয় বিবাহ?

রাজা।—দুই।

সন্ন্যাসী।—দুটি রাণীই বর্ত্তমান?

রাজা।—না, দ্বিতীয়া রাণী এক্ষণে আমার পট্টমহিষী।

সন্ন্যাসী।—প্রথমা মহিষী জীবীতা থাকিতে দ্বিতীয়া পত্নী পট্টমহিষী হয় না। প্রথমা মহিষী কি লোকান্তর গমন করিয়াছেন?

রাজা।—না, সেই পাপিয়সী আমার জীবন হনন করিতে আসিয়াছিল, সেই মহাপাপে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

"আপনি কি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, না কাহার মুখে শুনিয়াছিলেন?"

রাজা।—স্বচক্ষে একটা ছায়া দেখিয়াছিলাম, ঘরের ভিতর খড়্গ দেখিয়াছিলাম, তাহার পর ছোট রাণীর মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়াছি।

সন্ন্যাসী।—বিশ্বাস হইয়াছিল ?

রাজা।—বাজে লোকের কথা হইলে বোধ হয় বিশ্বাস হইত না। ছোটরাণী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার সখীরাও সাক্ষ্য দিয়াছিল।

সন্ন্যাসী।—এখন যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, সেই সখীরা এখনও সেইরূপ সাক্ষ্য দিবে ?

রাজা।—তাহারা পলাইয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী।—রাজরাণীর সখীরা পলায়ন করিতে পারে না। মহারাজের সভাভঙ্গ হইবার অগ্রেই তাহারা অন্তঃপুরে উপস্থিত থাকিবে। আমিও কিঞ্চিৎ বিলম্বে পুনর্ব্বার মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

স্বস্তি বাচনের সহিত এইরূপ আভাষ দিয়াই সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। কোথায় গেলেন, কি কার্য্য করিলেন, কাহাকে কি বলিলেন, রাজা তাহা জানিলেন না, সভাভঙ্গের পূর্ব্বেই সন্ন্যাসী দ্বিতীয়বার সভামধ্যে দর্শন দিলেন। অব্যবহিত পরেই সভাভঙ্গ হইল। সন্ন্যাসীকে সম্ভাষণ করিয়া রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে যান, নারায়ণ স্মরণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "মহারাজ! আমিও একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করি ; রাজদর্শন হইল, রাজ্ঞী দর্শনে অভিলাষ।"

সন্ন্যাসীকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইতে রাজার আপত্তি হইল না, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে বুড়ীর সহিত সেই দুটি সখী ছোট রাণীর গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, রাণী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অষ্টাহ তোমরা কোথায় ছিলে ? সখীরা উত্তর দিয়াছিল, দেবদর্শনে গিয়াছিলাম। একটি দেবী আর একটী দেবকুমারী আসিয়াছেন, এই অষ্টাহ কাল আমরা তাঁহাদের সেবা করিয়াছি।"

সন্ন্যাসীর সহিত গৃহে প্রবেশ করিয়াই রাণীর সম্মুখে রাজা বিস্মিত নয়নে সেই তিনটি সখীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কোন কথা বলিবার অগ্রেই সখীত্রয়কে সম্বোধন করিয়া সন্ন্যাসী সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা সত্য কথার মহিমা জান ? সত্য সনাতন পরমেশ্বর সত্য কথায় পরম সন্তুষ্ট। তোমাদের মহারাজ আমাকে একটি মর্ম্মভেদী কথা

বলিয়াছেন। তোমাদের বড় রাণী পতিহন্তা হইতে গিয়াছিলেন, তোমরা তাহা চক্ষে দেখিয়াছিলে, এ কথা কি সত্য ?"

ছোট রাণীর মুখ শুকাইয়া গেল। বুড়ীটি চুপ করিয়া রহিল। ছোট রাণীর সখী দুটি একবাক্যে কহিল, "ছোটরাণী যাহা বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আমরা বলিয়াছিলাম।" এই কথা বলিয়া সখীরা ইত্যগ্রে বাসাবাড়ীতে কুমারকেতুর নিকটে যাহা যাহা বলিয়াছিল, রাজার সাক্ষাতে অবিকল তাহাই ব্যক্ত করিল।

রাজার মাথা ঘুরিয়া গেল। শুষ্ককণ্ঠে ছোটরাণী বলিয়া উঠিলেন, "মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা! বিশ্বাসঘাতিনী!"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "বিশ্বাসঘাতিনী নহে, ইহারাই সত্যবাদিনী। রাণী মা! তুমিও ইহাদের মত সত্যবাদিনী হও, ইহকাল নষ্ট হইয়াছে, পরকালে তোমার মঙ্গল হইবে।"

রাণীর সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল। পাপকার্য্য হৃদয় মধ্যে জাগিতেছিল, নূতন হইয়া যেন নেত্রপথে দেখা দিল, ঢলিয়া ঢলিয়া তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন, বাহু বিস্তার করিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে ধরিলেন, সান্ত্বনা করিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, "কেন মা অধীরা হও, সত্য কথা বল, পরকালে মঙ্গল হইবে। বড় রাণী কিছুই জানিতেন না, সমস্তই তুমি জান, হৃদয়ে বিষপোষণ করিয়া চিরজীবন কেন জর্জ্জরিত হইবে, কেন অনন্তকাল ঘোর অন্ধকার নরককুণ্ডে ডুবিয়া থাকিবে, সত্য কথা বল, মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, পরিণামে পরিত্রাণ পাইবে, নতুবা নিস্তার নাই।"

নিরুপায় হইয়া পাপিনী ছোটরাণী শুষ্কনয়নে চাহিতে চাহিতে কম্পিতকণ্ঠে সমস্ত সত্য স্বীকার করিলেন, শিরে করাঘাত করিয়া রাজা হাহাকার রব করিয়া উঠিলেন, চক্ষের জলে দশদিক অন্ধকার দেখিয়া সন্ন্যাসীকে কাতর কণ্ঠে সুধাইলেন, "দেব! দয়া করুন, দয়া করুন। হায় হায়! কোথায় আমার মহিষী! কোথায় আমার প্রাণাধিক পুষ্পকেতু! কোথায় আমার স্নেহপুত্তলি কুমারকেতু!"

প্রফুল্লবদনে সন্ন্যাসী কহিলেন, "রোদন বিফল! রোদনে জ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। মহারাজের জ্ঞানকৃত পাপ কি না, চিন্তা করুন। সভামধ্যে প্রথমেই আমি প্রশ্ন করিয়াছিলাম, মহারাজের রাজ্যে সুবিচার

আছে কি না? মহারাজ সে প্রশ্নের সদুত্তর দানে অক্ষম হইয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন, সুবিচার নাই। বিনাদোষে সপুত্র নিরপরাধিনী রাণীকে বনবাসিনী করিয়াছিলেন। কাতর হইবেন না, তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন, জগদীশ রক্ষা করিয়াছেন, এই রাজ্য মধ্যেই এখন তাঁহারা উপস্থিত।"

নিস্পন্দ শরীরে নিস্পন্দ নয়নে রাজা সূর্য্যকেতু সন্ন্যাসীর বস্ত্রাচ্ছাদিত চন্দ্রবদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, সন্ন্যাসীর ইঙ্গিতে একটি সখী সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গিয়া অনতিবিলম্বে জননীর সহিত পুষ্পকেতুকে রাজ সমীপে আনয়ন করিল। শূন্য গৃহে চন্দ্রোদয়। শত শত অপরাধ স্বীকার করিয়া অনুতপ্ত রাজা তখন পতিব্রতা মহিষীর নিকটে ক্ষমা চাহিলেন, পুষ্পকেতু পিতৃচরণে প্রণিপাত করিলেন, মহিষী কাঁদিতে লাগিলেন। পাপীয়সী ছোটরাণী যেন জ্ঞানশূন্য নিশ্চেষ্ট, সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাজা সাশ্রুনয়নে সন্ন্যাসীকে কহিলেন, "আপনার প্রসাদে আমার মোহ ঘুচিল, হারানিধি প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু ভগবান, আমার কনিষ্ঠ কুমার স্নেহাধার কুমারকেতু কোথায়?"

কিছুমাত্র উত্তর না দিয়াই সন্ন্যাসী দ্রুতপদবিক্ষেপে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, কৃত্রিম জটা শ্মশ্রু খুলিয়া ফেলিয়া, ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অঙ্গের বিভূতি ভস্ম প্রক্ষালন করিয়া, নবীন কুমারবেশে পরক্ষণেই পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক ভক্তিভাবে পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন, অন্ধকার রাজপুরী মধ্যে এককালে তিনটি পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। সে সময়ের নির্ব্বাক আনন্দ ক্ষুদ্র লেখনীমুখে অবর্ণনীয়।

এইবার ছোটরাণীর প্রায়শ্চিত্ত। তরবারি নিস্কাসিত করিয়া রাজা সেই মুহূর্ত্তে ছোটরাণীর মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, পুণ্যবতী বড়রাণী রাজার হস্তধারণ পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া, মিনতি করিয়া কহিলেন, "স্ত্রীহত্যা করিবেন না, স্ত্রীহত্যা করিবেন না মহারাজ! ভাগ্যে ছিল, তাই আমরা কষ্ট পাইয়াছি, সেজন্য স্ত্রী হত্যা করিয়া রাজহস্ত কলঙ্কিত করিবেন না, আপনার চরণে আমি সতীনী ভগ্নীর জীবন ভিক্ষা চাই।"

পতি সদয় হইয়া প্রতিপ্রাণা সতীর বাক্য রক্ষা করিলেন, ছোটরাণীর মাথা কাটিলেন না। মাথা মুড়াইয়া রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন। এইখানেই এই নাটকের যবনিকা পতন।

যিনি সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন, তিনিই কনিষ্ঠ কুমার কুমারকেতু, শ্বেত

হস্তী তাঁহাকে অন্য রাজ্যের রাজা করিয়াছে, রাজা সূর্য্যকেতু সে পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন, বনবাসে তাঁহাদের যত কষ্ট হইয়াছিল, তাহাও শুনিলেন, অনুতাপে ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, হায় হায় করিতে লাগিলেন। দুঃশীলা সপত্নীরা সুখের সংসারে কিরূপ ভয়ঙ্কর গরল উৎপাদন করিতে পারে, রাজা তখন তাহাও বুঝিলেন। রামায়ণের কৈকয়ী রাজা দশরথের নিকটে দুইটি বর প্রার্থনা করিয়া রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনচারি করিয়াছিলেন, রাজা সূর্য্যকেতুর কনিষ্ঠা পত্নী সেই কৈকয়ী অপেক্ষাও সহস্রগুণে ভয়ঙ্করী সপত্নী।

আর একটি পরিচয় বাকি। চাঁপাগাছে কুমারকেতুকে দেখিয়া ব্রহ্ম-দৈত্যজ্ঞানে যে বুড়ী ভয় পাইয়াছিল, সেই বুড়ী এই পুণ্যশীলা বড়রাণীর সেই প্রবীণা সহচরী কর্পূরা। এক্ষণে সমস্ত অন্ধকার দূর হইল, নাটকের শেষ অঙ্কে এই পরম সুখের পুনর্ম্মিলন। কিছুদিন পরে, পিতৃরাজ্যে বাস করিয়া, কুমার কুমারকেতু আপনার নবরাজ্যে গমন করিলেন, উপযুক্ত অবসরে রাজা সূর্য্যকেতু জ্যেষ্ঠ কুমার পুষ্পকেতুকে রাজ্য দান করিয়া মহিষীর সহিত পরমার্থ চিন্তায় অরণ্যবাসী হইলেন।

সমাপ্ত।

"শিবাখ্যা-কিঙ্কর"।

(কাব্য।)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীধর্ম্মদেব কর্ত্তৃক মহামায়ার স্তব।

অবস্থা বিশেষে রবির কিরণ
যেমন সকলে প্রকাশ পায়।
তেমতি তোমার বিমল কিরণ
করে না বঞ্চনা কভু কাহায়॥
তোমা চেয়ে আর, কেহ আপনার,
নাহিক জীবের ধরণীতলে।

প্রাণের যাতনা, প্রাণের বেদনা,
প্রাণ খুলি কথা তোমারে বলে॥
কেন না বলিবে, জনক জননী,
বনিতা দুহিতা কিছুতো নয়।
জীবন অবধি, সম্বন্ধ এদের,
মরণের পর কে আর হয়॥
যাইবে তোমাতে, রহেছে তোমাতে,
তোমা হ'তে মাতঃ এসেছে সবে।
এমন যে জন, মরম-বেদন,
না বলি তোমারে কাহারে কবে॥
বায়ুর সমান, তব অবস্থান,
নয়নগোচর সহজে নও।
স্থিতি অবগতি, অনুমানে হয়,
করম কারণে প্রকাশ হও॥
কহে বুধগণ, বড় লোক মেয়ে,
তব দরশন বিষম ভার।
তব আবরণ, অতি গুরুতর,
ছেলে দেখা নাহি পায় তোমার॥
মহামায়ে তব, রূপ অপরূপ,
কিরূপ স্বরূপ কেহ না জানে।
কখনো বালিকা, কখনো যুবতী,
কাঁপাও আতঙ্কে অসুর প্রাণে॥
কখনো ব্রাহ্মণ, কাঁদে উতবীয়,
হেঁটমুখে দ্রুত যজনে যাও।
পূজোপকরণ, করিয়া স্মরণ,
কভু সুখ কভু দুখ বা পাও॥
কখনো গণক, পাঁজি বাম হাতে,
প্রণঃ গণপদে করি প্রণাম।
উদাস হইয়া, চল মহামায়ে,
ভাবি বুঝি বিধি হইবে বাম॥

কভু বৈদ্য তুমি, লইয়া ঔষধ,
ধীরে ধীরে দেবি কর গমন।
রোগের বিচার, করি মনে মনে,
দক্ষিণা ধ্যানেতে হও মগন॥
কভু কুম্ভকার, হেলাইয়া কাঁদ,
কুঁজা হয়ে তুমি হাটেতে যাও।
হাঁড়ির বাজরা, চলে আগে পাছে,
মনে আঁচ দর পথে নাহি চাও॥
কভু তন্তুবায়, বগলে বসন,
চিতাইয়া বুক কর গমন।
বেচিয়া কি পাবে, কি কিনিবে তাহে,
ভাবিয়া না আগে চলে চরণ॥
কভু কাঠুরিয়া, কঠিন কোমরে,
ডান হাত নাড়ি হাটেতে যাও।
ক্ষৌর করমে, কভু হও ব্রতী,
লোকমুখপানে সতত চাও॥
কে বলিবে ভবে, কত রূপ তব,
রূপ নিরূপণ করা যে ভার।
সকলের মন, মুরতি আঁকিবে,
এ হেন ক্ষমতা আছে বা কার॥
সলিল হইতে, উঠে বুদ্‌বুদ,
সলিলেই পুন বিলয় পায়।
মানুষ কেবল, রূপ ভেদ তব,
তোমা হ'তে হয় তোমাতে যায়॥
পদার্থ বিশেষে, রবির কিরণ,
বিভিন্ন রঙ্গেতে প্রকাশ হয়।
মানস বিশেষে, তেমতি তোমার,
স্থিতি সুপ্রকাশ বিশেষ ময়॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ধুতুরার ফুল।

(১)

কি এক অজ্ঞাত দেশ
প্রথম কি এই শেষ—
চলে যায় সেইখানে—আসে না ত ফিরে,
যে যায় সে নাহি আসে—
সে দেশ কি ও আকাশে—
সে দেশ কি ওই ভায় মরণের তীরে ?

(২)

শুনিয়াছি সব যায়—
সব যায় যে তথায়—
কোথায় এমন স্থান প্রহেলিকাময়—
মমতায় দিয়ে ছাই—
যায় আর দেখা নাই—
এমন সুন্দর স্থান—কোথা দয়াময়।

(৩)

রাজা প্রজা অতি দীন
সেথা কি সম্বন্ধহীন
একত্রে আবাসে সেথা তেয়াগি বিচার,
সেথায় কি শয়তান
রাজাসনে পায় স্থান
পাপী তরে এত দয়া আছে কি তাঁহার !

(৪)

তাই যেন মনে হয়—
এ ধরায় ধরা নয়—
সেথা যে পড়িবে ধরা—সেই ধরা—ধরা,
সেথা ধরা হাতে নাতে
আর কোথা লাজ তা'তে
নগ্ন মন নগ্ন প্রাণ—দিগ্‌বাস পরা !

(৫)

দেবচর্ম্ম সুশোভনে
হেথা যত দৈত্যগণে—
দেখায় ধর্ম্মের ভান লোকের লোচনে,
কিন্তু সে বিষম ঠাঁই
সেথা সুপারিস নাই
নহে কৃমি পূজ্য সেথা নব আবরণে !

(৬)

হায় কি সুন্দর দেশ
দেবে নরে সমাবেশ—
সেই দেশ কার তরে মহার্ঘ এমন,
নিজ মণি শিরে রাখি
গোময়ে লুকায়ে থাকি
যে পারে যাইতে তথা সেই মহাজন !

(৭)

অন্ধ-অন্ধকারময়
সে দেশের পথ হয়
তার তরে রাজবর্ত্ম ত্রিদিব সোপান,
বাধা নাহি বিঘ্ন নাহি
নাহি তার ত্রাহি ত্রাহি—
আপনি আপন পথে চলে পূর্ণ প্রাণ !

(৮)

সে আছিল গো আমায়—
হায় হায় আমি তায়
যাবার সময়ে তারে দিতে গো পাথেয়,
জীবনের যা সম্বল
চোখে ক'রে এনে জল
বলি ধর ধর সখা কবো না'ক হেয় !

(৯)

বলিল সে সে কথায়—
কাজ নাই আর হায়—

আছি আমি যেই দেশে এসো সখা এসো,
যতদিন রহে প্রাণ—
করো অশ্রুবিন্দু দান
চিতায় আমার বঁধু—বেসো ভালবেসো।

(১০)

এই আমি চলে যাই—
বাঁশীটি আমার ভাই—
যতন করিয়ে সখা রেখো তুলে রেখো,
ক্ষম সখা মোরে ক্ষম
অধরের সুধা মম
লেগে আছে বাঁশরীতে—মুছনা তা দেখো।

(১১)

যদি পার—রেখো মনে
মনে করো শুভক্ষণে
সে সুধার মুখ সুধা মিলাইয়ে থেকো,
আর যদি মনে হয়
হয় যদি সুসময়
বঁধু বলে সে বাঁশীতে ডেকো মোরে ডেকো।

(১২)

কলঙ্কী চাঁদের নীচে
মিছা দেহে থাকি মিছে
দিনকত কিছু আলো সকলি আঁধারে,
থাক তুমি ভয় নাই
ডেকে নেবো আমি ভাই
মাটির ধরায় সুখ থাক ভুঞ্জিবারে।

(১৩)

সেই নৈশ সমীরণে—
শুদ্ধ হিমাংশু কিরণে—
সেই সে চিতার পরে—গঙ্গাতট তলে,

মোরে ধিরে সাধ হায়—
ঢালিবে ও হেন কায়—
সেই দিন দেখা দেব সপ্তর্ষিমণ্ডলে।

(১৪)

শশী সুধা ছাঁকি হায়—
অশনি মিশায়ে তায়—
মধুর নির্ঘোষে আমি ডাকিব তোমায়,
"এসো এসো বঁধু এসো"
"আধ আঁচরে বসো"
নয়নের মণি—আর কেন ও ধরায়!

(১৫)

হর সখা আঁখি খুলে
মায়ার ঘোমটা তুলে
তোমা তরে হায় আমি দুয়ারে
ত্বরায় ত্বরায় চলে
এসো বঁধু এসো কোলে
মিলিয়ে মিশাই এসো বধু কায়ে কায়ে।

(১৬)

যতদিন বিশ্ব রয়—
এই প্রেম লোকময়—
ছড়াব দোঁহায়—যায় হবে না ক ভুল,
তুমি আমি ও শ্মশানে
মিলে দুটি প্রাণে প্রাণে—
ফুটে রব পূত শুভ্র ধুতুরার ফুল!

শ্রীদেবকণ্ঠ বাগ্‌চী।

সমালোচনা।

বায়ু।—শ্রীযুক্ত ডাক্তার চুণীলাল বসু মহাশয়ের রচিত, "সাহিত্য-সভায়" পঠিত একটি প্রবন্ধ। এই পুস্তকে সেই প্রবন্ধের সমাবেশ। বায়ু কি? বায়ুর উপাদান, বায়ুর কার্য্য, বিশুদ্ধ বায়ু, দূষিত বায়ু, গৃহনির্ম্মাণের কুপ্রণালী, বহুজনাকীর্ণ কবিযাত্রার আসরে বহুলোকের সঙ্গীত, বায়ু দূষিত হইবার কারণের মধ্যে শেষের দুটি কথার যোগ আছে, বায়ু দূষিত হয় কেন, দূষিত হইলে শোধনের উপায় কি, তাহাও এই প্রবন্ধে নিবদ্ধ আছে। এখানি বিজ্ঞানের রসায়ন তত্ত্বের একাঙ্গ। গ্রন্থকার কে? সে পরিচয় পাইলে পাঠক মহাশয়েরা বর্ণিত বিষয়ের সত্য উপযোগীতা শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। গ্রন্থকার আমাদিগের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের রসায়ন পরীক্ষক,—মেডিকেল কলেজের রসায়ন অধ্যাপক, শিয়ালদহ ক্যাম্বেল স্কুলের রসায়ন শিক্ষক রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু এম, বি, বাহাদুর। চুণী-বাবুর "জল" যেমন মলেত সম্প্রদায়ের আদরের জিনিষ হইয়াছে, এই "বায়ু"ও সেইরূপ সে ক্ষেত সম্প্রদায়ের অনেক উপকারে আসিবে, এবং ইংরাজি অনভিজ্ঞ বহুলক্ষ লোকেরও উপকারে আসিবে। কারণ বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক বিরল; চুণীবাবুর দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক মঙ্গল হইতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। "বায়ু" সরল এবং সুললিত ভাষায় লিখিত। পাঠ করিয়া আমরা পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম। "বায়ুর" মূল্য ॥০ আট আনা।

জয়কৃষ্ণ চরিত।—উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ মুখোপাধ্যায় বংশীয় আদর্শ ভূম্যধিকারী জয়কৃষ্ণ বাবুর জীবনী। শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা। বাবু অম্বিকাচরণ এই পুস্তকে জয়কৃষ্ণ বাবুর অনেকগুলি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। জমিদারীর উন্নতি সাধনে ও প্রজাপুঞ্জের শিক্ষাবিস্তারে তিনি সবিশেষ যত্নবান ছিলেন, জীবনচরিত-লেখক জয়কৃষ্ণ চরিতকে দোষশূন্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বলিয়াছেন, গুণদোষের তুলনায় দোষের ভাগ অল্প। বঙ্গের জমিদার-সন্তানগণকে আমরা এই জীবনচরিতখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। জয়কৃষ্ণ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন, এবং পৌত্র রাসবিহারী বাবু শিবনারায়ণ বাবু বঙ্গ-সাহিত্যের ভূষণ ও হিতানুরাগী বন্ধু।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

দ্বাদশ বর্ষ। } অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সাল। { ৫ম সংখ্যা।

মৃত্যুর পর।

মৃত্যুর পর মনুষ্যের কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, দেখা যাউক। প্রথমতঃ, তাহার অন্নময় কোষের ধ্বংশ হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, অন্নময় কোষ বা স্থূল ঘনীভূত শরীর অসংখ্য জীবন্ত 'সেলের' (cells) দ্বারা গঠিত। 'সেল্ সকলকে' পৃথক্‌ভাবে ধরিতে গেলে, উহাদের মৃত্যু বা ধ্বংশ হয় না, উহারা মৃত্যুর পূর্ব্বে যেরূপ জীবন্ত ছিল, মৃত্যুর পরেও সেইরূপ জীবন্ত থাকে; কিন্তু উহাদিগকে সমষ্টিভাবে ধরিলে, ঐ শরীরের মৃত্যু হইয়াছে, এইরূপ বলা হয়।

অন্নময় কোষ হইতে বাহির হইয়া জীব কিছুকালের জন্য প্রাণময় কোষে অবস্থান করেন। প্রাণময় কোষকে ইথিরীয় দ্বৈতশরীর বা পিণ্ড শরীর বলে। ইহা ইথারের দ্বারা গঠিত। অধ্যাত্ম-তত্ত্ববিদেরা অবগত অছেন যে, এই ইথিরীয় শরীর, স্থূলশরীরের সহিত একটী অতি সূক্ষ্ম সংযোগ-সূত্র দ্বারা সংযুক্ত থাকে। যদি মৃত স্থূলশরীরকে অগ্নি দ্বারা সৎকার করা না হয়, তাহা হইলে এই সূক্ষ্ম সূত্র মৃত্যুর পর ৩৬ ঘণ্টা বর্ত্তমান থাকে। তৎপরে ঐ সূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং স্থূল জগতের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, এইজন্য হিন্দু-ঋষিরা মৃত্যুর পর মৃতদেহের নাতি-বিলম্বে অগ্নি সৎকারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। যাঁহারা অতীন্দ্রিয়-দর্শী, তাঁহারা বলেন যে, স্থূলশরীর মৃত হইলে উহা হইতে ভায়োলেট বর্ণের কুজ্ঝটিকার ন্যায় পদার্থ নির্গত হইয়া

থাকে। এই কুজ্ঝটিকা অতি শীঘ্র একটী আকৃতি ধারণ করে। ইহাই প্রাণময় কোষ।

আত্মা যেমন স্থূলশরীর ত্যাগ করিয়াছেন, সেইরূপ এই সূক্ষ্ম প্রাণময় কোষও ত্যাগ করেন। ইহা তখন মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। প্রাণশক্তি এই শরীরের সাহায্যে কার্য্য করে বলিয়া, ইহার নাম প্রাণময় কোষ। চৌম্বক, বৈদ্যুতিক প্রভৃতি শক্তি প্রাণশক্তির অংশ বিশেষ মাত্র। আত্মা প্রাণময় কোষ ত্যাগ করিলে প্রাণশক্তির বিকাশ আর হয় না।

মনুষ্য উক্ত দুই শরীরের সাহায্যে ভূর্লোকে কার্য্য করিয়া থাকেন। তৎপরে তিনি ভুবর্লোকে বা অন্তরীক্ষলোকে গমন করেন। এই লোককে কামলোকও বলা হয়। ভুবর্লোক বা কামলোকের যে ভাগে মনুষ্য বাস করে, তাহার দুইটী অংশ আছে,—প্রথম অংশটীকে প্রেতলোক এবং দ্বিতীয় অংশটীকে পিতৃলোক বলা হয়। মনু বলিয়াছেন যে,—

"যস্ত্বাচরতি ধর্ম্মং স প্রায়শোঽধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈরেব চাঁবৃতো ভূতৈঃ স্বর্গে সুখমুপাশ্নুতে॥
যদি তু প্রায়শোঽধর্ম্মং সেবতে ধর্ম্মমল্পশঃ।
তৈর্ভূতৈঃ স পরিত্যক্তো যামীঃ প্রাপ্নোতি যাতনাঃ॥"

(মনুসংহিতা, ১২—২০, ২১।)

অর্থাৎ জীব যদি অধিকাংশ ধর্ম্ম ও অল্প অধর্ম্ম করেন, তবে পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূত দ্বারা শরীরী হইয়া তিনি পরলোকে সুখভোগ করিতে থাকেন। আর যদি তাঁহার অধর্ম্ম অধিক ও ধর্ম্মের ভাগ অল্প থাকে, তাহা হইলে ঐ রূপ ভূতাংশ দ্বারা তাহার দেহ গঠিত না হইয়া, যাহাতে সে যম-যাতনা ভোগ করে, এইরূপ একটী দেহপ্রাপ্ত হয়।

মনু এই দুই শরীরের দ্বারা মনোময় কোষের দুইটী অংশকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মনোময় কোষের প্রথম অংশটী পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম ভূতের স্থূল উপকরণে নির্ম্মিত; ইহাকে কামলোকীয় শরীর বলে। এই শরীরে জীবকামনা সমূহ অবস্থান করে এবং এই শরীরের দ্বারা জীব ভুবর্লোকে কার্য্য করিয়া থাকেন। এই দেহের দ্বারা মনুষ্য যমযাতনা ভোগ করেন। যাহারা দুষ্কৃতিকারী, তাহারা এই যাতনাময় দেহে আবদ্ধ থাকিয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু যাহারা দুষ্কৃতিকারী নহে, তাহারা

মনোময় কোষের সূক্ষ্ম অংশ ধারণ করিয়া স্বর্গভোগ করেন; এই সূক্ষ্ম অংশে রাগাদি (emotions) ও চিন্তাদি অবস্থিতি করে।

কামনা বা ভুবর্লোকীয় শরীর আবার বিভিন্ন প্রকার গুরুত্ববিশিষ্ট সূক্ষ্ম পদার্থের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। যে সকল সূক্ষ্ম পদার্থের গুরুত্ব অধিক, তাহারা কামনা শরীরের বাহ্যিক কোষ (cell) প্রস্তুত করে, তদপেক্ষা গুরুত্বহীন পদার্থ উক্ত বাহিরের কোষের ভিতরে আর একটী কোষ প্রস্তুত করে। এইরূপে গুরুত্ব অনুসারে কামলোকীয় শরীরের কোষ সকল (cells) প্রস্তুত হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত উন্নতি হইতে থাকে, তত এই কোষ সকল খসিয়া যায়। মনুষ্যের মৃত্যুর পর যতদিন না সংজ্ঞা-লাভ হয়, ততদিন সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অবস্থায় কাটিয়া যায়। যাহারা দুষ্কৃতিকারী, তাহারা শীঘ্র চেতনালাভ করে এবং উক্ত প্রকার কোষবিশিষ্ট ভুবর্লোকীয় শরীরের দ্বারা যমযন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু যাহারা দুষ্কৃতি-কারী নহে, তাহারা সুখময় স্বপ্নবৎ অবস্থায় মৃত্যুর পর সময় কাটাইয়া থাকে। তাহারা যখন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তখন আপনাদিগকে স্বর্গলোকে দেখিতে পায়। এই অজ্ঞানের অবস্থায় তাহাদিগের ভুবর্লোকীয় শরীর ত্যাগ হইয়া থাকে।

মনুষ্যের যেমন পার্থিব মৃত্যু হয়, সেইরূপ কামলোকেও তাহার কাম-লোকীয় মৃত্যু হইয়া থাকে। অর্থাৎ কামলোকে কামনাময় শরীর ত্যাগ করিয়া মনুষ্য উচ্চতর দেবলোকে বা স্বর্গলোকে প্রস্থান করিয়া থাকে। পৃথিবীর সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধাদি দ্বারা মনুষ্য কামলোকে বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু দেবলোকে পার্থিব আকর্ষণের শক্তি পঁহুছিতে পারে না। কামলোকে মনুষ্য যে সকল কোষ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা অনেক সময় মনুষ্যের ক্ষতি করিয়া থাকে। অর্দ্ধ সংবিৎবিশিষ্ট সত্তা সকল (elementals) এই পরিত্যক্ত কোষ সকল গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা ঐ সকল কোষ পরিত্যক্ত জীবের কার্য্য বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে।

মনুষ্যের কর্ম্মফল অনুসারে মনুষ্য অল্প বা অধিককাল কামলোকে ও দেবলোকে বাস করে। মনু বলিয়াছেন যে, মনুষ্যের এক মাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিন ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে দেবতাদিগের এক দিন-রাত্রি হয়।

উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন ও দক্ষিণায়ণ তাঁহাদের রাত্রি। (মনুসংহিতা, ১—৬৬, ৬৭)। এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, এক জন্ম হইতে অপর জন্ম গ্রহণের ভিতর মনুষ্যের সাধারণতঃ ১৫০০ বৎসর অতীত হইয়া থাকে।

ভুবর্ল্লোক হইতে মনুষ্য দেবলোকে প্রস্থান করিয়া থাকে। ভুবর্ল্লোকে মনুষ্যের যেরূপ মৃত্যু হয়, কর্ম্মাবসানে স্বর্গলোকেও মনুষ্যের সেইরূপ মৃত্যু, অর্থাৎ মনোময় কোষ ত্যাগ হইয়া থাকে। মনুষ্য তখন বিজ্ঞানময় শরীরে অর্থাৎ কারণ শরীরে অবস্থান করে। বিজ্ঞানময় শরীরে মনুষ্য মহর্ল্লোকে উপস্থিত হয়। অন্যান্য শরীর অপেক্ষা বিজ্ঞানময় শরীর অধিককাল স্থায়ী এবং জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ইহা বর্ত্তমান থাকে।

সুতরাং মৃত্যুর পর মনুষ্য প্রাণময় কোষের সাহায্যে সূক্ষ্ম শরীরকে স্থূল-শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া থাকে। স্থূলশরীর তখন মৃতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। মৃতশরীরে 'প্রাণ থাকে না,' কিন্তু অসংখ্য জীবন্ত 'সেল্' বর্ত্তমান থাকে। ইহারা ক্রমশঃ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। জীব তৎপরে অতি শীঘ্র প্রাণময় কোষ ত্যাগ করে এবং মনোময় কোষের স্থূল অংশকে তাহার বাহ্যিক আবরণরূপে ধারণ করে। তখন জীবকে প্রেত বলা হয় এবং জীব তখন প্রেতলোকে বাস করিতে থাকে। পার্থিব জীবনে জীব যদি সুকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহা হইলে এই অবস্থায় সুখের স্বপ্নের ন্যায় কাটাইয়া থাকে; কিন্তু যদি সে দুষ্কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রেত হইয়া যাতনা ভোগ করিতে থাকে এবং যে পার্থিব আমোদ আর উপভোগ করিবার আশা নাই, এইরূপ পার্থিব আমোদ উপভোগের জন্য ছট্ ফট্ করিতে থাকে। উক্ত উপভোগের বাসনা যত প্রবল হয়, তত বেশীদিন তাহাকে প্রেতলোকে থাকিতে হয়, কারণ ভোগের দ্বারা বাসনা ক্ষয় করা ভিন্ন ক্ষয়ের আর অন্য উপায় নাই। তৎপরে মনোময় কোষের স্থূল অংশ ত্যাগ হয় এবং মনুষ্য পিতৃলোকে প্রস্থান করিয়া থাকে। স্বর্গের অনুপযোগী অংশ সকল ত্যাগ করিতে যতদিন সময় লাগে, ততদিন মনুষ্য পিতৃলোকে থাকে। তৎপরে মনুষ্য পবিত্র মনোময় কোষ লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করে এবং তখন সুকর্ম্মের সুফল ভোগ করিতে থাকে।

যখন এই ফলভোগ শেষ হইয়া যায়, তখন পৃথিবীতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় নিকটবর্ত্তী হয় এবং পবিত্র মনোময় কোষ তখন চ্যুত হয় এবং

জীব তখন বিজ্ঞানময় কোষে অবস্থান করে। তৎপরে অতি শীঘ্র জীব নূতন আবরণ ধারণ করিবার জন্য শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে এবং পার্থিব জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য জীব একটী নূতন মনোময় কোষ ধারণ করিয়া থাকে। জীবের কর্ম্মফলানুসারে দেবতারা তাহার জন্য একটী প্রাণময় ও একটী অন্নময় কোষ প্রস্তুত করিয়া থাকেন এবং পরে মনুষ্য এই সকল আবরণ লইয়া ভূর্ল্লোকে জন্মগ্রহণ করে।

এইরূপে মনুষ্যের দৃশ্যজগতে স্থিতি, মৃত্যু, অদৃশ্য জগতে স্থিতি এবং পুনর্জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। এই প্রকারে জন্মচক্র অসংখ্যবার আবর্ত্তিত হইতেছে। অবশেষে জীব উক্ত তিনলোকে অবস্থান করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া থাকেন। তখন তিনি উচ্চ, সূক্ষ্ম এবং বিস্তৃত জীবনের জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকেন; তাঁহার তখন মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি তখন ভগবানের পূজা করিতে, মন স্থির বা যোগ অভ্যাস করিতে রত হন এবং দুর্ব্বলের সাহায্য করিতে উৎসুক হইয়া থাকেন। তখন বাহ্যিক আবরণের দ্বারা তিনি নিজের সুখ খুঁজিয়া বেড়ান না, পরন্তু পরের উপকার করিতে থাকেন এবং এই প্রকারে শরীর সকলের ব্যবহার করেন বলিয়া, তাহারা তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না। জীব তখন উচ্চতর লোক সকল লাভ করেন। তখন তিনি পরোপকারের জন্য নিম্নতর শরীর সমূহ রাখিতে পারেন অথবা সেই সকল শরীর ত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

শ্রীআশুতোষ দেব।

পূর্ব্বজন্মের ঋণ পরিশোধ।

এক বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ, সময় প্রায় গোধূলী, আকাশে মেঘ, শিবনগরের এক অরণ্যের মধ্যস্থলে একটি ব্রাহ্মণ। অরণ্যটী দীর্ঘে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ, প্রস্থে প্রায় তদপেক্ষা কিছু কম। দুর্গাপুর গ্রাম হইতে সেই অরণ্য পার হইয়া শিবনগর গ্রামে যাইতে হয়। অরণ্য মধ্যে হিংস্র জন্তু বিস্তর, মধ্যে মধ্যে বৃক্ষারোহণ করিয়া, দুষ্টলোকেও দুষ্টচেষ্টায় লুকাইয়া থাকে, এই কারণে সন্ধ্যার পর সে বনে কেহই প্রবেশ করে না। ঐ উভয় গ্রামে যাঁহাদের গতিবিধি, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই তাঁহারা স্ব স্ব ঠিকানা গ্রহণ করেন, দৈবাৎ ঐ ব্রাহ্মণটীর সেদিন পথের মধ্যে বেলা গিয়াছিল,

বনের মাঝে সন্ধ্যা হয়। ব্রাহ্মণের নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বয়স প্রায় ৫০ বৎসর।

ব্রাহ্মণ যাইতেছেন। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, মেঘের অন্ধকার বনের ভিতর নামিয়া আসিয়াছে, ব্রাহ্মণের বুক কাঁপিতেছে। ভয়ে মানুষের গতি যেমন দ্রুত হয়, স্থানবিশেষে তেমনি মৃদুও হইয়া থাকে। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মৃদুগতিতেই বনপথ অতিক্রম করিতেছিলেন, হঠাৎ মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। রামেশ্বর চমকিত হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইলেন।

তিনজন মানুষের কথা। রামেশ্বর শুনিলেন, একস্বর বলিতেছে, "আমি চলিলাম।" দ্বিতীয় স্বর জিজ্ঞাসা করিতেছে, "কোথায় ?"

প্রথম।—শিবনগরে। সেখানে একজনের হাজার টাকা আমি ধারি, পূর্ব্বজন্মের ঋণ, নূতন জন্মে তাহা শোধ করিতে হইবে, মহাজনের ঘরেই আমি জন্মগ্রহণ করিব।

দ্বিতীয়।—আমিও চলিলাম। ঐ গ্রামে একটি লোক আমার কাছে সাতশত টাকা ধার লইয়াছিল, খাতকের ঘরে জন্ম লইয়া সেই টাকা আমি আদায় করিব।

তৃতীয়।—আমি চলিলাম। ঐ গ্রামের এক ব্রাহ্মণের লক্ষ টাকার খাতক আমি ছিলাম, সে জন্মে শোধ হয় নাই, নূতন জন্মে শোধ দিব। ব্রাহ্মণের নাম রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। তোমাদের দুজনের কম কম টাকা, তোমরা ত শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়া আসিবে, আমাকে অনেকদিন শিবনগরে থাকিতে হইবে, রামেশ্বরের পুত্র হইয়া আমি জন্মিব।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ঐ কথাগুলি শ্রবণ করিলেন। মানুষ দেখিতে পাইলেন না। বন অন্ধকার, কিছুই দেখা গেল না। অন্ধকার না হইলেও আকৃতি দেখা যাইত না। রামেশ্বর মনে মনে অনুমান করিলেন, ভূত। ভয় হইল, গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন। বন পার হইয়া, তাঁহার হাসি আসিল। মনে মনে হাসিয়া মনে মনে তিনি বলিলেন, "কলির মানুষ মিথ্যা কথা কয়, কলির ভূতেরাও মিথ্যাবাদী। আমার স্ত্রীর বয়স ৪৫ বৎসর, এত বয়স পর্য্যন্ত একটিও ছেলে হয় নাই, বৃদ্ধবয়সে পুত্র হইবে, বড়ই হাস্যকর কথা! তিন প্রেতাত্মা এক গ্রামে জন্মিবে, এটাও মিথ্যা কথা।

কথা ভাবিতে ভাবিতে রামেশ্বর স্বগ্রামে পৌঁছিলেন। বনে যাহা

শুনিয়া আসিলেন, কাহারও নিকটে তাহা প্রকাশ করিলেন না। তিন মাস গেল, ব্রাহ্মণী গর্ভবতী।

ব্রাহ্মণীর আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। পূর্ণ দশ মাসে ব্রাহ্মণী একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। ব্রাহ্মণের তখন একটা নূতন বুদ্ধি যোগাইল। এক বৎসরের মধ্যে গ্রামের আর কাহার কাহার পুত্র জন্মিয়াছে, সন্ধান করিলেন। জানিলেন, দুইজনের দুইটি পুত্র হইয়াছে; একজন বড় মানুষ কায়স্থ, আর একজন শ্রমজীবী সদ্‌গোপ।

রামেশ্বরের পুত্র দিন দিন বাড়িতে লাগিল। পাঁচ বৎসর বয়স হইলে রামেশ্বর সেই পুত্রকে স্বয়ং সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, পুত্রের নাম হইল বীরেশ্বর।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য শ্রাদ্ধশান্তি প্রভৃতি দশকর্ম্ম জানিতেন, বেশীর ভাগে জ্যোতিষশাস্ত্র পড়া ছিল, ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া দিতেন, লোকের ঠিকুজী কোষ্ঠী প্রস্তুত করিতেন, তাহাতেও তাঁহার কিছু কিছু আয় হইত; ছেলেটিকেও তিনি জ্যোতিষ গণনা শিখাইতে লাগিলেন।

বীরেশ্বর বিংশতি বর্ষে উপনীত। সেই সময় বরিশাল জেলা হইতে একটা দানসাগর আদ্যশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণপত্র তাঁহার নামে আসিল, ব্রাহ্মণীর কাছে ছেলেটিকে রাখিয়া তিনি বরিশাল যাত্রা করিলেন। ছেলে তখন জ্যোতিষশাস্ত্রে বেশ পণ্ডিত হইয়াছিল।

ঐ শিবনগর গ্রামে একঘর গন্ধ বণিকের বাস। বণিকের নাম তিতুরাম। সেই তিতুরাম বিদেশে সওদাগরী কার্য্য করেন, বৎসরে একবার বাড়ীতে আইসেন, মাসে মাসে ডাকযোগে পত্র পাঠান; টাকা পাঠান, সুখে নিরুৎবেগে সংসার চলে। এবারে আর আট মাস কোন খবর নাই। তিতুরামের পত্নী বড়ই ভাবিত হইয়া একদিন বৈকালে রামেশ্বরের বাড়ীতে শুভাশুভ গণনা করাইতে যায়; গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলে, "মা, কর্ত্তাঠাকুর কোথা? আমাদের কর্ত্তা আট মাস কোন চিঠি পত্র লেখেন নাই। কেমন আছেন, কি বৃত্তান্ত, প্রাণ কেমন ছট্ ফট্ করিতেছে, একবার গণাইয়া দেখিব।"

ব্রাহ্মণী বলিলেন, "তিনি পূর্ব্বদেশে নিমন্ত্রণে গিয়াছেন, গণনা-বিদ্যাতে আমার ছেলে খুব পণ্ডিত হইয়াছে, ঠিক ঠিক গণনা করে, তাহাকে জানাও, ঠিক হইবে।"

বণিক-পত্নী বীরেশ্বরকে জানাইল। বীরেশ্বর গণনা করিয়া বলিলেন, "সমস্ত মঙ্গল, কল্য কিংবা পরশ্ব তিনি আসিবেন, এবার তাঁহার অনেক টাকা লাভ হইয়াছে। কাজের ঝঞ্ঝাটে চিঠিপত্র লিখিতে পারেন নাই।"

বণিক-পত্নীর নাম মায়াবতী। বীরেশ্বরের পদধূলি মাথায় তুলিয়া মায়াবতী বলিল, "বাবা! তোমার গণনা যদি ঠিক হয়, এবার তিনি যত টাকা রোজগার করিয়া আনিবেন, তাহার সিকি তোমাকে দিয়া আমি প্রণাম করিব।"

মায়াবতী ঘরে গেল। তৃতীয় দিবসে অনেক লোকজন সঙ্গে লইয়া তিতুরাম বাড়ী আসিলেন। পদপ্রক্ষালন অথবা বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অগ্রেই মায়ামতী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কারবারে কত টাকা লাভ হইয়াছে?"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তিতুরাম ধমক দিলেন। চক্ষে জল আনিয়া মায়াবতী বলিল, "কিছুই শুনিব না, আগে বল, তাহার পর অন্য কথা।"

বিরক্ত হইয়াই তিতুরাম বলিলেন, "চার লাখ অপেক্ষা কিছু বেশী।"

মায়াবতী বলিল, "এক লাখ আমাকে দাও।"

চমকিয়া তিতুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

মায়াবতী বলিল, "ফিরিয়া আসিয়া উত্তর দিব, আগে দাও।"

গৃহিণীকে সর্ব্বস্বই দেওয়া যায়, মায়াবতীর অঞ্চলে তিতুরাম লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক নোট গুণিয়া দিলেন, অঞ্চলে গ্রন্থি লাগাইয়া মায়াবতী তৎক্ষণাৎ ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে ছুটিল; বীরেশ্বরকে সেই লক্ষ টাকা দিয়া বলিল, "বাবা! তুমি রাজা হও, তোমার গণনা ঠিক হইয়াছে।"

প্রণাম করিয়া মায়াবতী চলিয়া গেল। বীরেশ্বর একটু হাস্য করিলেন। ভট্টাচার্য্যের মাটির ঘর, ঘরের ভিতর ব্রাহ্মণী ছিলেন, নোটগুলি লইয়া বীরেশ্বর সেইখানে তাঁহার পায়ের কাছে রাখিয়া তিনি বলিলেন, "মা! এইগুলি রাখুন, বাবা আসিলে তাঁহাকে দিবেন।"

জননীর পদতলে নোটগুলি রাখিয়া বাহিরে আসিবার সময় ঘরের চৌকাটে হোঁচট খাইয়া বীরেশ্বর উঠানে ঠিকরাইয়া পড়িলেন, বেদনায় মুখে একবার হাস্য, তৎক্ষণাৎ প্রাণান্ত।

ব্রাহ্মণী কাঁদিয়া উঠিলেন, পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল, সকলেই কাঁদিল, বীরেশ্বরের শেষকার্য্য হইয়া গেল। তিন দিন পরে রামেশ্বরের প্রত্যাগমন। বাড়ীর নিকটে বাজারের একখানা দোকানে তামাক

খাইবার আশায়, উপস্থিত হইবামাত্র দোকানী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি বাড়ী ছিলেন না? বাড়ীতে মহাবিপদ, আপনার ছেলেটি মারা গিয়াছে।"

হাস্য করিয়া বীরেশ্বর কহিলেন, "দূর পাগল! এত শীঘ্র কি আমার ছেলে মরে!"

আর তামাক খাওয়া হইল না, দোকান হইতে রাস্তায় নামিয়া ব্রাহ্মণ আপন মনে বলিলেন, "লক্ষ টাকা শোধ করিবার কথা, এক কড়া কড়িও শোধ করে নাই, সে ছেলে কি মরিয়া যাইতে পারে? মিথ্যা কথা!"

বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ সত্য কথা শুনিলেন। ব্রাহ্মণী ভূমে আছাড় খাইয়া কাঁদিলেন, ক্রন্দন থামিলে সকল কথা বলিলেন, ব্রাহ্মণের চক্ষে এক ফোঁটাও জল পড়িল না। তদবধি তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিলেন, সংসারে যাহারা জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের প্রধান কার্য্য মাতা-পিতার ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করা কিংবা তাহাদের কাছে পূর্ব্ব ঋণ আদায় করা, সেই কার্য্য শেষ হইলে, তাহারা চলিয়া যায়; সে জন্মে শোধ না হইলে, জন্মান্তরে আবার আইসে; অতএব কলিযুগে পুত্রকন্যার অকালমৃত্যুতে শোক করিতে নাই। শান্তিঃ! শান্তিঃ!! শান্তিঃ!!!

বারান্তরে এ সম্বন্ধে আর কিছু বলিবার রহিল।

বঙ্গসাহিত্যে বিদ্যাসাগর *।

সাহিত্য †। সাহিত্য-কাননে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আজকাল অনেক বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সাহিত্যেরও এক্ষণে নবযুগ আরব্ধ

* বঙ্গবাসী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার প্রণীত "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থ হইতে দৃষ্টান্ত সঙ্কলিত।

† "সাহিত্য কাহাকে কহে? সাহিত্য বলিতে বিস্তর অর্থ বুঝাইয়া থাকে। যথা—কর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, বিয়োগ শাস্ত্র, কাব্য, কবিতা, গণিত, জ্যোতিষ ইত্যাদি; কিন্তু সকলই স্থূলতঃ সাহিত্যেরই অধিকারাধীন, ভাগ বিভাগ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ভেদে এই সাহিত্যেরই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রযুক্ত হইয়া থাকে।"

হইয়াছে। বহুকাল পূর্ব্বে যে সাহিত্য-কানন, এক আধটী পুষ্পের শোভায় লোকের মনোহরণ করিত, এক্ষণে সেই সাহিত্য-কানন বিবিধ লতাপত্রে ও বিবিধ কুসুম-রাজিতে সুশোভিত। অতএব এক্ষণে বর্ত্তমান বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যসেবী লেখকগণের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি আদর্শ মহাপুরুষগণ বাঙ্গালা-সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন ও ক্রমোন্নতির পথ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া, দেশের ও দশের যথেষ্ট হিতবিধান করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্য-কাননের শুষ্কপুষ্প প্রত্যাখ্যানের যোগ্য নহে, সাহিত্য-কুসুম বীণাপাণির কৃপায় কদাচ শুখাইবার বা ম্লান হইবার নহে।

বিজাতীয় শিক্ষার পরাক্রমে বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবিগণ এক্ষণে লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়া, দাঁড়াইয়াছেন। অনেকেই আর বাঙ্গালা পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করেন না; কেহ অমুক পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছেন? এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "যে বাঙ্গালায় এমন কি পুস্তক আছে, পাঠ করিব?" কিন্তু তাঁহারা স্বজাতীয় সাহিত্যের সহায়তায় অগ্রসর নহেন; প্রসিদ্ধ সিলি বলিয়াছেন, "যদি ভারতবর্ষকে প্রকৃত জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিতে হয়, তবে ইংরাজী বা সংস্কৃতের সাহায্যে হইবে না; বাঙ্গালা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার দ্বারা তাহা সংসাধিত করিতে হইবে।" আমাদের পূজ্যপাদ হাইকোর্টের বর্ত্তমান জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের স্বজাতীয় ভাষায় জ্ঞান বিস্তার না হইলে, আমরা কখনও বহুবিষয়ে অভিজ্ঞ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিব না; যাবৎ জাতি সাধারণের মধ্যে স্বজাতীয় ভাষার জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ না হইবে, তাবৎ চারিদিকের গভীর অজ্ঞানান্ধকার কখনই বিলুপ্ত হইবে না।" এক্ষণে কেই বা এ সকল হিতজনক কথায় কর্ণপাত করেন? যিনি বলিয়াছেন, তাঁহার কথা কিন্তু বৃথা হয় নাই। সময়ে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে।

জাতীয় সাহিত্য জাতীয় জীবনের একমাত্র শক্তি ও প্রধান উপাদান। ভারতে যদি বাল্মীকি ব্যাস না জন্মিতেন, তাহা হইলে হিন্দুর হিন্দুত্ব কোথায় থাকিত? যদি কালিদাস ভবভূতি, অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে হিন্দুর প্রাণে কোমলতা, এ কাব্যমাধুরী, এ জগন্ময়ী শান্ত

উদারতা কে শিক্ষা দিত? যদি বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গে প্রাদুর্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের এত উন্নতি, এত শ্রীবৃদ্ধি, এত পরিপুষ্টি কিরূপে সাধিত হইত? সেই জন্যই বার বার বলিতেছি, জাতীয় সাহিত্য, জাতীয় জীবনের কর্ণধার। সাহিত্য-সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত সুলেখক শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ, মহোদয় বলেন, * * ভাষাসমূহ, ক্রমোন্নতি সহকারে, দেশকাল-পাত্রভেদে, নানা কারণে, নানা প্রকার সংস্পর্শে, পরিশেষে পূর্ণোন্নতি লাভ করিয়া, মানব-সমাজের শিক্ষা শক্তি সভ্যতা ও চরিত্রের আধার হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সাহিত্য মানব-সমাজের মহা সহায়। স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যের আলোচনা ও শ্রীবৃদ্ধি ব্যতীত পৃথিবীর কোনও জাতিই সভ্যতার উন্নত পবিত্র ও প্রশস্ত মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই; No nation can attain to greatness without a literature of its own. ইতিহাসের এই মহাজ্ঞানগর্ভবাক্য, সভ্যতম জনপদের এই প্রাচীন প্রবাদ কাঙ্গালী বাঙ্গালীর স্মরণ রাখা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অধঃপতিত বঙ্গসন্তানের যদি কখনও আবার পূর্ণোন্নতি হয়, যদি বঙ্গসমাজ কখনও সভ্যজাতির অত্যুন্নত সমাজের সমকক্ষ হইতে পারে, তাহা হইলে বঙ্গভাষার পূর্ণোন্নতিরও আশা করা সম্ভবপর; ইহাই আমাদের বিশ্বাস,—ইহাই আমাদের ধারণা। জননী বঙ্গভূমির ভাষা ও সাহিত্যের যিনি পোষক, যিনি স্বজাতীয় সাহিত্যের সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি নরাকারেও দেবতা। তিনি বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান পূজ্য পুরুষ।

সাহিত্য জাতিগত উন্নতির সহিত সম্বন্ধ, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত, সাহিত্য দেখিয়া সর্ব্ব জাতির উন্নতি, অবনতির পরিমাণ অবধারণ করা যায়। যে জাতি যত উন্নত, সে জাতির সাহিত্য তত শ্রীসম্পন্ন, যে জাতির সাহিত্য একেবারেই নাই, বা যাহাদের অনুশীলন অল্প, তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি, নীতি, সকলই কদর্য্য হইয়া থাকে। অপিচ, উন্নত জাতির সাহিত্যের বিমল-বিভায় মানব-হৃদয় যে আলোকিত হইয়া উঠে, তাহা স্থির। এই আলোকে মানব-প্রতিভা ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া পড়ে, এবং এই সাহিত্যের প্রভাবেই মানব পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। তাই বলি, যদি কিছু মানবের প্রার্থনীয় থাকে, তাহা সাহিত্য। যদি মানবের কিছু বরেণ্য থাকে, তাহা সাহিত্য। যদি মানবজাতির উন্নতির

কিছু সহায় থাকে, এবং তাহার অনুশীলনে মানবসাধারণের হিত উপকার ও ধর্ম্মসাধন হয়, তাহাও সাহিত্য; যদি আমাদের ইহাই মূলমন্ত্র হয়, তাহা হইলে আশার সাফল্য আর সুদূরপরাহত নহে।

যারপরনাই পরিতাপের বিষয়, বাঙ্গালা-সাহিত্য গভীর অনন্ত মর্ম্মভেদী শোকে নিমগ্ন! বুঝি এ শোক যাইবার নহে। এ শোক বিদ্যাসাগরশূন্যতার। বাঙ্গালা সাহিত্য বিদ্যাসাগর হারা হইয়াছে। বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের মেরুদণ্ড ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই মহা মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মহাসাগর আজ শুখাইয়া গিয়াছে। সে বিশাল মেরুদণ্ড, সে বিচিত্র মহাসাগর, কি বাঙ্গালা সাহিত্য আর ফিরিয়া পাইবে? হায়! কে জানে, কবে আবার সাহিত্যের সর্ব্বদিক্ আলো করিয়া, একটী উজ্জ্বল প্রতিভা-সূর্য্যের উদয় হইবে? বঙ্গভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার নিমিত্ত আমরা স্বর্গীয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চির ঋণে আবদ্ধ আছি। লক্ষ লক্ষ বালক বিদ্যাসাগরের "বর্ণপরিচয়" পাঠ করিয়া ক্রমশঃ বঙ্গসাহিত্য পথে অগ্রসর হইতে হইতে পাণ্ডিত্য-গৌরবে গৌরবান্বিত হইতেছে। আজকাল যে সকল সাহিত্যসেবী বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে কলম ধরিতে শিখিয়াছেন, একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই তাঁহাদের সকলের শিক্ষা-গুরু। বিদ্যাসাগর বঙ্গসাহিত্যের বিশুদ্ধি, পরিপুষ্টি ও উন্নতিসাধন-কল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়াছিলেন! যিনি যাহাই বলুন, আমাদের স্থির বিশ্বাস, যতদিন বঙ্গভাষার,—বঙ্গসাহিত্যের অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন বঙ্গীয় লেখক-সমাজ প্রাণের উচ্ছ্বাসে বঙ্গ-সাহিত্যের মুখোজ্জ্বল করিতে থাকিবেন,—ততদিন বিদ্যাসাগরের শূন্য আসনেও পুষ্প-চন্দন অর্পিত হইবে।

প্রকৃত কর্ম্মযোগী মহাপুরুষের প্রভিতা-সূর্য্য অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ; সেই সূর্য্য আপন শক্তিবলে আপনার গন্তব্যস্থান স্থির করিয়া আপনা আপনি প্রভাব বিস্তার করে, শত সহস্র বিঘ্ন বাধা সে প্রভাকে ম্লান করিতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের পাঠ্যাবস্থায় নিজের জীবনে তাহা স্পষ্ট দেখাইয়া গিয়াছেন; পাঠ্যাবস্থায় তিনি সময়ে সময়ে বিবিধ বিষয়ে সংস্কৃত শ্লোক, কবিতা, সাহিত্য-বিষয়ক পারিতোষিক প্রবন্ধ লিখিয়া, পুরস্কার পাইয়াছিলেন। সারগ্রাহী পাঠকগণের জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

মেঘ।

প্রায়ঃ সহায় যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত্তুমীশতে সর্ব্বে।
জলদাঃপ্রাবৃড়পায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়ানিতরাম্॥ ১॥
কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জ্জিতেন
তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্।
ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পান্থ যূনাং
সাহায়কায় কিল নির্ম্মল মশ্রুবর্ষম॥ ২॥

সংস্কৃত হইতে নিঃসৃত বঙ্গভাষা কুঞ্জে অনুপ্রাস পুষ্পের যেমন শোভা হয়, সে সকল পুষ্পে যেমন সৌরভ হয়, অন্য কোন মিশ্রিত ভাষার অনুপ্রাসে কদাচ তেমন হয় না। বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত রচনাকল্পেও উদাসীন ছিলেন না; সংস্কৃত ভাষায় যাঁহাদের অধিকার আছে, উপরি উদ্ধৃত পংক্তিচতুষ্টয় পাঠ করিলে, তাঁহারা উহার মর্ম্ম বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা বঙ্গসাহিত্য কি পর্য্যন্ত উপকৃত, সুশোভিত ও সমুন্নত হইয়াছে, তিনি যখন জীবিত ছিলেন, তৎকালে বাঙ্গালা সাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ ঋজুস্বভাব সারগ্রাহী সুপণ্ডিত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক পুস্তকে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন; রাজনারায়ণ বাবু লিখিয়াছেন, "এক্ষণে আমরা বাঙ্গালা ভাষার, জন্‌সন্ স্বরূপ বিজ্ঞাগ্রগণ্য মাননীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নিকট আগমন করিতেছি। বিদ্যাসাগর মহাশয় আপনার প্রণীত গ্রন্থ সকলের দ্বারা বঙ্গভাষার বর্ত্তমান উন্নতির প্রথম সূত্রপাত করেন। অনেকে অবগত নহেন যে, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট ৺অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন। অক্ষয় বাবু কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে সংশোধনের অতীত হইয়া অসাধারণ প্রভায় দীপ্তি পাইয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, বিদ্যাসাগরের উদ্ভাবনীশক্তি নাই, তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অনুবাদ মাত্র; কিন্তু যিনি তাঁহার রচিত সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব এবং বিধবা-বিবাহ বিচারগ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিদ্যাসাগরের অসাধারণ স্বকপোলরচনাশক্তি নাই, এমন কথা কখনই বলিতে পারিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার সময় তাহা সমাপনকালে অনেক

ইংরাজীওয়ালা অজ্ঞাতসারে বিদ্যাসাগর-রচিত বিধবা-বিবাহ-সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের উপসংহারের অনুকরণ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রণীত সীতার বনবাসে, ভবভূতির উত্তরচরিত ও বাল্মীকির রামায়ণের কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহাতে তাঁহার নিজেরও অনেক মনোহর রচনা আছে। উহা তাঁহার একপ্রকার স্বকপোল-রচিত গ্রন্থ বলিলে হয়। বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার অনেক পরিমাণে নির্ম্মাণ ও পরিমার্জ্জনাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতাঋণে বদ্ধ আছে।

বিদ্যাসাগরের ইদানীন্তন ভাষা যেমন সহজ, কোমল ও মসৃণ হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তিনি সংস্কৃত শব্দ বহুল সাধুভাষা ব্যবহার করাতে শ্রীযুক্ত রাধানাথ শিকদার ও শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বিরক্ত হইয়া ১৮৫৪ সালে অপভাষায় লিখিত একখানি "মাসিক পত্রিকা" প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি বিজ্ঞাপন থাকিত। সেই বিজ্ঞাপনে এই কথাগুলি লেখা থাকিত, "এই পত্রিকা পণ্ডিত লোকদিগের জন্য প্রকাশিত হচ্চে না। তাঁহারা পড়্‌তে চান পড়্‌বেন, কিন্তু তাঁদের জন্য এ পত্রিকা নহে।" ঐ পত্রিকায় টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত "আলালের ঘরের দুলাল" প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ কল্পিত টেকচাঁদ ঠাকুর আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র। সেই অবধি দুই প্রকার ভাষা সৃষ্টি হইয়াছে, বিদ্যাসাগরী ভাষা ও আলালী ভাষা। কোন ভাষা জয়লাভ করিবে, অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে সন্দেহ ছিল। এক্ষণে যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ দুই ভাষা হইতে উৎপন্ন এক মিশ্রভাষা গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রচলিত হইবে। এই মিশ্র ভাষা ব্যবহারের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শক বিখ্যাত উপন্যাস রচয়িতা বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এমন অনেকানেক বিশেষ বিষয় আছে, যাহাতে হয় কেবল "বিদ্যাসাগরী ভাষা", নয় কেবল "আলালী ভাষা" চিরকাল ব্যবহৃত হইবে। পুরাবৃত্ত, জীবনচরিত কিম্বা বিজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলে, বিদ্যাসাগরী ভাষা অবলম্বন করিতেই হইবে; আর শ্লেষাত্মক গদ্য কাব্য, কিংবা কৌতুকাবহ উপন্যাস অথবা নাটক লিখিতে হইলে, "আলালী ভাষা" ব্যবহার করিতেই হইবে।" রাজনারায়ণ বাবুর এই মন্তব্যের উপর দ্বিরুক্তি করিবার কিছুই নাই; প্রতিবাদের চেষ্টা করাও অদূরদর্শিতার পরিচয় দেওয়া মাত্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ইংরাজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার সমান অধিকার ছিল। কিন্তু মাতৃভাষার, পরিপুষ্টির জন্য সকল প্রতিভা নির্ভর করে, এই কারণে বাঙ্গালাভাষা কিসে কার্য্যকরী অর্থকরী ভাষায় পরিণত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার ঐকান্তিক চিন্তা ও চেষ্টা ছিল। তিনি জননী বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবায় জীবনোৎসর্গ করিয়া, মাতৃভাষা শিক্ষার পথ যথেষ্ট প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। যদিও তাঁহার পূর্ব্বে মৃতমহাত্মা রামমোহন রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণ বঙ্গ-সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁহাদের ভাষার অনেকাংশই দুর্ব্বোধ্য। দৃষ্টান্ত হৃদয়ঙ্গম করিয়া, চিন্তাশীল পাঠকগণ সে বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় সময় সময় "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতেন; তিনিই সর্ব্বাগ্রে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করেন। সে অনুবাদ সম্পূর্ণ হয় নাই। ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় সেই অনুবাদ দৃষ্টে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শমতে বঙ্গদেশের কতিপয় খ্যাতনামা পণ্ডিতের সাহায্যে মহাভারতের সম্পূর্ণ বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া, বঙ্গ সাহিত্যের মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। যে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ আজ শত সহস্র হিন্দু নরনারী পাঠ করিতে পায়, বিদ্যাসাগরই সেই অনুবাদের একমাত্র পথপ্রদর্শক। ইতিপূর্ব্বে (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে) গবর্ণমেণ্টের নিকট এদেশে সংস্কৃত শিক্ষা রহিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। অনেক কৃতবিদ্য সাহেব ও বাঙ্গালী সেই প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তৎকালে অদম্য উৎসাহে সেই কৃতঘ্ন মাতৃদ্রোহিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হন। একদিকে গবর্ণমেণ্টের সপক্ষে যাবতীয় কৃতবিদ্য সাহেব বাঙ্গালী, অপর দিকে বিদ্যাসাগর একাকী। সংগ্রামে অখণ্ডনীয় যুক্তিরূপ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে বিদ্যাসাগরেরই জয়লাভ হইল। সংস্কৃত ভাষার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া দেশের যাবতীয় বিজ্ঞলোক তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ করিলেন। যাহাতে সহজে সংস্কৃত ভাষার শিক্ষাবিধানও বহুল প্রচারের সুবিধা হয়, সেই উদ্দেশে সেই সময়ে কতকগুলি সহজ সরল সংস্কৃতপাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন। সংস্কৃত-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি।

ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালাভাষা তত সরল ও সুবোধ্য ছিল না। তাহাতে বালক বালিকার শিক্ষালাভের বিশেষ অসুবিধা ঘটিত; সেই অসুবিধা দূর করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে যে পুস্তক যে যে সময়ে প্রণয়ন করেন, তাহার একটী তালিকা নিম্নভাগে প্রদত্ত হইল;—

পুস্তকের নাম		প্রণয়নের কাল।
বেতাল পঞ্চবিংশতি	...	১৮৪৭ খৃঃ অব্দ।
বাঙ্গালার ইতিহাস	...	১৮৪৮ „
জীবনচরিত	...	১৮৫০ „
বোধোদয়	...	১৮৫১ „
উপক্রমণিকা ব্যাকরণ	...	১৮৫২ „
সংস্কৃত ঋজুপাঠ (তিন ভাগ)	...	১৮৫২ „
ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ	...	১৮৫৩ „
ঐ ২য় ও ৩য় ভাগ	...	১৮৫৪ „
শকুন্তলা	...	১৮৫৫ „
বিধবা-বিবাহ ১ম ভাগ	...	১৮৫৬ „
ঐ ২য় ভাগ	...	ঐ „
বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)	...	ঐ „
কথামালা	...	ঐ „
সংস্কৃত প্রস্তাব	...	ঐ „
চরিতাবলী	...	১৮৫৭ „
মহাভারতের উপক্রমণিকা	...	১৮৬০ „
সীতার বনবাস	...	১৮৬২ „
ব্যাকরণ কৌমুদী ৪র্থ ভাগ	...	ঐ „
আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ	...	১৮৬৮ „
ঐ ২য় ভাগ	...	ঐ „
ঐ ৩য় ভাগ	...	১৮৭০ „
ভ্রান্তিবিলাস	...	ঐ „
বহুবিবাহ (রহিত হওয়া উচিত কিনা)	...	১৮৭২ „

আর একখানি বাসুদেব চরিত। এই বাসুদেব চরিত বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের একটি পরম রত্ন। এই গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে বিরচিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণলীলা ইহার পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে প্রকটিত হইয়াছে। সেই সময় এবং তৎপূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল, বাসুদেব চরিতের সহিত তুলনায়, ভাষার পারিপাট্যে সে সকল পুস্তক কোন অংশে সমকক্ষ হইতে পারে না। বাসুদেব চরিতের ভাষার একটু নমুনা দেখুন:—

একদিবস দেবর্ষি নারদ মথুরায় আসিয়া কংসকে কহিলেন, "মহারাজ! তুমি নিশ্চিন্ত রহিয়াছ, কোনও বিষয়ের অনুসন্ধান কর না; এ যাবৎ গোপী ও যাদব দেখিতেছ, ইহারা দেবতা, দৈত্যবধের নিমিত্ত ভূমণ্ডলে জন্ম লইয়াছে, এবং শুনিয়াছি, দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া নারায়ণ তোমার প্রাণসংহার করিবেন, এবং তোমার পিতা উগ্রসেন এবং অন্যান্য জ্ঞাতি-বা[illegible]। তোমার পক্ষেও হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন; অতএব মহারাজ! অতঃপ[illegible]ধান হও, অদ্যাপি সময় অতীত হয় নাই, প্রতীকার চিন্তা কর।[illegible] বলিয়া দেবর্ষি প্রস্থান করিলেন। কংস শুনিয়া অতিশয় কুপিত[illegible]ল এবং তৎক্ষণাৎ সপুত্র বাসুদেব দেবকীকে আনাইয়া তাঁহাদিগের সমক্ষে পুত্রের প্রাণনাশ করিল এবং তাঁহাদিগকে কারাগারে নিগড়-বন্ধনে রাখিল। অনন্তর নিজ পিতা উগ্রসেনকে দূরীকৃত করিয়া স্বয়ং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিল, এবং প্রলম্ব বক চানূর তৃণাবর্ত্ত প্রভৃতি দুর্বৃত্ত সৈন্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যদুবংশীয়দের উপর নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল। তাঁহারা প্রাণভয়ে পলাইয়া কুরু, কেকয়, শাল্ব, পাঞ্চাল, বিদর্ভ, নিষধ আদি নানা দেশে প্রচ্ছন্নবেশে বা[illegible] করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কংসের শরণাপন্ন ও মতানুযায়ী হই[illegible] মথুরাতেই অবস্থান করিলেন। * *

* * * *

"অনন্তর অষ্টম মাস পূর্ণ হইলে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষে অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্র সময়ে ভগবান্ ত্রিলোকনাথ দেবকীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হইলেন। তৎকালে দিক্ সকল প্রসন্ন হইল, গগনমণ্ডলে নির্ম্মল নক্ষত্রমণ্ডল উদিত হইল, গ্রামে নগরে নানা মঙ্গল বাদ্য হইতে লাগিল। নদীতে নির্ম্মল জল ও সরোবরে কমল প্রফুল্ল হইল। বন উপবন প্রভৃতি মধুর মধুকর

গীতে ও কোকিল-কলকলে আমোদিত হইল; এবং শীতল, সুগন্ধি মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহিতে লাগিল। সাধুগণের আশয় জলাশয় সুপ্রসন্ন হইল। দেবলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সিদ্ধ চারণ কিন্নর গন্ধর্ব্বগণ গীতি ও স্তুতি করিতে লাগিল। বিদ্যাধরীগণ অপ্সরাদিগের সহিত নৃত্য করিতে লাগিল। দেব ও দেবর্ষিগণ হর্ষিত মনে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মেঘ সকল মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল।"

ইহা কোন একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ নহে। ভাষা উৎকৃষ্ট, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে আর কাহারও ভাষা এরূপ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল হয় নাই; তিনি বলিতেন, "সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনে নানা ফল। ইউরোপে শব্দবিদ্যার যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন তাহার মূল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন দ্বারা অন্যান্য ভাষার মূল নির্ণয়, স্বরূপ, পরিজ্ঞান ও মর্ম্মভেদে সমর্থ হইয়াছেন এবং এই পৃথিবী যে নানা মানবজাতির আবাসস্থান, তাঁহাদের কে[৫২] ন্ শ্রেণীর অন্তর্গত, কে কোন্ দেশের আদিম নিবাসী, লোক কে, কোন্[৫৩] " হইতে আসিয়া কোন্ প্রদেশে বাস করিয়াছে, ইত্যাদি নির্দ্ধারণ ক[৫৪] " রম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু ইউরোপীয় শব্দবিদ্যা যাবৎ সংস্কৃত [৫৫] হায়তা প্রাপ্ত হয় নাই, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল বিষয় অন্ধকারে আচ্[৫৬] ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পূর্ব্বে ও পরে যে সকল বিদ্বান [ঐ] সাহিত্যের আলোচনায় বৃতি হইয়াছিলেন, তাঁহাদের ভ [ঐ] নমুনা আমরা এইস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :— [ঐ]

রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকদিগের ধর্ম্ম-প্রণা[ঐ] প্রভৃতি আরও কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করি[১৮৫৭] একখানি পথ্যপ্রদান। আবশ্যক বিবেচনায় আমরা [১৮৬০] হইতে কিঞ্চিৎ নমুনা দেখাইব। যথা :— [১৮৬২]

"বাস্তবিক ধর্ম্মসংহারক অথচ ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী না[ঐ] যে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমুদায়ে দুই শত অষ্টাত্রিংশৎ পৃষ্ঠা সংখ্যক হয়; তাহাতে দশ পৃষ্ঠা পরিমিত ভূমিকা গ্রন্থারম্ভে লিখেন। এই দশ পৃষ্ঠে গণনা করা গেল যে, ব্যঙ্গ ও নিন্দাসূচক শব্দ ভিন্ন স্পষ্ট কটূক্তি বিংশতি শব্দ হইতে অধিক আমাদের প্রতি উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ সমগ্র পুস্তক প্রায় দুর্ব্বাক্যে পরিপুষ্ট হয়। ইহাতে এই উপলব্ধি

হইতে পারে যে, দ্বেষ ও মাৎসর্য্যতায় কাতর হইয়া ধর্ম্মসংহারক শাস্ত্রীয় বিবাদচ্ছলে এইরূপ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া অন্তঃকরণের ক্ষোভ নিবারণ করিতেছেন; অন্যথা দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ বিনা শাস্ত্রীয় বিচার সর্ব্বথা সম্ভব ছিল।"

[ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

মিত্রসভা।

সমাজকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে গেলে, যে শক্তি উহার জীবন, সেই শক্তির পূর্ণ প্রসার চাই। এই শক্তির কার্য্য, যতই সংকীর্ণ হইবে, সমাজ ততই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবে। সংসারে থাকিতে গেলে কয়েক জন মিলিয়া কতকগুলি কার্য্য করিতে হয়। তাহা না করিলে সমাজের বিশেষ অনিষ্ট হয়। মনে করুন, আমার মাতার মৃত্যুকাল উপস্থিত। সেই সময় যাহাতে তিনি ক্ষণভঙ্গুর দেহ ত্যাগ করিয়া শান্তিময় রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন, সেরূপ আয়োজন করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য। এইজন্য যাহাতে তাঁহার গঙ্গালাভ ঘটে, মরণের সময় তাঁহার কর্ণকুহরে সর্ব্বতাপহারী হরিনামধ্বনি প্রবেশ করে, তাহা করিতে হয় এবং মৃত্যুর পর যাহাতে তাঁহার বিকৃত দেহের চিহ্নমাত্র না থাকে, সে অভিপ্রায়ে উহা অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিতে হয়। কিন্তু এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতে গেলে, যে কয়জন লোকের সাহায্যের প্রয়োজন, সেই কয়জন লোক আমার পরিবারের মধ্যে না থাকিলে আমাকে আমার প্রতিবাসীর সাহায্য লইতে হয়। এক্ষণে যদি আমি এ কার্য্যে আমার প্রতিবাসীর সাহায্য না পাই, তাহা হইলে আমার দারুণ মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইবে এবং কোনও প্রকারে আমার মাতার সৎকার সম্পন্ন করিয়া হয়তো যাহাতে এরূপ নিষ্ঠুর প্রতিবাসীর নিকট আর না থাকিতে হয়, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কিন্তু মনে করুন, হয়তো কোন কারণে আমার নিষ্ঠুর প্রতিবাসীকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাওয়া হইল না। এরূপ অবস্থায় যদি আমার প্রতিবাসীর কোন সত্য বিষয়ে রাজদ্বারে আমার সাক্ষ্যদানের আবশ্যকতা হয়—বা যদি তাঁহার কোন আত্মীয়ের মৃত্যু ঘটে, এবং তাঁহার সৎকারের জন্য আমার সাহায্য প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে

হয়তো তাঁহার পূর্ব্ব নিষ্ঠুর আচরণ মনে করিয়া আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে নাও পারি। এইরূপ অবস্থায় আমার প্রতিবাসী আমার সহিত পূর্ব্বে যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাঁহার অপরাপর প্রতিবেশিগণেরও প্রতি যদি সেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ কাহারও নিকট তিনি সাহায্য পাইবেন না এবং তন্নিবন্ধন তাঁহার বিশেষ কষ্ট ও মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইবে।

উপরিলিখিত দৃষ্টান্তানুসারে যে স্থানে প্রতিবেশিগণ কেহ কাহাকে সাহায্য করেন না, সে স্থানের অবস্থা যারপরনাই শোচনীয়। কয়জনে মিলিয়া একস্থানে বাস করায় যে সুবিধা, তাহা এ স্থানে নাই। যখন যতদূর সম্ভব পরস্পরের সাহায্য করা, সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য—তখন আমরা যাহাকে সমাজ বলি, তাহাও এ স্থানে নাই।

প্রত্যক্ষভাবে সমাজস্থ অপর ব্যক্তিকে সাহায্য করিলে, পরোক্ষভাবে যে আপনাকে সাহায্য করা হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তে দেখিয়া আসিয়াছি। এইজন্য আত্মরক্ষা যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে সমাজ রক্ষাও নিতান্ত প্রয়োজন। নিজের কোন ন্যায়সঙ্গত অভাব উপস্থিত হইলে আমার মনের যেরূপ অবস্থা হয়, সমাজস্থ অপর ব্যক্তিরও যে, সেরূপ হয়, তাহা মনে করিয়া আমার সহানুভূতি প্রকাশ করা কর্ত্তব্য—এইজন্য একতা, সমানুভূতি এবং পরস্পরকে সাহায্য করাই—সমাজের প্রধান বন্ধন। অপরের অভাবে সহানুভূতি প্রকাশ করা অনেকটা আবার মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। এইজন্য যাহাদের মনের অবস্থা অনেকটা এক প্রকার, তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি অধিক। মানসিক উন্নতির যে ক্রম—সেই ক্রমের সমাবস্থাই, বোধ হয়, আমাদের দেশে বর্ণবিভাগের মূলভিত্তি।

সমাজরক্ষাই আত্মরক্ষা, এ কথা ভুলিয়া গিয়া, আমরা এখন সমস্ত সমাজ-বন্ধন শিথিল করিয়া ফেলিতেছি। এখন প্রকৃতপক্ষে যাহাকে সমাজ বলে, তাহা আমাদের মধ্যে নাই, বলিলেই হয় এবং ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচারের বিষময় ফল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। এ জগতে মুখে যত লোকে সত্যের আদর করে, তাহার এক চতুর্থাংশও কার্য্যে ঘটে না। এইজন্য যে সত্যগুলি পালন করা আমাদের জীবন ধারণের জন্য অবশ্য কর্ত্তব্য, সেই সত্যগুলি পালন করিবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত চাই। আমাদের শাস্ত্রেই এই বন্দোবস্ত

আছে। এই বন্দোবস্ত, বিস্তারিত হইলেও, সকল অবস্থায় উহা পর্য্যাপ্ত নহে। এইজন্য কতকগুলি দেশাচার চলিত হইয়া আসিয়াছে। যখন সমাজ, শাস্ত্রানুসারে চালিত হয়, তখন যে মূল সত্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় বিধানের ব্যবস্থা হয়, দেশাচারগুলিও, সেই মূল সত্যের উপর লক্ষ্য রাখিয়া কল্পিত ও প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু যে সমাজে মূল সত্যের উপর দৃষ্টি রাখিয়া অনেক কাজ হয় না, সেই সমাজে যথেচ্ছাচারের স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, কালে এই যথেচ্ছাচারের স্রোতঃই, দেশাচার বলিয়া গণ্য হয় এবং পরিণামে এই সকল দেশাচারের ফলে সমাজ, উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। আজকাল আমাদের সমাজে যেরূপ যথেচ্ছাচার বাড়িয়াছে, তাহাতে উহা শীঘ্র নিবারিত করিতে না পারিলে, অচিরে আমাদের সর্ব্বনাশ হইবার সম্ভাবনা।

এক্ষণে বিবেচ্য, কি উপায়ে আমরা এই যথেচ্ছাচারের স্রোতঃ নিবারণ করিয়া সমাজের কলঙ্ক দূর করিতে পারি? আজকাল এদেশে সকলেই প্রধান হইতে চায়; অপর কাহারও হিতকথা শুনিতে চায় না। সুতরাং বক্তৃতার দ্বারা কিছু ফল হইবে না। রাজার দ্বারাও এ বিষয়ে কোন সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না, আমাদের রাজা, আমাদের অভাব ভাল করিয়া বুঝেন না বা বুঝিতে চান না। এরূপ অবস্থায় একটী মাত্র উপায় আছে। উপায়টী এই;—যে সকল কারণে আমাদের জাতীয় জীবন, ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িতেছে, সেই সকল কারণের বিরুদ্ধে যত দূর সম্ভব সকলে মিলিত হইয়া উহাদের উচ্ছেদ করা। উক্ত প্রকারে মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে গেলে, একটী সভার অবতারণা করা আবশ্যক। অবশ্য যাঁহারা দেশের ও দশের জন্য সাধ্যমত দেহ, মন ও অর্থ নিয়োজিত করিতে কখনই কুণ্ঠিত হন না, তাঁহাদের দ্বারা উক্ত সভা প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত হওয়া সম্ভব। এই সভার নাম "মিত্রসভা" দিলে মন্দ হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনকে উন্নত ও উহার অবনতি নিবারিত করা, সভার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে। এই উদ্দেশ্যগুলি সাধন করিতে গেলে, প্রধানতঃ যাহাতে সাধুগণের মধ্যে অবাধে পরস্পরের সাহায্য হয়, সে বিষয়ে বন্দোবস্ত করা উচিত। এইজন্য প্রথমে যাহাতে প্রতি সভ্যের নিকট তাঁহার সামর্থ্যানুসারে মাসিক চাঁদা গ্রহণ এবং উক্ত চাঁদার টাকা দ্বারা যাহাতে কোন দুঃস্থ বা মৃত সভ্যের পরিবারের অর্থকষ্ট মোচন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যদি

সভ্যগণের মনে স্থির ধারণা থাকে যে, সভার প্রসাদে কোন দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহাদের অন্নসংস্থান নষ্ট হইলে তাঁহাদিগকে বা তাঁহাদের অবর্ত্তমানে তাঁহাদের পরিবারবর্গকে এক মুষ্টি অন্নের জন্য পরের দারস্থ হইতে হইবে না, তাহা হইলে সভার জন্য ন্যায়সঙ্গত সমস্ত কার্য্য সাধ্যমত করিতে তাঁহাদের কখনও কিছুমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। এইজন্য উপরি-উক্ত ব্যবস্থা, সর্ব্বপ্রথমে করা আবশ্যক। এইরূপ করিলে সভা, অতি অল্পকালের মধ্যে এত অধিক বলসঞ্চয় করিবে যে, সেই বলের দ্বারা অনেক কার্য্য, যাহা এখন সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, তাহাও অল্প আয়াসে, সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে। সভার জন্য অর্থ নানাপ্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। অন্নপ্রাশন, বিবাহ, আদ্যশ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে সভার মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ সামর্থ্যানুসারে সাহায্য করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবেন না। যে ব্যক্তির অনেক অর্থ আছে এবং যাঁহার মৃত্যুর পর উক্ত অর্থ ভোগ করিবার কেহই নাই, যাহাতে তাঁহার অর্থ, তাঁহার মৃত্যুর পর সভার কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন। যাঁহারা ধনী এবং স্বদেশহিতৈষী, তাঁহারা যে, এই সভার হিতকর কার্য্যে প্রভূত অর্থ সাহায্য করিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সভার অর্থবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভা, সমাজের যথেচ্ছাচার নিবারণ, এদেশীয় শিল্প, কৃষিকার্য্য ও ব্যবসায়ের উন্নতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতির বিস্তারিত চর্চ্চা ও উন্নতি, ধর্ম্মরক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ দেশহিতকর কার্য্য করিতে পারেন। যাঁহারা সচ্চরিত্র, মিতব্যয়ী, স্বদেশহিতৈষী ও ধর্ম্মভীরু—তাঁহারাই কেবল সভার সভ্য বলিয়া মনোনীত হওয়া উচিত। এই সভা, যে রূপে গঠিত,—উহার কার্য্যকলাপ চালিত হইলে জনসাধারণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য।

দেশের ও সমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, উপরিউক্ত সভার প্রতিষ্ঠা, একান্ত আবশ্যক। যদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাদের অধঃপতনের শেষাবস্থা আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বোধ হয়, উক্ত সভা, শীঘ্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে যাহাতে উহার মহোদ্দেশ্যগুলি সফল হয়, সে বিষয়ে যে রীতিমত ব্যবস্থা করা আবশ্যক হইবে, তাহা এস্থলে বলা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

হেমন্ত।

আইল হেমন্ত ঋতু ধরাতল মাঝে।
ধরণী সাজিল পুনঃ অভিনব সাজে॥
শুখাইল নদী নদ লুকাইল ঘন।
দিন দিন হিম-ময় হয় সমীরণ॥
বৃষ্টিধারা সম পড়ে নিশির শিশির।
হেম-তনু হৈমন্তিক নোয়াইল শির॥
চন্দ্র সূর্য্য উভয়ের তেজ হ'ল হীন।
ঘরে ঘরে লোক প্রায় পীড়ার অধীন॥
ফলহীন ফুলহীন সব তরুলতা।
দূরে গেল শরতের নব মধুরতা॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।
মেদিনীপুর।

কপালকুণ্ডলা।

বঙ্কিমবাবুর "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাস বঙ্গবিখ্যাত। কেবল নামে বিখ্যাত নয়, গুণেও কপালকুণ্ডলা একটী রত্ন বিশেষ। "কপালকুণ্ডলা" একটী নবীন তপস্বিনী। পুস্তকখানি গদ্যে লিখিত বটে, কিন্তু কাব্যরসে পরিপূর্ণ। এ উপন্যাসে কবিত্ব প্রচুর, ভাবও অতি সুন্দর। উপন্যাস না বলিয়া পুস্তকখানিকে কাব্য বলা যাইতে পারে।

বঙ্গের নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি এই কাব্য মোহিনী "কপালকুণ্ডলা"কে নাট্য অলঙ্কারে সাজাইয়াছেন। যথার্থ যোগ্যপাত্রের হস্তেই এই নাট্যসজ্জা। যে সকল কাব্যে নরনারী চরিত্রের স্বাভাবিক চিত্র থাকে, সে সকল কাব্য রঙ্গালয়ে অভিনীত হইলেই ভাল মানায়। বঙ্কিম বাবুর "কপাকুণ্ডলায়" দুটি চরিত্র সমুজ্জ্বল,—কপালকুণ্ডলা আর মতি বিবি। এই দুটি চরিত্র পরস্পর বিরোধী। কপালকুণ্ডলা সংসারবিরাগিনী মূর্ত্তিমতি সরলতারূপিনী দেবী বিশেষ, আর মতিবিবি সংসারের

ভোগসুখবিলাসিনী, অতি বুদ্ধিমতি সংসারবাসিনী চতুরা রমণী। নাটকের সকল অঙ্কই উত্তম, তথাপি এখন এই দুটি প্রধান চরিত্রের বিচার।

বঙ্কিমবাবুর "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসের অক্ষরে আছেন, রঙ্গমঞ্চে সেই কপালকুণ্ডলা যেন সজীব বলিয়া বোধ হয়। বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা মূর্ত্তিমতী হইয়া মানুষের চক্ষের সম্মুখে আসেন না, গিরীশবাবুর কপালকুণ্ডলা রঙ্গালয়ের রঙ্গমঞ্চে আপন স্বভাব প্রদর্শন করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে বিমোহিত করিতেছেন। প্রতিরূপ দর্শন করিয়া দর্শকের মনে কপালকুণ্ডলার প্রতি অধিক ভক্তি জন্মিতেছে। মতিবিবির চরিত্র সম্বন্ধেও ঐরূপ। অপরাপর নায়ক-নায়িকার চরিত্রগুলিও এ নাটকে সবিশেষ পরিস্ফুট করা হইয়াছে। বিশুদ্ধ কাব্যকে নাটকাকারে সজ্জিত করিয়া অভিনয় দেখাইতে পারিলে পাঠকের ও দর্শকের মন আদি পুস্তক অপেক্ষা অধিক আকৃষ্ট হয়, এ কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। কাব্যকে নাটক করার অনেক গুণ।

বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলাকে নাটকাকারে সজ্জিত করিয়া নাট্যবিশারদ পণ্ডিত গিরীশচন্দ্র ঘোষ সেই সকল গুণ এই নাটকে প্রকৃষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়াছেন। নাটকখানি কেমন হইয়াছে, আমরা তাহার আদর্শ দেখাইব। পাঠক মহাশয়েরা অনেক স্থলে অনেক নূতনত্ব দেখিতে পাইবেন।

একটি কথা এইখানে বলা আবশ্যক। কতদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা প্রকাশ হইয়াছে, এতদিন ইহার গুণাবলী বহুলোক মুখে বিঘোষিত হয় নাই, পাঠকেরা পাঠ করিয়া কেবল মনে মনে আনন্দ লাভ করিয়াছেন মাত্র; বেশী যদি কিছু হইয়া থাকে, এই হইয়াছে যে, রমেশবাবু কপালকুণ্ডলা পাঠ করিয়া উমেশ বাবুকে বলিয়াছেন, "বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলাখানি বড় সুন্দর পুস্তক।" এই পর্য্যন্ত।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ সেই পুস্তকখানি নাট্যাকারে পরিণত করিয়া কলিকাতার ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখাইতেছেন। অভিনয় দর্শন করিয়া আজকাল অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বড় বড় সাহিত্যবন্ধু কপাল-কুণ্ডলার কথা লইয়া বিশেষরূপ সমালোচনা করিতেছেন, মুখে মুখে নহে, অভিপ্রায়যুক্ত দীর্ঘ দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সমাচারপত্রে ছাপাইয়া দিতেছেন। ভালই হইতেছে। এতদিন এই পদ্মফুলটি যেন গহন বনে লুকাইয়াছিল, এখন ঐরূপ আলোচনার গুণে সকলের মন সেই পদ্মের দিকে সমাকৃষ্ট হইবে। নাটকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া পণ্ডিত মালাকার বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষ

সেই বনের পদ্মটি নগরে আনিয়া রোপণ করিলেন, সেইজন্য চতুর্দ্দিকে এই শুভ আন্দোলন। পদ্মের ভাব কেমন, পাঠকগণ অপেক্ষা করুন, তাহার আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

তারা।

(১)

"তোর মুখে আগুন! এই সামান্য কথাটার মানে তুই বুঝতে পাল্লিনি?"

স্ত্রীকণ্ঠে কে যেন কাহাকে এই কথাগুলি বলিল। দ্বিতীয় স্বরে উত্তর হইল, "না ভাই! আমি ত কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। কাদের কথা বল্‌ছিস্? কুলের কুলবধূ, বিবিলোকের মত পোষাক, ঘোমটার বিসর্জ্জন, বিলেতী বুলি মুখে, সোয়ামীকে গোলাম করা, এ সকল কি কথা?"

সহরের শ্যামবাজার অঞ্চলে দিব্য একখানি দোতালা বাড়ী; আড়াই মহল;—সদর অন্দর দুই মহল, আর—বাবুলোকের, বধূলোকের নির্জ্জন স্নানের নিমিত্ত একটী অর্দ্ধ মহল, এই আড়াই মহল। বাড়ীর বাহিরে উত্তরাংশে নীচু নীচু প্রাচীর দিয়া ঘেরা সুন্দর একটী ফুলবাগান; ধারে ধারে দুটী একটী পিচ গাছ, লেবু গাছ, গোলাপ জামের গাছ আর বড় বড় চাঁপা ফুলের গাছ; বাগানের মাঝখানে একখানি আটচালা ঘর,—সাহেবী ধরণের বাংলা। চতুস্পার্শে অনেকটা খালি জায়গা। আটচালায় কেহ বাস করে না, মধ্যে মধ্যে রাত্রিকালে বাড়ীর দুই একজন দরোয়ান শয়ন করে। বাড়ীতে দরোয়ান পাঁচজন; তন্মধ্যে একজন স্বতন্ত্র এক-খানি ঘর ভাড়া করিয়া পরিবার লইয়া থাকে; সে ঘরখানিও বাবুর বাড়ীর নিকটে। দরোয়ানটি একজন ব্রজবাসী, পত্নীটি পরমাসুন্দরী, পত্নীর গর্ভে একটী কন্যা জন্মিয়াছে, কন্যাটীও পরম রূপলাবণ্যবতী সুন্দরী; কন্যাটীর নাম তারাসুন্দরী; সুন্দরী প্রায় কেহই বলে না, সকলেই বলে, তারা। যখনকার কথা, কন্যার বয়স তখন প্রায় আট বৎসর।

বাড়ীর পরিচয় হইল, বাগানের পরিচয় হইল, দরোয়ানের পরিচয় হইল, এখন বাকী রহিতেছে বাবুর পরিচয়। বাবুর নাম বাবু নীলমণি দে; মাতা পিতা নাই, সহোদর ভ্রাতা নাই, আছে একটী বয়ঃকনিষ্ঠ

পিতৃব্য পুত্র; সেটির নাম জলধর। বাবুর দুই সংসার; এক সংসার স্বর্গে, দ্বিতীয় সংসার এই মর্ত্ত্যধামে। দ্বিতীয় পক্ষের বনিতাটি যুবতী, বিদ্যাবতী, বুদ্ধিমতী, পতির উপর প্রভুত্ব করিতে যত্নবতী; রূপের কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, মাঝামাঝি, মন্দ অল্প রূপবতী।

ঐ বাড়ীর দুইজন কিঙ্করী পরস্পর প্রথমোক্ত কথাগুলি বলাবলি করিতে করিতে খিড়কী দরজার সম্মুখের গলিপথ বাহিয়া রাস্তায় আসিতেছিল, রাস্তায় আসিয়া কথা ছাড়িয়া দিল। দাসীরা যাহা বলাবলি করিতেছিল, দাসীর মুখে না শুনিয়া লেখকের লেখনীমুখে শ্রবণ করিলেই লেখকের আশা পূর্ণ হইবে।

(২)

বাবুটির নাম নীলমণি দে; বাবু কিন্তু আপনাকে বাবু বলাইতে অথবা বাবু নামে পরিচিত হইতে নারাজ; তিনি বলাইতে চান, মিষ্টার ডি; তিনি আহার করিতে চান ইংরাজী ডিস্, পরিধান করিতে চান ইংরাজী ড্রেস; এই তিনটি "ডি" তাঁহার বড় প্রিয়; তিনি একটি প্রকৃত সাহেব। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীটিও তাহার উপযুক্ত হইয়াছে;—নামে তিনি কুলবধূ, ব্যবহারে বিবি। দ্বিতীয়া কিঙ্করী যে সব কথার মানে বুঝিতে পারে নাই, সে সব কথার অধিকারিণী ঐ বিবিটি। "দাঁতে মিশি, শাড়ী পরা শেম শেম শেম!" এই নজীরের দোহাই দিয়া, তিনি গাউন পরেন, বনেট মাথায় দেন, পতির বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মিহিসুরে ইংরাজী ভাষায় কথা কহেন, বিলাতী ধরণে "মিসেস্ ডি" উপাধি লইতে তিনি অভিলাষিণী নহেন। নীলমণিকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "স্ত্রীপুরুষের সমান পদ, সমান পদবী; স্বামীর উপাধিতে পত্নীরা পরিচিতা হয় কেন, তাহা আমি বুঝি না; তুমি আমাকে তোমার উপাধিতে 'মিসেস ডি' করিতে চাও, আমি তাহা কেন হইব? আমাকে ঐরূপ না করিয়া, তুমি বরং আমার উপাধি ধরো;—তোমারে বিবাহ করিবার অগ্রে আমার নাম ছিল, 'মিস্ মীরাবিবি বাসু;' সেই নাম লইয়া তুমি এখন হইয়া যাও—মিষ্টার মীরাবিবি বাসু।"

বঙ্গের যে কুলবধূ আপন পতিকে এমন কথা বলিতে পারে, সে কুলবধূ করিতে পারে না, এমন কর্ম্ম সংসারে নাই। মীরাবিবি স্বামীকে গ্রাহ্য করেন না, স্বামীর ইচ্ছা অপেক্ষা তাঁহার ইচ্ছা বড়, সর্ব্বদা এই

কথা বলেন, কাজেও তাহা দেখান। স্বামী প্রকৃত সাহেব, তিনি প্রকৃত বিবি, টেবিলে এক সঙ্গে খানা খাওয়া হয়, ক্ষটিকপাত্রেরও মর্য্যাদা রক্ষা হয়, কেবল স্বামী সঙ্গে নহে—ভোজের টেবিলে স্বামীর দুটি পাঁচটি বন্ধু-বান্ধব থাকেন;—সম্পর্কে ভাসুর হন, কিম্বা মামাশ্বশুর হন, তাঁহারাও থাকেন; বিবি সাহেবের নিজের বন্ধুও দুটি একটি না থাকেন এমন নয়; বিবির মাথায় ফুলদার বনেট, বুকে কাঁচলী আঁটা।

সাহেব-বিবিতে ভালবাসা কেমন, তাহার পরিচয় কি কেহ শুনিতে চান? ভালবাসা নাই। দেশের ভিতর এত পণ্ডিত থাকিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুখ্যাতি করিতে মীরাবিবি বেশ পটু, অধিক পরিচয় কি, নীলমণিকে তিনি একদিন স্পষ্ট বলিয়াছেন, "নীলমণি কলিকাতা সহরে ভয়ানক প্লেগ রোগ হইতেছে, হঠাৎ তুমি যদি এই রোগে মরো,—হাঁ ভাল কথা! তোমাদের দেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন খাসা লোক, হঠাৎ যদি প্লেগ রোগে তুমি মরো, বিদ্যাসাগরের কল্যাণের জন্য এই বেলা আমি একটি দ্বিতীয় পতি মনোনীত করিয়া রাখি, তুমি অনুমতি কর। অনুমতি কর আর নাই কর,—তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিব না, আমি তোমারে বিবাহ করিয়াছি, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলিতে নাই,—তোমাদের বিজয়া দশমীর দিন রাত্রে তোমার বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে একটি বন্ধুকে আমি 'দ্বিতীয় বর' বলিয়া মনোনীত করিয়াছি, বিজয়ার আলিঙ্গন করিয়াছি, তুমি কি ইহার অন্যথা করিতে পারিবে? সাধ্য কি?"

বাবু নীলমণি বিবিটির এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হিংসায় জ্বলিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যদি না মরি, তাহা হইলে তোমার মনোনীত দ্বিতীয় বরের কি গতি হইবে?"

প্রশ্নের উত্তরে বিবি আবার আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "ঐ দুঃখই বড় হয়। আমাদের মধ্যে কুসংস্কার অনেক; ডাইভোর্সের বিধি নাই! তুমি যদি না মর, আমি তোমারে ডাইভোর্স করিতে পারিব না, তোমাদের শাস্ত্রে মানা আছে; শাস্ত্র আমি মানিব না,—মানিও না, আপন ইচ্ছায় আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব, নূতন বরকে বিবাহ করিব। যাহাকে পতি বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, তাহাকে আমি ফেলিতে পারিব না। আরও ধর, পূর্ব্বে এ দেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা শত শত বিবাহ করিত, এখনও কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরে অনেকে দুই তিন বিবাহ করে, তাহাতে

দোষ হয় না, গুণ হয়; তোমাদের পক্ষে যদি এ বিধি আছে, আমাদের পক্ষে না থাকিবে কেন? তুমি বর্ত্তমানে দ্বিতীয় বরকে আমি বিবাহ করিব।"

ঈর্ষার আগুনে অধিক জ্বলিয়া মিষ্টার নীলমণি দে আকাশপানে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ও ব্যবস্থা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, খৃষ্টান বন্ধুগণ এক বিবি বিদ্যমানে দ্বিতীয় বিবি গ্রহণ করেন না।"

অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া মীরাবিবি বলিলেন, "আমি এখনও ততদূর খৃষ্টান হই নাই; তোমার ললিতমোহনকে আমি বিবাহ করিবই;—দুই সংসার লইয়া ঘর করা আমার পক্ষে কষ্টের কারণ হইবে না—সুখের হইবে; তুমি যদি আমারে—দ্বিতীয় বরটি বিবাহ করিয়াছি, এই বলিয়া তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও, করিতে পার, স্বচ্ছন্দে করিও; থাকিতে না পার, তোমাদের দেশের একটি অশিক্ষিত কন্যাকে বিবাহ করিও, বেশ লাল লাল কস্তা পেড়ে শাড়ী পরিবে, ঘোর ঘোম্‌টায় কলাবৌ সাজিবে, দাঁতে মিশি দিবে, চক্ষে কাঁজল দিবে, বেশ পেটে পাড়িয়া শক্ত শক্ত দড়ি দিয়া, মাথার মাঝখানে খোঁপা বাঁন্ধিবে, দুই হাতে দুই জোড়া শাঁখা পরিবে, চারি গাছা ছয় গাছা মল বাজাইবে, বেশ হইবে, সুখে থাকিবে। থাকিও, থাকো;—এই অগ্রহায়ণের পঞ্চবিংশ দিবসে শুভ বিবাহের শুভদিন, শুভলগ্ন লেখা আছে, সেইদিন রাত্রি দশটার পর ললিত-মোহনকে আমি বিবাহ করিব, তুমি ওদিকে তোমার নূতন বউমার রূপ দেখিয়া দেখিয়া মূর্চ্ছা যাইবে।

(৩)

নীলমণির বাড়ীর দাসীরা ঐ সকল কথাই বলাবলি করিতেছিল। তাহাদের কথার ভিতর আরও কথা ছিল। যে বাড়ীতে ঐ রকম কাণ্ড, কুলবধূ যে বাড়ীতে বিবি, বিবির হুকুম যে বাড়ীতে অকাট্য, যে বাড়ীতে পতির উপর কুলবধূর অশ্রদ্ধা, যে বাড়ীতে পতি বিদ্যমানে বাড়ীর কুলবধূ দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিতে চায়, সে বাড়ীতে থাকিতে নাই। দাসীরা ছোট লোকের মেয়ে, মনের ঘৃণায়—সংস্কার বশে তাহারাও বুঝিয়াছিল, ওটা অধর্ম্ম, বুঝিয়াই স্থির করিয়াছিল, অধর্ম্মের বাড়ীতে থাকিতে নাই। মিষ্টার নীলমণি যে বিষয়সম্পন্ন সুশিক্ষিত লোক হইয়া, কিরূপ স্বচ্ছন্দ মনে অতঃপর সেই বাড়ীতে বাস করিবেন, একটি যুবতী স্ত্রীলোকের দুইজন "পুরুষ সতীন" ইহা তিনি কিরূপে সহ্য করিবেন, ভাবিবার বিষয় বটে!

যাহাদের ভাবনা, তাহারা ভাবুক, ২৫শে অগ্রহায়ণে বিবাহ, সে শুভ দিনেরও বিলম্ব আছে, এই অবসরে আমরা একটি বিয়োগান্ত পরিণয় ঘটনার পরিচয় প্রদান করিব।

সেই যে ব্রজবাসী দরোয়ান, যাহার একটি মাত্র কন্যা, যে কন্যার নাম তারা, সেই কন্যার বিবাহ উপস্থিত। নির্দ্ধারিত দিবসে বিবিধ খোট্টাবাদ্য বাজাইয়া ভাল ভাল আলো জ্বালিয়া,—মহা সমারোহে বর আসিল, বরযাত্র প্রায় আড়াই শত। বেচারা ব্রজবাসী কোথায় অত লোকের স্থান দিবে, ছোট একখানি ঘর, লোক অনেক। উপায় ভাবিয়া ব্রজবাসী তখন বাবুর আশ্রয় লইল। নীলমণি বাবু সেদিকে বেশ সদাশয় লোক, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিজের বাগানে বর ও বরযাত্র রাখিবার হুকুম দিলেন। বর দেখিতে নিতান্ত মন্দ নয়, বয়স অনুমান ২০।২৫ বৎসর।

বরের দল বাবুর বাগানবাড়ীতে আসিল, সেখানেও অনেক আলো জ্বলিল, সভা হইল;—সকলকার মস্তকেই নানাবর্ণের এক এক পাগড়ী, শোভা বড় চমৎকার হইয়াছিল। রাত্রি দশটার পর লগ্ন; সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ হইতে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছিল, ভোজনের অপরাপর আয়োজনও ঠিক হইয়াছিল। রাত্রি যখন প্রায় আটটা, সেইসময় বরের জ্বর হইল, গাল গলা ফুলিল, তখনকার ঐ রকম জ্বরের সাধারণ নাম প্লেগ, নূতন বরের প্লেগ হইল, বিবাহ হইল না। ভোজনের আয়োজন সমস্ত পণ্ড হইল, সকলেই উৎসাহভঙ্গ হইয়া পড়িল। বরের অনেক চিকিৎসা হইয়াছিল, কিছুতেই কিছু হইল না। পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় বরের মৃত্যু হইল, সকলের হৃদয়ে বিষাদ বাড়িল; একটা গোলমাল পড়িল।

গোলমালটা এই যে, যাহা হইবার, তাহা ত হইয়া গেল, এখন সেই কন্যার গতি কি হয়? ব্রজবাসীদেরও ব্যবহার আছে, যে কন্যার গাত্র-হরিদ্রা হয়, নির্দ্দিষ্ট দিনে বিবাহে বাধা পড়িলে পাঁচদিনের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে; অভাগিনী তারার অধিবাস পর্য্যন্ত হইয়াছিল; পাঁচদিনের মধ্যে বিবাহ না দিলে জাতিতে খোঁটা হয়, সেইজন্য শীঘ্র শীঘ্র আর একটি পাত্র খুঁজিয়া আনিয়া, শোকার্ত্ত ব্রজবাসী তিনদিনের মধ্যে বিবাহ কার্য্য শেষ করিয়াছিল; কন্যা জামাতা এক্ষণে নিরাপদে বাঁচিয়া আছে।

বিবাহ রজনীতে অকস্মাৎ বরের মৃত্যু হইলে এদেশের অনেক স্থলে মহাদায় উপস্থিত হয়। পাঁচদিনের মধ্যে ভাল ঘরের নূতন পাত্র প্রাপ্ত

হওয়া যায়, সচরাচর সে সুবিধা ঘটে না, সুতরাং কোনও কোনও স্থলে জাতিকে ছোট করিয়া ব্যবহারকে বড় করা হয়। প্রবোধ নাই;—বিধাতার কার্য্য বলিয়াই প্রবোধ পাইতে হয় মাত্র।

মিষ্টার নীলমণি দে স্বতন্ত্র হইলেন, বাড়ী হইতে স্থানান্তর নহেন, পত্নী হইতে স্বতন্ত্র। ললিতমোহনের সহিত মীরা বিবির বিবাহ হইল, মীরা বিবি ললিতের বাড়ীতে গেলেন, পূর্ব্ব স্বামীকে ভুলিলেন। একটা উপকার হইল, মিষ্টার নীলমণি দে ওরফে মিষ্টার ডি ঐ বিবাহের পর বাবু নীলমণি হইলেন, হ্যাট কোট দূরে ফেলিয়া দিলেন, বিলাতী ডিসের গন্ধ আর সহিতে পারিলেন না, নূতন একটি গৃহস্থকন্যাকে বিবাহ করিলেন। কন্যাটি যথার্থই কুলবধূ হইল! নীলমণির স্বভাব ফিরিয়া গেল; দাসীরাও সন্তুষ্ট হইল। ছয় মাস পরে সংবাদ রটিল, ললিতমোহন মরিয়া গিয়াছে, মীরাবিবি এখন নীলমণির কাছে ফিরিয়া আসিলেন, কিম্বা তৃতীয় পাত্র অন্বেষণ করিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

সমাপ্ত।

ভোরের বেলা।

(১)

কে তুই আসিলি বালা,
নিঝুম ভোরের বেলা,
ঊষার আলোক হ'তে।
পুন কেন চলে গেলি,
এসেছিলি যেই পথে।

(২)

চঞ্চলা চপলা মত,
বিকাশি কিরণ শত,
ডুবিলি গগন-পটে।
কাহারে খুঁজিতে বল,
তাড়াতাড়ি এলি ছুটে।

(৩)

সুকোমল শয্যাকোলে,
আপনা জগত ভুলে
ছিনু সুখে ঘুম ঘোরে।
কেন মিছে গাঢ় ঘুমে,
বাধা দিলি স্নিগ্ধ ভোরে।

(৪)

নীরবে নীরবে এসে,
দেখা দিয়ে আধ হেসে,
কোথায় পালালি বল?
পলকে লুকালি কোথা,
এ আবার কোন্ ছল।

(৫)

পরাণে যাতনা বাণ,
করে হৃদি খান খান,
হয়েছি পাগল পারা।
কেন এ ছলনা তারে,
কেন তারে দগ্ধে মারা।

(৬)

একবার আয় বালা,
তেমনি ভোরের বেলা,
হেরিব মনের মত;
তোর ও বদনখানি,
লজ্জাভরে অবনত।

(৭)

ওচারু বদন ঘিরে
কেশ-গুচ্ছ ধীরে ধীরে,
সমীরে নাচিবে বালা;
কানেতে দুলিবে দুল,
সোহাগে করিবে খেলা।

(৮)

তোর ওই শোভা রাশি,
হেরিবারে ভালবাসি,
তাই ডাকি বার বার।
ছলনা চাতুরী ফেলি,
আয় বালা একবার।

(৯)

সে বিমল আভা তব,
সেই হাসি অভিনব,
সদাই প্রাণেতে ভায়।
তোর সে নয়ন দু'টী
পরাণ বিঁধেছে তায়।

(১০)

বায়ু বহে ঝর্ ঝর্,
নদী বহে তর্ তর্
ঊষার কিরণ মাখি,
অদূরে বিটপীশিরে,
কুলুঙ্বরে ডাকে পাখী।

(১১)

এমনি সময়ে মম
চিন্তামগ্ন গাঢ়তম
এ পোড়া হৃদয়মাঝে,
তোর ওই মধু তান
মরমে মরমে বাজে।

(১২)

তোর ওই প্রেম-ছবি,
উজ্জ্বল-প্রভাত-রবি,
এ হৃদি জুড়িয়া রয়।
বড় সাধ তোর সনে,
প্রাণ করি বিনিময়!

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সমর্পণ।

প্রভো!

অখণ্ড সচ্চিদানন্দ! সম্মুখে আমার,
নিত্য তব অবস্থান যুগ যুগান্তর,
বহু পূর্ব্ব জন্ম হ'তে শ্রীপদ তোমার
দেখিতেছি নিত্য যেন অমৃত-সাগর।

(২)

অনন্ত অব্যয়, তুমি জানি হে নিশ্চয়,
একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ সনাতন!
ব্রহ্মাণ্ড শরীরে তব হইবে বিলয়,
স্থাবর জঙ্গম লবে তোমার শরণ।

(৩)

তুমি আদি মধ্য অন্ত অতি দূরতর,
কভু বা তোমারে হেরি, সম্মুখে আমার,
বসিয়া বিরাটরূপে ব্যাপিয়া অম্বর,
দূর করিতেছ মম মোহ অন্ধকার।

(৪)

জগতের পিতা তুমি, সৃষ্টিকাল হতে,
"তত্ত্বমসি" মহাবাক্য করিছ নির্গত,
কৃতাত্মা মনিষীগণ চলি তব পথে
হংসারূঢ়া ব্রহ্মা সন্ধ্যা উপাসনে রত।

(৫)

নিত্য নিত্য প্রভাময় সবিতার প্রায়
কর্ম্ম উপাসনা তরে সুসংযত মন,
হেরি তেজঃপুঞ্জ কান্তি জ্যোতির্ম্ময় কায়,
বৃষারূঢ়া মধ্যসন্ধ্যা ধ্যানেতে মগন।

(৬)

হৃদয়ের প্রাচীদিক্ রঞ্জি রক্তিমায়
অস্তপ্রায় যবে প্রভো জগতলোচন!

চারিবেদ সার ভাগ রাখিলা ধরায়,
স্মরিয়ে সায়ংসন্ধ্যা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥

(৭)

শব্দরূপী জানি তোমা পুরুষ প্রধান
পুণ্য গঙ্গাস্রোত প্রায় দেখি বার বার।
"সর্ব্বস্ব গুরবে নমো" বলি মনে মনে
শরণ ল'তেছি আজি চরণে তোমার॥

বীণা।

ও গো, কেবা বেঁধে দিবে আমার এ বীণা!
বেসুরা যে বাজে কাণে
ভুলে যাই লয় তানে
পুরাতন ছিন্নতন্ত্রী বাজাতে পারি না;
কোথায় কোমল রবে
কোন্ সুরে লয় হবে
ঝঙ্কারিলে কোন্ তারে, বাঁধিতে জানি না
ওগো, কেবা বেঁধে দিবে আমার এ বীণা!
আজি স্বপনের প্রায়
কতদিন পরে হায়
বিস্মৃত সে সুর লয় পড়ে গেছে ম'নে,
বেজেছিল কোন্ দেশে
এখনও তাহার রেস
সুরাধারা ঢালিতেছে আমার শ্রবণে,
কবে কার কথা সে যে প'ড়ে গেছে মনে!
জীবনের তন্ত্রীগুলি
একে একে গেছে খুলি

উৎসাহ আলোক শিখা এসেছে নিভিয়া,
কল্পনার সূত্র ধরি
দিন মাস বর্ষ হরি,
সেই এক পুরাতন সঙ্গীত ভাবিয়া
সেও যেন ঐ সুরে যাইত ডুবিয়া।
সে সুর ছিল না মনে,
আজি যেন কোন্‌খানে
বাজাইছে বীণা কেহ সে দিনের (ই) মত,
সর্ব্বস্ব লইয়া তুলি
সুর সঙ্গে দেয় ঢালি,
আশা অভিলাষ সুখ স্নেহ শত শত,
মিশাইয়া সেই সুরে সে দিনের (ই) মত।
বিষম লজ্জার ভরে
আড়ালে মধুর স্বরে
সে দিনের (ই) মত যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া,
তুলিছে অস্ফুট তান,
সুর সঙ্গে অভিমান
লজ্জা, ভয়, অবিশ্বাস র'য়েছে মিশিয়া
সে দিনের (ই) মত গান গাহিছে কাঁপিয়া।
যেন যুগান্তের কথা
আছে সেই সুরে গাঁথা
প্রতি ঝঙ্কারেতে তার অগাধ করুণা,
সে দিনের সেই ভাবে
আজি সুর দিতে হবে,
বাজাইতে চাহি বীণা বাজাতে পারি না,
ওগো, কেবা বেঁধে দিবে আমার এ বীণা॥

শ্রীদেবব্রত কবিরত্ন।

সমালোচনা।

১। মহামতি-রাণাডে।—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত, মূল্য দশ পয়সা। মহাদেব রাও গোবিন্দ রাণাডে বোম্বে হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র ও কার্য্য সর্ব্বজন প্রশংসিত। পণ্ডিত দেউস্কর মহাশয় রাণাডে মহোদয়ের পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয়ের সহিত তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আদর্শচরিত্র বলিয়া এই চরিত্রকে গণনা করা যাইতে পারে। ভাষা সুললিত, বৃত্তান্তগুলিও পাঠ করিয়া স্মরণ রাখিবার যোগ্য।

২। আনন্দীবাই।—এখানিও উক্ত দেউস্কর মহাশয় প্রণয়ন করিয়াছেন। আনন্দীবাই জোশী চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া এম, ডি, উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তাঁহার সুন্দরী প্রতিমা এবং জীবন-চরিত আছে। আমরা এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম।

৩। বাজীরাও।—এখানিও ঐ গ্রন্থকারের বিরচিত। বাজীরাও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহৎ লোক, তাঁহার জীবনচরিত ঐতিহাসিক প্রণালীতে যেরূপ চিত্রিত হওয়া উচিত, পণ্ডিত দেউস্কর মহাশয় সেই পন্থা অবলম্বন করিয়া সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। বাজীরাও চরিত্র আলোচনা করা বঙ্গবাসী পাঠক মাত্রেরই কর্ত্তব্য; এতৎ পাঠে প্রীতি ও শিক্ষা, উভয়ই লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

৪। এটা কোন যুগ?—এই প্রশ্ন দিয়া ঐ বহুদর্শী পণ্ডিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সংসারের যুগ বিচার করিয়াছেন। স্মৃতি, মহাভারত এবং হরিবংশের বিশেষ বিশেষ পাঠ এতৎগর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে। শাস্ত্র-প্রমাণে বর্ত্তমান যুগের নাম কলিযুগ। এই যুগে পৃথিবীর চারিখণ্ডে মানব-মণ্ডলীর জীবন ও আচার ব্যবহার কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, ক্রমশঃ উঠিতেছে কি নামিতেছে, এ পুস্তিকায় দেউস্কর মহাশয় তাহার বিচার করেন নাই। উপসংহারে কিঞ্চিৎ আলোচনা রাখিলে ভাল হইত।

৫। ঝাঁশীর রাজকুমার।—এখানিও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের প্রণীত। ঝাঁশীর পূর্ব্বাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া লর্ড ডালহাউসির শাসন কাল পর্য্যন্তের স্থূল স্থূল বিবরণ এই পুস্তকে আছে।

রাজা গঙ্গাধর রাও আপনার শিশুপুত্র বিয়োগে একটি জ্ঞাতিপুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুত্রের নাম দামোদর রাও; তাঁহার নামেই এই পুস্তকের নাম ঝাঁশীর রাজকুমার। রাজা গঙ্গাধরের মহিষী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাই। রাণীর এবং রাজকুমারের দুঃখ কাহিনীতে এই পুস্তকের শেষভাগ পরিপূর্ণ। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ঝাঁশী রাজ্য ততদিন হিন্দুরাজ্য, ততদিন হিন্দুরাজার শাসনে থাকিবে, ইংরাজেরা এইরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। ইংরাজের কূট নীতি বার বার সেই সন্ধি ভঙ্গ করিয়া দামোদর রাওকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করে, তাহার পর যাহা যাহা হয়, রাণী লক্ষ্মীবাই এবং কুমার দামোদরের ভাগ্য, তাহাকে দেখাইয়া সকলকে কাঁদাইয়াছে। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া অশ্রুপাত করিতে হয়। লর্ড ডালহাউসির নীতি প্রভাবে দামোদর রাও রাজা হইতে পারেন নাই। ডালহাউসি বাহাদুর ঐ রাজ্যটি গ্রাস করিয়া গিয়াছেন। তাহার অব্যবহিত পরেই ভারতে সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত। পুস্তকের শেষাংশের বর্ণনা মর্ম্মভেদিনী। যাঁহারা বাঙ্গালাভাষা জানেন, তাঁহাদের সকলকেই আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের অশ্বারোহিণী রণরঙ্গিণী প্রতিমা এবং রাজকুমার দামোদরের বিমর্ষ প্রীতিরূপ এই পুস্তকের প্রথমে সন্নিবেশিত আছে। পুস্তকের মূল্য আট আনা মাত্র।

মনোরমা।—কেশ-তৈল, আমরা ইহার একশিশি উপহার পাইয়াছি। ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম উপকারী না হইলেও গুণবর্জ্জিত নহে। মনোরমার সৌরভ তৃপ্তিকর, দীর্ঘকাল স্থায়ী, মূল্যও সুলভ। আমরা এই সৌরভময় কেশ-তৈলের প্রচার কামনা করি।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

দ্বাদশ বর্ষ। } পৌষ, ১৩১০ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

জাতীয় মহাসমিতি।

২৮, ২৯, ৩০শে ডিসেম্বর দিবসত্রয় মাদ্রাজের ক্যাথলিক গার্ডেন উদ্যানবাটীকায় ভারতের জাতীয় মহাসমিতির ঊনবিংশ সাম্বাৎসরিক মহা সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গত ২৬শে ডিসেম্বর শনিবার সমিতির নবযত্ন-সাধিত তৃতীয় বার্ষিক শিল্প কৃষি প্রভৃতি প্রদর্শনী বসিয়াছিল, ৩০শে ডিসেম্বরে তাহা শেষ হইয়াছে। মহিশূরের মহারাজ মহোৎসাহে প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন, মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড আমথিল, তৎপত্নী লেডি আমথিল, এবং মহিশূরের মহারাণী উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ দান করাতে এবার প্রদর্শনীর বিশেষ গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে, শিল্পজাত বস্ত্রাদি এবং কৃষিজাত ফল পুষ্পাদি প্রদর্শিত সমস্ত সামগ্রীই সমস্ত দর্শকের মনোরঞ্জন করিয়াছিল, আমাদের জাতীয় সমিতির একটি মহৎ ও প্রধান অনুষ্ঠান—এই প্রদর্শনী মেলা বর্ষে বর্ষে যাহাতে ইহার অঙ্গরাগ বর্দ্ধন এবং পরিপুষ্টি সাধন হইতে পারে, দেশীয় জনগণের তদ্বিষয়ে অন্তরের সহিত যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, এই প্রদর্শনীর উপকারার্থ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট দশসহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। অনেকে আবার আমাদের এই জাতীয় সমিতিটিকে বড় একটা সরল নয়নে দর্শন করেন না, সেটা হয় ত আমাদের অদৃষ্টের দোষ, কিন্তু প্রদর্শনীতে সাধারণের অনেক উপকার, উদারচিত্ত রাজপুরুষেরা ইহার সহিত সহানুভূতি দেখাইলে দেশের একটি মহা উপকার সাধিত হইবে, তাঁহারাও আমাদের ধন্যবাদার্হ হইবেন। আদর্শ মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট।

উপর আপনার পদমর্য্যাদা অথবা চাকরি অথবা দুই একখানা পুস্তকের গ্রন্থকার ইত্যাদি গোটাকতক উপাধি সংযোগ করা যেন চাই-ই চাই। কোন গ্রন্থকারের পদমর্য্যাদাদি কিছুই না থাকিলে অন্ততঃ "রায়কুমারী, রাসবিহারী, পাগলা প্যারি" প্রভৃতি থানকতক উদ্ভট পুস্তকের নামগুলাও আপন নামের মাথায় উপর যোগ করিয়া দেওয়া হয়।

সম্প্রতি বঙ্গদেশের একটি নব্য যুবক দিব্য বাঁকাসিথি কাটিয়া আতর মাথিয়া আমাদের নিকটে আসিয়াছিলেন, উদ্দেশ্য ছিল, হস্তলিখিত একখানি ক্ষুদ্র কাব্যের আদর্শ দেখান। আদর্শখানি তাঁহার সঙ্গেই ছিল, আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক দেখিতে যাইলাম, তিনি দেখাইলেন রয়েল আট পেজি আকারে খাতাবাঁধা, খাতার উপরেই দীর্ঘচ্ছন্দে টাইটেল লেখা। টাইটেলে লেখা আছে—

ক্ষুদ্র কাব্য।

ঝিকুরে স্কুলের ভূতপূর্ব্ব তৃতীয় পণ্ডিত, জঙ্গিপুরের পুলিশ থানার অফিসিয়েটিং হেড কনেষ্টবল, শ্রীপুরডাক ঘরের ভূতপূর্ব্ব একটিং ক্লার্ক, (আমি ইংরাজী জানি) শেষকালে কমিটি পরীক্ষায় ওকালতী পাশ, *** জেলার জজকোর্টের উকীল, তথা "শ্রীদুর্গা পূজা" কৃষ্ণকেশী, রুধির মালা" প্যাচার বাসা হুগলী জেলার ভোম্বল দাস" প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রী * * * রুদ্রাক্ষ, টি, সি, জি, ই, আই, ও কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

রয়াল আট পেজি এক পৃষ্ঠায় টাইলের এই টাইটেলগুলি ধরিবে কিনা, বিষম সন্দেহ। যিনি গ্রন্থকার, তিনি কে, কোন সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি ভ্রমণ করেন, বঙ্গের সাহিত্য সংসার কস্মিনকালেও তাঁহার নাম শ্রবণ করেন নাই ; এই গেল এক কথা‚হবে ত্তীয় কথা—যে সকল পুস্তকের নাম তিনি লিব্রিং মিঃ নর্টন সঁপর পার্ব্বতী সংসারের কোন্ কর্ণই—সে সকল নাম সভাপতির আসন গ্রহণ ক্র পাতায় সকল পুস্তকের বাস্তবিক অশুদ্ধ আছে "ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বর্ষকাল এখন অত আড়ম্বর, বাজে মারকায় খাঁটি ভাবিয়াছিলাম, নিভৃতে কেবল স ল পরিচয়ে কে সেই গ্রন্থকারকে শেষকাল অতিবাহিত করিব, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদিগকে স্বগৌরবে মনোহ। গুটিকতক রাজনীতি ঘটিত বিষয়ে মন্ত লম্বা সেই সকল রাজদত্ত উপাধির হইতে হইল।" লেন

এইরূপে আসর বন্ধন করিয়া সুবিজ্ঞ সু বা।

ডুবে মরাই ভাল !

প্রথম পরিচ্ছেদ।

তুমি কাঁদ কেন ?

একটি পর্ব্বতময় প্রদেশ। তৎপ্রদেশে শতাধিক লোকের বসতি। তথাকার স্ত্রীপুরুষ সকলেই দীর্ঘাবয়ব। পূর্ণবয়সে সাড়ে তিন হাতের উপর কমবেশ আধ হাত উচ্চ।

এই বংশের একটি ত্রয়োদশ বর্ষের বালিকা আপনাদের বাড়ীর এক-ক্রোশ দূরবর্ত্তী একজন আত্মীয়ের বাঁড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। বালিকার নাম যশোমতী। পিতা বর্ত্তমান, সুতিকাগারে জননী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ; যশোমতী মাতৃহীনা, পিতার বড় আদরিণী। পিতার নাম মঞ্জনলাল। তাঁহার কিঞ্চিৎ বিষয় সম্পত্তি আছে, আয়ও মন্দ নয়, সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে, পাহাড়ী পদ্ধতিতে দু-একটা উৎসবেও ব্যয়ভূষণ করিয়া আমোদ করা হয়। মঞ্জনলাল গলদেশে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, পাহাড়ী লোকেরা পর্ব্ববিশেষে তাঁহাকে পুরোহিত বলিয়া বরণ করে। মঞ্জনলাল নীতিকথা অনেক জানেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত পার্ব্বত্য লোকেরা দলে দলে তাঁহার বাড়ীতে জমা হয়। যশোমতী জলপান দিয়া সেই সকল শ্রোতাদিগের সেবা করে।

যশোমতী আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে, একরাত্রি সেথানে বাস করিয়াছে, পক্ষাধিক হইল, তাহার পিতা একটা বিষয়-কর্ম্ম-উপলক্ষে দূরদেশে গিয়াছেন, বাড়ীতে যশোমতীর মন টেঁকে না। একরাত্রি স্থানান্তরে বাস। প্রভাতে সেই বাড়ীর অগ্নিকোণে একটা বিল্ববৃক্ষতলে যশোমতী একাকিনী বসিয়া রোদন করিতেছে। স্থানটা নির্জ্জন। দৈবাৎ বাড়ীর জনৈক বৃদ্ধা সেইদিকে গিয়া দেখিল, যশোমতী কাঁদিতেছে। বৃদ্ধাদের মায়া কিছু অধিক, কাতর হৃদয়ে নিকটে গিয়া বসিয়া সেই বৃদ্ধা সেই বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিল, "যশো! তোমার কি হইয়াছে ? তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে যশোমতী উত্তর করিল, "বাবা কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, মাসের অর্দ্ধেক ফুরাইয়া গেল, আজিও ফিরিলেন না, রাতদিন আমি কেবল তাহাই ভাবি, প্রাণ কেমন হু হু করে!"

কি যেন স্মরণ করিয়া চকিতে চাহিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, "ওহো হো! তাই বটে! তোমার বাবা তবে দেশে ছিলেন না? ঠিক্ বটে! তোমাকে বলিতে ভুলিয়াছি, কাল বৈকালে আমি যখন বাজারে গিয়াছিলাম, সেই সময় দেখি, বাজারের পথে একখানা গাড়ী; গাড়ীর দরজায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, তোমার বাবা বসিয়া রহিয়াছেন, সেই গাড়ীতে একটি মেয়ে। মেয়েটি ঠিক তোমার মতন। এই রকম সুন্দর। ভাবনা কি, তোমার বাবা বাড়ী আসিয়াছেন, তাঁর জন্য তুমি কাঁদো কেন?"

নেত্রাম্বর সহিত বালক-বালিকার অধরে মৃদুহাসি বড় সুন্দর দেখায়। "তবে আর আমি এখানে বিলম্ব করিব না," বলিয়া অশ্রুমার্জ্জন করিতে করিতে যশোমতী উঠিয়া দাঁড়াইল, সেই সঙ্গে সেই সময় বিধুমুখে একটু মধুর হাসি দেখা দিল।

বৃদ্ধা বলিল, "আর দু-দিন থাক, আমরা তোমার বাবার কাছে খবর পাঠাইব, তুমি ভাল আছ, দু-দিন পরে ঘরে যাইবে।"

মুখ ভারি করিয়া যশোমতী বলিল, "তাও কি হয় দিদি? সংসারে বাবা ভিন্ন আর কিছু আমি জানি না, কতদিন বাবাকে দেখি নাই, আর আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। এস তুমি আমার সঙ্গে, বাড়ীর সকলের কাছে বিদায় লইয়া এখনি আমি বাবাকে দেখিতে যাইব।" এই বলিয়াই যশোমতী চঞ্চলপদে বাড়ীর অন্দরের দিকে যাইতে লাগিল, বৃদ্ধা তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—(০)—

এ মেয়েটি কে?

বৃদ্ধার সঙ্গে যশোমতী বাড়ীর ভিতর গেল। বাবা বাড়ীতে আসিয়াছেন, মনে মনে আহ্লাদ, মুখে বাক্য ছিল না, মন কিন্তু নিশ্চিন্ত নহে। বালিকার মনে সংশয়ের সঙ্গে এক প্রবলা চিন্তা। বৃদ্ধা বলিয়াছে, 'বাবার

গাড়ীতে একটি মেয়ে।' কে সেই মেয়ে? বাবা কোথা হইতে সে মেয়েকে লইয়া আসিলেন? মেয়ে বুঝি আমার পিতৃস্নেহের ভাগীদার হইবে? তবেই ত আমার আদর আব্দার কমিয়া যাইবে? আমি হয় ত তাহা দেখিয়া দেখিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিব। যশোমতীর মনে এই চিন্তা প্রবলা।

যশোমতী বাড়ী যাইবে। যে বাড়ীতে ছিল, সে বাড়ীর সকলেই আর দু-দিন রাখিবার জন্য যত্ন করিল, যশোমতী তাহাদের কথা শুনিল না, পিতৃ-বৎসলা পিতৃ-দর্শনের অভিলাষে অত্যন্ত ব্যগ্র হইল, পরিবারগণের অনুরোধে বেলা দশটার মধ্যে স্নানাহার সমাপ্ত করিয়া গৃহযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। বৃদ্ধা একখানা পাল্কি ডাকিয়া আনিল, মিষ্টবচনে সকলকে সম্ভাষণ করিয়া শিবিকারোহণে যশোমতী গৃহে চলিল।

বেলা দুই প্রহরের পূর্ব্বেই যশোমতী পিতৃভবনে উপস্থিত হইয়া পিতৃ-চরণে প্রণাম করিল, আশীর্ব্বাদ করিয়া পিতা তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, যশোমতী ক্রোড়ের নিকটে বসিয়া সমাদরে মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। দু'টি একটি কথা কহিয়া চঞ্চল নয়নে যশোমতী ঘন ঘন চারিদিকে চাহিতে লাগিল; কতই যেন অন্যমনস্ক। নয়ন চঞ্চল কিসের জন্য? পিতার সঙ্গে কে আসিয়াছে, সে এখন কোথায়, সে মেয়েটিকে দেখিবার জন্য।

মেয়েটিকে দেখিবার জন্য এই মেয়েটির নয়ন চঞ্চল, অবশ্য চিত্তও চঞ্চল, যশোমতী কিন্তু তখন সে মেয়েটিকে দেখিতে পাইল না, কাজেই মানসিক আগ্রহে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! তোমার সঙ্গে একটি মেয়ে আসিয়াছে, কে সে? সেটিকে তুমি কোথায় রাখিয়াছ?"

হাস্য করিয়া মঞ্জনলাল কহিলেন, "ইতিমধ্যে সে সংবাদ তোমাকে কে দিল? আনিয়াছি একটি দিব্য মেয়ে, দিব্য শান্ত, সে তোমার ভগ্নী হয়, দেখিলেই তাহাকে তুমি ভালবাসিবে।" এই বলিয়াই দুই তিনবার নাম ধরিয়া সেই নূতন মেয়েটিকে তিনি ডাকিলেন। মেয়েটির নাম ফুলঝুরি। আহ্বান মাত্রেই হাসিতে হাসিতে ফুলঝুরি নিকটে আসিয়া দর্শন দিল।

রূপ দেখিয়া যশোমতীর আশ্চর্য্য জ্ঞান হইল। বৃদ্ধা যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক। যশোমতীর যেমন রূপ, ফুলঝুরির তদ্রূপ; যশোমতীর

যত বয়স, ফুলঝুরির তত; ফুলঝুরিও ত্রয়োদশ বর্ষীয়া। অবাক হইয়া এই দু'টি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া অনিমেষনেত্রে পরস্পরের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

অকস্মাৎ মৌনভঙ্গ করিয়া যশোমতী জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! এ মেয়েটি তুমি কোথায় পাইলে? কোথা হইতে আনিলে? ইহার সঙ্গে তোমার জানা শুনা কিরূপে হইল?" চিন্তাশীল মঞ্জনলাল কন্যার এই তিনটি প্রশ্নে পরিস্কার পরিস্কার উত্তর দান করিলেন। অনেক কথায় পরিচয়। সকল কথা লিখিতে হইলে কাহিনীটি অকারণে দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, অতএব তাহা না লিখিয়া আমাদের নিজের কথায় সংক্ষেপে সেই পরিচয় নিম্ন-ভাগে লিপিবদ্ধ করা হইল।

বাসগ্রামে মঞ্জনলালের একজন ধনবান প্রতিবাসীর একটি কন্যা ছিল, কন্যার নাম বিজলী। রূপে সেই বিজলী আকাশের বিজলীর সহিত তুলনা করিবার যোগ্য। কবিকল্পনা হইলেও এ উপমায় বোধ হয়, সারগ্রাহী-লোকেরা দোষ ধরিবেন না। মঞ্জনলালের সহিত বিজলীর পিতার বন্ধুত্ব ছিল। মঞ্জনলাল প্রায়ই মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতেন, অনেক-ক্ষণ থাকিতেন, স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা করিত না, বাঙ্গালি মেয়ের মত পাহাড়ীদের লজ্জা নাই, এই হেতু যুবতীরাও মঞ্জনলালের সহিত হাসিয়া হাসিয়া আলাপ করিত। বিজলীর বয়স যখন সপ্তদশবর্ষ, সেই সময় তাহার উপর মঞ্জনলালের লোভ পড়ে। পাহাড়ী মেয়েদের অধিক বয়সে বিবাহ হয়, আমাদের মত "অষ্টাদশ বর্ষে ভবেৎ গৌরি। নববর্ষে তু রোহিণী" ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য বচনে পাহাড়ীদের আদর নাই। সপ্তদশবর্ষীয়া বিজলী অবিবাহিতা, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য মঞ্জনলালের ইচ্ছা হয়, বিজলীও কথায়-বার্ত্তায়, ভাব-ভঙ্গিতে মঞ্জনলালের প্রতি অনুরাগ দেখায়। মনের কবাট অপর লোকে খুলিয়া দেখিতে যায় না, সে কবাট খুলিবারও চেষ্টা আমরা করিব না, বাহিরে কিন্তু দুটিতে বেশ মিল হইয়াছিল। এ দেশের পাহাড়ীরা ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবগত নহে, মেয়েগুলিকে বড় করিয়া রাখিতে হয়, কেবল এইটুকু মাত্র জানে। বিজলী-মঞ্জনের ভালবাসা অনেক পরিমাণে ইংরাজী ধরণে প্রকাশ পাইয়াছিল। মঞ্জনের ভালবাসা অকপট, বিজলীর ভালবাসা কপটতাশূন্য ছিল কি না, অন্য লোকে তাহা বুঝিতে পারিত না। বিবাহের পূর্ব্বে ইংরাজের যেমন "কোর্টসিপ" আছে, ইহাদের দুইজনেও কিছুদিন সেই-

রূপ চলিয়াছিল। কিছুদিন বলিলে সাধারণত অল্পদিন বুঝায়, ইহাদের "কোর্টসিপ" অল্পদিন বুঝায় নাই; ক্রমাগত চারি বৎসর। ভালবাসা এত-দূর উচ্চে উঠিয়াছিল যে, মঞ্জনের জ্ঞাতসারে বিজলী কোনরূপ গুরুতর অপরাধ করিলেও, নিজের বিপদ বুঝিয়াও মঞ্জনলাল তাহা চাপা দিবার চেষ্টা করিতেন, শেষে একটা বিপরীত ঘটনা হওয়াতে ঐ উভয়ের বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, বিজলী আর একজনকে মনোনীত করিয়া বিবাহ করে। সেই বিপরীত ঘটনার কথাটা এই কাহিনীর উপসংহারে প্রকাশ করা হইবে, এখন প্রকাশের সময় নয়। অন্য পাত্রের সহিত বিজলীর বিবাহ হইল, কাজে কাজে ভগ্নহৃদয়ে মঞ্জনলাল আর একটি পাত্রীকে বিবাহ করিলেন। সেই স্ত্রীর গর্ভে যশোমতীর জন্ম। যে বৎসর যশোমতী জন্মে, সেই বর্ষে বিজলীর গর্ভে ফুলঝুরির জন্ম হয়। প্রকাশ আছে, ফুলঝুরির বয়স এখন ত্রয়োদশবর্ষ, এক বৎসর পূর্ব্বে বিজলী বিধবা হয়, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও বিজলী আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করে নাই। সম্প্রতি কঠিন রোগাক্রান্তা হইয়া বিজলী শয্যাশায়িনী হইয়াছিল, সেই সময় পূর্ব্ব ভালবাসা স্মরণ করিয়া জন্মশোধ দেখা করিবার জন্য মঞ্জনলালকে সংবাদ দিয়াছিল, সেই সংবাদ পাইয়াই একপক্ষ পূর্ব্বে মঞ্জনলাল বিজলীর শ্বশুরালয়ে গিয়াছিলেন। দেখা হইয়াছিল, কথা হইয়াছিল, বিজলী কাঁদিয়াছিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা চাহিয়া ফুলঝুরিকে মঞ্জনের হস্তে সঁপিয়া দিয়া বিজলী মরিয়াছে, সেইজন্য মঞ্জনলাল ফুলঝুরিকে আপন বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছে। কেন এমন হইল, তাহার একটু হেতু জানাইয়া দেওয়া উচিত। বিজলীর স্বামী গরীব ছিল, পরিবারের মধ্যেও যোগ্য অভিভাবক কেহই ছিল না, মেয়েটিকে স্নেহ-যত্ন করে, তেমন লোকও বিজলী খুঁজিয়া পায় নাই; অতএব মঞ্জনের হস্তে সমর্পণ।

কুমারী যশোমতী পিতার প্রমুখাৎ ফুলঝুরির পরিচয় পাইল। পিতা বলিয়াছিলেন, দুটিতে তোমরা সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় সদ্ভাব-সন্তোষে বাঁচিয়া থাক। দুটিতে তাহারা সদ্ভাব-সন্তোষে সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিল। দুই বৎসর। সদ্ভাব সন্তোষ মনের ভাব, সত্য সত্য দু-জনের সদ্ভাব জন্মিয়াছিল কি না, অপরে তাহা কিরূপে জানিবে? ফুলঝুরির মাতামহ নির্ব্বংশ, ভদ্রাসন ছারখার, পিত্রালয়ে আপন বলিবার কেহ নাই, ফুল-ঝুরি পিতৃহীনা, মাতৃহীনা, সহায়হীনা, সম্পদহীনা একমাত্র মঞ্জনলাল

ভিন্ন কুমারী অবস্থায় তাহার আর গত্যন্তর ছিল না; ঐ আশ্রমটি তাহার তখনকার আশ্রয় স্থল; সুতরাং এই দুই বৎসরের মধ্যে ফুলঝুরি আর কোথাও যায় নাই। মঞ্জনলাল উভয়কেই ভালবাসেন, যেখানে সদ্ভাব সন্তোষের উপদেশ, সেখানে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম প্রকাশ পাইত; সদ্ভাবটা ছিল কিছু কিছু, তথাপি তাহার পার্শ্ব হইতে ছায়ামূর্ত্তি হিংসা একটু একটু উঁকি মারিত; সে হিংসা যশোমতীর মনের। আর এক বৎসর। যশোমতী আর ফুলঝুরি উভয়েই ষোড়শী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

প্রাণ কেন এমন হয়?

তিন বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। একদিন অপরাহ্নে মঞ্জনের বাড়ীতে একটি লোক আসিল। দিব্য সুন্দর যুবাপুরুষ; বয়স অনুমান ২৩।২৪ বৎসর; নাম ভজনরাম। এই ভজনরাম মধ্যে মধ্যে মঞ্জনের বাড়ীতে আসিত, মঞ্জন তাহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন; ক্রমশঃ ঘনিষ্টতা হওয়াতে বালিকা যশোমতী তাহাকে আদর করিয়া "ফুল" "ফুল" বলিয়া ডাকিত। ভজনরাম এবার তিন চারি বৎসরের পর দর্শন দিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া যশোমতীর আহ্লাদ জন্মিল, এক নিশ্বাসে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল,—"ফুল তুমি কেমন আছ, ফুল তুমি এতদিন কোথায় ছিলে, ফুল তুমি আমারে কি ভুলে গেছ? ইত্যাকার ঘন ঘন প্রশ্ন। ভজনরাম প্রফুল্লবদনে সকল প্রশ্নের ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিল।

যখন কথা হয়, তখন যশোমতীর সঙ্গে ফুলঝুরি ছিল। ভজনরাম বক্র দৃষ্টিতে বারম্বার ফুলঝুরির দিকে চাহিতেছিল, চাহিয়া চাহিয়া অন্যমনে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে যশোমতী?" যশোমতী উত্তর দিল, "বাবার এক বন্ধুর মেয়ে, নাম ফুলঝুরি; আমার সখী, বেশ ঠাণ্ডা।"

কিয়ৎক্ষণ মৌন থাকিয়া যেন উদাসীনভাবে ভজনরাম বলিল, "তাহা ত দেখিতেছি, বেশ ঠাণ্ডা। মিলিয়াছে ভাল,—দুটিতে তোমরা যেন মাণিক-জোড়।"

কথায় কথায় ফুলঝুরির সঙ্গে ভজনরামের অল্প আলাপ হইল। ভজনরাম প্রায় একমাস সেই বাড়ীতে থাকিল। থাকিতে থাকিতে দিন দিন সেই অল্প আলাপ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল। গল্প কথাও চলে, ঘরওয়া কথাও চলে, হাসি খুসির কথাও চলে। ভজনের হাসির কথায় ফুলঝুরি হাসে, ফুলঝুরির হাসির কথায় ভজনরামও হাসে। লজ্জা, অভিমান, প্রতিবন্ধক, কিছুই থাকিল না।

কৃষ্ণবিরহিনী রাধিকা একদিন নিকুঞ্জকাননে ফুটন্ত পুষ্পশোভিত কৃষ্ণচূড়াবৃক্ষ দর্শনে বিরহাবেশে বৃক্ষকে বলিয়াছিলেন, "মোর কৃষ্ণচূড়া হেরি কেন তোর শিরে?"

কৃষ্ণচূড়াফুলগুলি দেখিতে ঠিক শ্রীকৃষ্ণের চূড়ার ন্যায়। তদ্দর্শনে রাধিকার হিংসার সহিত বিরহ উথলিয়াছিল। গাছের উপর হিংসা। বিরহাবস্থায় ইহাও স্বাভাবিক। ভজনরামের সহিত ফুলঝুরির আলাপ, দশদিন দেখিয়া দেখিয়া যশোমতীর মনেও সেইরূপ হিংসার উদয় হইয়াছিল। পাঠক বলিবেন, এটা আবার কেমন কথা হইল? যাহার সহিত যশোমতীর নিজের রহস্যালাপ চলে, তাহার সহিত আর একটি সঙ্গিনী ভগ্নীর ঐরূপ আলাপে যশোমতীর হিংসা আইসে কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আছে।

ভাবুক পাঠকেরা সে উত্তরটি হয়ত বুঝিয়া থাকিবেন, তথাপি অভাবুকের বোধের জন্য কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলা যাইতেছে। ভজনরাম সে গৃহে আগন্তুক নহে, এই গৃহে অনেকবার যশোমতীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে, নির্জ্জনেও আলাপ হইয়াছে, যদিও নিতান্ত বালিকা, তথাপি কেহ আদর করিলে তাহার প্রতি বালিকাদেরও ভালবাসা জন্মে; অষ্টম নবম বৎসর বয়স হইতেই সেইরূপ ভালবাসা সঞ্চারিত হইতেছিল, দ্বাদশ বৎসর বয়সে যশোমতী যখন ভজনরামকে দেখে, তখন সেই ভালবাসার স্রোত আর একদিকে ফিরিয়াছিল। প্রেমিকেরা যাহাকে অনুরাগ বলেন, ভজনরামের প্রতি যশোমতীর সেই অনুরাগ সঞ্চারিত হয়। অনুরাগ উভয়ত; কিন্তু ভজনরামের অনুরাগ মনে মনেই চাপা ছিল, কোনরূপ বাহ্য লক্ষণে তাহা প্রকাশ পায় নাই। এখন যশোমতী ষোড়শী, প্রস্ফুটিত গোলাপ, সে হৃদয়ের অনুরাগ সত্য সত্যই প্রেমানুরাগে পরিণত। ফুলঝুরিকে দেখিয়া ভজনরামের নয়ন মন চঞ্চল হয়, যশোমতী তাহা বুঝিয়া মনে বড় কষ্ট পায়। হিংসা,—এ হিংসার নাম প্রণয়ের

ঈর্ষা; অপভাষার গায়ের জ্বালা। যশোমতী সেই গায়ের জ্বালা বুকের ভিতর পোষণ করে, কেহ কিছু জানিতে পারে না। একদিন বৈকালে একটি ঘরে একাকিনী বসিয়া যুবতী যশোমতী দর্পণে মুখ দেখিতেছিল, যৌবনের কান্তি সেই মুখে তখন পূর্ণ, বিকসিত, আপনার মুখ আপনি দেখিতে দেখিতে যশোমতীর চক্ষে জল আসিল।

চক্ষের জল নীরবে মুখ ভাসাইল; একটু পরেই যশোমতীর মুখ ফুটিল; নাটকের স্বগতবাক্যে মুখ ফোটা। আপন মনে যশোমতী বলিল, ফুল আমার, ফুলকে আমি আমার বলিয়াই জানি, ফুল কেন উহার দিকে চায়? ও কেন ফুলের পানে কটাক্ষ নিক্ষেপ করে? ফুলের কথা শুনিয়া ও কেন ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসে? সে হাসি যেন আমার গায়ে আগুন ছড়াইয়া দেয়! বাবা কেন উহাকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়াছেন? আমার প্রাণে দাগা দিবার জন্য? আমার সুখের আশায় আঘাত করিবার জন্য? না না, বাবার দোষ কি? বাবা ত আমার মনের কথা জানেন না! আমার মন আমি আপনিই জানি, মন কাঁদে, তাই আমিও কাঁদি। আপনি ভাবি আর আপনি কাঁদি। উঃ! প্রাণ কেন এমন হয়? ফুলঝুরি আমার সতীন হইবে বুঝি?

এই সব কথা কেহ জানে না, কেহ শুনে না, জানিবার শুনিবার অধিকারিণী কেবল যশোমতী একা। ফুলঝুরিও কিছু জানে না। ফুলঝুরি যেমন নিত্য নিত্য ভজনরামের সঙ্গে হাসিয়া হাসিয়া কথা কয়, তখনও সেইরূপ। যশোমতীর হিংসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়।

নৌকায় বাজ দেখিতে ভজনরামের বড় আমোদ। ভজনরাম এক দিন মঞ্জনলালের কাছে বাজ খেলিবার প্রস্তাব করিল, মঞ্জনলাল অনুমোদন করিলেন। নিকটেই নদী। একজন পাহাড়ী মাঝির নিকট হইতে নূতন রং করা একখানি নৌকা ভাড়া লইয়া বাজ খেলাইবার দিনস্থির করিল; মেয়ে দু'টিও সঙ্গে যাইবে, সর্ব্বসম্মতিতে তাহাও স্থির হইল।

ভজনরাম স্বয়ং বেশ নৌকা বাহিতে জানে, যশোমতীর পিতাও হাল ধরিতে জানেন। অতএব স্বতন্ত্র দাঁড়ি মাঝি নিযুক্ত করা হইল না, মেয়ে দুটিকে লইয়া তাঁহারা নিজে নিজেই সেই নদীতে জলবিহার আরম্ভ করিলেন, অপূর্ব্ব আনন্দ। যশোমতীর মন ভাল নয়। পাঁচদিন বাজ খেলার পর যশোমতী ম্লানবদনে পিতাকে বলিল, "নিত্য নিত্য জলের

হাওয়া লাগিয়া আমার বুকে শ্লেষ্মা বসিয়াছে; গলা সাঁই সাঁই করে, নাসিকায় নিশ্বাস আটকাইয়া যায়, আজ আর আমি নৌকায় বেড়াইতে যাইব না।"

মঞ্জনলাল উদ্বিগ্ন হইলেন, ভজনরামকে কহিলেন "যশোমতীর অসুখ, দুই চারি দিন নৌকা-ক্রীড়া বন্ধ থাকুক।" তাই মঞ্জুর। পাঁচদিন বিশ্রাম। এই পাঁচদিনের ভিতর মঞ্জনলাল আপন বাড়ীতে একটা মজ্‌লিস করিলেন। গ্রামের মাতব্বর মাতব্বর প্রাচীন পাহাড়ীরা সেই মজ্‌লিসে আহূত হইয়া আসিল, দশ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্ক বালক এবং নব্য নব্য যুবকেরাও প্রাচীনগণের সঙ্গে আসিল। মজ্‌লিস বসিলেই নানা প্রকারের নানা কথা আন্দোলিত হয়, দশজনে দশ রকমের কথা কয়, এ মজ্‌লিসেও ক্ষণকাল সেই প্রকার অভিনয় হইল; তাহার পর বাড়ীর কর্ত্তা মঞ্জনলাল দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে বলিলেন, "যশোমতী আমার জীবনসর্ব্বস্ব, যশোমতীর পীড়া হইয়াছে, নাড়ীতে নাড়ীতে টান পড়িতেছে, আমার প্রাণ যেন থাকিয়া থাকিয়া হু হু করিতেছে, বোধ হয় আমি আর বেশী দিন বাঁচিব না, এই সময় দশের নিকটে আমার জীবনের একটা বৃহৎ গুপ্ত কথা আমি ব্যক্ত করিব।" মনে মনে মৃত্যু নিকট অনুমান করিয়া মঞ্জনলাল সকলের কাছে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলেন। ফুলঝুরির পরিচয় যে ভাবে দেওয়া হইয়াছে, মঞ্জনের গুপ্তকথাটিও আমরা সেই ভাবে আমাদের নিজের কথায় বুঝাইয়া দিব।

বলা আছে, বিজলীর সহিত মঞ্জনলালের চারিবৎসর কোর্টসিপ *। চারিবৎসর পূর্ণ হইবার অগ্রেই একটা ঘটনা হয়, বিজলী একরাত্রে একটা পিতলের বাক্স আনাইয়া মঞ্জনকে দেখায়, সেই বাক্সের মধ্যে বাইশ থান আকবরী মোহরে গাঁথা একছড়া মোহরমালা। যে রাত্রে দেখায়, তাহার দুইদিন পরে সেই বাক্স শুদ্ধ মোহরমালা চুরি যায়। মঞ্জনলাল চুরি করিয়াছে, বাড়ীর ভিতর এই কথাই রাষ্ট্র হয়। বাস্তবিক কে চুরি করিয়াছিল, মঞ্জনলাল তাহা জানিতেন, বিজলীই চোর। বিজলীর প্রতি মঞ্জ-

* এই "কোর্টসিপ" শব্দটির ঠিক অর্থ আমাদের ভাষায় নাই, তদনুরূপ শব্দের সৃষ্টি হয় নাই, অতএব বাঙ্গলা অক্ষরে ইংরাজী কোর্টসিপ শব্দই ব্যবহার করা হইল।

নের ভালবাসা তখন ষোল আনা অপেক্ষাও বেশী, সুতরাং তিনি নিজের কলঙ্ক মোচন করিবার চেষ্টা না করিয়া লোকের কথাতেই চৌর্য্যাপরাধ স্বীকার করিলেন, বিজলীর নাম করিলেন না। বিজলীর পিতা মঞ্জনলালকে পুলিশে দিল, বিচারে নির্দ্দোষ মঞ্জনের একপক্ষ কারাবাস দণ্ড হইয়াছিল; মৃত্যুকালে দশজন লোকের সাক্ষাতে ঐ চুরির কথা স্বীকার করিয়া, কাঁদিয়া মঞ্জনের কাছে, ক্ষমা চাহিয়াছিল। সেই দশজন তাহার সাক্ষী আছে। এতদিনের পর সেই গুপ্তকথার ব্যাখ্যা শুনিয়া মজ্‌লিস শুদ্ধ লোকেরা কাঁপিয়া উঠিল। মঞ্জনলাল ধার্ম্মিক, সত্যবাদী, পরোপকারী, নিষ্কলঙ্ক, তিনি মোহরমালা চুরি করিয়াছেন, পরিচিত লোকেরা সেই অদ্ভুত সমাচারে পরিতপ্ত হইয়াছিল। এখন ভ্রম ঘুচিল, ধাঁ ধাঁ ঘুচিল, দ্বিধা ঘুচিল, পরিতাপ ঘুচিল, রহিল কেবল অনুতাপ।

ব্যাখ্যা যখন হয়, তখন সেই মজ্‌লিসের একধারে, দরজার আড়ালে ফুলঝুরি আর যশোমতী লুকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহারাও ঐ সব কথা শুনিল। মা যখন মঞ্জনের কাছে অনুতাপ করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল, ফুলঝুরি তখন তাহাও শুনিয়াছিল, যশোমতীর কাছে সাক্ষ্য দিল।

নিষ্কলঙ্ক মঞ্জনলালকে নিখুঁৎ নিষ্কলঙ্ক জানিয়া সমাগত লোকেরা সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল, মঞ্জনের হৃদয়ের একটা গুরুভার কমিয়া গেল। সেইরাত্রে সেই বাড়ীতে একজন অতিথি আসিল। অপরিচিত অতিথি, ইহাও বলা যায় না, অতিথির পিতার সহিত মঞ্জনলালের বন্ধুত্ব ছিল, অতিথির সঙ্গেও পাঁচ সাতবার দেখা সাক্ষাৎ ছিল, যথেষ্ট খাতির যত্ন হইল। অতিথির নাম জিমলমল। দিব্য গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, স্থূলাঙ্গ বাবরী চুল, দিব্য গোঁপ, অল্প অল্প গালপাট্টা দাড়ি, বয়স অনুমান চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বেশ আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া গেল, তাহার পর শয়ন। সকলেই নিদ্রা গেল, জাগিল কেবল যশোমতী। মনে মনে যশোমতীর দুই ভাব। এক ভাবে হৃদয়ে ঈর্ষার অগ্নি প্রধূমিত, দ্বিতীয় ভাবে পিতার কলঙ্ক মোচনে আনন্দ। বিষদানন্দে যশোমতী জাগিল, জাগিয়া জাগিয়া বার বার বলিল, তবু কেন আগুন জ্বলে? প্রাণ কেন এমন হয়?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নৌকা ডুবি।

রজনী প্রভাত। পাঁচদিন নৌকা চড়া হয় নাই, প্রাতঃকাল হইতেই ভজনরামের নৌকার খেয়াল উঠিল। জিমল্‌মল সাঁতার জানেন না, অথচ তাঁহারও নৌকাচড়া বাই, তিনিও ভজনরামের উৎসাহে উৎসাহ প্রকাশ করিলেন। বৈকালে নৌকা যাত্রা। যশোমতীর অসুখ, যশোমতী গেল না, ফুলঝুরি গেল।

হালে বসিলেন মঞ্জনলাল, দাঁড়ে বসিল ভজনরাম। যেদিকে বাতাস অনুকূল, সেইদিকে তর্‌তর্ করিয়া নৌকা ছুটিল। সুবাতাসে নিরাপদে এক ঘণ্টা ভ্রমণ। হঠাৎ আকাশের এককোণে একটু মেঘ উঠিল, দেখিতে দেখিতে আকাশময় ছড়াইয়া পড়িল, বাতাস উঠিল, নৌকাখানি হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে লাগিল; নৌকার ভিতর দুই তিন ঝলক্ জল উঠিল, ফুলঝুরি কাঁদিয়া ফেলিল।

নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রবল। নৌকা তীরের দিকে লইয়া যাইবার জন্য মঞ্জনলাল বিস্তর চেষ্টা করিলেন, সামলাইতে পারিলেন না। ঝড় উঠিল। প্রবল ঝড়। নৌকাখানা যেন নাগরদোলায় দুলিতে আরম্ভ করিল। সামাল সামাল পড়িয়া গেল। রক্ষা হইল না। একান্ত ক্লান্ত হইয়া মঞ্জনলাল হাল ছাড়িয়া দিলেন, নৌকা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অতল জলে তলাইয়া গেল। চারিজনেই জলে পড়িলেন। দাঁড়ি মাঝির সন্তরণ জানা ছিল, স্রোতে গা ঢালিয়া তাঁহারা খানিক দূর ভাসিয়া গেলেন, জিমলমল আর ফুলঝুরি একবার ডুবিতে লাগিল, একবার ভাসিতে লাগিল। একে স্রোতের টান, তাহাতে প্রাণের ভয়ে আকুল, সন্তরণে অক্ষম, রক্ষা পাওয়া ভার; উহারা ডুবিতেছে ভাসিতেছে, অতি কষ্টে স্রোত ভেদ করিয়া ভজনরাম একজনকে ধরিল, পৃষ্ঠে বহন করিয়া চড়ার উপর তুলিল; জিমলমলের প্রায় অচেতন দেহ। ওদিকে মঞ্জনলাল প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ফুলঝুরিকে টানিয়া টানিয়া তীরে উঠাইবার চেষ্টা করিতেছেন, পারিতেছেন না, ভার শুদ্ধ এক একবার নিজেও ডুবিয়া যাইতেছেন,

প্রাণপণ যত্নে ভার লইয়া আবার ভাসিতেছেন, সন্তরণের শক্তি ফুরাইয়া গিয়াছে, এক সঙ্গে দুটিই বুঝি যায়! মহাবিপদ!

ভজনরাম পুনর্ব্বার জলে ঝাঁপ দিল, সন্তরণে দুর্ব্বল হইয়া এলোকেশী ফুলঝুরির কেশগুচ্ছ ধরিয়া ফেলিল, জোরে জোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। সেই আকর্ষণে স্রোতের টানে মঞ্জনের হস্ত শিথিল হইয়া পড়িল, অগত্যা তিনি ফুলঝুরিকে ছাড়িয়া দিলেন। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভজনরাম ফুলঝুরিকেই টানিয়া টানিয়া চড়ায় লইয়া গেল। ফুলঝুরি অজ্ঞান। দুটি অচৈতন্য দেহ ভজনরামের জিম্মায়। ভজনরাম নদীর দিকে যাইয়া দেখিল, রণরঙ্গিনীবেশে নদী নাচিতেছে, মঞ্জনলাল নাই, কোথায় তলাইয়া গিয়াছেন, কতদূরে ভাসিয়া গিয়াছেন, কিছু জানা গেল না। ভজনরাম অনেকক্ষণ বাষ্পাকুল নয়নে জলের দিকে চাহিয়া রহিল, কোন চিহ্নই দেখিতে পাইল না। হায় হায়! পরের প্রাণরক্ষা করিতে গিয়া ধর্ম্মশীল মঞ্জনলাল সলিলগর্ভে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ভজনরামের কাণের কাছে, কে যেন বলিয়া গেল, চক্ষের উপর আপন জনের মৃত্যু দর্শন অপেক্ষা ডুবে মরাই ভাল!

উপসংহার।

বহুযত্নে, বহুকষ্টে দুটি উদ্ধৃত প্রাণীর চৈতন্য সম্পাদন করিয়া ভজনরাম অনেকক্ষণ নদীতীরে বসিয়া রহিল, ঝড়ের বেগ অল্প অল্প কমিয়া আসিলে, গ্রাম হইতে একখানা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া আনিয়া, তাহাদের দুইজনকে গৃহে লইয়া আসিল। অপঘাতে পিতার এই মৃত্যু সংবাদে যশোমতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল, অনেকক্ষণ পরে অনেক কষ্টে মূর্চ্ছা ভঙ্গ। পরিত্রাহি চিৎকার। সান্ত্বনা নাই?

ভজনরামের দেশে যাওয়া হইল না। অষ্টাহ চিকিৎসা ও শুশ্রূষার পর গৃহমধ্যে কথঞ্চিৎ শান্তি স্থাপিত হইল। এক বৎসর পরে ভজনরামের সহিত যশোমতীর বিবাহ; ফুলঝুরির সহিত জিমলমলের বিবাহ।

গল্পের সমস্ত রহস্য গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই পরিব্যক্ত হইয়াছে, কেবল একটি রহস্য বাকি। ভজনরাম কে? কোন্ দেশে নিবাস? পিতা মাতা

কে, কিছুই প্রকাশ হয় নাই! জিমলমল মঞ্জনলালের মিত্র কুমার, সে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, এখন ভজনরামের পরিচয়।

কোর্টসিপের মহিমা অনন্ত। মঞ্জনের সহিত বিজলীর দুই বৎসর কোর্টসিপ যখন পূর্ণ হইতে যায়, সেই সময় বিজলীর তিন মাস গর্ভ; বিজলীর মুখে মঞ্জনলাল সেই কথা জানিতে পারেন। অকস্মাৎ একদিন পক্ক শ্মশ্রুধারী একজন বৃদ্ধলোক বিজলীদের বাড়ীতে উপস্থিত হয়, বৃদ্ধ আসিয়া বিজলীর পিতাকে বলে, আপনারা জানেন না, জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বিজলীর এক মাসি আছে, সেই মাসির আসন্নকাল, তাহার অনেক টাকার বিষয় আছে, উত্তরাধিকারী কেহ নাই, বিষয়গুলি বিজলীকে দিয়া যাইবে, ইহাই তাহার ইচ্ছা, অতএব বিজলীকে আমি লইতে আসিয়াছি, মাসির শেষকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বিষয়াধিকারিণী হইয়া বিজলী আবার ঘরে আসিবে। অর্থলোভে বিনা আপত্তিতে বিজলীর পিতা সম্মত হইলেন, বিজলী সেই বৃদ্ধের সঙ্গে মাসির বাড়ী গেল, এক বৎসর পরে ফিরিয়া আসিল। জয়ন্তিয়া পাহাড়ে বিজলী একটি পুত্র প্রসব করে, পুত্রটি এক মাসের হইলে সেই বৃদ্ধলোক রাত্রিকালে গোপনে সেটিকে তথাকার একজন ধনাঢ্য পাহাড়ী সর্দ্দারের বাড়ীর সদর দরজার বাহিরে রাখিয়া আইসে, শিশুটী সেই বাড়ীতেই প্রতিপালিত হয়। সেই শিশুই এই জিমলমল। বিজলীর গর্ভজাত মঞ্জনলালের ঔরষজাত পুত্র। ফুলঝুরির সহিত জিমলমলের বিবাহ হইয়াছে। সম্পর্কটা কিরূপ? ফুলঝুরি সেই বিজলীর গর্ভজাতা কন্যা, জিমলমল সেই বিজলীর কুমারীকালের কোর্টসিপজাত গর্ভপ্রসূত পুত্র। এ সম্পর্ক মঞ্জনলাল ব্যতীত আর কেহই জানিত না। বিজলী অবশ্য জানিত কিন্তু বিজলী মরিয়াছে, মঞ্জনলাল জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন; তিনি বাঁচিয়া থাকিলে এ বিবাহ হইতে পারিত কি না সন্দেহ। এখন রহস্যের কথা রহস্যের গর্ভেই নিহিত রহিল, দম্পতিরা ঘর সংসার করিতে লাগিল। ইহাই এ গল্পের উপসংহার। একটি সূক্ষ্ম কথা অবশিষ্ট, বার্ত্তাবহ সাজিয়া যে বৃদ্ধ লোকটি বিজলীকে মাসির বাড়ী লইয়া গিয়াছিল, সেই বৃদ্ধ অপর আর কেহই নহে, ছদ্মবেশী মঞ্জনলাল।

বঙ্গসাহিত্যে বিদ্যাসাগর।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপধ্যায়।—ইনি "ষড়্দর্শন সংগ্রহ" "বিদ্যাকল্পদ্রুম" প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিদ্যাকল্পদ্রুমের ভাষার একটু নমুনা দেখুন;—"এতদ্দেশের প্রাচীন ইতিহাস পুস্তকে অনেক অনেক নরপতি ও বীরদিগের দেবপুত্ররূপে বর্ণনা আছে, ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্ব-কালীন লোকদের সত্যাপেক্ষা অদ্ভুত বিবরণে অধিক আদর ছিল, এবং পুরাণ লেখকেরা কবিতার ছন্দোলালিত্যাদির প্রতি অনুরক্ত হইয়া শব্দ বিন্যাস করতঃ পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন পুরঃসর বিবিধ বিষয়ে উপদেশ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং অবিকল ইতিবৃত্ত লিখিয়া স্ব স্ব কল্পনাশক্তিকে খর্ব্ব করেন নাই। কাব্য ও অলঙ্কারের রসে রসিক হইয়া স্ব স্ব কবিত্বনৈপুণ্য প্রকাশ পূর্ব্বক সাধারণের সন্তোষ করিয়া উল্লিখিত শূরবীর রাজাদিগের মানের গৌরব করিবেন, তাঁহাদিগের ইহাই বিশেষ তাৎপর্য্য ছিল।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র—ইনি বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে আপনার দক্ষতার ও জ্ঞানগবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহারও ভাষার নমুনা এই,—

"পরন্তু এতদ্দেশীয় মহাশয় জন সকল যদি একত্র হওত ঈষদনুগ্রহাবলোক করিয়া স্বদেশীয় মঙ্গলবৃদ্ধির উৎসাহ জন্মাইবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নানা উপায় দ্বারা তদভিষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। ভদ্র ভদ্র স্থানে অথবা গ্রামে গ্রামে সর্ব্বসাধারণের সর্ব্বকালিক বংশ পরম্পরায় উপকারার্থে গ্রামভেটিও বারইয়ারির ধন অথবা তত্রত্য প্রত্যেক ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মাসিক দান দ্বারা এক গ্রন্থালয় স্থাপন করিলে কোন ব্যক্তির ব্যয়ক্লেশ হইবে না অথচ অতুল উপকার। গ্রন্থের অভাব প্রযুক্ত অনেকে নানা শাস্ত্রালোচনার যোগ্য হইয়াও স্বয়ং গ্রন্থসংগ্রহে অপারক বোধে আলস্যের হস্তে পতিত হন। অনেকের ইতিহাস ও ভূগোলবৃত্তান্ত শ্রবণে ও পঠনে স্বতঃই ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাদৃশ গ্রন্থাদির অভাব প্রযুক্ত নিরর্থক ভৌতিক ও মান্ত্রিক গল্পজল্পনাতে কালযাপন করেন।

আমরা পল্লিগ্রামবাসী জনের প্রতি অমর্ষান্বিত হইয়া দুর্ব্বল পরামর্শ

পক্ষের উল্লেখ করিতেছি; কিন্তু তাহাই যে সর্ব্বত্রেরই রীতি হউক, এমত আমাদের অভিসন্ধি নহে।

এতদ্রূপ ভদ্র ধনাঢ্য পল্লীগ্রাম অনেক আছে যে, তাহাতে প্রতি বৎসর মিথ্যা কর্ম্মোপলক্ষে অনেক ব্যক্তি শত শত টাকার বারুদ পোড়াইয়া ক্ষণিক আমোদ করেন, মিথ্যা সং নির্ম্মাণ করিয়া কতশত মুদ্রাব্যয় করেন। এমত সকল গ্রামে এক একটি উত্তম গ্রন্থালয় না থাকা তত্তদ্ গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের কি পর্য্যন্ত নিন্দাকর, তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন।"

উপরিউক্ত বঙ্গবন্ধুগণের গ্রন্থ পাঠে যথেষ্ট সদ্উপদেশ লাভ হয় সন্দেহ নাই কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহাদের অবলম্বিত ভাষা সজ্জিত হইয়া সমভাবে সকলের চিত্তবিনোদন, করিতে সমর্থ হয় নাই; ইংরাজী অনুকরণে বাঙ্গালাভাষা একান্ত দুর্ব্বোধ ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে; সে বিচার অবশ্য পাঠকগণ করিবেন; বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সহিত তুলনা করিলে বোধ হয়, আর কাহারও ভাষা এরূপ বাগাড়ম্বরবিহীন, সর্ব্বাংশেই সুন্দর বলিয়া বোধ হয় না; বিদ্যাসাগরী ভাষায় বঙ্গসাহিত্যের সৌন্দর্য্য এবং আলোচনার গভীরতা উভয় গুণই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গসাহিত্য শিক্ষার, নিমিত্ত তিনি যথেষ্ট উদ্যোগ যত্নপরিশ্রম ও অনুশীলন শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন; তিনি ইদানীং বঙ্গসাহিত্যসেবীদিগের মত নামের কাঙ্গাল ছিলেন না, তিনি কৃতকর্ম্মের সফলতার ভিখারী ছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুবাদে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; এটা তাঁহাদের বুঝিবার ভ্রম। তিনি অনেক স্থলেই অবিকল অনুবাদ করেন নাই, স্বয়ং সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও, ১১৫৪ সালে মার্স-ম্যান সাহেবের বিশেষ অনুরোধে হিন্দী "বৈতাল পচ্চিসী" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন; কিন্তু ঠিক তাহা অনুবাদ নহে।

"উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্ব সেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার চারি মহিষী। তাঁহাদের গর্ভে রাজার ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই সুপণ্ডিত ও সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে, নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শঙ্খ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। তৎকনিষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বিদ্যানুরাগ, নীতিপরতা ও শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি, রাজ্যভোগের লোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া, জ্যেষ্ঠের প্রাণসংহার

পূর্ব্বক, স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইলেন; এবং ক্রমে ক্রমে নিজ বাহুবলে, লক্ষ-যোজন বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া, আপন নামে অব্দ প্রচলিত করিলেন।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় যেভাবে "বৈতাল পচ্চিসী" লিখিয়াছেন, শকুন্তলা কিন্তু সেভাবে লিখিত হয় নাই; এ বিষয়ে কিন্তু এখনও অনেকের মত-ভেদ আছে, আবশ্যক বিবেচনায় শকুন্তলার অনুবাদের কৃতিত্ব বুঝাইবার জন্য নিম্নে কিঞ্চিৎ মাত্র উদ্ধৃত করা হইল :—

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরূণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুলী ফলভিদঃ সূচ্যন্তএবোপলাঃ।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগা-
স্তোয়াধারপথাশ্চ বল্কল শিখানিস্যন্দরেখঙ্কিতাঃ॥

অভিজ্ঞান-শকুন্তলং প্রথমাঙ্কঃ।

অনুবাদ—কোটরস্থিত শুকের মুখভ্রষ্ট নীবার সকল তরুতলে পড়িয়া রহিয়াছে; তপস্বীরা যাহাতে ইঙ্গুলী ফল ভাঙ্গিয়াছেন, সেই সকল উপলখণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে। ঐ দেখ, করুভূমিতে হরিণশিশু সকল নির্ভয় চিত্তে চরিয়া বেড়াইতেছে এবং যজ্ঞীয় ধূমের সমাগমে নবপল্লব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে।"

রাজা দুষ্মন্তের মুখে মহাকবি কালিদাস যেরূপে তপোবনের লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদে সেই সকল শ্লোকের অবিকল অনুরূপ বর্ণনাই দৃষ্ট হইতেছে।

"ঊনবিংশ শতাব্দির স্রোতে ইংরাজী ভাষার এতাদৃশ প্রাবল্যে তিনি কি কেবল সংস্কৃত ও হিন্দীভাষার ভাব সংগ্রহ করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? কখনই পারেন না।

ইংরাজী গৌরবরক্ষার্থ তিনি বিশেষ বিশেষ নীতিগর্ভ ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে এদেশীয় বালকগণের জন্য সরল সরল বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক রচনা করিয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত কবি সেক্সপিয়রের "কমিডি অব্ এরারস্" অবলম্বনে ভ্রান্তিবিলাস নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ভ্রান্তিবিলাস তাঁহার শেষ গ্রন্থ, তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকের ভাষায় যেন মণিমাণিক্য জ্বলিতেছে। তাঁহার সহিত বঙ্গসাহিত্যের কি প্রকার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, এই

ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব, আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই বর্ত্তমান প্রবন্ধে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদয় পাঠক মহাশয়েরা তাহার বিচার করিবেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাপক্ষ বিপক্ষে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকেন, প্রকৃত কথা বলিতে কি, তাঁহাকে এক আসনে বসাইয়া ঠিক তাঁহার পার্শ্বাসনে বসান যাইতে পারে, সমস্ত বঙ্গদেশ অন্বেষণ করিয়া তাদৃশ ব্যক্তিকে শীঘ্র খুঁজিয়া পাওয়া দুরূহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাস" আধুনিক ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তকরূপে অনেক বৎসর বঙ্গীয় শিক্ষাসমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। সুদীর্ঘ শব্দযোজনা, সংস্কৃত সাহিত্যানুগত্য ও বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্মত রচনায় সীতার বনবাস এক সময়ে পাঠ্যপুস্তকের একমাত্র আদর্শস্থানীয় ছিল—কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বঙ্গসাহিত্যে তাহা অতি প্রাচীন বা Classic রূপেই ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহা বঙ্গভাষার রচনার আদর্শ (Model) হইতে পারে না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "চরিতা-বলী", "বোধোদয়" প্রভৃতি গ্রন্থ উঠাইয়া দিয়া "নূতন পাঠ" নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এতাদৃশ অবিচারে বিদ্যাসাগর ভক্তমাত্রেই মর্ম্মাহত হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাগীরথী যেমন হিমগিরির সঙ্কীর্ণ কন্দর হইতে নির্গত হইয়া ক্রমে স্বকীয় সঙ্কীর্ণ ভাব বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং বহুজনপদ অতিক্রম পূর্ব্বক শেষে শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গম লাভ করিয়াছে, বঙ্গসাহিত্যের গদ্য রচনাও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবস্রোত উৎপন্ন হইয়া মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক, বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া শেষে বিদ্যাসাগরের সঙ্গমলাভে সমর্থ হইয়াছে; তন্নিমিত্তই অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত ও গঠিত বাঙ্গালা ভাষাই আমাদের মূলধন। তাঁহারই উপার্জ্জিত, সম্পত্তি লইয়া আমরা নাড়া চাড়া করিতেছি।" বস্তুতঃ এইকথাগুলি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিয়া নেত্রপথে রক্ষা করা সমস্ত সাহিত্যসেবকের অবশ্য কর্ত্তব্য। ভাগীরথী সাগরসঙ্গমস্থল যেমন মহাতীর্থ হইয়া, শতসহস্র তীর্থযাত্রীকে পবিত্রভাবে পরিপূর্ণ করিতেছে, বাঙ্গালা গদ্য রচনায় বিদ্যাসাগর সঙ্গমও সেইরূপ সাহিত্য-সেবকদিগের মহাতীর্থ স্বরূপ হইয়াছে। যে রচনা এক সময়ে উৎকট দুর্ব্বোধ ও পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ-শূন্য ছিল, তাহা বিদ্যাসাগরের

যত্নে সরল সুবোধ ও সুসংস্কৃত হইয়াছে এবং বিদ্যাসাগরের শক্তিতে শক্তি-সম্পন্ন হইয়া আত্মপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইতেছে। সেই রচনা এখন দুরুচ্চার্য্য শব্দময়ী রচনা ললিত মধুর শব্দাবলীর বিকাশভূমি হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির অনুপ্রাসের আড়ম্বর, বিদ্যাসাগরের লিপিকৌশলতায় অন্তর্হিত হয়। বিদ্যাসাগরের গদ্য প্রাঞ্জল, ভাবের ও মাধুর্য্য গুণের দৃষ্টান্ত স্থল। বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা না হইলেও, সৌন্দর্য্যসম্পাদন ও পরিপুষ্টি সাধন জন্য উহার পিতৃস্থানীয়।

বিদ্যাসাগর যেমন বাঙ্গালা গদ্য প্রাঞ্জল করেন, তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্রবে অক্ষয়কুমার সেইরূপ উহা ওজস্বী করিয়া তুলেন। অক্ষয়কুমারের গদ্য আবেগময় ও উদ্দীপনা পূর্ণ। অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা গদ্যে এমন জীবনী-শক্তি সমর্পণ করিয়াছেন যে, তাহাতে ভাষা তেজস্বিনী ও বেগবতী হইয়া খরস্রোতে প্রবাহিত হইতেছে। বিদ্যাসার ও অক্ষয়কুমার, উভয়েই সংস্কৃত ভাষার অবলম্বনে বাঙ্গালা গদ্য শ্রীসম্পন্ন করিয়াছেন। কিন্তু উভয়ের রচনা একভাবে গ্রথিত বা এক শ্রেণীতে সন্নিবেশিত হয় নাই। একজনের গদ্য-সুকোমলতা পূর্ণ, অপরজনের গদ্য উচ্ছ্বাসের উদ্দীপক। একটি লাবণ্যময় পূর্ণচন্দ্র, অপরটি প্রদীপ্তভাবে হৃদয় প্রমত্ত করিয়া তুলে।

যে সময়ে বাঙ্গালা গদ্যে সংস্কৃতের অধিক আধিপত্য, সেইসময় বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে একটি মনস্বী পুরুষের আবির্ভাব হয়। সহজভাবে কথোপ-কথনের ভাষায় গদ্য লিখিবার প্রণালী দেখাইয়া বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র "আলালের ঘরের দুলাল" প্রভৃতি কতিপয় পুস্তক প্রকাশ করেন। বাবু প্যারীচাঁদ স্বপ্রণীত গ্রন্থে প্রকৃত নাম গোপন পূর্ব্বক টেঁকচাঁদ ঠাকুর সাজিয়াছিলেন। টেঁকচাঁদ বাবুর আলালী ভাষায় বাঙ্গালা গদ্যের রূপান্তর করেন, যাঁহারা প্রচলিত সহজভাষায় গ্রন্থরচনার পক্ষপাতী, তাঁহারা প্যারীচাঁদের প্রদর্শিত পথ একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে "হুতুম পেচার" প্রচার, প্রচারক কর্ত্তা বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ। অতঃপর "এই এক নূতন" ধুয়ায় একখানি গুপ্তকথার জন্ম, কলিকাতার বাজারে সেই পুস্তকের সহজ নাম "হরিদাসের গুপ্তকথা" প্রণয়নকর্ত্তা শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিম বাবুর প্রতিভায় ঐ পথ প্রশস্ত সুসংস্কৃত হয়। এখন সংস্কৃত পথ কতক পরিমাণে অনেক গদ্য লেখকের অবলম্বনীয় হইয়াছে। অনেকে আবার

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের পথ একবারে না ছাড়িয়া, উভয়দিকে সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বাঙ্গালা গদ্য এইরূপে সুলেখকদিগের রচনাচাতুর্য্যে শ্রীসম্পন্ন হইতেছে।

একজন স্কচ দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, "কোন ব্যক্তি যদিও কোন মৌলিক ভাব বিশিষ্ট পুস্তক না লেখেন, কিন্তু সামাজিক কুরীতি ও ভ্রমাদি দূরীকরণ মানসে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া সামাজিক লোকদিগের প্রমাদাদি দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাকে প্রকৃত সাহিত্য-সেবক ও স্বদেশ-হিতৈষী বলা যাইতে পারে।" বিদ্যাসাগর মহাশয় যদিও অধিক পরিমাণে মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন নাই সত্য, কিন্তু প্রকৃত সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি কেবল স্বদেশীয় ইংরাজী সাহিত্য হইতে ভাবসমূহ সংগ্রহ করিয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যকে সুশোভিত ও পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন এবং স্বদেশীয় সামাজিক কুরীতির বিনাশ মানসে বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহ সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সমাজের উপকার সাধনে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

আরও, তিনি যে সময় সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করেন, সে সময় বঙ্গ-সাহিত্যের পরিবর্ত্তনের সময়। তখন বিদ্যাপতি চৈতন্য ও কবিকঙ্কণের কাল হইতে ইংরাজী সাহিত্যের সংশ্রবে, বঙ্গসাহিত্য সম্পূর্ণ এক বিভিন্ন দিকে ধাবিত হইতেছিল। সাধারণ লোকে—এমন কি বিদ্বান লোকেও ইংরাজি শিক্ষার দিকে এতদূর আকৃষ্ট ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তন্নিবন্ধন এতদূর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে, তাঁহাদিগকে পুরাতন সংস্কৃত ভাষা বা মৌলিক বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের সময়, সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের এই প্রকার পতনাবস্থাকালে বিদ্যাসাগর যে অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বনে বঙ্গভাষাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রভূত উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি অতি বিচক্ষণতার সহিত এক মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত হইতে ভাবমালা লইয়া তিনি "শকুন্তলা" "সীতার বনবাস" ইত্যাদি প্রণয়ন করিলেন; হিন্দি হইতে "বেতাল পঞ্চবিংশতি" ও ইংরাজী হইতে "বঙ্গের ইতিহাস", বোধোদয়, ভ্রান্তিবিলাস "কথামালা" ইত্যাদি রচিত হইল। তাঁহার ভাষা সংস্কৃত ভাষা বা সংস্কৃত বাঙ্গালা বা গ্রাম্য বাঙ্গালা বা ইংরাজী বাঙ্গালা হইল না; তিনি এক নূতন উপাদানে নূতন

নিয়মে সকলের আয়ত্তগম্য ও সরল এক নূতন ভাষা সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, একথা বলা যাইতে পারে, বর্ত্তমান কালের বিদ্যাসাগরী ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিদ্যাসাগরের ভাষার একদিকে যেমন উত্থান, অপর দিকে তেমনি পতন ছিল, এক দিকে যেমন বীর ও করুণরসাত্মক, অপরদিকে তদ্রূপ হাস্য ও বীভৎস রসাত্মক ছিল। সেইজন্য তাঁহাকে সমগ্র বঙ্গসাহিত্যের ঠিক পিতৃসদৃশ না বলিলেও তাঁহাকে ইহার পরিপোষণকর্ত্রী মাতা বলা যাইতে পারে। তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালা গদ্য-সাহিত্যের বর্ত্তমান সুমার্জ্জিত, ও নির্ম্মল অবস্থা।

বিদ্যাসাগর মহাশয় কেবলমাত্র ভাষাকে সজ্জিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, লোকে যাহাতে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়া বঙ্গসাহিত্যকে আরও উন্নত করিতে পারে, সে বিষয়ে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি দেখিলেন, সাধারণ লোকে সহজে স্বদেশীয় অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিতে পারে না; কারণ তাহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এইজন্য বালক-বালিকাগণ যাহাতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের আরও উন্নতি সাধন করিতে পারে, তজ্জন্য তিনি চারিভাগ "ব্যাকরণ কৌমুদী" প্রকাশিত করেন। ইহার পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য সুকুমারমতি বালকদিগের দুরূহ "মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ" পাঠ করিতে হইত; কিন্তু তাহা সকল ছাত্রে আয়ত্তগত করিতে পারিত না। ব্যাকরণ কৌমুদী প্রচারিত হইবামাত্র সাধারণ লোকের সংস্কৃত শিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠিল। দ্বিতীয়তঃ বালকগণ যাহাতে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ইংরাজি সাহিত্য-ভাণ্ডার হইতে অমূল্য রত্নাদি আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাগারে সজ্জিত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তাহার সুবিধার জন্য বিদ্যালয় সমূহ স্থাপন করিলেন। তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গসাহিত্যকে কোন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করা, কিন্তু তৎকালে বঙ্গসাহিত্যের শৈশব প্রযুক্ত ইহার ভবিষ্যদবস্থা অত্যন্ত সন্দেহ-সঙ্কুল ছিল; সুতরাং তিনি প্রগাঢ় চিন্তার পর বঙ্গসাহিত্যকে সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্যের উপর দণ্ডায়মান করাইলেন। তাহার সুফল আজ বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। বঙ্গীয় যুবকগণ ইংরাজি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়া সেক্সপীয়র, মিল্টন, সেলি প্রভৃতি

কবিগণের গ্রন্থাদি হইতে, স্কট্ কলিন্স প্রভৃতি প্রসিদ্ধ উপন্যাসকারদিগের পুস্তকাবলী হইতে ভাবমালা সংগ্রহ করিয়া বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি প্রণয়ন করিতেছেন এবং অপরদিকে ভবভূতি, কালিদাস প্রভৃতি স্বদেশীয় মহা কবিগণের সদ্‌গ্রন্থাবলী হইতে সুগন্ধ পুষ্পাদি চয়ন করিয়া বঙ্গসাহিত্য-বালার কণ্ঠদেশ সুন্দর পুষ্পমালায় সজ্জিত করিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন-চরিত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি প্রথমে ইংরাজি জানিতেন না, তৎপরে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি-কল্পেই ইংরাজি-সাহিত্যে অভিজ্ঞ হওয়া অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া, বহুপরিশ্রমের সহিত ইংরাজি সাহিত্যে পারদর্শী হইলেন। স্বার্থশূন্য হইয়া, স্বদেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিয়া, বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে এদেশের অতি অল্প লোকই দেখা যায়।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গসাহিত্যের যাহা কিছু উন্নতি দৃষ্ট হয়, তাহার আদি কারণ বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিগত ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ বঙ্গের কি ভীষণ দিন, সেইদিন তিনি বঙ্গসাহিত্য-সংসারকে চিরদিনের জন্য শোক-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া যোগ্যস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্য তাঁহার কৃপায় কতদূর উন্নত হইয়াছে, তাহাই আমরা কিঞ্চিৎমাত্র আলোচনা করিলাম, তদ্ভিন্ন তিনি আমাদের পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, সমাজের বন্ধু, দেশের বন্ধু। পিতৃহীন পুত্র ও নিঃসহায় ব্যক্তিরা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বিহনে সজলনেত্রে অহঃরহ রোদন করিতেছে,—আমরাও আজ সেই দুর্ল্লভ মহাত্মার বিয়োগ-জন্য তাহাতে আমাদের অশ্রুকণা সম্মিলিত করিলাম।

বিদ্যাসাগরের সহিত বঙ্গসাহিত্যের কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা অতি সংক্ষেপেই লিখিত হইল। তাঁহার সদ্‌গুণাবলীর কোনটীও বিশিষ্টরূপে বর্ণিত হয় নাই। ভরসা করি, গুণগ্রাহী মহাশয়েরা আমার এই ত্রুটির মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

হেমচন্দ্র কোথা ?

(১)

হেমচন্দ্র কোথা ?—কাব্যের কোকিল,
কাব্য-কুঞ্জবনে কূজন যাঁর—
তানে তানে তানে মাতাইত চিত,
মধুরে বাজিত হৃদয়-তার !

(২)

কোথা সে কোকিল লুকা'ল এখন,
সে কল-কাকলী না শুনি কেন ?
যেদিকে নেহারি, দেখিতে না পাই,
কাব্য-কুঞ্জবন আঁধায় যেন !

(৩)

না, না, না, না, না, না, একি কথা বলি ?
কেন ভ্রান্ত হয় পাগল মন ?
কেন লুকাইবে, লুকাইবে কোথা,
হেম কিবা লুকাইবার ধন !

(৪)

পশেছে ত্রিদিবে ত্রিদিব-ভূষণ,
জুড়ায়েছে যত ভবের জ্বালা।
নিত্যানন্দধামে আনন্দ লভিছে,
অপ্সরা সঁপিছে কুসুম-মালা !

(৫)

হেসে হেসে যবে কেটেছিল দিন,
ওকালতি পদে কতই মান—
লভেছিলে কবি ! অর্থ রাশি রাশি,
কাঙ্গাল গরীবে করেছ দান !

(৬)

তখনো কেঁদেছ স্বদেশের দুখে,
কেঁদে কেঁদে কত গেয়েছ গীত !

ভারত সঙ্গীতে সেই অশ্রুধারা—
হুতাশনে জ্বলি দহেছে চিত ?

(৭)

হেমচন্দ্র ! কহ স্বরগ ভেদিয়া,
সত্য কিনা যাহা কহিনু আমি ?
চক্ষু-রত্ন-হারা ছিলে মরধামে,
লয়েছেন কোলে অখিল-স্বামী !

(৮)

সেই তুমি হায় ! জীবনের শেষে,
পেয়েছ অন্তরে যাতনা কত ;
দীপ্তিহীন নেত্রে ফেলি অশ্রুধার,
যাপিয়াছ দীন ভিখারি মত !

(৯)

তবু কাঁদিয়াছ স্বদেশের তরে
চিরদিন ছিলে হিতেতে রত,
কণ্ঠাগত প্রাণ, তবু কাঁদিয়াছ,
কে আর কাঁদিবে তোমার মত ?

(১০)

কাঁদিয়াছ কবি, যাহাদের তরে,
উঠ জাগ বলি কাতরে ডেকে,
তাহারা ত কেহ শোনে নাই কথা,
ঘুমায়ে রয়েছে জাগিয়া থেকে !

(১১)

নাই বা শুনিল, ক্ষতি কিবা তায় ?
অবশ্য সময়ে আসিবে দিন,
যবে তব বাণী বিতরিবে ফল,
রবে না ভারত এহেন হীন ?

(১২)

হেমচন্দ্র ! তুমি গিয়াছ স্বরগে,
চর্ম্মচক্ষে আর দেখা না পাই,

সে নয়ন মুদি ভক্তিনেত্র খুলি,
জ্যোতির্ম্ময় তোমা দেখিতে পাই !

শ্মশান ও আদ্যকৃত্য।

আছিল জীবন, না ছিল নয়ন,
তথাপি যখন মুঁদিলে আঁখি,
হিম কলেবর, স্তব্ধ তারস্বর,
উড়ে গেল যবে জীবন-পাখী,
মিলি বন্ধুজন, সে দেহ তখন,
সুরধূনী তীরে লইয়া এলো,
শ্মশানের ঘাটে, ভিজে কাঁচা কাঠে,—
সেই হেম-দেহ * পুড়িয়ে গেলো !
সমাপি সৎকার, হয়ে শুদ্ধাচার,
ঘরে গেল সবে চুকিল গোল,
কিছু কিছু নয়, সব শূন্যময়,
বাতাসে মিশিল বোল হরিবোল !
বাজিল না খোল, ফাঁকা হরিবোল,
বল রে হরি, হরি হরিবোল !
হেমচন্দ্র-শোকে, গৃহবাসী লোকে,
তুল্‌ল দু-দিন রোদনের রোল !
দেহ ভস্মসার, ক্রন্দন অসার,
ক্রন্দন বিফল মায়া !
সব নিভে যায়, দু-দিনে ফুরায়,
প্রাণ যবে ছাড়ে কায়া !
হেমচন্দ্র কবি, বঙ্গ পদ্মরবি,
অস্তাচলে চলি গেলা !
সেই নাম স্মরি, বন্ধুরূপ ধরি,
কেঁদে লও এই বেলা !

* "হেমদেহ"—হেমচন্দ্রের দেহ।—অর্থান্তরে স্বর্ণদেহ। মাটির দেহ হইলেও কবির দেহকে সোণার দেহ বলা কবির ইচ্ছা।

সভ্য ভাই সব, থেক না নীরব,
'কাঁদিবার সভা কর' !
বক্তৃতায় কেঁদে, স্নেহে বুক বেঁধে,
সভ্যতার ধ্বজা ধর !
বেশ কাঁদিয়াছ, ভাব লাগায়েছ,
ধন্য ধন্য ভালবাসা !
কাঁদিতেই হয়, মনে যেন লয়,
কাঁদিবারে ভবে আসা !
শ্রাদ্ধ-বিধি আছে, সবাকার কাছে,
সে বিধি পালিতে হয়।
তিনদিন পরে, কন্যা শ্রাদ্ধ করে,
"চতুর্থ" তাহারে কয় ॥
বর্ণ অনুসারে, ক্রমশঃ সবারে,
দিনে দিনে শ্রাদ্ধ করে।
করিতেই হয়, না করিলে নয়,
বিশেষ হিন্দুর ঘরে ॥
আজিকার কালে, সভ্যতার চালে,
বক্তৃতায় শ্রাদ্ধ হয় !
পচা পুরাতন, আচার নূতন,
হ'ক সভ্যতার জয় !!

মুক্তি।

কারাবাসী যেইদিন কারামুক্ত হয়,
মনে কর তার প্রাণে কত সুখোদয় !
দেহ-কারামুক্ত হয়ে ভব-জীব-প্রাণ,
বাতাসের সনে করে স্বস্থানে প্রস্থান।
ভাব দেখি সেইদিন কি আনন্দ তার,
ধরায় ফিরিতে সে কি ইচ্ছা রাখে আর ?

মরণে নির্ব্বাণ মুক্তি যুক্তি দেন যাঁরা,
সত্য সত্য সংসারের শান্তিদাতা তাঁরা।
কতশত খেলা করে, ভেঙ্গে খেলা-ঘর,
পশেছেন মুক্তিধামে মুক্ত কবিবর।
কবিবর হেমচন্দ্র মরিয়া অমর,
অমরের মৃত্যু নাই, সম-পূর্ব্বাপর।
ভব শাস্ত্রে লেখা আছে, মোহিও না শোকে,
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ইহপরলোকে।
কীর্ত্তিমান্ হেমচন্দ্র অক্ষর অমর,
মুক্তিধামে হেমচন্দ্র বঙ্গ কবিবর।
ভাবিতে তাঁহার রূপ ইচ্ছা যদি হয়,
স্মরিতে হেমের গুণ মনে যদি লয়।
কীর্ত্তি আলোচনা কর, মাতিয়া কৌতুকে,
উল্লাসে হেমেরগুণ গান কর মুখে।
শোকসভা কেন ভাই, কান্না কি কারণ?
মুক্ত-পুরুষের জন্য নিষেধ রোদন।
কীর্ত্তিতে কীর্ত্তিতে রূপ, কীর্ত্তিগুণময়,
কীর্ত্তিপটে দেখা পাবে হেমের উদয়।
ছোট ছোট কীর্ত্তি নয়, স্বভাবে প্রকাশ,
পদে পদে পরিচয় হৃদয় উচ্ছ্বাস।
তোমাদেরি হিতব্রতে সমর্পিয়া প্রাণ,
স্বদেশের দশাগীতি করেছেন গান।
গানের তরঙ্গ ছোটে ভারত-সাগরে,
চেয়ে দেখ সে তরঙ্গ সানন্দ অন্তরে।
পার যদি সে তরঙ্গে ঝাঁপ দিতে যাও,
বামাদের মত কেন কাঁদিয়ে ভাসাও?
পেয়েছ পুরুষ-জন্ম, পুরুষত্ব ধর,
মিছামিছি কেঁদে কেঁদে কেন তুমি মর।
কেঁদ না কেঁদ না ভাই করি নিবেদন,
চিরজীবি হেমচন্দ্র, কবি-সিংহাসন!

কীর্ত্তিতে কবির বাণী আলোচনা করি,
"ভারত-সঙ্গীত"-খানি হৃদয়েতে ধরি,
গাও কবীন্দ্রের গুণ, গাও প্রাণ ভরি
পালক বীন্দ্রের বাক্য, বল হরি হরি!
সম্বর রোদন ভাই, সম্বর রোদন,
দেখাও দশের বল, শান্ত কর মন।
স্বর্গধামে পশেছেন হেমচন্দ্র দ্বিজ,
আপন মঙ্গল সবে সাধ নিজ নিজ।
মঙ্গল সাধনে হবে দেশের মঙ্গল,
চক্ষুজল ফেলে কেন ডাক অমঙ্গল!
আমি এইখানে আজ পালা সাঙ্গ করি,
আইস আমার সঙ্গে বল হরি হরি।

মাতুলসহ শিশুর উদ্যান ভ্রমণ।

(১)

চলগো মাতুল, চল যাই নদীকূলে।
মনোহর উপবন শোভে যার তীরে॥
যথা শোভে তরুরাজি বিকশিত ফুলে।
প্রভাত সমীর যথা প্রবাহিত ধীরে॥

(২)

প্রাচীশির স্বর্ণ রাগে করিয়া রঞ্জিত।
উদিল অরুণ ছবি তরুণ তপন॥
মনোদুখে কুমুদিনী হইল মুদিত।
হেরিয়া নলিনীনাথে মলিন বদন॥

(৩)

যথা সেই উপবন কিবা শোভাময়।
নন্দনকানন সম নবশোভা ধরে॥
বৃন্দারক-বৃন্দ যাহে আনন্দিত হয়।
নব নব ফুল্ল ফুল শোভে থরে থরে॥

(৪)

তরুরাজি রবিকরে রঞ্জিত হইয়া।
সমীর সঞ্চারে কিবা দোলে শাখাচয়॥
যেন যুঝে শ্বেতসেনা সমরে মাতিয়া।
অরিকুল রক্তপাতে হয়ে রক্তময়॥

(৫)

...দেখ ফুটেছে মাতুল
...ুল যেই সংসার ল্তিরে
...ণ যার সুষমা ম্মুর্ত্তি।
...ষ আশুতোষ যাঁর ফলাহারে॥

(৬)

...চ কুসুমদামে শোভিত বরুণ।
...রুণ শোভিছে যেন কুসুম মালায়॥
প্রসারি সহস্র বাহু পাদপ অর্জ্জুন।
শোভিছে সহস্র বাহু অর্জ্জুনের প্রায়॥

(৭)

কদম্ব কদম্ব কিবা তটিনীর তীরে।
বিকশিত ফুলদামে অতি সুশোভন॥
কদলী কান্তারে দেখ কদলী কান্তারে
ভূতলে অতুল যার সুন্দর নয়ন॥

(৮)

ঐ দেখ পলাশ পলাশে ঢাকি দেহ।
বনপ্রিয় বনপ্রিয় ডাকিছে সু-স্বরে॥
ধন্য পাখী, ওর মত আর নাহি কেহ।
কুহরি ঢালিছে সুধা শ্রবণ কুহরে॥

(৯)

যাতী যুঁথী মালতী মল্লিকা থরে থরে।
ফুটেছে, ছুটেছে ফুল শত শত অলি॥
লাজে দুখে বিষাদে রয়েছে একধারে।
ভৃঙ্গরাজ ভৃঙ্গরাজ উপেক্ষিত বলি॥

(১০)

আর কত মত ফুল ফুটেছে চৌদিকে।
কত রঙ্গে সাজায়েছে উপবন ভূমি॥
সব শোক দূর হয় দেখিলে অশোকে।
বল মামা, ওরে ভালবাস নাকি তুমি॥

(১১)

লজ্জালু লজ্জালু যেন কুলের রমণী।
পাছে কেহ ছোঁয় বলি রয়েছে লুকায়ে॥
দুর্ব্বার দূর্ব্বার ক্ষেত্রে যেন কত মণি।
নিশির শিশির বিন্দু দিয়াছে ছড়ায়ে॥

(১২)

রজনী রজনী যোগে সৌরভ ছড়ায়ে
গৌরব-বিহীন যথা ধনহীন দাতা॥
জানাইছে দশদিকে গন্ধ ছুটাইয়ে।
গন্ধরাজ পুষ্পরাজ দলে দলে গাঁথা॥

(১৩)

কাঞ্চন বরণ যত কাঞ্চনের ফুল।
কামিনী কামিনী কুল কবরীর প্রায়
বক হেন বক ফুল মরি কি অতুল।
গাছে গাছে শোভে নব শাখায় শাখায়

(১৪)

প্রভাতি বনেরশোভা দেখিতেদেখিতে
আনন্দে উদাস প্রাণ, কহিল মাতুল॥
"বলিতে কি পার শিশু, কেবা অবনীতে
সাজাইল বনখানি শোভায় অতুল?"

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়্যা।
এক্তারপুর মদনমোহন বাড়।

শ্রীশ্রীধর্ম্ম।

ধর্ম্ম সম্পূর্ণ। ধর্ম্ম চতুর্ম্মুখ, ধর্ম্ম চতুর্ভুজ, ধর্ম্ম চতুষ্পদ, অতএব ধর্ম্ম সম্পূর্ণ। ধর্ম্মের এক হস্তে মাল্য, এক হস্তে শাস্ত্র, এক হস্তে অভয়, এক হস্তে ধর্ম্মপথ প্রদর্শনে অঙ্গুলী সঙ্কেত।

ধর্ম্মের রূপ এই। কে জানে কেমন রূপ, বলিতে শুনিতে এইরূপ রূপ। পাঠক মহাশয় উপরে যে চিত্রখানি দেখিতেছেন, আর একবার দেখুন, ধর্ম্মের বামপার্শ্বে একটি রাজা। রাজাটি কি করিতেছেন? উভয় হস্ত বিস্তার করিয়া হয় ত ধর্ম্মের পদে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, অথবা ধর্ম্মকে দেখাইয়া মানুষকে বুঝাইয়া দিতেছেন, এই ধর্ম্মই ইহসংসারে সার।

ধর্ম্ম সম্পূর্ণ। সত্যযুগের ভাগ্যবান লোকেরা এই পূর্ণরূপের পূজা

করিতেন, ত্রেতাযুগে একাংশ হীন, দ্বাপরযুগে অর্দ্ধাংশ বিদ্যমান ছিল, এখন কলিযুগ, এক্ষণে চতুর্থাংশের একাংশমাত্র বিদ্যমান। ছবিতে চিত্রিত আছে, চারি পদ, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে বস্তুত একপাদ মাত্র অবশিষ্ট। নামটি বিলুপ্ত হয় নাই, কিন্তু অঙ্গহীন, মলিন।

কোন সময় সংসারে কলির অধিকার, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে শ্রীকৃষ্ণের মায়ায় রাজা যুধিষ্ঠির পাতালপুরে বলিরাজের সভাগৃহের দ্বারে বন্ধনদশা-গ্রস্ত মেষরূপী কলির বন্ধন মোচন করিয়া দেন, অনন্তর কলি স্বমূর্ত্তিতে সম্মুখীন হইলে যুধিষ্ঠির তাহাকে বলেন, "আমি যতদিন রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিব, ততদিন যেন পৃথিবীতে কোন উপদ্রব না ঘটে।" কলি তাহাতে এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, পরীক্ষিতের রাজত্বকালে, পাণ্ডব রাজ্যে কলির অধিকার হইবে।

তাহাই হইয়াছে। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, রাজা পরীক্ষিৎ একদা দেখিয়াছিলেন, ত্রিপাদভগ্না কাতরা একটি গাভী অতিকষ্টে ক্ষীণদেহে অশ্রুপাত করিতে করিতে এক পদে চলিয়া যাইতেছিল, ভীমমূর্ত্তিতে কতিপয় দুর্দ্দান্ত লোক সেই গাভীটিকে প্রহার করিতেছিল, রাজা তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে গাভী বলিয়াছিল, "আমি ধর্ম্ম, আমার শত্রুরা আমার এই দশা করিয়াছে! আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বংশধর, শত্রুরা ইহার উপর আর যেন আমার অধিক দুর্গতি করিতে না পারে, আপনি তাহার উপায় করিবেন।"

হায় হায়! রাজা পরীক্ষিৎ প্রাণপণ যত্ন করিয়াও পূর্ণাংশে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। রাজা পরীক্ষিতের পর সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, হায় হায়! এখন সেই ধর্ম্মের অনন্ত দুর্গতি। ছবির রাজা হস্ত বিস্তার করিয়া ধর্ম্মকে দেখাইয়া দিতেছেন, কিন্তু দেখে কে?

ধর্ম্ম আছেন। শাস্ত্র প্রমাণে একপদ মাত্র অবশিষ্ট, চতুর্থাংশ মাত্র হইলেও পৃথিবীতে ধর্ম্ম আছেন। এককালে ধর্ম্ম না থাকিলে এতদিনে কবে মহাপ্রলয় ঘটিয়া যাইত। সাধারণ লোকেও বলে, ধর্ম্ম না থাকিলে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত থাকিত না, দিবারাত্রি হইত না। ধর্ম্ম আছেন, সর্ব্ববাদীসম্মত।

হায় হায়! ধর্ম্মের মহিমা এখন খর্ব্ব, অধর্ম্ম প্রবল! ধার্ম্মিক ধর্ম্মপথ প্রদর্শন করেন, স্বয়ং ধর্ম্মপথে চলেন, ইহা সংসারের মঙ্গলনিদর্শক; কিন্তু

কই, ধার্ম্মিক এখন সে কর্ত্তব্যপালন করেন কই? এমন অনেকগুলি ধার্ম্মিক আছেন, যাঁহাদের সকলেই প্রায় যুগবশে অথবা কালবশে ভ্রমপ্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া এক এক বিষয়ে অধর্ম্মের দিকেই চলিয়া পড়িতেছেন। কথায় বলে, গড্ডালিকা প্রবাহ। ভেড়ার পাল যখন পথে চলে, তখন অগ্রগামী বড় ভেড়াটা যেদিকে যায়, পালের সমস্ত ভেড়া সেইদিকে চলিয়া থাকে। ধার্ম্মিকের যদি অধর্ম্মে মতি হয়, জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে ধার্ম্মিক যদি কুপথে চলেন, তাহা হইলে জগতের প্রকৃতিপঞ্জ তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ক্রমশই অধর্ম্মপথে প্রধাবিত হইবে, ইহা নিশ্চয়।

এ লক্ষণ কোন অংশেই মঙ্গলদায়ক নহে। পৃথিবীতে অজ্ঞাতনাম বহুবিধ নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব বর্ষে বর্ষে বিবিধ আকস্মিক রোগে বহুপ্রাণীক্ষয়, দেশে দেশে ঘন ঘন ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ, এ সকল কেবল অধর্ম্মের ফল।

যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া যাঁহারা জ্ঞানলাভ করিতেছেন, ধর্ম্ম বিচারে যাঁহাদের তর্কশক্তি জন্মিতেছে, অটল বিশ্বাসে তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষা করিতে পারেন না; তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের দেশের মূর্খ স্ত্রীলোক এবং মূর্খ সাঁওতালাদি বন্যজাতির ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্ম ভয় অধিক। লেখাপড়া না শিখিলে যে ধর্ম্মপালন করা যায় না, একথা অগ্রাহ্য।

আমরা ঐ ছবিখানির প্রতি আর একবার পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করি। ছবিতে ধর্ম্মের রূপ যেমন পূর্ণাঙ্গ, ছবিতে রাজার যেরূপ হস্তসঙ্কেতে মঙ্গলকামনা, সংসারে আমরা সেরূপ পূর্ণাঙ্গধর্ম্ম এবং সেইরূপ মঙ্গলকামি ব্যক্তি দর্শন করিতে অভিলাষী।

সমালোচনা।

১। চরিত্রবান্ কুলীন।—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রণীত, মূল্য ১৲ এক টাকা। হালিসহরের শ্রীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় চতুর্দ্দশটি বিবাহ করিয়াছিলেন। আটটীকে সর্ব্বদা নিজ বাড়ীতে রাখিতেন, অবশিষ্ট ছয়টিকে বিশেষ বিশেষ পর্ব্ব উপলক্ষে বাটীতে আনয়ন করিতেন; সকল গুলির প্রতি তাঁহার সমান যত্ন ছিল। বাবু মহেন্দ্রনাথ এই বিষয়টি উপ-

ন্যাসের প্রণালীতে চলিত ভাষায় রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্বে যখন রাঢ় বঙ্গে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকে অনেক বিবাহ করিতেন, সেই সময় যদি এই প্রকারের দুই একখানি পুস্তক প্রচারিত হইত, তাহা হইলে বহুবিবাহ-কর্ত্তা কুলীন পুরুষেরা অনেকটা শিক্ষালাভ করিতে পারিতেন। এক্ষণে এ দেশে বহুবিবাহ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তথাপি এই পুস্তক পাঠ করিয়া সামাজিক লোকেরা অনেক প্রকার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ইহাতে বাবু মহেন্দ্রনাথের গ্রাম্য সামাজিক অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় আছে। আজকাল যাঁহারা বহু বিবাহের কথা লইয়া সাধারণ কুলীন ব্রাহ্মণের প্রতি দোষারোপ করেন, এই পুস্তক পাঠ করিয়া তাঁহারা বুঝিবেন, নবগুণবিশিষ্ট চরিত্রবান কুলীন কোন অংশে তিরস্কারভাজন হইতে পারেন না। পুস্তকের স্থানে স্থানে একাত্তরটি গীত আছে, গীতগুলির রচনাও উত্তম; কিন্তু এক এক স্থলে গীতের পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনে কবি তাদৃশ যত্নশীল হন নাই, এইরূপ যেন আমাদের বোধ হইল। যাহা হউক, সমাজপ্রিয় পাঠকবৃন্দকে আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

২। বেদম হাসি।—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য পাঁচ আনা। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা হাসির গল্প শুনিতে ভালবাসে; নীতিগর্ভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প অবলম্বনে বিপ্রদাস বাবু আমাদের বালক বালিকাগণকে হাসাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। গল্পের শিরোনামগুলি দর্শন করিলেই হাসি আইসে। লেজ কাটা বাঘ, লোভী ঢাকী, হাবা গোরাচাঁদ, বানরের ফলার, মাংস-খোর কালা কাকা, বাগ্-ডুমা-ডুম্-ডুম্, শেয়ালের মামা ইত্যাদি গল্প ইহাতে অনেকগুলি আছে, গল্পের মাথায় মাথায় সুন্দর সুন্দর সুরঞ্জিত ছবি আছে। ছবি দেখিলেও হাসি পায়, পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১২শ বর্ষ। } মাঘ, ১৩১০ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

পরমকল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

পরমাত্মা প্রকাশ না হইবার কারণ।

পরমাত্মা পূর্ণরূপে সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে দেখিতে না পাইবার কারণ এই যে, যেমন—যদি কোন দরিদ্র ধন আশায় রাজার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সে যেমন রাজার সাক্ষাৎ পায় না, কেবলমাত্র দরিদ্রদিগকে দেয় বন্দোবস্তানুযায়ী ধন পাইয়া প্রস্থান করিতে বাধ্য হয়, প্রহরীরা তাহাকে রাজদর্শন করিতে দেয় না, সেই প্রকার যাহারা কেবলমাত্র ফলাকাঙ্ক্ষা করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করে, পরমাত্মা তাহাদিগের নিকট প্রকাশ না হইয়া, কেবলমাত্র কর্ম্মফলাফল অনুসারে তাহার অন্তরে ভাববুদ্ধি প্রেরণা করিয়া কৌশলে ভোগ প্রদান করেন। আশা, তৃষ্ণা, অজ্ঞানাদি, ভোগবিলাসী ব্যক্তিদিগকে পরমাত্মার দিকে অগ্রসর হইতে দেয় না। যদি কেহ কেবলমাত্র পরমাত্মাকে পাইবার জন্য উপাসনাদি করেন, তাঁহাকে পরমাত্মা শীঘ্রই জ্ঞানদানে আপনার সহিত অভেদ করিয়া লন। যেমন বাসনারহিত ব্যক্তির সহিত রাজাগণ সহজেই মিলিত হন।

যদি কাহার অন্তরে স্বাভাবিক বাসনাদি থাকে, তাহাতে বিশেষ চিন্তা বা ভীত হইবার কারণ নাই। কারণ, পরমাত্মার শরণাগত হইলে পরমাত্মা নিজগুণে কৃপা করিয়া ক্রমে মন পবিত্র করতঃ অভেদ করিয়া লইবেন।

সকাম বা নিষ্কাম যেভাবে হউক, উত্তম শ্রেষ্ঠ কার্য্য কর এবং পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি রাখ, তাহা হইলে কোন চিন্তা হইবে না; যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহা পরমাত্মা করিবেন। সকলের বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, যদি মাতা, পিতা পুত্র-কন্যাকে ধন দান করেন, তাহা হইলেই মাতা-পিতাকে ভক্তিশ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিতে হয়। নচেৎ করিতে নাই? ইহা কি সৎপুত্র কন্যার কর্ত্তব্য কার্য্য? মাতা পিতা ধন দান করুন আর নাই করুন, সৎপুত্র-কন্যার কর্ত্তব্য, মাতা-পিতার সেবা করা। সেই প্রকার জ্ঞানবান্ ব্যক্তিমাত্রেরই উচিত, নিষ্কপটভাবে মাতা পিতা পরমাত্মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপাসনা করা; এবং যে উপায়ে জগৎ চরাচর সুখে থাকিবে, তাহা পরমাত্মা সর্ব্বদাই করিতেছেন। তাঁহার দয়া ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও কেহ বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। যতদিন স্থূলশরীরে থাকিতে হইবেক, ততদিন অন্ন, জলাদির প্রয়োজন হয়। উহা পরমাত্মা পূর্ব্ব হইতে মানিয়াই উহার উপায় করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি অন্তর্যামী কাহার কি প্রয়োজন, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানিয়াছেন।

ত্যাগ, গ্রহণ, আসক্তি, অনাসক্তি, সকাম, নিষ্কাম ও বন্ধন বিষয়।

যে সকল ব্যক্তি-বিচার পূর্ব্বক পরমাত্মার আজ্ঞানুসারে গৃহস্থ-ধর্ম্মে থাকিয়া প্রয়োজন মত নানা উপায়ে ভুরি ভুরি অর্থ উপার্জ্জন ও পরিমিত সকল ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য ভোগ করিয়া সুখ দুঃখে, ক্ষুণ্ণ বা লাভ ক্ষতিতে আসক্ত না হয়, অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ টাকা বা ভোগলাভে আনন্দ এবং লক্ষ লক্ষ টাকা বা ভোগ নষ্ট হইলে দুঃখিত হয় না, পরমাত্মাই সকল ভোগ এবং সমস্তই পরমাত্মার। অন্য কাহার কিছুই নাই, এমন কি, একটী তৃণ পর্য্যন্ত কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, ইহা বুঝিয়া, সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকে; মনে করে যে, লক্ষ লক্ষ টাকা ভোগ লাভ বা নষ্ট হইলে তাহার সহিত আমি লাভ বা নষ্ট হই না। আমি যাহা তাহাই আছি ও থাকিব। আমার এমন কিছুই নাই, যাহাতে অসক্ত বা নিরাসক্ত হইব এবং যাহা ত্যাগ বা গ্রহণ করিব। পরমাত্মারই সমস্ত, তাঁহার ইচ্ছাতেই সমস্ত হইবে, এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে যথার্থ নিষ্কামী ও ত্যাগী জানিবে।

পরমাত্মা যাহাকে যতদূর জ্ঞানবুদ্ধিশক্তি প্রদান করিয়াছেন, প্রয়োজনানুসারে উহা পরমার্থিক ও ব্যবহারিক কার্য্যে নিয়োগ করা উচিত। যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়, কোন বিষয়ে কাহার কষ্ট না থাকে, এই প্রকারে যাহারা গৃহস্থ ধর্ম্ম পালন করেন, তাঁহাদিগকে কর্ম্মহেতু বদ্ধ হইতে হয় না। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ নিষ্কামী মুক্তস্বরূপ। যেমন পরমাত্মা পিপাসা নিবারণার্থ জল সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কেহ প্রয়োজন মত জল পান বা সঞ্চয় করে, তাহাকে আসক্তি প্রযুক্ত বদ্ধ হইতে হয় না, এবং উহাকে আসক্তি বলে না। যে ব্যক্তি আপনার প্রয়োজন মত জল পান বা সঞ্চয় করিয়া তৃপ্তিলাভ না করিয়া অধিক সঞ্চয়ের জন্য কষ্টভোগ করে, তাহাকেই অসক্তহেতু বদ্ধ হইতে হয়, এবং এই প্রকার লোভকেই যথার্থ আসক্ত বলে।

পরমাত্মা গৃহস্থদিগকে যে যে উদ্দেশ্যে যে যে দ্রব্য প্রদান করিয়াছেন, মনুষ্যগণের উচিত, উহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহার করা। নচেৎ অপব্যয় কিংবা বদ্ধ করিয়া রাখা উচিত নহে। যে গৃহস্থকে পরমাত্মা লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়াছেন, তাহার উচিত উহা যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা। যদি অকস্মাৎ চুরি হইয়া যায়, উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার বিশেষ চেষ্টা করিবে, কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের নিকট থাকিলে উহা সদ্ব্যবহার হইবে; এবং দুষ্টলোকের নিকট থাকিলে উহা দ্বারা জগতের অমঙ্গল হইতে পারে। যদি অন্বেষণ করিয়াও পুনঃপ্রাপ্ত না হও, তাহা হইলেও উহাতে আসক্ত হইয়া দুঃখ করিতে নাই। কারণ সমস্তই পরমাত্মার বস্তু, তিনি কি কারণে যে লইয়া গিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। তাঁহার ইচ্ছায় যাহা হইবে, তাহা মঙ্গলকর বোধ করা উচিত; এবং যদি ঐ টাকা পুনঃ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে উহার সদ্ব্যবহার করা উচিত। এই প্রকারে কার্য্য করিলে আসক্তির জন্য বদ্ধ হইতে হয় না।

সকলেরই ইহা মনে রাখা উচিত যে, সকলই শূন্যহস্তে আসিয়াছেন ও শূন্যহস্তে যাইতে হইবে। কেহ কিছু সঙ্গে করিয়া আনেন নাই এবং কেহ কিছু সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। এমন কি, এই স্থূলশরীর যাহার পোষণ ও সুখের জন্য এত লালাইত এবং যাহার মধ্যে বসিয়া রাজা, ধনী, জ্ঞানী, পণ্ডিত, সন্ন্যাসী প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া অহঙ্কারে সকলকে তুচ্ছ মনে করিতেছ, ইহাও কাহার সঙ্গে যাইবেক না। কি রাজা, কি

দরিদ্র, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ যতদিন স্থূলশরীরে থাকিবেন, ততদিন পান ও আহারের জন্য জল ও একমুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্য একখানি বস্ত্র সকলেরই প্রয়োজন; ইহাই ভোগের যথেষ্ট। কেহই স্বর্ণাদি আহার বা মলরূপে নির্গত করেন না। সকলেই অন্ন আহার করেন, মল নির্গত হইলে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। সকলেই দুই দিবসের জন্য ভোগ করিতেছেন। জীবন বহির্গত হইলে সমস্তই শেষ হইয়া যাইবেক। অতএব যাহাতে জগতবাসীগণ কি ব্যবহারিক, কি পরমার্থিক উভয় কার্য্য পরমাত্মার নিয়মানুসারে পালন করিয়া সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।

বিচারপূর্ব্বক দেখুন, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই পরমাত্মা তাহার আহারের জন্য মাতার স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত সন্তানের অন্নাদি আহারোপযোগী দন্ত বাহির না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দ্বারা পালন করেন। যখন সন্তান অন্নাদি আহার করিতে সক্ষম হয়, অপ্রয়োজনহেতু তখন মাতার স্তনে দুগ্ধ রাখেন না। অতএব কেহ কামনা কর আর নাই কর, পরমাত্মা পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজনানুসারে অভাব মোচন করেন।

ব্যাকরণোক্ত বর্ণ সকলের তত্ত্ব নিরূপণ।

ব্যাকরণে স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই বর্ণ এবং ক্লীব লিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী-লিঙ্গ এই তিন লিঙ্গ কল্পিত আছে। ইহার যথার্থ সারভাব না জানিয়া নানা-লোকে নানাপ্রকার বলিয়া থাকে কিন্তু ইহার সার ভাব এইরূপ বুঝিবে।

একই কালি হইতে "অ, আ, ই" প্রভৃতি ১৩শ বা ১৬টী স্বর ও "ক, খ, গ, ঘ" প্রভৃতি ৩৫টী ব্যঞ্জন বর্ণ এবং একই কালিতে কি অক্ষরকে ক্লীব-লিঙ্গ, কা অক্ষরকে পুংলিঙ্গ এবং কাকে স্ত্রী-লিঙ্গ কল্পনা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সকলি কালি মাত্র। উহাতে কোন বর্ণ বা লিঙ্গাদি নাই। কেবল ব্যবহার কার্য্য সুশৃঙ্খলে চলিবার জন্য কালিতে নানা নাম কল্পনা করা হইয়াছে। এবং ব্যবহার কার্য্যে ক স্থলে খ বা কি স্থানে খি করিলে চলিবে না। কারণ যে শব্দের বিষয় যাহার সংস্কার পড়িয়াছে, তাহা প্রকাশ না করিলে ভাব অনুভব হইবে না। এই জন্য নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ গুণ ক্রিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। এই সকল ভাব পরমার্থিক বিষয় হইতে গ্রহণ করিয়া ব্যবহারিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, যথা—

কালিরূপ একমাত্র শুদ্ধ চৈতন্য কারণ পূর্ণপরব্রহ্ম। যখন নিরাকার হইতে ওঁকার সাকার জগৎ নাম রূপে বিস্তার হইলেন, তখন তাহাতে স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ এবং স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ অর্থাৎ যে চেতন জ্যোতিঃ চরাচর জীব চেতন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাকে স্বরবর্ণ এবং স্থূল শরীরকে ব্যঞ্জন বর্ণ জানিবেন এবং পরমাত্মার নিরাকার ভাবকে পুংলিঙ্গ, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্বরূপ মহাভাবকে স্ত্রীলিঙ্গ এবং ক্ষিতি আদি পঞ্চ-ভূতকে ক্লীবলিঙ্গ জানিবে।

জ্যোতিঃস্বরূপ স্বরবর্ণ, মনুষ্যের মধ্যে তের বা ষোল ভাবে কার্য্য করিতেছেন, যথা—দুই নেত্র দ্বারে জ্যোতিঃরূপে, দুই নাসিকা দ্বারে প্রাণরূপে, দুই কর্ণে আকাশ রূপে, মুখে অগ্নি রূপে, দুই হস্তে দুই পদে, একটী পায়ুতে, একটী উপস্থে। এই তের এবং সত্ত্ব, রজ, তম এই তিনগুণ লইয়া ষোল প্রকারে একই জ্যোতিঃর প্রকাশ ভাবকে স্বরবর্ণ বলে; এবং শরীরের অস্থি মাংসের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে এক এক ব্যঞ্জনবর্ণ ধরিয়া ৩৫টী ব্যঞ্জনবর্ণ কল্পনা আছে।

লিখিত আছে, স্বরবর্ণ ব্যতিরেকে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয় না। ইহার সার ভাব এই যে, তোমরা যে জ্যোতিঃ স্বরবর্ণ, ইহা ব্যতিরেকে তোমাদিগের সুস্থ শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না! যখন তুমি জ্যোতিঃ ১৬ কলায় পূর্ণ হইয়া প্রকাশ হও, তখন তোমার স্থূল শরীর কার্য্য-ক্ষম হয়। নচেৎ যখন তুমি জ্যোতিঃ সুষুপ্তি অবস্থায় নিরাকারে স্থিত হও, তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়া থাকে, কোন কার্য্য হয় না। পুনরায় যখন নিরাকার হইতে ১৬ কলায় প্রকাশ পাও, তখন তুমি জ্যোতিঃ ও স্থূল শরীর একত্রিত হইয়া ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

এই সকল এক একটী বর্ণ দ্বারা এক একটী কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। যথা—ক বর্ণ বায়ু ব্রহ্ম দ্বারা চরাচর স্ত্রী পুরুষের নাসিকাদ্বারে প্রাণ বায়ু চলিতেছে। খ বর্ণ অগ্নিব্রহ্ম দ্বারা ক্ষুধা লাগিতেছে। আহার করিতেছে ও অন্ন পরিপাক হইতেছে এবং কথা কহিতেছ। এইরূপ বিরাট ব্রহ্মের এক এক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি দ্বারা জগৎ চরাচরের এক একটী কার্য্য হইতেছে।

পঞ্চ তত্ত্ব ব্রহ্ম, পঞ্চ কর্ম্ম ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু, সত্ত্ব, রজ, তম, তিন গুণ লইয়া এবং মন এই পঁচিশ প্রকৃতিকে, ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশ স্পর্শ বর্ণ কল্পিত আছে। মন, বুদ্ধি, চিত্ত অহঙ্কারকে

য, র, ল, ব এই চারি অন্ত্যস্তবর্ণ কল্পিত আছে। চারি বেদমাতা জ্যোতিঃস্বরূপকে শ, ষ, স, হ এই চারি উষ্মবর্ণ এবং বুদ্ধি ও চিত্তকে অনুস্বর ও বিসর্গ কল্পিত আছে। বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রকৃতি পুরুষকে বিসর্গ এবং চেতন পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ যাহা জীবের অঙ্গকে তিলমাত্র প্রকাশ হইয়া সকল কার্য্য করাইতেছেন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, চারি অন্তঃকরণ, ছয় রিপুকে, ব্যাকরণে প্র হইতে আ পর্য্যন্ত বিংশতি অব্যয় এবং ইহার প্রকাশকারক বিষয়কে উপসর্গ কল্পনা করিয়াছে। বর্ণ আদি নানাপ্রকার ব্যাখ্যাকে একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাতা পিতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও নানাপ্রকার গুণ শক্তি বুঝিয়া লইবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশিবনারায়ণ স্বামী।

পূর্ব্বজন্মের ঋণ পরিশোধ।

গত অগ্রহায়ণ মাসের জন্মভূমিতে এই শিরোনামে যে প্রবন্ধটির প্রথম অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, পাঠক মহাশয় আজ তাহার উপসংহার দর্শন করুন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের পুত্র ললিতমোহন হোঁচট খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, তাদৃশ পুত্ররত্ন হারাইয়া রামেশ্বরের হৃদয়ে শোকের সঞ্চার হইল না, তিনি বরং হৃষ্টচিত্তে অন্য তত্ত্বের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন। ললিতের যখন জন্ম হয়, গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া তখন তিনি জানিয়া রাখিয়াছিলেন, একজন ধনবান কায়স্থের একটি এবং শ্রমজীবী সদ্গোপের একটি, এই দুটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। কায়স্থের নাম ভূধরচন্দ্র মিত্র, সদ্গোপের নাম ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ। একগ্রামে বটে, গ্রামখানি খুব বড়, রামেশ্বরের বাটী হইতে ঐ দুটি লোকের বাটী অনেকটা দূর; সর্ব্বদা সে পাড়ায় রামেশ্বরের গতিবিধি ছিল না, কোথায় কবে কাহার বাটীতে কে জন্মিয়াছে, কে মরিয়াছে, এ সকল খবর তিনি রাখিতেন না, বিশ বৎসরের মধ্যে রাখেনও নাই। ললিতমোহনের মৃত্যুর পর রামেশ্বর একে একে সেই দুই বাড়ীতে উপস্থিত হন। প্রথমে যান ভূধরবাবুর বাড়ী; ভূধরবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, প্রথমে তিনি নানারকম গল্প জুড়িয়াছেন, গণকঠাকুর তিনি, গল্প করিতে করিতে ভাগ্যের কথা পাড়েন; পরিশেষে আশীর্ব্বাদ করিয়া

জিজ্ঞাসা করেন, "বিশ বৎসর পূর্ব্বে আপনার যে একটি সুলক্ষণযুক্ত পুত্র জন্মিয়াছিল, সেটি ত কুশলে আছে? দুঃখের জ্বালায় ঘুরিয়া বেড়াই, সর্ব্বদা সংবাদ লইতে পারি না, ছেলেটি ত আছে ভাল?"

একদৃষ্টে চাহিয়া ভূধরবাবু বলিলেন, "বিদ্যা আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন; জ্যোতিষী পণ্ডিত হইয়া সে ছেলের মঙ্গলামঙ্গল জানেন না, বড়ই আশ্চর্য্য কথা! সে ছেলে পাঁচমাসের অধিক দিন আমার কাছে ছিল না; অনেক দিন সে ছেলে চলিয়া গিয়াছে, তার কথা আমি অনেক দিন ভুলিয়া গিয়াছি।"

কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া রামেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিয়া চলিয়া গেল?" ভূধরবাবু উত্তর করিলেন, "কিছুই করিয়া যাই নাই। আহা! পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে ৫০০৲ টাকা খরচ করিয়া আমি সামাজিক বিতরণ করিয়াছিলাম; ছেলে যখন পাঁচ মাসের, তখন হঠাৎ তাহার ধনুষ্টঙ্কার রোগ হয়, গ্রামের চিকিৎসকেরা হারিয়া যায়, কলিকাতা হইতে ভাল ভাল সাহেব ডাক্তার আনাইয়া চিকিৎসা করা হইয়াছিল, তাহাতেও আমার ৫০০৲ খরচ হয়; রোগ এক প্রকার সারিয়া গিয়াছিল, ডাক্তারেরা যে দিন 'আর ভয় নাই' বলিয়া প্রফুল্ল বদনে বিদায় হন, সেই দিন রাত্রি আড়াই প্রহরের সময় হঠাৎ এক ঝলক্ রক্ত বমি করিয়া ছেলেটী জন্মের মত অনন্ত নিদ্রার কোলে শয়ন করিল! তাহার কথা আর আমি মনেও করি না।"

রামেশ্বর একটু বিমর্ষ হইলেন না, 'আহা' করিলেন না, একটু আত্মীয়তাও জানাইলেন না; নির্ব্বাকে গাত্রোত্থান করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন। পথে আসিয়া তিনি ভাবিলেন, প্রবোধ দিবার উপায় ছিল; পূর্ব্বজন্মে তাহার কাছে তুমি ১০০০৲ ঋণ লইয়াছিলে, এই ছেলে, সেই টাকা আদায় করিতে আসিয়াছিল।" এই কথা বলিয়া প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারিত, কিন্তু বাবু পাছে তাঁহাকে পাগল মনে করেন, সেইজন্য নিস্তব্ধ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতঃপর ঈশ্বর ঘোষের বাড়ীতে গিয়া পূর্ব্বরূপ প্রশ্ন করিলেন। ঈশ্বর ঘোষ বলিল, "দশ বৎসর বয়সে সে ছেলেটী মারা পড়িয়াছে।" ভট্টাচার্য্য পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, "কিরূপে মারা গেল?" ঘোষ বলিল, "কোন রোগ হয় নাই। আশ্চর্য্য মরণ! আমার তখন দোক্তা তামাকের কারবার ছিল; একদিন দুটী গরু আর চারিটী বস্তা দিয়া সেই ছেলেকে

আমি দোক্তা তামাক কিনিতে পাঠাই, ছেলে সেইগুলি লইয়া আসিয়া বাড়ীর উঠানে হঠাৎ পড়িয়া যায়, তাহার সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হয়, দেখিতে দেখিতে বৈদ্য ডাকিতে না ডাকিতেই প্রাণ বাহির হইয়া গেল।"

মৌনব্রত ধরিয়া রামেশ্বর সে বাড়ী হইতেও বাহির হইতে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘোষ তাঁহাকে ফিরাইল; ব্যগ্রতা জানাইয়া বলিল, "শুনিলেন যদি, তবে শেষ কথাটাও শুনিয়া যাউন।" রামেশ্বর ফিরিয়া গিয়া শেষ কথা শুনিলেন। ঈশ্বর ঘোষ বলিল, "ছেলে ত চারি বস্তা দোক্তা তামাক আনিয়া দিয়া জন্মশোধ বিদায় হইয়া গেল, তাহার পর একমাস আমি আর সে সকল বস্তা খুলিয়া দেখি নাই; মাসান্তে খুলিয়া দেখি, একবস্তা তামাকের সাত থাকের নীচে ১০০৲ টাকা হিসাবে দশখানি ব্যাঙ্ক নোট!"

যাহা শুনিবার, তাহা শুনিলেন, পূর্ণ প্রত্যয় বক্ষে রাখিয়া রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, জন্মান্তর বাক্যে অনেক দেশের অনেক লোকের বিশ্বাস নাই; তিনি নিজেও কখন কখন দুইদিকে টলিতেন; এই ঘটনায় বিশেষ প্রমাণপ্রাপ্ত হইয়া তিনি একজন প্রধান জন্মান্তরবাদী হইয়া উঠিলেন, জ্যোতিষ বিদ্যার প্রসাদে অনেক ভাল ভাল লোকের বাড়ীতে তাঁহার যাওয়া আসা ছিল, অনেক লোক তাঁহার গণনা ও পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতেন। ভট্টাচার্য্য ভাবিলেন, আমার বিশ্বাসে যদি কতকগুলি লোকেরও বিশ্বাস জন্মে, তাহাতেও মঙ্গল ফল ফলিবে। পুত্র কন্যার অকালমৃত্যুতে জ্ঞানীলোকের শোক তাপ কম হইবে। বঙ্গদেশে গৃহস্থ স্ত্রী পরম্পরায় একটা সাধারণ প্রবাদ বাক্য আছে, 'পুত্র শোকাতুরা জননীকে অনেকে সেই কথা বলিয়া বুঝায়, ছেলে তোমার শত্রু ছিল, ডাকাত ছিল, মহাজন ছিল, তাড়াতাড়ি আপনার কাজ সারিয়া পলাইয়া গেল।' একথা ঠিক্।

এই সব স্থির করিয়া তিনি একখানি পাঁতি লিখিয়াছিলেন, লেখা ছিল, "আর্য্য শাস্ত্রে পূর্ব্বজন্মের, পরজন্মের এবং বিবিধ জন্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। পূর্ব্ব জন্মে যাহারা মহাজন থাকে, পরজন্মেও তাহারা মহাজন হয়, পূর্ব্বজন্মের খাতক পরজন্মে তাহার খাতক হইয়া জন্মে; যত টাকার খাতক, পরিশোধ সময়ে সে বরং বেশী দিয়া যায়, কম দেয় না। পূর্ব্বজন্মের মহাজন পরজন্মে বরং বেশী আদায় করে,

কম আদায় করে না। এক জন্মে পরিশোধ অথবা আদায় না হইলে পুনরায় দ্বিতীয় জন্মে ধারাবাহিক কার্য্য হয়। সংসারের ঘটনা দেখিয়া অবশ্যই ইহাতে বিশ্বাস আইসে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, জ্ঞানীলোকের যুক্তির সঙ্গেও ইহার মিল আছে, জানা যাইবে। অধিকন্তু একটী কথা 'কর্ম্মভোগ'। যে জন্মের কর্ম্ম, সেই জন্মেই ভোগ হয়, এমন প্রায় দেখা যায় না, সম্ভবও বোধ হয় না। একজন চিরজীবন দুষ্কার্য্য করিয়া জীবনকাল সুখে কাটাইলেও নির্ব্বিঘ্নে মরিলেও আর একজন পুণ্যবান্ সাধুলোক চিরজীবন ধর্ম্মনিষ্ঠ থাকিয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা সমাপ্ত করিলেন। কর্ম্মের ভোগ তবে কবে হইল? পুণ্যবান্ স্বর্গে গিয়া সুখী হইলেন, পাপীলোক নরকে গিয়া কৃমি ভক্ষণ করিল। ইহাই যে জীবনের কার্য্য, ইহাই যে সংসারের কর্ম্মভোগ এরূপ বিশ্বাস করা যায় না; অবশ্যই পরজন্ম আছে, তাহা না হইলে শ্রীকৃষ্ণ কথিত কর্ম্মভোগের অর্থ ব্যর্থ হয়।"

এইরূপ পত্রিকা লিপিবদ্ধ করিয়া রামেশ্বর শেষকালে আপনার অনুরোধ লিখিলেন, "মানুষের জন্মান্তরে কেহ অবিশ্বাস করিও না।" রামেশ্বরের বাক্য গুরুবাক্যের ন্যায় স্বীকার করিয়া আমরাও বলিতেছি, অন্য ধর্ম্মের কথা বলিতে সাহস হয় না, সনাতন আর্য্যধর্ম্মের সেবক যাঁহারা, জন্মান্তর পুনর্জন্ম বিশ্বাসে তাঁহাদের অটল থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা হইলে শ্রীকৃষ্ণকে ঠাকুর বলা হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, "শত শতবার তুমিও জন্মিয়াছ, শত শতবার আমিও জন্মিয়াছি, পূর্ব্বজন্মের কথা তোমার কিছুই মনে নাই, আমার সমস্তই মনে আছে।" প্রকৃত হিন্দুসন্তানের সাধ্য নয়, এ বাক্যে অবিশ্বাস করা।

তর্কের পোষকে আর একটী কথা।—কাব্যে, পুরাণে, ইতিহাসে এবং অভিধানে একটী শব্দ দেখা যায়, শব্দটী জাতিস্মর। ধারাবাহিক পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কার্য্যাবলী যাঁহার স্মরণ থাকে, তাঁহাকে জাতিস্মর বলে। অনেক জাতিস্মর মহাপুরুষের বিবরণ অনেকে পাঠ করিয়াছেন; জন্মান্তরে অবিশ্বাস থাকিলে মহাপুরুষগণের বাক্য মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করিতে হয়; সংসারের স্তম্ভোপরি দণ্ডায়মান হইয়া মহাজনবাক্যে অবিশ্বাস করা একটা পাপ; সাধ করিয়া পরের দৃষ্টান্তে আপনাকে পাপলিপ্ত করা কখনই সাধুসঙ্গত হইতে পারে না। বিশেষতঃ এক জন্মে জীবের সমস্ত সুখ দুঃখ ফুরাইয়া যায়, মানুষের এরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলে পাপকর্ম্মের স্রোত

অধিক বেগে প্রবাহিত হইবে, একথা নিশ্চয়; পুনর্জন্মে এ জন্মের পাপের ভোগ করিতে হইবে এমন ভয় থাকিলে মহাপাপীরাও ইচ্ছামত কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইবে। সমাজের কল্যাণেও জন্মান্তরে বিশ্বাস করা উচিত।

সরস্বতী স্তোত্রম্।

(১)

তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥

কলামাত্র চন্দ্র যাঁর ললাট উপর,
শুভ্রকান্তি-ময় যাঁর দেহ নিরন্তর,
স্তনভরে অবনত শরীর যাঁহার,
শ্বেত-পদ্মোপরি যাঁর স্থিতি অনিবার,
কর-পদ্মে থাকি যাঁর পুস্তক-লেখনী
ধরিয়া রহেছে শোভা ভুবন-মোহিনী,
বাক্যের দেবতা যিনি, সেই সরস্বতী
সবে সর্ব্বসিদ্ধি-দানে সদা দিন মতি!

(২)

যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা
যা বীণাকরদণ্ডমণ্ডিতকরা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃ শেষজাড্যাপহা॥

কুন্দপুষ্প চন্দ্র আর তুষার মতন
যাঁর শ্বেতবর্ণ-রাশি ভুবন-মোহন;
যাঁর নিত্য স্থিতি শ্বেতপদ্মের উপর,
শ্বেতবর্ণ পরিধান যাঁর নিরন্তর;
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর আদি দেবগণ
সর্ব্বদাই করিছেন যাঁহার বন্দন,
বীণাদণ্ডে কর যাঁর পরম শোভন,
জড়তা-নাশের যিনি পরম কারণ;
ঐশ্বর্য্য-শালিনী যিনি, সেই সরস্বতী
হউন সর্ব্বদা মোর একমাত্র গতি!

(৩)

শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্‌দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাঞ্ছিতবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীম্॥

যাঁর দেহ সদা শুভ্র বরণে আবৃত,
স্বচ্ছ বিলেপন, মাল্য, বসনে ভূষিত;
ব্যাখ্যা, জপমালা, সুধাকুম্ভ, বিদ্যা আর
করপদ্মে ধরি যিনি রন্ অনিবার;
বালচন্দ্রে যিনি সদা পরম সুন্দর,
পদ্মোপরি অবস্থিতি যাঁর নিরন্তর;
যিনি কুচভরে নত, সহাস্য-বদন,
প্রদান করেন যিনি সদা বাক্য-ধন;
সৌভাগ্যদায়িনী যিনি, যিনি ত্রিনয়না,
তাঁর পদ পূজিবারে নিয়ত বাসনা!

(৪)

বাণীং পূর্ণনিশাকরোজ্জ্বলমুখীং কর্পূরকুন্দপ্রভাং
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকাং নিজকরৈঃ সংবিভ্রতীমাদরাৎ।

বীণামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ তুঙ্গস্তনীং
দিব্যৈরাভরণৈর্বিভূষিততনুং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥

পূর্ণচন্দ্র সম যাঁর উজ্জ্বল বদন,
কর্পূর-কুন্দের মত যাঁহার বরণ ;
বীণা জপমালা, সুধাকুম্ভ, বিদ্যা আর
নিজ করে ধরি যিনি রন্ অনিবার ;
অর্দ্ধচন্দ্র শিরে যাঁর শোভিছে সতত,
সমুন্নত কুচযুগে যিনি সুশোভিত ;
যিনি দিব্য-ভূষা-যুত, হংসে যাঁর স্থিতি,
সেই ভারতীর পদে আমার প্রণতি।

(৫)

আসীনা কমলে করৈর্জপবটীং পদ্মদ্বয়ং পুস্তকং
বিভ্রাণা তরুণেন্দুবদ্ধমুকুটা মুক্তেন্দুকুন্দপ্রভা।
ভালোন্মীলিতলোচনা কুচভরাক্রান্তা ভবদ্ভূতয়ে
ভূয়াৎ বাগধিদেবতা মুনিগণৈরাসেব্যমানানিশম্ ॥

পদ্মোপরি স্থিতি যাঁর, যিনি নিজ করে
জপমালা, পদ্মদ্বয়, গ্রন্থ রন্ ধ'রে ;
প্রোঢ়চন্দ্র শিরে যাঁর শোভে অনিবার,
মুক্তা-চন্দ্র-কুন্দ-সম শুভ্রবর্ণ যাঁর ;
ললাটে যাঁহার নেত্র রহে উন্মীলিত,
কুচ-যুগ-ভরে যিনি সদা অবনত ;
মুনিগণ যাঁর সেবা করে অবিরল,
সেই সরস্বতী তব করুন কুশল !

(৬)

মুক্তাহারাবদাতাং শিরসি শশিকলালঙ্কৃতাং বাহুভিঃ স্বৈঃ
ব্যাখ্যাং বর্ণাক্ষমালাং মণিময়কলসং পুস্তকঞ্চোদ্বহন্তীম্।
আপীনোত্তুঙ্গবক্ষোরুহভরবিলসন্মধ্যদেশা মধীশাং
বাচামীড়ে চিরায় ত্রিভুবননমিতাং পুণ্ডরীকে নিষণ্ণাম্ ॥

মুক্তাহারসম শুভ্র যাঁহার বরণ,
শশিকলা শিরে যাঁর শোভে সর্ব্বক্ষণ,
ব্যাখা বর্ণ, জপমালা, মণিকুম্ভ আর
পুস্তক যাঁহার করে রহে অনিবার ;
পীনোন্নত-পয়োধর-ভারে অবনত
যাঁর ক্ষীণ কটিদেশ শোভে অবিরত,
প্রণত যাঁহার পদে এই ত্রিভুবন,
বক্ষোপরি অবস্থিত যিনি অনুক্ষণ ;
বাক্যের দেবতা যারে বলে ত্রিসংসার,
সেই ভারতীর পদে প্রণাম আমার !

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ।

আয় বাজিয়ে মল।

(১)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
সাঁজের বেলা বকুল তলায়, গাঁথ্‌বি মালা শ্যামা লতায়,
পরবি গলে দুল্‌বে দুদুল
দুল্‌বে নাসায় বিনোদ বকুল,
পড়্‌বে ফুটে চাঁদের আলো ভাসবে বকুল তল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল ॥

(২)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
সাঁজের বেলা দীঘির ঘাটে, দেখ্‌বি তপন বস্‌বে পাটে,
খেল্‌বি খেলা সাঁজের হাওয়ায়,
চাঁদের আলো মাখ্‌বি লো গায়,
দেখ্‌বি লো জল্ চলছে কেমন, ছল ছল ছল ছল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল ॥

(৩)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
সাঁজের বেলা রসাল শাখে, ডাক্‌ছে কোকিল কুহু ডাকে,
ভাস্‌ছে ভূ-তল সুধার স্রোতে,
উঠ্‌ছে লহর শূন্যপথে,
প্রাণভোরে পান কর্‌বি সুধা মন্দাকিনীর জল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(৪)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
সাঁজের বেলা কুসুম বনে, তুলিবি লো ফুল আপন মনে,
ফুট্‌ছে কেমন দেখ্‌বে আসি,
চুরি ক'রে তোর মধুর হাসি,
খুলিয়ে কেমন ধীরে ধীরে কোমল নবীন দল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল।

(৫)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
সাঁজের বেলা ছাদের 'পরে, মেঘ চলে যায় বাতাস ভরে,
শালের পাতা খাবার আশে,
শালবনে যায় রাজার দেশে, *
দেখ্‌বি যদি সঙ্গে কত হাতি ঘোড়ার দল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(৬)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
সাঁজের বেলা চাঁপার মূলে, তুলিয়ে চাঁপা পর্‌বি চুলে,
চাঁপায় ঘেরা বিনোদ খোঁপা,
অঙ্গে বরণ কণক চাঁপা,

* কোন কোন দেশে পিতামহিরা ছেলে-মেয়েদিগকে বায়ুভরে গতিশীল মেঘ বর্দ্ধমানের রাজার শালবনে শালপাতা খাইতে যায়, বলিয়া মেঘের গতির কারণ নির্দ্দেশ করেন।

ফুটিয়ে চাঁপা চাঁপার তলে, রূপে ঢল ঢল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(৭)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
খেল্‌বি যদি পুতুল-খেলা, পূবের ঘরে সাঁজের বেলা,
চুপি চুপি দোরটী দিয়ে,
বর কনের দিবি বিয়ে,
লগন বৈয়ে যায়, গোধূলি সইতে যাবি জল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(৮)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
উঠান মাঝে সাঁজের বেলা, খেল্‌বে কুমীর কুমীর খেলা,
আঁটিয়ে আঁচল সরু মাজায়,
উড়িয়ে অলক সাঁজের হাওয়ায়,
টুপ্‌ টুপ্‌ টুপ্‌ পড়্‌বে কেমন স্বেদবিন্দু জল,
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(৯)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
আগ-বাগ-ডুম খেল্‌বি খেলা, মাঝের ঘরে সাঁজের বেলা,
বাজিয়ে মৃদম্‌ কাড়া ডাগর
তুলিয়ে মধুর সুরের লহর,
ফুটিয়ে গোলাপ অশোক জবা মোমের গণ্ডতল,
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(১০)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল।
আকাশ কোণে একটী তারা, সাঁজের বেলা ন্যায়া পারা,
ধরিয়ে গলে বলবি আয়,
কয়টী চোক তোমার আমার,
নারদ নারদ বোলে আবার চাইবি ভূমির তল,
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(১১)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
তুলিয়ে সাঁজের পুরবী তান, বাজিয়ে ধীরে মধ্যমান,
শিখ্‌বে বোলে মধুর বুলি,
আস্‌বে ছুটে মরালগুলি,
নীচ মুখে পিছে পিছে ছেড়ে মৃণাল দল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(১২)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
তুলিয়ে প্রাণে ভাবের লহর, আয় বালিকে ঝমক ঝমক,
ভাব সাগরে ডুবে রই,
আয় বালিকে প্রেমময়ি,
ধরায় বোসে স্বরগ ছবি দেখ্‌ব অবিরল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(১৩)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
সুখের ভরে বিভোল হয়ে, সমে সমে দেখ্‌ব চেয়ে,
আস্‌ছে কেমন দেববালা,
রূপে ভুবন কোরে আলা
দুলিয়ে চাঁচর চিকণ কেশ বর্ষা মেঘের দল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

(১৪)

আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল,
হৃদয় বনে কুসুম কলি, একে একে সকলগুলি,
উঠ্‌বে ফুটে ছুট্‌বে বাস,
প্রাণ জুড়াব বার মাস,
ডুবিয়ে দেব ভাবনা রাশি অতল সাগর-তল।
আয় বালিকে আয় বাজিয়ে মল॥

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়।

বিপিনবাসিনী।

বুনি দিদি।

প্রথম পল্লব।

দর্শন।

এক বৎসর বসন্তকালের একদিন বৈকালে একজন অশ্বারোহী যুবা পুরুষ একটি কানন মধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। কাননটি নিবিড় কানন ছিল না, মধ্যে মধ্যে সুশ্যামল তৃণক্ষেত্র বিদ্যমান ছিল; সেইরূপ এক তৃণক্ষেত্রের অতি নিকটে একটি জলাশয়; জল নির্ম্মল, কিন্তু তীরভূমি স্থানে স্থানে উচ্চনিম্ন থাকাতে তাদৃশ শোভা ছিল না; বনের পুকুর, বাঁধাঘাট ছিল না, কিন্তু দয়াবতী প্রকৃতিদেবী সেই পুষ্করণীর চারিধারে অতি চমৎকার ঘাট বানাইয়া দিয়াছিলেন; চারিধারেই দীর্ঘ দীর্ঘ সোপানের ন্যায় স্তবকে স্তবকে অতি সুন্দর শ্যামল তৃণ-স্তবক সুসজ্জিত।

অশ্বারোহী পশুশিকারে বিফলমনোরথ হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক সেই পুষ্করিণীর পশ্চিমতীরে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। বেলা তখন অধিক ছিল না, আকাশে সূর্য্য ছিলেন, কিন্তু সূর্য্য তখন অস্তাচলে যাইবার জন্য প্রস্তুত; সরসীকূলে বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতে করিতে যুবা হঠাৎ একবার উত্তরদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন, একটি গৌরাঙ্গী শীর্ণাঙ্গী বালিকা তাঁহার নয়নগোচর হইল। বালিকার কাছে একপাল ছাগল।

কৌতূহল-কৌতুকে গাত্রোত্থান করিয়া যুবা ধীরে ধীরে সেই বালিকার সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা মলিন ছিন্নবসনা, ম্লানবদনা, রুক্ষকেশা, বিষাদ শীর্ণা; সে মূর্ত্তি দেখিলেই নিতান্ত দুঃখিনী বলিয়া প্রতীতি জন্মে। দুঃখিনী বলিয়া বিশ্বাস হয় হউক, বস্তুতঃ বালিকাটি সুন্দরী, অযত্নে মলিনা, তরল মেঘঢাকা চাঁদ। পালনে থাকিলে সেই বালিকা একজন পরম রূপবতী যুবতী বলিয়া গণ্য হইত। বালিকা বলিতে বলিতে যুবতী বলা হইল কেন, তাহার একটি হেতু আছে। অঙ্গলক্ষণে বোধ হইল,

মেয়েটির বয়স প্রায় চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ বর্ষ। এ বয়সে আমাদের দেশে কন্যাগণকে যুবতী বলা যাইতে পারে। আজকাল অন্য দেশের অনুকরণে বিংশতি বর্ষীয়া যুবতীকে বালিকা পরিচয়ে কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার বঙ্গসমাজে বাহির করিতেছেন, সেই প্রকার রুচিতে বঙ্গবালাগণের বালিকা নামের সীমা কতদূর, ঠিক বুঝিতে না পারিয়াও যুবা সেই বনবালাটিকে যুবতী স্থির করিয়াছিলেন। করুন, করা উচিত, তথাপি আমরা যখন বালিকা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি, তখন যদবধি নামটি পাওয়া না যায়, তদবধি ঐ কন্যাটিকে আমরা বালিকা বলিয়াই পরিচয় দিব।

যুবা সেই বালিকাটির সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, সহসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, তুমি কে? কোথায় থাক? বনে তুমি কেন আসিয়াছ? তোমার এমন অবস্থা কেন? তোমার মত কোমলাঙ্গীকে ছাগল চরাইতে কে পাঠাইয়াছে?"

উপর্য্যুপরি ঝড়ের মত এতগুলি প্রশ্ন হইল, বালিকা কিছুই বুঝিল না। বুঝিল কি না বুঝিল, ভগবান জানেন, বালিকা কিন্তু একটিও উত্তর করিল না, কেবল চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। বালিকার রোদনের প্রকৃত কারণ কি, যুবা তাহা বুঝিলেন না। সূর্য্যদেব যেন শীঘ্র শীঘ্র পশ্চিমদিকে ছুটিতেছেন। বালিকার হাতে একগাছি খেজুরপাতার ছড়ি ছিল, সেই ছড়ি নাচাইয়া, বালিকা সেই ছাগলের পালকে পশ্চিমমুখে ফিরাইল। আগে আগে ছাগলেরা, পশ্চাতে বালিকা।

ছাগল চলিতেছে, বালিকা চলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে যুবকটিও চলিতেছেন। বালিকা হয় ত অগ্রে তাহা জানিতে পারে নাই, বনপথের মাঝখানে একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, সেই যুবাটি আসিতেছেন। দেখিবামাত্র বালিকা সেইখানে যুবার দিকে সম্মুখ ফিরিয়া চমকিয়া দাঁড়াইল. আবার তাহার চক্ষে জল আসিল, চক্ষের জল না মুছিয়া একখানি হস্ত ঊর্দ্ধদিকে তুলিল, তৎক্ষণাৎ আবার হাতখানি নিম্নে নামাইয়া একটি অঙ্গুলির দ্বারা ভূমিতল নির্দ্দেশ করিল, আবার সেই হস্তের পঞ্চাঙ্গুলী সঞ্চালনপূর্ব্বক অনুগামীকে সঙ্গে আসিতে নিষেধ করিল, আর কোন দিকে চাহিল না, পশ্চিমে মুখ ফিরাইয়া ছাগল চালাইয়া অবিলম্বে অদৃশ্য হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পল্লব।

অনুরাগ।

যুবার নাম হরেন্দ্রকুমার মিত্র, বয়স অনুমান পঞ্চবিংশতি বৎসর, নিবাস রঘুনাথপুর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের রঘুনাথপুর ষ্টেশন যে স্থানে অবস্থিত, সে স্থানে এই রঘুনাথপুর নয়, এ রঘুনাথপুর হুগলী জেলায় একখানি পল্লীগ্রাম। ইঙ্গিত করিয়া বনবালা চলিয়া গেল, হরেন্দ্রকুমার ক্ষণকাল সেইস্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখনও অল্প অল্প আলো ছিল। বনবালার ইঙ্গিতের অর্থ কি, যেন ধ্যানমগ্ন হইয়া হরেন্দ্রকুমার কিয়ৎক্ষণ তাহাই ভাবিলেন; ভাবিয়া ভাবিয়া স্থির করিলেন, গূঢ় অর্থ আছে। বালিকা ঊর্দ্ধদিকে হস্ত তুলিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য—আকাশে এখন যতটুকু বেলা আছে, ততটুকু বেলা থাকিতে পুনরায় দেখা হইতে পারিবে; নীচের দিকে হাত নামাইয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য—এইখানেই দেখা হইবে।

হরেন্দ্রকুমারের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হইল। কল্যই তিনি আসিবেন, ঠিক এই সময়ে এইস্থানেই দেখা করিবেন, মনে মনে এইরূপ স্থির করিলেন।

হরেন্দ্রকুমার কে?—নামের পরিচয়ে প্রকাশ হইয়াছে, হরেন্দ্রকুমার একটি কুলীন কায়স্থকুমার; তাঁহার পিতা বসন্তকুমার মিত্র রঘুনাথপুর গ্রামের একজন বর্দ্ধিষ্ণু লোক, বিষয়সম্পত্তি প্রচুর, গ্রামের মধ্যে সকলের নিকটে তাঁহার বিশেষ সম্মান ও বিশেষ প্রতিপত্তি। হরেন্দ্রকুমার তাঁহার একমাত্র পুত্র। হরেন্দ্রের বিবাহ হইয়াছে, বধূটি যুবতী, সন্তানাদি জন্মে নাই। বর্ত্তমানকালের প্রকৃতিধর্ম্মে বধূটির সন্তান হইবার বয়ঃক্রম ফুরায় ফুরায় এইরূপ আশঙ্কা। দিব্য একটি সুন্দর খোকা হয়, সেটিকে কোলে করিয়া নাচান, বিধুমুখের আধ আধ মধুর বাণী শ্রবণ করেন, হরেন্দ্রের এইটি নিতান্ত ইচ্ছা; হরেন্দ্র অপেক্ষা বধূমাতার আরও অধিক ইচ্ছা। হিন্দুধর্ম্মে এবং ধর্ম্মানুসারী সাধারণ জনপ্রবাদে হরেন্দ্রের অকপট বিশ্বাস; কামদেবপুর গ্রামে একটী প্রাচীন পঞ্চানন্দ আছেন, সেই দেবতার সাধারণ ডাক নাম বাবাঠাকুর; মানতি করিয়া সেই বাবাঠাকুরের চরণামৃত পান করাইলে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হয়, এইরূপ প্রবাদ; সেই প্রবাদ বহুদূর পর্য্যন্ত বিখ্যাত; অনেকেই বলে, "কামদেবপুরের বাবা নিত্য জাগ্রত।"

মৃগয়াবিহারীবেশে হরেন্দ্রকুমার এখন যে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন, এটি কামদেব পুরের অরণ্য; হরেন্দ্রকুমার কামদেবপুরে উপস্থিত। বাবা-ঠাকুরের প্রত্যাদেশ এইরূপ যে, "যে নারী পুত্র কামনা করে, সে স্বয়ং ঐ পীঠস্থানে আসিয়া চরণামৃত পান করিবে, কিম্বা তাহার স্বামী আসিয়া চরণামৃত লইয়া যাইবে।"—যুবতী পত্নীকে কামদেবপুরে পাঠাইতে হরেন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না, তন্নিমিত্ত হরেন্দ্র স্বয়ং চরণামৃত লইতে আসিয়াছেন।

অরণ্যের উত্তরাংশে প্রায় একক্রোশ দূরে একখানি গণ্ডগ্রাম,—ছোটখাট সহর বলিলেও বলা যায়, সেই স্থানটি সাধারণতঃ কামদেবপুর নামে পরিচিত, সেইস্থানেই বাবাঠাকুরের পীঠ। কামদেবপুরে আসিয়া হরেন্দ্রকুমার শুনিলেন, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর সন্ধ্যাকাল ভিন্ন অন্য দিন অন্য সময়ে বাবার চরণামৃত প্রদান করিবার আদেশ নাই। পূর্ণিমার দিন হরেন্দ্রকুমার উপস্থিত হইয়াছিলেন, দুই সপ্তাহ পরে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী, অতএব দুই সপ্তাহ বিলম্ব করিতে হইবে। লোকের বাড়ী অতিথি হইয়া দুই সপ্তাহ কাটিবে না, এইজন্য সহরের মধ্যে একখানি ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া হরেন্দ্রকুমার বাস করিতেছিলেন। মৃগয়ায় তাঁহার বড় সাধ, বড় আমোদ, দুই তিন দিন থাকিতে থাকিতে তিনি শুনিলেন, অদূরে একটি অরণ্য আছে, সে অরণ্যে শীকারযোগ্য বিবিধ পশু পক্ষী পাওয়া যায়। সেই বনে শীকার করিতে হরেন্দ্রের ইচ্ছা হইল; সঙ্গে বন্দুক ছিল, গুলী বারুদ ইত্যাদি সরঞ্জামও ছিল, হরেন্দ্রকুমার মৃগয়ার্থ প্রস্তুত হইলেন। নগর হইতে বন প্রায় একক্রোশ দূর, পদব্রজে গমন করা দুঃসাধ্য, অতএব অর্দ্ধমূল্য জমা দিয়া একটি আস্তাবল হইতে তিনি একটি অশ্ব ভাড়া করিয়া লন, সেই অশ্ব আরোহণে কানন মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। প্রথম দিবসেই বনবালার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

বনবালা বনে চলিয়া গেল, হরেন্দ্রকুমার বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসাঘরে সে রাত্রে হরেন্দ্রকুমারের নিদ্রা হইল না; জাগিয়া জাগিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে বনবালা; নয়ন মুদিত করিয়া মানস চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে বনবালা; কিঞ্চিৎ তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে বনবালা; বনবালা ভিন্ন সে রাত্রে তাহার চিন্তাপথে আর কিছুই আসিল না।

প্রথম দর্শনেই বনবালার প্রতি হরেন্দ্রের অনুরাগ জন্মিয়াছিল। হরেন্দ্র

ভাবিতে লাগিলেন, বনবালা কে? বনবালার নাম কি? বনবালার জাতি কি? বনবালা থাকে কোথায়? বনবালা ছাগল চরায় কেন? বনবালার এমন মলিন বেশ কেন? কথা সুধাইলে বনবালা কাঁদে কেন? বনবালা কথা কহে না কেন?

প্রশ্নগুলি চিন্তায় আসিল, উত্তর আসিল না। হরেন্দ্রকুমার পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন, বনবালা দর্শনে আমার চিত্ত এমন হইল কেন? বনবালাকে আমি ভালবাসিয়াছি। আমি পাগল! অজ্ঞাত-কুল-শীলা বনকন্যার প্রতি আমার অনুরাগ,—দয়ায় অনুরাগ নহে, প্রেমের অনুরাগ! হঠাৎ আমার এমন চিত্তবিকার কেন হইল! আচ্ছা, আমার যেমন হইয়াছে, বনবালারও কি এইরূপ? বনবালাও কি আমার প্রতি অনুরাগিনী?

অবশ্যই অনুরাগিনী। তাহা যদি না হইবে, তবে বনবালা সে রকম সঙ্কেত করিল কেন? দ্বিতীয়বার দেখা করিতে চায়? সেই মুকুলিত বনফুলের ভিতর যদি মধুর সঞ্চার না হইয়া থাকিবে, তবে সেই কুরঙ্গ-নয়নে আমার প্রতি সে রকম কটাক্ষপাত করিয়া, বনবালা সজলনয়নে মুখ ফিরাইল কেন? অবশ্যই অনুরাগিনী। আচ্ছা, সত্যই যদি অনুরাগিনী, তবে বনবালা আমার সঙ্গে কথা কহিল না কেন?

কত তর্ক, কত প্রশ্ন, কত চিন্তা, হরেন্দ্রের হৃদয়ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়া রজনীর শীতলতায় বিলীন হইয়া গেল, অপরে তাহা জানিতে পারিল না। হরেন্দ্রকুমার একবার ভাবেন, আশা, একবার ভাবেন, নিরাশা। একবার ভাবেন, বনবালা তাহার প্রতি অনুরাগিনী, আবার ভাবেন, বনবালার অনুরাগ নাই। এই প্রকার মানসিক যন্ত্রণায়—ক্ষণে ক্ষণে মানসিক উল্লাসে হরেন্দ্রকুমার নিশাযাপন করিলেন। রজনী প্রভাত।

তৃতীয় পল্লব।

পিসী মা।

রজনী প্রভাত। কামদেবপুরকে যদিও ছোটখাট সহর বলা হইয়াছে, তথাপি প্রাকৃতিক শোভায় কামদেবপুর একখানি পল্লীগ্রাম। প্রকৃতি-দেবীর করুণায় এখানে বিবিধ সুন্দর সুন্দর তরুলতা বিরাজিত, মনোহর

পুষ্পোদ্যান, মনোহর সরোবর, মনোহর তরুকুঞ্জ শোভা পায়। এ স্থানে অতি উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা নাই, প্রভাতের সূর্য্যরশ্মি প্রথমে উচ্চ উচ্চ তরু-চূড়াগুলিকে স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া, রজতবর্ণ ধারণে অট্টালিকাগুলির ছাদে ছাদে নামিল, তাহার পর ধরাতলে পুষ্পক্ষেত্র ও তৃণক্ষেত্রাদিতে ছড়াইয়া পড়িল। ঊষাকালে তরুবাসী যে সকল বিহঙ্গম মধুরকণ্ঠে গান করিয়াছিল, আহারান্বেষণে তাহারা দিগদিগন্তে উড়িয়া গেল; মধুকরেরা মধুপানে মত্ত হইয়া প্রস্ফুটিত কুসুমে কুসুমে চুম্বন করিয়া বেড়াইতে লাগিল, নগর-বাসী শ্রমজীবী লোকেরা আপনাদের দৈনিক কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল; শয্যাত্যাগ করিয়া হরেন্দ্রকুমার ভাবিতে লাগিলেন, অনুরাগিনী বনবালা।

কতক্ষণে বৈকাল আইসে, সেই ভাবনাই হরেন্দ্রের মনে প্রবলা। স্নান আহার করিতে হয়, সময় প্রতীক্ষায় উন্মনা হইয়া বিশ্রাম করিতে হয়, হরেন্দ্র তাহাই করিলেন; সূর্য্যদেব মাথার উপর রহিয়াছেন, হরেন্দ্র দেখিতেছেন, পশ্চিমে যেন অনেকদূর ঢলিয়া পড়িয়াছেন, বৈকাল আসিয়াছে, আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই, সূর্য্য-গতি ভাবিতে ভাবিতে হরেন্দ্র একবার আপন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, শিহরিয়া উঠিয়া ভাবিলেন, সত্যই ত বটে! এক রাত্রির মধ্যে আমি কাহিল হইয়া গিয়াছি। আমার মুখশ্রী— * * * *

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আবার শিহরিয়া হরেন্দ্র একখানি দর্পণ লইয়া আপনার মুখ দেখিলেন; দেখিয়াই তৃতীয়বার শিহরিয়া বিমর্ষবদনে বলিলেন, সত্যই আমার মুখশ্রী মলিন হইয়া গিয়াছে! এ মুখ দেখিয়া বনবালা বুঝি আর আমাকে ভালবাসিতে চাহিবে না! কেন চাহিবে না? বনবালার মুখখানি ত আমার মুখের অপেক্ষাও মলিন, তবে কেন বনবালা আমাকে ভালবাসিবে না? না বাসিতে চায়, বাসিবে না;— আমি বনবালাকে ভালবাসিব।

যতক্ষণ হরেন্দ্রকুমারের পরিতাপ, যতক্ষণ কল্পনা, যতক্ষণ সঙ্কল্প, সূর্য্যদেব ততক্ষণে হরেন্দ্রের কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অনেকটা পশ্চিমে ঢলিয়া-ছিলেন, হরেন্দ্রকুমার সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিয়া, বেশভূষা পরিধান করিলেন;—আজি আর ভীষণদর্শন মৃগয়া-বেশ নহে, রমণীরঞ্জন মোহন বেশ। সুসজ্জিত অশ্বারোহণে প্রেমানুরাগী হরেন্দ্রকুমার মৃগয়া-কাননে

যাত্রা করিলেন। কানন বটে মৃগয়ার, হরেন্দ্রের যাত্রাও বটে মৃগয়া যাত্রা, কিন্তু সাধারণ শীকারীরা সচরাচর যে প্রকার মৃগয়া করেন, হরেন্দ্র আজি সে প্রকার মৃগয়া করিবেন না, প্রেমিক পুরুষ-জাতিকে ভগবান যে সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, সেই সকল অস্ত্র ব্যতীত শীকারী হরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে কর্ম্মকার নির্ম্মিত অন্য কোনও প্রকার অস্ত্রাদি রহিল না।

কানন মধ্যে হরেন্দ্রকুমার উপস্থিত। যে সময়ে সাক্ষাৎ করিবার সঙ্কেত ছিল, হরেন্দ্র তাহার অনেক পূর্ব্বেই হাজির। আশা বিফল হইল না। সরসীর উত্তর তীরে বনবালা ছাগল চরাইতেছিল, অশ্বটীকে একটি বৃক্ষে বন্ধন পূর্ব্বক হরেন্দ্র অতি ধীরপদে—অকস্মাৎ বনবালার বিস্ময়োৎপাদনের উদ্দেশে টিপি টিপি অন্য দিক দিয়া বনবালার কাছে চলিলেন। বনবালা তাহাকে দেখিতে পায় নাই, ইহাই তখন তাহার ধারণা হইয়াছিল; যেদিকে বনবালার মুখ, সেদিক দিয়া না গিয়া, পুষ্করিণীর পূর্ব্বতীর ধরিয়া তিনি বনবালার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইলেন।

হরেন্দ্রের ধারণায় ভুল ছিল না। সত্যই বনবালা তাহাকে দেখিতে পায় নাই। বিষাদিনী আপন বিষাদের ভাবনাতেই সর্ব্বদা ম্রিয়মানা, সর্ব্বদা অন্যমনস্কা, সর্ব্বদা অনন্যদৃষ্টি, বনের ভিতর কখন্ কোথা হইতে কোন্ দিক দিয়া কে আসিল, দেখিবার তাহার অবকাশ ছিল না, হরেন্দ্রকে দেখিতে পায় নাই। পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া, হঠাৎ চমক লাগাইবেন, হরেন্দ্র একবার এইরূপ ভাবিয়াছিলেন, পরক্ষণেই আবার সেটা অকর্ত্তব্য বুঝিয়া পূর্ব্ববৎ ধীরপদে বনবালার সম্মুখে গিয়া দেখা দিলেন। সর্ব্বাঙ্গ সঞ্চালন করিয়া বনবালা কাঁপিয়া উঠিল।

কি যেন কুকর্ম্ম করিয়াছেন, মনে এইরূপ পরিতাপ আনিয়া, হরেন্দ্র বলিলেন, "তোমার সঙ্কেত আমি বুঝিয়া ছিলাম। যে সময়ে যে স্থানে সাক্ষাৎ করিবার ইঙ্গিত তুমি করিয়াছিলে, সেই সময়ের পূর্ব্বে এইস্থানে আমি আসিয়াছি, কিছু মনে করিও না, চমকিত হইও না, কল্য সমস্ত রজনী আর আজ এই এতখানি বেলা পর্য্যন্ত আমি কেবল তোমাকেই ভাবিয়াছি; শেষবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারি নাই; ইহাতে যদি আমার কোনও অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা কর!"

বিস্ফারিত নেত্রে বনবালা কেবল হরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া রহিল; পূর্ব্বদিনের মত অশ্রুবর্ষণ করিল না; মুখে কথা নাই, সুতরাং কথা কহিল

না। নিকটে হরেন্দ্রকুমার দাঁড়াইয়া রহিলেন, বনবালা আপন কর্ম্মে মন দিল। হরেন্দ্রকুমার নিস্তব্ধ।

সেদিনের মত সূর্য্যদেবের কার্য্য সমাপ্ত হইল, বনবালার কার্য্যও সমাপ্ত হইয়া আসিল, বনবালা ঘরে চলিল। অগ্রে অগ্রে ছাগলগুলি, পশ্চাতে বনবালা, তৎপশ্চাতে হরেন্দ্রকুমার। এত কথা না বলিয়া সংক্ষেপে বলা যায়, অগ্রে ছাগল, মধ্যে বনবালা, পশ্চাতে হরেন্দ্র।

যেস্থানে পূর্ব্বদিনের সঙ্কেত, সেইস্থানে থামিয়া, বনবালা একবার পশ্চাতে চাহিল, হস্ত সঙ্কেতে হরেন্দ্রকে জানাইল, "আইস"।—আনন্দে হরেন্দ্রের বক্ষঃস্থল কাঁপিল; আশা ফলবতী হইবে, এইরূপ আশ্বাস জন্মিল; উল্লাসে উল্লাসে তিনি বনবালার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

হরেন্দ্র চলিলেন, নিশ্চিন্ত হইয়া চলিলেন না;—উল্লাসের সঙ্গে ভাবনা আসিল, একি! সব হয়, সব করে, সব বুঝায়, কিন্তু বনবালা কথা কহে না কেন? মুখ দেখিয়া বুঝা যায়, একান্ত সরলা, এমন সরলা যে কপটতা করিয়া কথা কহিবে না, এমন ত কিছুতেই সম্ভব বোধ হয় না, তবে কি? বনবালার কি কথা কহিবার শক্তি নাই? বনবালা কি তবে বোবা? ভাবে বোধ হয়, আমার কোন কথাও শুনিতে পায় না; বনবালা কি তবে কালা?

চলিতে চলিতে হরেন্দ্রের এইপ্রকার মানসিক তর্ক। চলা শেষ হইল। কাননপ্রান্তে একটা প্রকাণ্ড ক্ষেত্র; তাহারও ধারে ধারে বৃক্ষলতা অনেক, কিন্তু নিবিড় বন নহে। সেই ক্ষেত্রমধ্যে কালাচিতে গাছের বেড়া দেওয়া একখণ্ড ভূমিতে তালপাতা দিয়া ছাওয়া দুইখানা চালাঘর, একখানা খুব বড়, পূর্ব্বদিক ঘেষা, উত্তর দিকে দরজা, দ্বারে কপাট নাই—হোগলা পাতার আগড়, আর একখানা চালা কিছু ছোট, উত্তর দক্ষিণে লম্বা, পূর্ব্বদিকে প্রবেশদ্বার। বেড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, বনবালা নয়নভঙ্গী করিয়া, হস্তদ্বারা হরেন্দ্রকে একটি স্থান দেখাইয়া দিল, হরেন্দ্র সেইখানে ঘাসের উপর বসিলেন, বনবালা ছাগলগুলি লইয়া সেই ছোট চালাঘরে প্রবেশ করিল, ক্ষণেক পরে বড় একটা মাটির ভাঁড় দুগ্ধপূর্ণ করিয়া বড় ঘরে কাহার কাছে গেল; সেইখানে আর একটা আধারে অর্দ্ধেক দুগ্ধ ঢালিয়া রাখিয়া, সেই দুগ্ধভাণ্ডটী হরেন্দ্রের নিকটে লইয়া আসিল, ভাণ্ডটী হরেন্দ্রের হস্তে দিয়া পান করিবার ইঙ্গিত করিল; প্রেমের অনুরোধে

হরেন্দ্রকুমার সেই দুগ্ধের কিয়দংশ পান করিলেন। বনবালা আবার সেই ভাণ্ডটি লইয়া বড় ঘরে প্রবেশ করিল।

বড় ঘরে কে? একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। অত্যন্ত স্থূলকায়, কেহ হাত ধরিয়া না তুলিলে উঠিবার সামর্থ্য নাই, তার উপর দুইটি চক্ষু অন্ধ। প্রসঙ্গ শ্রবণে জানা যায়, সেই প্রকাণ্ড স্ত্রীলোকটি বনবালার পিসী-মা। পিসীমার সম্পত্তির মধ্যে ঐ দুখানি ঘর, গুটিকতক ছাগল, দুইটি দুগ্ধবতী গাভী, নগদ তহবিলের মধ্যে তিনটি টাকা আর দশ আনা পয়সা; এই বনবালা সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সেই খাতিরে বনবালা ঐ অন্ধ পিসীমার সেবা করে; পিসী-মা হাঁ করিল, বনবালা সেই গহ্বরে সঞ্চিত দুগ্ধ অল্প অল্প ঢালিয়া দিল,—পরিমাণ দুই সের অপেক্ষাও অধিক।

পিসীমাকে দুগ্ধ পান করাইয়া বনবালা পুনরায় হরেন্দ্রের নিকটে ফিরিয়া আসিল, হস্তে নয়নে দুই তিন প্রকার ইঙ্গিত; হরেন্দ্রকুমার সে সকল সঙ্কেত বুঝিলেন; কথা কহিয়া কিছু বলিবেন ভাবিয়াছিলেন, শেষে বিবেচনা করিলেন, নিরর্থক; কথা কহিলে যখন উত্তর পাওয়া যায় না, বহু কথাতেও বনবালা যখন একটিও কথা কহেন না, তখন চুপ করিয়া থাকাই ভাল। পূর্ব্বে তিনি অনুমান করিয়াছিলেন, 'বনবালা বোবা,—বনবালা কালা; এই সময় সেই পূর্ব্ব অনুমান সত্য বলিয়াই হরেন্দ্রকুমারের নিজমনে প্রতীতি জন্মিল; হরেন্দ্রকুমার দাঁড়াইলেন, বনবালার মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে সে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বনবালার গাভী দোহনে, দুগ্ধ আনয়নে, অতিথিকে দুগ্ধ প্রদানে, পিসীমাকে দুগ্ধ পান করাইবার প্রক্রিয়ায় অনেকটা সময় লাগিয়াছিল, রাত্রি এক প্রহর অতীতপ্রায়। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী, রাত্রি এক প্রহরের পর চন্দ্রোদয় হইল। অজানা বনপথে অন্ধকারে গমন করিতে হরেন্দ্রের বিলক্ষণ অসুবিধা হইত, চন্দ্রমা সে অসুবিধা দূর করিলেন। হরেন্দ্রকুমার সেই বনস্থলীতে প্রবিষ্ট হইয়া, বনবালার নয়নপথের অদৃশ্য হইয়া গেলেন, বামহস্তে অশ্রু মার্জ্জন করিয়া বনবালা মৃদুগতিতে পিসীমার নিকটে উপস্থিত হইল। ওদিকে বৃক্ষ হইতে অশ্বটিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া, তৎপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, হরেন্দ্রকুমার দ্রুতধাবনে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পিসীমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে বনবালা, সেই লোভেই হউক, অথবা কর্ত্তব্যানুরোধেই হউক, বনবালা অতিযত্নে পিসীমার সেবা করিত।

সেবার খরচপত্র আসিত কোথা হইতে? যে স্থানে পিসীমার বাড়ী,—প্রাসাদ-মন্দিরই হউক, অথবা সামান্য পর্ণকুটীরই হউক, মানুষ যে স্থানে নিজের ঘর বলিয়া বাস করে, সেই স্থানকেই তাহার বাড়ী বলা যায়,—তাল-পাতার কুঁড়ে হুখানি বনবালার পিসীমার বাড়ী;—যে স্থানে পিসীমার বাড়ী, সেই স্থানের পশ্চিমদিকে অর্দ্ধক্রোশেরও অল্প দূরে ক্ষুদ্র একখানি পল্লীগ্রাম; সেই গ্রামে বিশ পঁচিশ ঘর লোকের বাস; কায়স্থ-ব্রাহ্মণে পাঁচ সাত ঘর মাত্র; বনবালা প্রতিদিন প্রভাতে উঠিয়া সেই গ্রামে ভিক্ষা করিতে যাইত;—ভিক্ষার কথা মুখে বলিতে পারিত না, তবেই আমাদের বলা উচিত, প্রতিদিন প্রভাতে বনবালা সেই গ্রামে বেড়াইতে যাইত। বোবা হউক, কালা হউক, বনবালার ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি ছিল, জাতি অজাতি জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বাড়ী ভিন্ন বনবালা আর অন্য কোনও জাতির দ্বারস্থ হইত না। বনবালা জন্মদুঃখিনী এই গ্রামের ভদ্রলোকেরা তাহা জানিতেন, তাঁহাদের গৃহিণীরাও জানিতেন; বনবালা যে বাড়ীতে প্রবেশ করিত, সে বাড়ীর কর্ত্তাদের সঙ্গে দেখা করিত না। গৃহিণীমহলে গিয়া কান্দিতে বসিত; দয়াবতী গৃহিণীরা দয়াবশে তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিতেন; কেহ চাউল, কেহ দুটি বেগুন, কেহ একটু লবণ, কেহ একটি পয়সা প্রদান করিয়া বনবালাকে গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। বনবালার নাম কেহ জানিত না; বনবালা বনমধ্যে বাস করে, সেইজন্য গ্রামের লোকেরা আদর করিয়া তাহাকে বুনী বলিয়া ডাকিত; বুনীর অপেক্ষা যাহাদের বয়স কম, বুনীকে তাহারা বুনীদিদি বলিয়া ভালবাসা দেখাইত।

বুনীদিদি নিত্য নিত্য সেই গ্রামে তণ্ডুলাদি প্রাপ্ত হইত। মাঝে মাঝে ছাগলছানা বিক্রয় করিয়াও কিছু কিছু লাভ হইত। দুটী দুগ্ধবতী গাভী; গাভীদুগ্ধ বিক্রয় করা ঘটিয়া উঠিত না। ভিক্ষাপ্রাপ্ত তণ্ডুলাদি রন্ধন করিয়া বনবালা দিবাভাগে পিসীমাকে ভোজন করাইয়া আপনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইত; রাত্রিকালে উভয়ে কেবল গাভীদুগ্ধ পান করিয়া শুইয়া থাকিত; সেইজন্য বনবালা গাভীদুগ্ধ বিক্রয় করিত না; তবে যদি দৈবাৎ কোনও বারে দুটি গাভী এক সময়ে বৎস প্রসব করিত, দুগ্ধ অধিক হইত, সে সময় বনবালা তাহার কতকাংশ বিক্রয় করিয়া পয়সাগুলি সংসার-খরচের জন্য রাখিত। সংসার-খরচ সামান্য, চাল কিনিতে হয় না, কাঠ কিনিতে হয় না,

তরকারী কিনিতে হয় না, মধ্যে মধ্যে লবণও জমা থাকে, দোকানের সামগ্রীর মধ্যে কেবল তৈল কিনিতে হয়। বনবালা মৎস্য ভক্ষণ করে না, মৎস্য কিনিবার প্রয়োজন হয় না। গুটিকতক নগদ পয়সা হইলেই বনবালার মাস চলিয়া যাইত। ছাগলেরা বনে চরে, গাভী দুটি মাঠে চরে, ঘরে সেগুলিকে আহার দিতে হয় না, কাজে কাজে খরচ কম হয়; তথাপি এক পয়সাও জমা হয় না। বনবাসিনী বোবা কালা বুনীদিদি কত কষ্ট স্বীকার করিয়া, পিসীমার সেবা করে, পিসীমার প্রতি ভক্তি দেখায়, পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করুন।

চতুর্থ পল্লব।

সরোবর তীরে।

বাবু হরেন্দ্রকুমার মিত্র বনবালাকে বোবা কালা স্থির করিয়া, বনবালার রূপে মোহিত হইয়া, বনবালার দুঃখ মোচনে অভিলাষী হইলেন। রূপে মোহিত হইয়া দুঃখ-মোচনের চেষ্টা করা কিরূপ, রসজ্ঞ পাঠক মহাশয়কে তাহা বুঝাইতে হইবে না; বনবালাকে বিবাহ করিতে হরেন্দ্রের সঙ্কল্প হইল।

গত দুই দিবসে দুই প্রকার খেলা হইয়াছে, তৃতীয় দিবসে কিরূপ খেলা হইবে, হরেন্দ্রকুমার তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তায় আসিল একটি নূতন ভাব। হরেন্দ্রকুমার ধনবানের সন্তান, বিদেশে আসিয়াছেন, সঙ্গে যথেষ্ট অর্থ ছিল; বাজার হইতে দুইগাছি সোণার বালা, পুঁথিগাঁথা এক-ছড়া সোণার কণ্ঠমালা, দুইখানি সুন্দর বসন আনাইয়া, মধ্যাহ্ন ভোজনের পরক্ষণেই তিনি অশ্বারোহণে কানন যাত্রা করিলেন।

বনবালা বেলা দুই প্রহরের মধ্যে পিসীমাকে ভোজন করাইয়া, আপনি কিঞ্চিৎ আহার করিয়া, সেই রৌদ্রে ছাগল চরাইতে আইসে। হরেন্দ্রকুমার দুই প্রহরের পরে আসিয়াছেন; আসিয়া কিন্তু কানন-ভূমি আঁধার দেখিলেন; বনবালাকে দেখিতে পাইলেন না; বনবালা তখনও আইসে

নাই; আসিবে কি না আসিবে, এই ভাবিয়া হরেন্দ্রকুমার অধীর হইলেন। অধীর হইলেই নিধি পাওয়া যায় না, কে যেন হরেন্দ্রের কর্ণে এইরূপ প্রবোধ দিয়া গেল; আশার মুখ চাহিয়া হরেন্দ্র একটু শান্ত হইলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কানন-সরসীর চারিদিকে প্রকৃতি-হস্তে তৃণস্তবকে ঘাট বাঁধা; গহনা-বস্ত্র ক্রোড়ে রাখিয়া হরেন্দ্রকুমার সেই ঘাটের স্বভাবজাত সোপানাবলীর একটি সোপানে পা ঝুলাইয়া বসিয়া, সলিল-শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ বেলা যাইতে লাগিল, বনবালা আসিল না; পূর্ব্বে দুইদিন যে দিকে বনবালা ছাগল চরাইয়াছিল, হরেন্দ্রকুমার ঘন ঘন সেই দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, বনবালাকে দেখিতে পাইলেন না; হতাশের ছায়া আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অন্ধকার করিল; বেলাও ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিল; হরেন্দ্র ভাবিলেন, রজনী আসিতেছে, অন্ধকার আসিতেছে, যে প্রতিমা তিনি ভাবিতেছেন, সে প্রতিমা আসিতেছে না; আশায় বিসর্জ্জন দিয়া রজনীর অন্ধকারে তিনি ডুবিয়া থাকিবেন, এই ভয়—এই নৈরাশ্য তাঁহার মনে।

ঠিক এই সময়ে কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে একটি অঙ্গুলী স্পর্শ করিল, এইরূপ তিনি বুঝিলেন।—সুকোমল স্পর্শ।—তিনি তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, বনবালা। বনবালার মুখে তিনি একবারও হাস্য দর্শন করেন নাই, সেই সময় দেখিলেন, বনবালার সুন্দর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু মৃদু হাস্য। উল্লাসে যেন আত্মবিস্মৃত হইয়া হরেন্দ্রকুমার সানুরাগে বনবালার একখানি হাত ধরিলেন; হাতখানি ছাড়াইয়া লইবার জন্য বনবালা চেষ্টা করিল না; অর্দ্ধ কুব্জভঙ্গীতে পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া হরেন্দ্রের বামদিকে বসিল। বনবালার ছিন্ন মলিন বসন, সেই মলিন বসনের অঞ্চলে কি যেন লুকান ছিল, সেই বস্তুটি বাহির করিয়া বনবালা সতৃষ্ণনয়নে হরেন্দ্রের মুখপানে চাহিল; একছড়া ফুলের মালা। বনবালা সেই মালা ছড়াটি নির্ব্বাক অভিনয়ে হরেন্দ্রের গলদেশে পরাইয়া দিল।

হরেন্দ্রকুমার সময় পাইলেন,—সুবিধা পাইলেন; ফুলের মালার বিনিময়ে তিনি বনবালার গলায় সোণার কণ্ঠমালা দুলাইয়া দিলেন, দুই হাতে দুগাছি সোণার বালা পরাইলেন, মলিন বাস ছাড়াইয়া স্বহস্তে একখানি সুচিক্কণ

নূতন বস্ত্র পরাইয়া দ্বিতীয় বস্ত্রখানি তাহার হস্তে অর্পণ করিলেন। চকিতনয়নে বনবালা তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। স্বহস্তে যুবতীকে বস্ত্র পরিধান করান পুরুষের পক্ষে ব্যবহার বিরুদ্ধ, এই তর্ক তুলিয়া কেহ কেহ হয়ত বর্ণনা কর্ত্তাকে নির্লজ্জ বলিয়া নিন্দা করিবেন, কিন্তু উপায় নাই।

রুক্ষকেশা শুষ্কগাত্রা বনবালা নূতন অলঙ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া যেন রাজবালার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। হরেন্দ্রকুমার বুদ্ধিমান, বনবালা অভদ্রকুল-সম্ভূতা নহে, ইহা তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইলেন। তাহার উৎফুল্ল নয়নে নিজের উৎফুল্ল নয়ন নিক্ষেপ করিতে করিতে সহসা বনবালা উঠিয়া দাঁড়াইল, মরাল-গামিনী হইয়া তীরবর্ত্তী বনের দিকে চলিল; কোথায় যায়, জানিবার জন্য হরেন্দ্রকুমার বিস্মিত লোচনে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বনবালা ফিরিল; হস্তে একটি বৃক্ষপত্র, আর তিনটি বড় বড় বেলের কাঁটা। সেই দুটি জিনিস হরেন্দ্রের হস্তে প্রদান করিয়া, অভাগিনী সেই বৃক্ষপত্রের উপর অতি চমৎকার সঙ্কেতে অঙ্গুলি চালন করিতে লাগিল। হরেন্দ্র বুঝিলেন, অবলা বালিকা সেই পত্রে তাঁহার নামটি লিখিয়া দিবার সঙ্কেত জানাইতেছে। বৃক্ষপত্রটি অল্প সবুজ বর্ণ, বংশীবটপত্রের ন্যায় আয়ত, স্থূল, অল্প লোমশ; কদলী পত্রের ন্যায় গুটাইয়া রাখিলে ভাঙ্গিয়া যায় না, এত নরম; বিল্ব-কণ্টকের সাহায্যে হরেন্দ্রকুমার সেই পাতার উপর লিখিলেন, "শ্রীহরেন্দ্রকুমার মিত্র, রঘুনাথপুর, হুগলী।" এইখানে প্রকাশ থাকা উচিত, পদব্রজে গমন করিলে কামদেবপুর হইতে রঘুনাথপুর প্রায় পাঁচদিনের পথ।

পঞ্চম পল্লব।

বিচ্ছেদ।

বনবালা দিল বরের গলায় ফুলের মালা, বর দিলেন কনের গলায় কণ্ঠমালা; বিজন কাননমধ্যে ইহার নাম মাল্যবদল। গান্ধর্ব্ব বিবাহ এখন আমাদের দেশে অপ্রচলিত, কিন্তু সেই বনমধ্যে মাল্য বিনিময়ে হরেন্দ্রকুমার সেইদিন রাত্রে গান্ধর্ব্বমতে বনবালাকে বিবাহ করিলেন। রাত্রি

হইতেছে, পিসীমা কত ভাবিতেছেন, সে কথাটা তখন বনবালা যেন ভুলিয়া রহিল; নূতন আনন্দ, নূতন সুখের আশা, সেরূপ ভুল হওয়াটা নিতান্ত অসঙ্গতও নয়। তিথি পঞ্চমী, রাত্রি দশ দণ্ডের পর চন্দ্রোদয়, বনবালার বিবাহ হইল, বনলতাগণ খানিকক্ষণ বাসর জাগিল; বাসরের শোভা দর্শনার্থ তারাপতি সুধাকর সুধামুখে হাসিয়া হাসিয়া আকাশপটে দর্শন দিলেন; নিবিড় পল্লব বৃক্ষরাজির অঙ্গ ভেদ করিয়া বাসরক্ষেত্রে চন্দ্ররশ্মি অল্প অল্প প্রতিভাত হইল, হরেন্দ্রকুমার যেন স্বপ্ন ভঙ্গে জাগরিত হইলেন। বনবালার নিকটে বিদায় লইতে হইবে, কথায় বিদায় লওয়া হইতে পারিবে না, বনবালার দুইখানি হাত ধরিয়া তিনি তাহার প্রফুল্ল নয়ন পানে চাহিলেন, বনবালাও সেইরূপে চাহিল, বনবালার চক্ষে জল আসিল। এই সময় প্রবোধের সঙ্কেত; উভয়েই প্রবুদ্ধ।

বনভূমিতে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নালোকে সরসীকূলে অশ্বটি চরিয়া বেড়াইতেছিল, হরেন্দ্রকুমার পূর্ব্ববৎ সেইটিকে একটি বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া, বনবালাকে গৃহে রাখিয়া আসিতে চলিলেন। সেদিন ছাগল আইসে নাই, বনবালা একাকিনী; বরকন্যা উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া চলিলেন, যথাস্থানে পৌছিলেন সেইখানে পুনরায় পরস্পর সঙ্কেত বিনিময় হইল; বনবালা পিসীমার সেবা করিতে গেল, হরেন্দ্র পুনরায় বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে অশ্বারোহী হরেন্দ্রকুমার কামদেবপুরে উপনীত। সে রজনীতে হরেন্দ্রের সুখনিদ্রা হইয়াছিল। বিবাহ হইয়াছে, প্রতিদিন এক একবার নবীনা বনিতাকে দেখা দেওয়া আবশ্যক, হরেন্দ্র তন্নিমিত্ত তদবধি প্রতিদিন অপরাহ্ণে সেই বনে যাইতে আরম্ভ করিলেন, বনবালার সহিত যথাসম্ভব নবরস উপভোগ করিতে লাগিলেন; অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিয়া যাইতেন, বাসার লোকেরা সেই বিলম্বের কারণ কিছুই বুঝিতে পারিত না।

দুইমাস এইরূপ। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতে পঞ্চানন্দের চরণামৃত লইয়া হরেন্দ্রকুমার স্বদেশে যাইবেন, এইরূপ সঙ্কল্প ছিল; সে চতুর্দ্দশী কবে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর একটা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী গত হইয়া গিয়াছে—সে কথা হরেন্দ্রের মনেই ছিল না; একরাত্রে তিনি তাঁহার প্রথম বিবাহিতা ভালবাসা বঁধুটীকে স্বপ্নে দেখিলেন, মন বিচলিত হইল, চরণামৃতের কথা মনে পড়িল, কিন্তু হয় কি? কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী নিকটে নাই; যে রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন,

সে রাত্রে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথির ভোগ; পক্ষ শেষ হ
বাকী; তাহার পর আবার চতুর্দ্দশ দিবস; আবার ব
আহ্লাদ, কতক উদ্বেগ, এইভাবে হরেন্দ্রকুমার সে
করিলেন; নিত্য নিত্য বনবালার সঙ্গে দেখা হয়,
কৌতুক চলে, তাহাতে কোনও বাধা হয় না; কিন্তু
যে দিন চতুর্দ্দশী, সে দিন আর হরেন্দ্রকুমার বনবালা
পারিলেন না, ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, বাসা উঠাইয়া, পত্নীর
চরণামৃত লইয়া, রঘুনাথপুরে চলিয়া গেলেন। বাড়ীতে
আর মনে রহিল না।

এদিকে বনবালার বিরহদশা উপস্থিত। যে দিন হরেন্দ্রকুমার বিদায় হইয়াছেন,—"আসিব না" বলিয়া "কল্য আর দেখা হইবে না" বলিয়া বিদায় হন নাই, ভাবার্থ ধরিয়া বলিতে হইলে বলিতে হয়, এক প্রকার পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহার পরদিন বনবালা অনেকক্ষণ পথ পানে চাহিয়াছিল, হরেন্দ্রকুমার আইসেন নাই। তৃতীয় দিবসে বনবালার সমান হতাশ। ক্রমাগত দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, হরেন্দ্রকুমার আসিলেন না। বনবালা মনে মনে কি ভাবে, সে অন্তরে কে প্রবেশ করিবে। অনুমানে বুঝিয়া লওয়া যায়, বনবালা ভাবে হরেন্দ্রকুমার।

বনবালা চিরদুঃখিনী; ছাগল চরাইয়া, ভিক্ষা করিয়া, অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও বনবালা এক প্রকার সুখে ছিল, পরের জন্য ভাবিতে হইত না। ভাবনা-শূন্য মানুষ থাকে না, বনবালা হয়ত আর কিছু ভাবিত, নবপ্রেমে, অনাস্বাদিত নবরসে, অল্পদিন আমোদিনী থাকিয়া, অকস্মাৎ বিচ্ছেদে একজন অপরিচিত পুরুষের জন্য এমন করিয়া ভাবিতে হইত না। যাহারা কথা কহিতে পারে না, তাহাদের চিত্তের ভাবনা বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী। কথা কহিতে পারে না, মুখ ফুটিয়া অথবা ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেও পারে না। এমন বোবা কালা অনেক দেখা যায়, যাহারা হাউমাউ করিয়া অর্থ-শূন্য চীৎকার করিতে পারে, ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতে পারে, হাহা হোহো করিয়া হাসিতে পারে, রোদনে তাহাদের দুঃখের ভার লঘু বোধ হয়, বনবালা সে প্রকৃতির বোবা কালা নয়, বনবালা এক প্রকার আশ্চর্য্য বোবা কালা; বনবালার কণ্ঠে কোন প্রকার স্বর বহির্গত হয় না, কিন্তু বনবালা কাঁদিত; কাঁদিবার প্রমাণ কেবল অশ্রুধারা।

হইতেছে, পিসীমা রহ। ভগিনী একে দুঃখের জ্বলনে অহরহঃ দগ্ধীভূত, রহিল; নূতন আর অন্তর্দাহী নূতন বিরহ!

অসঙ্গতও নয়। তিল মণ্ডল, বরিষে গরল,
বিবাহ হইল, বনলতা চন্দন আগুন কণা
দর্শনার্থ তারাপতির তাম্বুল, লাগে যেন শূল,
দিলেন; নিবিড় গীত নাট ঝন্‌ঝনা॥
অল্প অল্প প্রতিফলের মালায়, সূচের জ্বালায়,
বনবালার নি তনু হৈল জর জর।
না মলয়ের বায়, বজ্র বাজে গায়,
তনু কাঁপে থর থর॥
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে,
কাণে হানে যেন তীর।
যত অলঙ্কার, জ্বলন্ত অঙ্গার,
পোড়ায় মোর শরীর॥
এ নীল কাপড়, হানিছে কামড়,
যেমন কাল-সাপিনী।
শয্যা হৈল শাল, লজ্জা হৈল কাল,
কেমনে জীবে পাপিনী॥

* * * *

কি ছার বিছার জ্বালা।”

এইরূপে বিনাইয়া ভারতচন্দ্রের বিরহিনী নায়িকার মত কাঁদিয়া কাঁদিয়া, বনবালা আপন সহচরীর নিকটে বিরহ-যন্ত্রণা প্রকাশ করিতে পারে না, তবেই সকলে ভাবুন, বোবা বনবালার বিরহযন্ত্রণা কতদূর! হৃদয়-সাগরে তরঙ্গ বহিয়া যায়, চক্ষের জলে ভূমি ভিজিয়া যায়, সে বিরহের একটি বর্ণও মুখে বাহির হয় না। ভয়ানক যন্ত্রণা!

[ক্রমশঃ]

সরস্বতী।

নমি দেবি! তুয়া রাঙাপায়!
কৃপাদৃষ্টি কর মা আমায়!
বাগীশ্বরী তুমি বীণাপাণি!
সদা সেবি রাঙা পা-দুখানি;
কাঁদি সদা অন্নবস্ত্র তরে!
কমলা নিদয়া অভাগারে!
সতিনী তোমরা দোঁহে সতি!
তাই হিংসা সন্তানের প্রতি?
তোমাদের এই ভাব স্মরি,
দাক্ষভূত কলিতে শ্রীহরি!

লক্ষ্মী।

কমলে! কমলাসনা তুমি,
নারায়ণ-হৃদিবিলাসিনী।
শুভঙ্করি! প্রসাদে তোমার,
ধনপূর্ণ অখিল সংসার,
কিন্তু মাতঃ! না জানি কি পাপে,
বঞ্চিত ও তামার কৃপা লাভে,—
সরস্বতী সেবা করে যারা,
কহ দেবি! কারণ ইহার,
কেন ঘটে হেন অবিচার?
কর দয়া এই ভিক্ষা চাই।

বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা।

বঙ্গভাষার নাম করিলে অধিকাংশ বাঙ্গালী নাসিকা কুঞ্চিত করেন, বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, উহার অসারতার উল্লেখ করিয়া নানা প্রকার প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন, ইহার একমাত্র কারণ বঙ্গভাষার পাঠোপযোগী পুস্তকের অভাব। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে বৎসরে সহস্র সহস্র অসার আখ্যায়িকা, প্রকৃত ইতিহাস বিবর্জ্জিত কল্পণাময় ঐতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ায় বঙ্গভাষা ক্রমেই আবর্জ্জনাময় হইয়া পড়িতেছে, পাঠকবর্গও উত্যক্ত হইয়া পড়িতেছেন। ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ নিরক্ষর ব্যক্তিও সংবাদ-পত্রের স্তম্ভে আত্মপ্রশংসাপূর্ণ আড়ম্বরময় বিজ্ঞাপন প্রকাশের সাহায্যে বঙ্গভাষার লেখক শ্রেষ্ঠমধ্যে জাহির হইতেছেন, কাজেই লোকে বরাবর হতাশ হইয়া বঙ্গভাষার অসারতা উপলব্ধি করিতেছে? স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র যে প্রতিভাবলে বঙ্গভাষা চর্চ্চায় বঙ্গবাসীদিগকে প্রণোদিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারগণ অনেকেই তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া আপনাদিগের অযোগ্যতা বশতঃ বঙ্গভাষার সমূহ অকল্যাণ সাধন করিতেছেন; ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষার উপর লোকের বিরক্তির সঞ্চার করিয়া দিতেছেন। বস্তুতঃ ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

বাঙ্গালীর মাতৃভাষা পাঠে বিরক্তি, ভাষার অবনতির চাক্ষুষ নিদর্শন; কিন্তু এই বিরক্তির কারণ কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি? ব্যাকরণের খটমটি, শব্দের ছটা চিরকাল লোকের ভাল লাগে না। ভাষার অপেক্ষা ভাবের প্রতি লোকের আগ্রহ অধিক, ইহা চির প্রসিদ্ধ—কেবল ফাঁকা আওয়াজ করিলে তাহা লোকের চিরদিন ভাল লাগিবে কেন? বর্ত্তমান কালে বই লেখা বলিলেই লোকেরা নবেল লেখা মনে করে। সংবাদপত্র বলিলেই গালাগালি মনে করে, কাজেই লোকের মনে বঙ্গভাষার প্রতি ক্রমেই অশ্রদ্ধার সঞ্চার হইতেছে।

মোট কথা, যদি বাঙ্গালীর বাঙ্গালাভাষা পাঠ করিবার ইচ্ছা না থাকিত, তবে ভাষার উপরে তাহার বিরক্তি হইত না। কারণ অনুরাগই বিরক্তির মূল। যেখানে দেখিবে, কাহারও কোন বিষয়ে বিরক্তি আছে, সেখানে জানিবে যে, পূর্ব্বে সে বিষয়ে তাহার অনুরাগ ছিল। সুতরাং এক সময়ে যে

বঙ্গীয় পাঠক সমাজ বঙ্গভাষা চর্চ্চা করিতেন, ইহা নিশ্চয়;—উপহারের লোভে যে আজকাল সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের গ্রাহক জুটিতেছে, ইহাও সেই পূর্ব্বানুরাগের নিদর্শন, আর উপহার ব্যতীত যে বাঙ্গালা কাগজ চলে না, ইহার কারণও বঙ্গভাষায় পাঠোপযোগী বিষয়ের অভাব। বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহের সেই একই সুর, একই ভাষা, একই বিষয় লোকের দিন দিন ভাল লাগিবে কেন?

বঙ্গীয় পাঠক সমাজের বঙ্গভাষায় বিরাগ দর্শনে লেখককুল ক্রমেই হতাশ হইয়া পড়িতেছেন, পাঠকগণও বঙ্গভাষার লেখক সমাজকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করিয়া তাঁহাদিগের লেখার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইতেছেন; বলিতে পারি না, ইহা উন্নতি কি অবনতির লক্ষণ। যদি লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এই ঘৃণার ভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পায়, লেখক যদি পাঠককে মূর্খ ও নির্ব্বোধ জ্ঞানে তাহার রুচি ও প্রবৃত্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আপনার পাণ্ডিত্য প্রকাশেই ব্যতিব্যস্ত থাকেন, পাঠকও লেখকের মনোভাব বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বোধে তাঁহার লেখা বাতুলের বাতুলতা মনে করেন, তবে বঙ্গভাষা অচিরাৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। আর যদি এই বিরক্তির কারণ অনুসন্ধানের দ্বারা লেখক ও পাঠকের মধ্যে সদ্ভাব সঞ্চারিত হয়, লেখক যদি পাঠকের রুচি অনুযায়ী সুপাঠ্য সারবান পদার্থ প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, নূতন ভাবের আবেশে পাঠকের রুচি পরিবর্ত্তিত করিতে প্রস্তুত হন, নিত্য নূতন নূতন ভাবের উচ্ছ্বাসে পাঠকের মনের সহিত সমাজ ধর্ম্ম ও নীতি প্রবর্ত্তনে যত্ন প্রকাশে যদি সচেষ্ট হন, তবে এই বিরক্তিকে উন্নতির কারণ বলিতে হইবে।

সুখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজের প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র মার্গ গমনোন্মুখী হইয়াছে। যে ইতিহাস লোকে চর্চ্চার বিষয় বলিয়া গণনা করিত না, সেই ইতিহাসের ক্রমেই আদর দেখা যাইতেছে। লোকে যে প্রাচীন তথ্যের হতাদর করিত, তাহারই আদর দেখা যাইতেছে, লোকের চক্ষে এখন যেন আর নূতনের চটক অপেক্ষা পুরাতনের অন্ধকার ভাল লাগিতেছে। এই আগ্রহের সময় যদি প্রাচীন বিষয়ের উদ্ধার চেষ্টায় বঙ্গভাষার দেহ পরিপুষ্ট হয়, তবে বোধ হয় বঙ্গভাষার দুর্দ্দশা দূরীভূত হইতে পারে।

শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী।

"সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ।"

("সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদ" পুস্তকের ও চিকিৎসার সমালোচনা।)

"সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ" নাম শুনিলেই মনে হয় যে, ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদের সংস্রব আছে এবং এই চিকিৎসায় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধের ন্যায় সূক্ষ্মমাত্রায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া উহার নাম "সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ" হইয়াছে। কিন্তু "সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ" চিকিৎসার প্রধান গ্রন্থ বৃহৎ, "সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ" পাঠে জানা যায় যে, উক্ত ধারণা ভ্রান্ত। বিদেশীয় উদ্ভিজ্জে সূক্ষ্মায়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ প্রস্তুত হয় সত্য কিন্তু এই চিকিৎসায় একাধিক উপাদান লইয়া কোনও ঔষধ প্রস্তুত হয় না বা ইহাতে কোন প্রকার বিষাক্ত, জান্তব বা ধাতুঘটিত ঔষধ নাই। ঔষধের সংখ্যা সর্ব্বসমেত ১৭টী। এই ১৭টী ঔষধ অবলম্বনে কেমন করিয়া সমস্ত রোগ আরোগ্য করা যায়, তাহা এই চিকিৎসার মূল সূত্রপাঠ এবং ঔষধগুলির ফল প্রত্যক্ষ করিলে সহজে বুঝা যায়। হোমিওপ্যাথিচিকিৎসাও এই চিকিৎসা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেন না, হোমিওপ্যাথির মূল সূত্র, চিকিৎসাপ্রণালী ও ঔষধাদি সম্পূর্ণ পৃথক্।

খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী বটব্যাল বি-এ, মহাশয়, এই চিকিৎসার আবিষ্কারক। প্রায় ১৮ বৎসর হইল, তিনি এদেশে ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন এবং তাঁহার চেষ্টায় ও সুচিকিৎসাফলে উহা এ দেশে প্রসার লাভ করে। তিনি এ দেশের সর্ব্বপ্রধান ইলেক্ট্রো-হোমিপ্যাথিক চিকিৎসক বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার আবিষ্কৃত সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথি-চিকিৎসার রূপান্তর মাত্র। সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদের সহিত ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথির যে কোন সংস্রব নাই এবং দুই একটী চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা "বৃহৎ সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ" পুস্তকে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কলিকাতার ও মফঃস্বলের অনেকে, এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার রোগে কেবল সূক্ষ্মায়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করেন। এই চিকিৎসার ফল, অন্যান্য চিকিৎসার ফলের অপেক্ষা ভাল না হইলে, তাঁহারা, বোধ হয়, এরূপ করিতেন না। ওলা-উঠা, জ্বরাধিকার প্রভৃতি উৎকট, ও প্রবল রোগের নূতনাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া, বহুমূত্র, কুষ্ঠ প্রভৃতি কঠিন অথচ পুরাতন রোগে, এই চিকিৎসার ফল, যেরূপ হয় শোনা যায়, অন্য কোন্ দেশীয় বা বিদেশীয় চিকিৎসায়

সেরূপ ফল হইয়াছে, এরূপ শোনা যায় না। এই সকল কারণেই বোধ হয় যাঁহারা এই চিকিৎসার গুণ জানেন, তাঁহারা ইহা আদৌ ছাড়িতে চাহিবেন না। এতদ্ভিন্ন "সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার" একটী প্রধান গুণ এই যে, ঠিক রোগ নির্দ্ধারণে উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচিত হইয়া প্রযুক্ত হইলে, উহা সাধারণতঃ নিষ্ফল হইবার নয়।—ঔষধগুলির সংখ্যা অল্প। উহাদের কার্য্যক্ষেত্র সবিস্তৃত বলিয়াই, উপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করাও অপেক্ষাকৃত সহজ। যে সকল রোগে মৃত্যু অনিবার্য্য, সেই সকল রোগেও, এই সকল ঔষধের ক্রিয়া, যথেষ্টরূপে স্পষ্টই লক্ষিত হয়। তবে উক্ত অবস্থায় জীবনীশক্তি নিস্তেজ থাকে বলিয়া উক্ত ক্রিয়া স্থায়ী হয় না।

"সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ" একটী নূতন আবিষ্ক্রিয়া, উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ ও সর্ব্বরোগ-দমনক্ষম এবং যারপর নাই সহজ। একটী চিকিৎসা আবিষ্কার করা যে কিরূপ কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। যাহাতে এইরূপ চিকিৎসার দেশব্যাপী পরীক্ষা ও প্রচার হয়, সে বিষয়ে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত। কেন না, যাহাতে দেশের উন্নতি ও গৌরব, সে বিষয়ে সাধারণের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত পূর্ণ-সফলতা লাভ করা বড় কঠিন।

সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদের মূলসূত্র কি তাহা বুঝাইবার জন্য "বৃহৎ সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ" পুস্তক হইতে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত হইল ;—

ঔষধের সূক্ষ্মতার আবশ্যকতা।—আমাদের বিবিধ খাদ্য দেহ-মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুতে পরিণত হইয়া দেহের শক্তি ও অংশসমূহ উৎপন্ন করে। পরিপাকাদি ক্রিয়া দ্বারা কেমন করিয়া উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, এই পুস্তকে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত শরীর-বিদ্যা পাঠ করিলে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে। আমাদের দেহের বিবিধ অংশের উপযোগী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুর আধিক্য বা অল্পতা নিবন্ধন দেহমধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে, উক্ত বিশৃঙ্খলাকে পীড়া কহে। এইরূপ অবস্থায় দেহকে প্রকৃতিস্থ করিতে গেলে আবশ্যকীয় পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুর অভাব বা আধিক্য দূর করা আবশ্যক। কিন্তু যখন রোগনিবন্ধন দেহের বিবিধ যন্ত্র বিকৃত, সুতরাং স্ব স্ব কার্য্য করিতে অক্ষম থাকে, তখন কেমন করিয়া সমস্ত আবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত ভাবে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুতে পরিণত হইবে? আমরা জানি যে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থ আমাদের দেহের সহিত শীঘ্র ও সহজে মিশ্রিত হয়। কেন না, উহারা সূক্ষ্ম বলিয়া দেহযন্ত্রের সাহায্যে উহাদিগকে সূক্ষ্ম করিবার আবশ্যকতা হয় না,

অথবা উহাদিগকে অধিকতর সূক্ষ্ম করিতে হইলে আমাদের দেহ-যন্ত্র সমূহের বিশেষ আয়াস পাইতে হয় না। উপরোক্ত কারণে একটি ঔষধ আমাদের দেহের পক্ষে শীঘ্র ও সহজগ্রাহ্য করিতে হইলে উক্ত ঔষধের উপযুক্ত ভাবে সূক্ষ্ম মাত্রায় পরিণতি-কার্য্য এরূপ প্রক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া উচিত, যাহাতে ঔষধের প্রধান প্রধান গুণগুলি না বিনষ্ট হয়।

যে সকল চিকিৎসায় স্থূল মাত্রায় ঔষধ ব্যবহৃত হয়, সেই সকল চিকিৎসায় বিজ্ঞ চিকিৎসক মাত্রেই অবগত আছেন যে, রোগীর যদি ঔষধ পরিপাক এবং যদ্দ্বারা উহার উপযুক্ত অংশগুলি ভাল করিয়া দেহের সহিত মিশ্রিত করিবার শক্তি না থাকে, তাহা হইলে উক্ত ঔষধ বিষহীন এবং উপযুক্তগুণ-বিশিষ্ট হইলেও উহার দ্বারা কোন উপকার হয় না বরং অরুচি, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগের অঙ্গ বৃদ্ধি পায়, রোগ উত্তরোত্তর অধিকতর মন্দ হইয়া আইসে এবং প্রতিকূল অবস্থায় সাংঘাতিক হইয়া উঠে। এইরূপ স্থলে বিষময় ঔষধ প্রযুক্ত হইলে অধিকতর অনিষ্ট হয়।

আমরা যে খাদ্য খাই, তাহার অসারাংশ দেহ হইতে মলমূত্রাদির আকারে বহির্গত হইয়া যায়। সারাংশ রক্তে পরিণত হয়। রক্তের দ্বারা আমাদের স্নায়ু, ঝিল্লী, অস্থি প্রভৃতি দেহের যাবতীয় অংশ গঠিত ও উহাদের কার্য্য নিয়মিত হয়। রক্তের যে সকল অংশে স্নায়ু প্রভৃতি গঠিত হয়, সেই সকল অংশ এত সূক্ষ্ম, যে কোন প্রকার যন্ত্রের দ্বারা তাহাদিগকে স্থির করা যায় না। অথচ এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুর দ্বারা যে দেহ গঠিত হয়, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। সূক্ষ্মায়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি এরূপে প্রস্তুত হয়, যাহাতে উহাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুগুলি রক্তস্থিত স্নায়ু, ঝিল্লী প্রভৃতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপাদানের ন্যায় সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উহাদের দ্বারা দেহের অভাব পূর্ণ হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, সূক্ষ্মায়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যে উক্ত প্রকার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুতে পরিণত হইয়া প্রস্তুত হয়, তাহার প্রমাণ কি? আমরা উত্তরে বলিতে চাই যে, সূক্ষ্মায়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলির ফলই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

যে জিনিষ যত সূক্ষ্ম, তাহার শক্তি তত অধিক। মৃত্তিকা অপেক্ষা জলে এবং জল অপেক্ষা বাষ্পে অধিক শক্তি দৃষ্ট হয়। একটি লঙ্কা লইয়া ভাঙ্গিয়া নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট করিলে উহার বিশেষ শক্তি বুঝা যায় না। কিন্তু যদি অগ্নিসংযোগবশতঃ উক্ত লঙ্কা হইতে উত্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণু নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে উহার অধিক শক্তি দৃষ্ট হয়। এইরূপ রক্তস্থিত বিবিধ

অণুতে যে শক্তি নিহিত থাকে, সেই শক্তি যে যে স্থূল উপাদান হইতে রক্ত প্রস্তুত হয়, সেই সকল উপাদানের শক্তির অপেক্ষা অধিক। এই শক্তির সাহায্যে দেহযন্ত্র চালিত হয়। যখন কোন পীড়া নিবন্ধন রক্তে সমস্ত প্রয়োজনীয় অণুগুলি প্রস্তুত হইতে পায় না, তখন সূক্ষ্মায়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সেবন করিলে উহা রক্তের প্রয়োজনীয় অণুগুলির অভাব পূর্ণ করিয়া দেয়, সুতরাং দেহযন্ত্র সহজে চালিত হয়।

বৃহৎ সূক্ষ্ম-আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের ভাষা সরল। স্ত্রীলোকেও সহজে এই পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন। চিকিৎসা যে এতদূর সহজ হইতে পারে, তাহা পূর্ব্ব কেহ কখন কল্পনা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। এ দেশের প্রায় সমস্ত চিকিৎসাপুস্তকে কেবল অপর পুস্তকের অনুকরণ বা অনুবাদ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার ইহাতে যতদূর সম্ভব সকল বিষয়েই নিজ ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষার ফল সন্নি-বেশিত করিয়াছেন। এই জন্য অনেক বিষয়ে এই গ্রন্থখানি মৌলিক। এই মৌলিকতার গুণে, ভাল করিয়া একবার পাঠ করিলে, পুস্তকখানির উপর আস্থা জন্মে। দেশীয় খাদ্য যে বিদেশীয় খাদ্য অপেক্ষা আমাদের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ—তাহা এই পুস্তকে অতি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন কেমন করিয়া সমাজে প্রভূত অনিষ্ট ঘটিতেছে, সুবিধামত তাহাও পুস্তকের অনেক স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহাতে দেহের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক উন্নতি হয়, সে বিষয়েরও ইহাতে যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। এককথায়, স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসা-সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তাহা ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে পুস্তকখানির যত অধিক প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

বৃহৎ সূক্ষ্মায়ুর্ব্বেদ পুস্তকখানি প্রায় ৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ হইলেও ইহাতে বাজে কথা একটীও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য আমরা সংক্ষেপে ইহার কয়েকটী প্রকরণের সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

উপক্রমিকা।—এই অংশে চিকিৎসকের, রোগীর ও রোগীর আত্মীয়-গণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত ও অপরাপর জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। অংশটী স্থানে স্থানে কয়েকজন চিকিৎসকের অরুচিকর হইলেও তদ্দ্বারা সাধারণ চিকিৎসক ও গৃহস্থের বিশেষ উপকার হইবে।

চিকিৎসাসূত্র।—মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিধানে আমাদের স্বাস্থ্য কিরূপ

হওয়া উচিত এবং কিরূপে অপব্যবহার করিয়া, আমরা উহা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি, প্রাকৃতিক নিয়মে কি কি সহজ উপায়ে আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে এবং রোগ নিবারণ ও আরোগ্য করিতে পারি ইত্যাদি বিষয় এই প্রকরণে বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা শুধু আরোগ্য কেন, জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, মৃত্যু, পীড়া প্রভৃতি সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে, তাহা অতি সরলভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। চিকিৎসার মূল সত্য সম্বন্ধে যাহা কিছু জানা আবশ্যক, তাহাও বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

দ্রব্যগুণ।—আমরা কি কি স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা দ্রব্যবিশেষের গুণ নির্ণয় করিতে পারি, তাহা এই অংশে প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য-দ্রব্যাদির গুণের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত শারীর বিদ্যা।—এই অংশ পাঠ করিলে শরীরের ভিতর কোথায় কিরূপ কার্য্য হয়, তাহা সহজে বুঝা যায়।

খাদ্য, পানীয়, বায়ু, রৌদ্র, শ্রম প্রভৃতি যে সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকিলে সহজে স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়, সেই সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। এই বর্ণনায় অনেক নূতন কথা শিখিবার আছে।

চিকিৎসা।—এই প্রকরণে সর্ব্বপ্রকার রোগের বিস্তারিত সংজ্ঞা, প্রকার, কারণ, লক্ষণ, রোগনির্ণয়, চিকিৎসা, পথ্য, সহকারী উপায় ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছে। যে রোগ যত কঠিন, সে রোগের বিষয় তত সহজ ও বিস্তারিতভাবে লিখিত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার জ্বর, ওলাউঠা, ক্ষয়কাশ, নিউমোনিয়া, ব্রণকাইটিস প্রভৃতি শ্বাসরোগ, অজীর্ণ, বিশেষ বিশেষ স্ত্রীরোগ ও শিশুপীড়া এই সকল রোগের অন্তর্গত।

অনেকে আজকাল স্বদেশীয় জিনিষের আদর বুঝেন। দেশের যে জিনিষ বিদেশীয় জিনিষ অপেক্ষা ভাল অথচ সুলভ, তাহার অনেক আদর হওয়া উচিত। সূক্ষ্ম আয়ুর্ব্বেদ দেশীয় চিকিৎসা। ইহাতে দেশীয় জিনিষ কি স্বাস্থ্যে, কি রোগচিকিৎসায় সর্ব্বত্র উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইজন্য আমরা আবার বলি, সাধারণের এই চিকিৎসাকে বিশিষ্টভাবে উৎসাহ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১২শ বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩১০ সাল। { ৮ম সংখ্যা।

শুক্রধারণ বা ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা।

আয়ুর্ব্বেদে দেখা যায় যে, শুক্র সোমগুণাত্মক, শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকর, গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবের প্রধান আশ্রয়।

"শুক্রসৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতং।
গর্ভবীজবপুঃ সারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥"

শুক্রে শৈত্যকারক এবং পোষকশক্তি থাকাতে উহাকে ঋষিরা সোম-গুণাত্মক লিখিয়াছেন।

শুক্রধাতুর অপব্যয় না হইলে দেহ স্নিগ্ধ শীতল ও সুস্থ থাকে। এই ধাতুর ক্ষয়ে দেহের উত্তাপ বাড়ে, যাবতীয় দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়াসম্পন্ন হইতে গেলেই দেহের (Tissue) বিধানগুলির সেই পরিমাণে নাশ হয়। ইহাকেই ইংরাজিতে Tissue Oxidation কহে। শুক্রক্ষয়ে এই Tissue Oxidation জনিত উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে গেলেই দেহের বিধানগুলির (Tissues) ক্ষয়ও সেই পরিমাণে হয়। এইরূপ উত্তাপ বাড়াকেই আয়ুর্ব্বেদমতে পিত্তপ্রকোপ কহে।

আজকাল অত্যধিক বিষয়চিন্তা ও শুক্রক্ষয়ে অধিকাংশ লোকেরই বায়ু এবং পিত্তপ্রকোপ দেখা যায়। পিত্ত বর্দ্ধিত হইলে নাড়ী চঞ্চল হয় (চপলা পিত্তবাহিনী)। এই পিত্ত প্রকোপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা শিরাসমূহ প্রসারিত হয়। এইজন্য হস্ত, পদ, জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি স্থান অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ ধারণ করে এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণবোধ হয়।

পুনশ্চ, শুক্রসম্বন্ধে লেখা আছে যে, রসাদি সপ্তধাতুর মধ্যে ইহাই চরমধাতু। অর্থাৎ রস (Chyle) হইতে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, এবং মজ্জা হইতে শুক্র উৎপন্ন হয়।

শুক্রক্ষয় হইলে প্রথমে কষেরুকা মজ্জা (Brain, Spinal cord) এবং অস্থি মজ্জা (Bone marrow) বিকৃত হয়। এইজন্য অত্যন্ত শুক্রক্ষয়ে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিকৃত হয়। শুক্রক্ষয়ে ক্রমশঃ মজ্জা হইতে রসধাতু পর্য্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং রোগী ক্ষয়রোগে কালকবলে কবলিত হয়।

পুনশ্চ শুক্র সম্বন্ধে লেখা আছে ;— প্রদা

ঘৃত যেমন দুগ্ধের, গুড় যেমন ইক্ষুরসে প্রদত্ত হয়ব ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, শুক্রও সেইরূপ সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থাঠ করে।

যথা পয়সি সর্পিস্ত গুড়শ্চেক্ষরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাং॥

আয়ুর্ব্বেদের এই উক্তির সহিত পাশ্চত্য বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারের আপাততঃ পার্থক্য দেখা যায়, কারণ সকলেই ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারেন যে, শুক্র (Semen) অণ্ডকোষের cell হইতে উৎপন্ন হয়। এই শুক্রে Prostrate Gland, Cowper's gland প্রভৃতি Glandএর নির্য্যাস (Secretion) মিশ্রিত থাকে। তাহা হইলে শুক্র সর্ব্বদেহব্যাপী কিরূপে হইল? আমরা পাশ্চাত্য আবিষ্কারেই দেখিতে পাই যে, শুক্রে এক প্রকার Spermin বা testiculin নামক পদার্থ Phoshporic Acidএর সহিত মিশ্রিত হইয়া আছে। এই পদার্থ Testicleএর রসবহা শিরা এবং Veins দিয়া সর্ব্বশরীরে যায়। মুষ্ক (Testicle) যদি যথানিয়মে কার্য্য করে, এবং শুক্রক্ষরণ অত্যধিক না হয়, তাহা হইলে দেহে যে সকল পুংচিহ্ন দেখা যায়, মুষ্কবিহীন প্রাণীর সে সকল চিহ্ন ভালরূপ দেখা যায় না। একটি বলীবর্দ্দের এবং একটি মুষ্করহিত বলীবর্দ্দের (দামড়া গরু) অবয়বের অনেক পার্থক্য দেখা যায়, মুষ্কবিহীন বলীবর্দ্দ অনেকটা গাভীর মত। ইহাদের ককুৎ প্রভৃতি পুংচিহ্ন হয় না। সাহসেও ইহাদের অনেক হীনতা দৃষ্ট হয়, মুষ্কবিহীন জন্তু প্রায়ই ভীতু। এইরূপ শুক্রক্ষয়ে মনুষ্যেরও মুষ্কহীন জন্তুর ন্যায় সাহস এবং মনের দৃঢ়তা নষ্ট হয়। অনেক দেখিয়াই ঋষিরা লিখিয়া গিয়াছেন যে, শুক্রধাতুই প্রাণ। "শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।"

আজ ভারতের উন্নতির দিকে অনেক ভারত-সন্তানের দৃষ্টি পড়িয়াছে। উন্নতির মূলভিত্তিই বীর্য্যধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য। বিদ্যার্থীদের পক্ষে এই ব্রহ্মচর্য্য একান্ত আবশ্যক। এইজন্য বিদ্যার্থীর পক্ষে মনু লিখিয়া গিয়াছেন,—

"ন রেতং স্কন্দয়েৎ বলাৎ"

বীর্য্যধারণ করিলে সকল বিষয়েই মনোনিবেশ করিবার শক্তি বাড়ে। শুক্রক্ষয়ে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হয় বলিয়া মনের চাঞ্চল্য বাড়ে, যোগ-শাস্ত্রেও এইজন্য বীর্য্যধারণের কথা ভূয়ো ভূয়ঃ লিখিয়াছেন।

মনুষ্য কায়মনোবাক্যে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিলে এই শুক্রধারণ করিবার শক্তি ভগবদনুগ্রহে অবশ্যই পাইতে পারে। ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা মনুষ্যের আর অধিক পুরুষকার কি হইতে পারে? তাঁহার প্রসাদে ইন্দ্রিয় জয় অনায়াসেই হইতে পারে।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।
৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পরমকল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

যমাদি ক্রিয়াযোগ বর্ণন।

মহাত্মাগণ যোগাঙ্গ বিষয়ে নানাপ্রকার বর্ণন করিয়াছেন। কোন কোন মতে ইহা চারি প্রকার। যথা,—ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে ছয় প্রকার। যথা, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে আট প্রকার। যথা (অষ্টাঙ্গ সাধন) যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, প্রত্যাহার এবং সমাধি। কোন কোন মতে পনের প্রকার। যথা, যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশকাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃকস্থিতি, প্রদান, সংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি। এই সকল যোগাঙ্গ বিষয়ে নানাশাস্ত্রে নিম্নলিখিত নানাপ্রকার উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—যম, অহিংসা, সত্য, অদত্ত পরদ্রব্য গ্রহণ না করা। ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ কার্য্যতঃ অভিলাষতঃ সকল প্রকার, মৈথুন এবং

অসৎপরিগ্রহ বর্জ্জন করা। এই পাঁচ প্রকার কার্য্যের নাম যম। শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, শাস্ত্রাধ্যয়ন, এবং ঈশ্বরভক্তি, এই পাঁচ প্রকারকে নিয়ম বলে। প্রাণায়ম, (রেচক পূরক ও কুম্ভক নামক ক্রিয়া) আসন, (শরীর ও মনের স্থিরতাকারক উপবেশন বিশেষ)। ইহা স্বস্তিক পদ্মবীর প্রভৃতি ৮৪ প্রকার কল্পিত আছে। শাম্ভবী, খেচরী, ইত্যাদি পঁচিশ প্রকার মুদ্রার নাম উল্লেখ আছে। কোন কোন মতে জিহ্বাকে বৃদ্ধি করিয়া তালুমূল ভেদ পূর্ব্বক ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া খেচরী মুদ্রা সিদ্ধ করিতে হয়, কোন কোন মতে জ্যোতিঃ পদার্থে দৃষ্টি স্থির করিয়া শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধ করিতে হয়। ধ্যান—অদ্বিতীয় বস্তুতে মন লীন করিবার চেষ্টা। ধারণা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সহিত অভেদ হওয়া নচেৎ ব্রহ্মকে পৃথকভাবে ধারণা হয় না। প্রত্যাহার-শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হইলে তাহাদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করা। সমাধি অর্থাৎ তীব্র একাগ্রতা ও স্বরূপে স্থিত হওয়া। ইহা দুই প্রকার, প্রথম সবিকল্প দ্বিতীয় নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় বিষয়ক জ্ঞানের লয় হয় না। অর্থাৎ ঐ তিন জ্ঞান সত্বেও ব্রহ্মাকারে চিত্তবৃত্তি বিরাজ করিতে থাকাকে সবিকল্প সমাধি বলে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের লয় হওয়ার অপেক্ষা থাকে। অর্থাৎ উক্ত বিকল্পত্রয়ের লয় হেতু জ্ঞান অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে লীন হইয়া (একীভূত হইয়া) যায়, সুতরাং একটী মাত্র যাহা তাহাই অখণ্ডাকারে অবশিষ্ট থাকে।

উক্ত যোগাঙ্গ সকলের সার মর্ম্ম এইরূপে বুঝিয়া লইবেন। যোগ শব্দে একই বস্তু, কারণ কার্য্যভাবে যদ্যপি দুই হয়, পরে পুনর্ব্বার এক হওনের নাম যোগ। যোগাঙ্গ শব্দের সার ভাব এই যে, জীব ও পরমাত্মা কার্য্য কারণ হেতু পৃথক বোধ হইতেছে না, বস্তুতঃ পদার্থ একই। এই প্রকার জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃ স্বরূপের নিরাকার সাকার অখণ্ডভাব পারিজ্ঞাত হওয়ার নাম যোগ। এবং পৃথিবী জলাদি যে তাহার অঙ্গরূপে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছে, ইহাকে যোগাঙ্গ বলে। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, সূর্য্যনারায়ণ ও অহঙ্কার লইয়া আটটী বোধ হওয়াকে অষ্টাঙ্গ যোগ বলে। এবং বিচারাদি দ্বারা পৃথক পৃথক ভাব গ্রহণ না করিয়া পূর্ণপরব্রহ্মই একমাত্র আছেন। এই প্রকার বোধকে পূর্ণযোগ ও অষ্টসিদ্ধি বলে। রাজা প্রজা আপনারা এই সকল সিদ্ধাসিদ্ধির বিষয়

মনে করিয়া—ভীত বা আশ্চর্য্য হইও না, সমস্তই পরমাত্মার লীলা। তিনি যখন যাহা দ্বারা যে কার্য্য করিয়া লইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার দ্বারায় সেই কার্য্য করিয়া লন। সমস্ত তাঁহার আয়ত্বাধীন, অন্য কাহার কিছু করিবার সামর্থ্য নাই। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মা নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণভাবে থাকিয়া, তোমাদিগের সম্মুখে প্রকাশমান রহিয়াছেন। ইঁহি সর্ব্বদুঃখ ও ত্রিতাপমোচনকারী, ইহার শরণাগত হও। তোমাদিগের চিন্তা বা ভাবনা কি? তোমাদিগের কিসের অভাব? কেবল তাঁহাকে না জানিয়া, তাঁহা হইতে বিমুখ হইয়া, নানা প্রকার কল্পিতভ্রমে অন্ধ হইয়া, কষ্ট পাইতেছ। এক্ষণ হইতে শান্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ধীরভাবে তোমাদিগের প্রত্যক্ষ মাতা পিতা আত্মা পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ গুরুর প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা কর এবং সৎগুরুভাবে ওঁকার জপ কর এবং তাঁহাতে নিষ্ঠা রাখ, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং তোমাদিগের সকল অভাব পূর্ণ করিবেন এবং আপনাতে লয় করিয়া, অখণ্ডরূপে পূর্ণভাবে প্রকাশমান হইবেন। তোমাদিগের আর কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে হইবে না। যেমন,—ক্রোড়স্থ শিশুর নিজ সুখ-স্বচ্ছন্দের কোন চেষ্টা নাই, কিন্তু তাহার স্নেহময়ী মাতা তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্য সদা ব্যাকুল হইয়া, চেষ্টা করিয়া থাকেন। শিশু শব্দে রাজা প্রজা এবং মাতা শব্দে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে জানিও। যোগ বিষয়ে যে তোমাদিগের নানাপ্রকার ভ্রম আছে, তাহা কিরূপে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ লয় করিয়া দিবেন, তাহার প্রমাণ। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে নানা ব্যক্তি নানাপ্রকারে স্বপ্ন দেখে এবং যোগ করে, অর্থাৎ "আমি যোগ করিতেছি" ইহা বোধ হইয়া থাকে, কিন্তু যখন জাগ্রত হয়, তখন সকল স্বপ্নের অবস্থা ও যোগ লয় হইয়া যায়, তখন আপনিই থাকে। এইরূপে নানা অজ্ঞান, ভ্রমযোগ, ইত্যাদি কল্পিত চিন্তাকে পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা ভস্ম করিয়া তোমাদিগকে আপনাতে সর্ব্বদা অদ্বৈত আনন্দ ভাবে রাখিবেন। এক্ষণে আর নানাপ্রকার ভ্রমে পতিত হইও না। যে ধাতু দ্বারা যে ব্যবহার ও পারমার্থিক কার্য্য সিদ্ধ হয়, সেই ধাতু দ্বারা সেই কার্য্য নিষ্পন্ন কর ও পূর্ণপরব্রহ্ম গুরুতে নিষ্ঠাভক্তি রাখ। তাহা হইলেই সহজে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য্য সিদ্ধ হইবেক।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির সর্ব্বসার সাধন।

রাজা প্রজার সর্ব্বদা চিন্তা করা বিশেষ আবশ্যক যে, আমি কে? এবং আমার স্বরূপ কি? এবং পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মা গুরু মাতা-পিতার কি স্বরূপ? এবং আমি কি স্বরূপ হইয়া কোন স্বরূপের উপাসনা ও ধ্যান ধারণা করিব? এতদিন আমি কোথায় ছিলাম, কোথা হইতে আসিয়াছি, এবং কোথায় যাইব? আমার কি করা কর্ত্তব্য? কি করিলে ব্যাবহার ও পরমার্থ কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা করিতে পারা যায়? যাহাতে আমরা সর্ব্বদা সকল বিষয় সুখ-স্বচ্ছন্দে আনন্দরূপে থাকিতে পারি। রাজা, প্রজা, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলেরই সর্ব্বদা নম্রভাবে এইরূপ প্রার্থনা করিবেন—হে পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা, যদ্যপি আমরা ব্যবহার কার্য্যে ব্যাকুল হইয়া আপনাকে বিস্মৃত হই, তথাপি আপনি নিজগুণে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না। হে অন্তর্যামী গুরো! আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রয়োগ করুন, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা আপনাতে মগ্ন থাকিতে পারি। এইপ্রকার প্রার্থনা এবং ওঁকার মন্ত্র গুরুভাবে জপ ও পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্য-নারায়ণকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উপাসনা ও প্রণাম করিবে। তাহা হইলে সহজেই কার্য্যসিদ্ধ হইবে। অকপটভাবে পরমাত্মার উপাসনা করিলে শীঘ্রই পরমাত্মা কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, ইহা নিশ্চয় জানিও।

মঙ্গল বিধি।

মঙ্গলময় পরমাত্মায় বিমুখ হইয়া রাজা, প্রজা, জীবজন্তু সকলেই নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিতেছেন। পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরুমাতা পিতাতে নিষ্ঠা না রাখা এবং ইহার আজ্ঞানুসারে না চলাই এই দুঃখের কারণ। জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কেহই নাই, যিনি এই জগতের দুঃখমোচন করিবেন। যদি সমস্ত জগদ্বাসী একত্র হইয়া কাহারও বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি পরমাত্মা তাহার সহায় থাকিলে, তাহার একটি লোম পর্য্যন্ত কাঁপাইতে পারিবে না। যদি পরমাত্মা কাহারও বিপক্ষ হন, তাহা হইলে সমস্ত জগদ্বাসী তাহার স্বপক্ষ

হইলেও কেহই তাহাকে রক্ষা করিতে পারিবেক না।

আপনারা মঙ্গলপ্রার্থী হন, তাহা হইলে আপনাদিগের সম্মুখে জ্যোতিঃরূপে দিবারাত্রি প্রকাশিত আছেন, সকলে মিলিত হইয়া ভাবে ইহাঁর নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করুন। অগ্নিব্রহ্মে সুগন্ধ, সুস্বাদু ফলমূল, অন্নাদি ও ঘৃত দ্বারা হোম করুন। সকলকে আপনার আত্মা জানিয়া, বিবস্ত্রকে বস্ত্র, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন, পিপাসুকে জল, দরিদ্রকে অর্থ, রোগীকে ঔষধ, অজ্ঞানীকে জ্ঞান প্রদান করুন। এবং সকল প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চ হইতে দূরে থাকুন। একমাত্র পরমাত্মা জগত মাতা গুরু ব্যতীত কাহারও অস্তিত্ব কল্পনা করিও না। একমাত্র পরমাত্মারই জয়গান কর, সত্য মনে, সত্য বল, সত্য ব্যবহার কর, তাহা হইলেই সহজে পরমাত্মার কৃপায় জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে। কেহ কোন বিষয়ে কষ্ট পাইবেক না, নচেৎ অসত্য নিষ্ঠা রাখিলে, স্বার্থের জন্য মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিলে কিম্বা মানের নিমিত্ত সত্যকে ত্যাগ করিয়া পক্ষপাত বশতঃ অসত্যকে সত্য বলিয়া ধারণ করিলে ও করাইলে, জগতের কেবল অমঙ্গলই হইয়া থাকে, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে, এবং যাহারা ধর্ম্ম, কর্ম্ম আদির বিষয় যথার্থত পরিজ্ঞাত না হইয়া, অভিজ্ঞতা ভাণ দর্শাইয়া লোকদিগকে অসৎ দিকে লইয়া যায়, তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী হইতে হয়। রাজা জমিদার-দিগের উচিত, এই সকল অমঙ্গকারী ব্যক্তিদিগকে অন্যায় কার্য্য সকল করিতে নিবারণ করা, যাহাতে জগৎ হইতে মিথ্যা প্রপঞ্চ উঠিয়া সত্যের আলোকে জগৎ সতত উজ্জ্বলিত হইয়া থাকে, তাহার অনুষ্ঠান করা, তাহা হইলে জগতের অমঙ্গলকর মহামারি, রোগ, শোক, অনাবৃষ্টি, অতি-বৃষ্টি, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, অকালমৃত্যু প্রভৃতি থাকিবে না, সকলে সুখস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবেক।

বিচার ও আচার।

যাহা দ্বারা বা যাহা করিলে যে কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হয়, বুদ্ধি দ্বারা তাহা স্থির করাকে বিচার বলে, সেই বিচারানুসারে কার্য্য করাকে আচার বলে। বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাই একমাত্র সত্য ও জগৎ ক্ষণস্থায়ী, ইহা নির্দ্ধারণ করাকে বিচার, এবং সত্য স্বরূপ পরমাত্মাকে ভক্তিশ্রদ্ধা পূর্ব্বক উপাসনা

মণীয় পদার্থ সকলের মধ্যে থাকিয়া ও জলস্থিত পদ্মপত্রের রাজা প্রভৃত নির্লিপ্ত থাকার নাম আচার জানিবে, এবং কি করিলে ইহ এবং পারমার্থিক কার্য্য উত্তমরূপে সিদ্ধ হইবে, তাহা বোধ করাকে মাত্মা এবং ইহা অবগত হইয়া কার্য্যকরাকে আচার বলে। যেমন অন্ধকারে ঘরের কোন পদার্থ দেখা যায় না, অগ্নিপ্রজ্জ্বালিত করিলে দেখা যায়, এই প্রকার স্থির করাকে বিচার এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া অন্ধকার দূর করাকে আচার বলে। এই প্রকার হৃদয়রূপ গৃহ মান, অপমান, জয় পরাজয়, দ্বেষ, হিংসা, কাম, ক্রোধাদি নানাপ্রকার বাসনা, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। জ্ঞানরূপ পরমাত্মা দ্বারা এই অন্ধকার দূর হইবে, স্থির করার নাম বিচার, এবং পরমাত্মার উপাসনার দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখা, মান, অপমান হইতে অতীত হইয়া পরমানন্দে থাকার নাম আচার। নচেৎ অহঙ্কার প্রযুক্ত কেবলমাত্র এই সব শরীর সর্ব্বদা ধৌত করা প্রভৃতি কার্য্যকে আচার বা বিচার বলেন।

বরং উহাকে অনাচার ও অবিচার বলে। শাস্ত্রকারদিগের উদ্দেশ্য, যাহাতে অন্তর বাহির সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকে, কোনপ্রকার রোগ না হয়, ইহা সকলের করা কর্ত্তব্য। নচেৎ একবিন্দু জল লাগিলে স্নানাদি করিয়া রোগগ্রস্ত হওয়া জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশ্য নহে। বিচার দ্বারা সত্য অসত্য, উচিত অনুচিত স্থির না করিয়া যথেচ্ছাচার করায়, মনুষ্যগণ নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিতেছে। যাহাতে বিচার পূর্ব্বক সত্য আচরণ করিয়া সুখী হও, তাহার চেষ্টা কর।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ শিবনারায়ণ স্বামী।

বিপিনবাসিনী।

ষষ্ঠ পল্লব।

বনে থাকা চলে না!

তিন মাস অতীত হইল। হরেন্দ্রকুমারের কোনও সংবাদ আসিল না। বনবালা কাঁদে, ঘরের কাজ কর্ম্ম করে, ভিক্ষা করে, রন্ধন করে, পিসীমাকে খাওয়ায়, নিজে কোনও দিন কিছু খায়, কোনও দিন কিছু খায় না, পূর্ব্বের মত দিন দিন ছাগল চরায়। সকল কার্য্যেই বনবালা কাঁদে;—ঘরে বসিয়াও কাঁদে, বনে আসিয়াও কাঁদে।

বিধাতাকে লোকে দয়াময় বলে। বিধাতার বিচার—বিধাতার খেলা। সকল খেলাতে দয়ার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বনবালা বিধাতার দয়ার পাত্রী, বিধাতা কিন্তু বনবালার প্রতি নির্দ্দয়। বনবালা গর্ভবতী! বিধাতার ইচ্ছা না থাকিলে এমন ঘটনা হয় না। বিধাতার ইচ্ছাতেই বনবালা গর্ভবতী!

গর্ভ হইল, সন্তান হইবে, ইহা ত আহ্লাদের কথা; আহ্লাদের ঘটনায় বিধাতাকে নির্দ্দয় বলা অজ্ঞানের কার্য্য। তর্কমুখে একথা স্বীকার্য্য, পাঠক মহাশয় এই অবস্থার আনুসঙ্গিক আর গুটিকতক কথা শ্রবণ করুন, শুনিয়া শুনিয়া বিচার করিবেন, বিচার করিয়া বলিবেন, বনবালার ভাগ্যে বিধাতা সদয় কি নির্দ্দয়।

পিসীমার ভরণপোষণের নিমিত্ত, নিজের ক্ষুদ্র উদরটিকে পোষণ করিবার নিমিত্ত, নিত্য প্রভাতে নিকটবর্ত্তী গ্রামে বনবালা ভিক্ষা করিতে যাইত। পূর্ব্বে যাহারা বনবালাকে ভালবাসিত, বুনীদিদি বলিয়া আদর করিত, করুণাবশে যাহারা বনবালাকে প্রতিদিন তণ্ডুলাদি প্রদান করিত, বনবালার গর্ভ লক্ষণ দেখিয়া তাহারা বনবালাকে অসতী মনে করিল; পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, "ছুঁড়ীকে এতদিন ভাল বোধ ছিল, গরীব বলিয়া দয়া করা যাইত, ওমা! সেই ছুঁড়ীর এই কীর্ত্তি! ছুঁড়ীটাকে আর বাড়ীর ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে দেওয়া হইবে না।"

গোপনে কেবল বলাবলি করা নয়, কথার কথা, কথামাত্রেই পর্য্যবসিত নয়, গ্রামবাসিনী ভদ্রকুলের গৃহিণী-ঠাকুরাণীরা কাজেও সেইরূপ নির্দ্দয়তা

দেখাইলেন; বনবালা ভিক্ষা করিতে যাইলে তাঁহারা তাহাকে ঝাঁটা লাথী দেখাইয়া, দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। পাঁচ সাত দিন পাঁচ সাত বাড়ীতে এইরূপে তাড়িতা হইয়া, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে বনবালা শূন্যহস্তে ঘরে আসিত, কাঁদিতে কাঁদিতে উপবাস করিত, কাঁদিতে কাঁদিতে পিসীমাকে দুইবেলা একটু একটু দুগ্ধ খাওয়াইত, পিসীমা বাঁচিয়া থাকিলেই যেন সৃষ্টিরক্ষা হইবে, স্নেহবৎসলা বনবালা যেন ইহাই ভাবিত। উপবাসে উপবাসে অভাগিনী দিন দিন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, শুষ্ক শরীরখানি আরও শুকাইয়া গেল। অভাগিনী আর ছাগল চরাইতে যাইতে পারিত না।

প্রকৃতিদেবীর অনেক প্রকার চমৎকার চমৎকার লীলাখেলা আছে। প্রথম গর্ভ হইলে তরুণী গর্ভবতীরা এক নূতন আনন্দে উৎফুল্লা হয়, নূতন খোকা হইবে, কোলে শুইবে, মা বলিয়া ডাকিবে, অপূর্ব্ব আনন্দ! বিরহে, কষ্টে, উপবাসে ক্লিষ্টা হইলেও, প্রকৃতি প্রণীত সেইরূপ আনন্দ বনবালার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইল। ক্রমাগত উপবাসে শরীর শুষ্ক হইলে গর্ভস্থ শিশু হয় ত বাঁচিবে না, সেই আশঙ্কায় বনবালা নিত্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ দিন যাইতেছে, ক্রমশঃ মাস যাইতেছে, বনবালার গর্ভকাল পাঁচ মাস। আবার দেখুন, নির্দ্দয় বিধাতার আর একটি নিষ্ঠুর ক্রীড়া! এই দুঃসময়ে পিসীমা একরাত্রে বিছানার উপর হঠাৎ মরিয়া রহিয়াছে, প্রভাতে বনবালা সেই মৃতদেহ দেখিল। শোকের উপর, দুঃখের উপর, বিরহের উপর অকস্মাৎ মহাশোক। বনবালার শোক প্রকাশের সম্বল কেবল চক্ষের জল; অচলার ন্যায় দাঁড়াইয়া বনবালা ক্ষণকাল অবিরল ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিল; চীৎকার করিয়া কাঁদিবার শক্তি নাই, চীৎকার করিতে পারিল না; ক্ষণেকের মধ্যে, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া যেন পেট ফুলিয়া উঠিল। আবার যেন অভাগিনীর কাণের কাছে বিধাতা প্রেরিতা প্রকৃতির নূতন উপদেশ। হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া পেট ফুলাইলে পাছে গর্ভস্থ শিশুর কোনও অমঙ্গল হয়, সেই শঙ্কায় বনবালা অশ্রু সম্বরণ করিল, গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল, মৃতদেহ ঘরের ভিতর পড়িয়া থাকিলে শেষকালের সৎক্রিয়া হইবে না, আপনিও সে কার্য্য সাধন করিতে কৃতকার্য্য হইবে না, কি হয়?—বনবালা ভাবিতে লাগিল। বনে লোকালয় নাই, নিকটে সেই

গ্রাম আছে, গ্রামে কিন্তু প্রবেশ করিতে বনবালার এখন ভয় হয়, লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়; ভদ্রকুলাঙ্গনারা তাহাকে কলঙ্কিনী ভাবিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন, শবদাহের সাহায্যের নিমিত্ত কোন্ মুখে আবার তাহাদের দ্বারস্থ হইবে, ইহাই বনবালার ভাবনার কথা।

বাহিরে দাঁড়াইয়া একবার মুখ ফিরাইয়া ঘরের ভিতর দিকে চাহিয়া, বনবালা আবার ভাবিল, যেদিকে কায়স্থ ব্রাহ্মণের বাস, সেদিকে আর যাইবে না; গ্রামের নবশাখ জাতির মধ্যে অনেকে তাহাকে ভালবাসিত, গর্ভের কথা জানিতে পারিয়াও, এখনও কেহ কেহ ভালবাসে; এখনও তাহারা আদর করিয়া 'বুনীদিদি' বলে, বনবালা তাহার প্রমাণ পাইয়াছে। এক মাস পূর্ব্বে সেই গ্রামের গোপজাতীয় দুটি লোক গোবৎস কিনিবার নিমিত্ত বনবালার পিসীর কাছে আসিয়াছিল, বনবালাকে দেখিয়া তাহারা, উত্তর পাইবার আশা না থাকিলেও, বুনীদিদি বলিয়া ডাকিয়াছিল, গর্ভ দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল, শুষ্কমুখ দেখিয়া ইসারা করিয়া, সদয় ভাব জানাইয়া ছিল; বৎস্যটির মূল্য ছিল এক টাকা, গোপেরা সেই একটি টাকা দিয়া, বুনীদিদিকে আরও চারি আনা পয়সা দান করিয়া গিয়াছিল। সেই প্রমাণে বুনীদিদি মনে করে, এখনও কেহ কেহ তাহাকে ভালবাসে। তখনও বুনীদিদি তাহাই মনে করিল; যত শীঘ্র চলিবার শক্তি ছিল, তত শীঘ্র চলিয়া সেই গ্রামে উপস্থিত হইল; ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা না হয়, সেই উদ্দেশে ভদ্রপল্লীর অন্যদিক্ দিয়া ঘুরিয়া গেল; বুনীদিদি কোন্ জাতি, গ্রামের কেহ তাহা জানিত না, বুনীদিদি কিন্তু সর্ব্বাগ্রে গোয়ালাবাড়ীতে প্রবেশ করিল; একজন গোপের সহিত সাক্ষাৎ হইল; বক্ষে, মুখে, হস্তে, তিন রকম ইসারা করিয়া, মনের ভাব, মনের কথা, উপস্থিত ঘটনা, উপস্থিত কার্য্য, তখনকার প্রয়োজন, সমস্তই সেই গোপটিকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল। গোপটির নাম রামগোপাল ঘোষ; বনবালার অভিপ্রায় বুঝিয়া, রামগোপাল তাহার এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, বনবালার সঙ্গে বনবালার বাড়ীতে গেল; উপযুক্ত স্থানে পিসীমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিল; বনবালা একটা বড় দায় হইতে মুক্ত হইল।

শ্মশানক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর রামগোপাল ঘোষ ভ্রাতুষ্পুত্র সহ পুনরায় বনবালার সঙ্গে বনবালার পর্ণকুটীরে ফিরিয়া আসিল। স্বহস্তে গাভীদোহন করিয়া রামগোপাল সস্নেহে একপাত্র দুগ্ধ বনবালাকে পান করাইল, সেরূপ

অবস্থায় তাহাদিগকেও কিছু মুখে দিতে হয়, তাহারাও এক চুমুক দুগ্ধ পান করিল।

আবার বনবালার ইসারা। একবার ঘরের দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত, যে ঘরখানিতে ছাগল গরু থাকে, সে ঘরের দিকেও একবার অঙ্গুলী সঙ্কেত, আকাশের সূর্য্যের দিকে একবার অঙ্গুলী সঙ্কেত, শেষকালে নিজের বুকের দিকে একবার অঙ্গুলী সঙ্কেত।

সব সঙ্কেতগুলির মর্ম্ম রামগোপাল বুঝিল। বনবালা বনের ঐ ঘর দুখানি বেচিবে, ছাগল গরু বেচিবে, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে চলিয়া যাইবে, বনবালার সঙ্কেতগুলি তাহাই বুঝাইল। কালের ধর্ম্ম কেমন! গোবেচেরা ভাল মানুষকে ঠকাইবার সুবিধা পাইলে অনেক লোক আনন্দ প্রকাশ করে; রামগোপাল ছোট একটা "দাঁও" মারিবে মনে করিল, গাভী জোড়াটীর প্রকৃত মূল্য অতি কম পঞ্চাশ টাকা, একটি বৎস্তের মূল্য অতি কম দশ বার টাকা, ছাগলগুলির মূল্য কম বেশ চল্লিশ টাকা, ঘর দুখানির মূল্য ন্যূনকল্পে পঁচিশ টাকা, সর্ব্বশুদ্ধ এই ১২৫৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি রামগোপাল তৎপর দিন হাসিতে হাসিতে বনবালার হস্তে পাঁচটি টাকা দিয়া অধিকার করিল; বনবালাকে তাড়াইয়া দিল না, বনবালা একাকিনী সেই বড় ঘরখানিতে থাকিতে পাইল।

আহারের সংস্থান নাই, গাভী বৎস্ত চলিয়া গিয়াছে, প্রাণধারণের ভরসা ছিল দুগ্ধটুকু, তাহাও নাই, ক'দিন আর গর্ভবতী বনবালা সেই বিজন কুটীরে বাস করিতে পারে? বনবালা পলায়নের চেষ্টা করিল।

পূর্ব্বে বলা আছে, পিসীমার সঞ্চিত সম্বল ছিল তিন টাকা দশ আনা, বনবালা সেই সম্বলের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী; ঐ তিন টাকা দশ আনা আর সম্পত্তির মূল্য পাঁচ টাকা, একুনে এই আট টাকা দশ আনা বনবালার পলায়নের সম্বল হইল; তিন রাত্রি সেই কুটীর মধ্যে একাকিনী উপবাসে বাস করিয়া, তৃতীয় রজনী অবসানে বনবালা সেই বনভূমি পরিত্যাগ করিল।

নগদ টাকা পয়সা ব্যতীত বনবালার সঙ্গে আর কি কি জিনিষ রহিল, তাহা এইখানে বলিয়া রাখিতে হইবে। বিবাহের অগ্রে হরেন্দ্রকুমার বনের ঘাটে বনবালাকে দুইখানি বস্ত্র, একছড়া কণ্ঠমালা আর দু'গাছি বালা দিয়াছিলেন, একখানি বস্ত্র মলিন হইয়াছিল, একখানি ফরসা ছিল; পরিধানে ময়লা কাপড়, কক্ষে ফরসা কাপড়; বালা আর কণ্ঠমালা অঙ্গ হইতে

উন্মোচন করিয়া, নগদ টাকা পয়সা পরিহিত বস্ত্রের অঞ্চলের এক-কোণে বাঁধিয়া লইল, অঞ্চলের অপর কোণে আর একটি কি জিনিষ বাঁধা রহিল, জানিতে হইবে। বিবাহের সময় বংশীবট পত্রিকার ন্যায় সেই যে এক অভিনব বৃক্ষপত্রে হরেন্দ্রকুমার আপন নাম ধাম লিখিয়া দিয়াছিলেন, অঞ্চলের অপর খুঁটে সেই পত্রখানি।

উষাকালে উঠিয়া বনবালা, বনসীমা পার হইল, জনপ্রাণীর সঙ্গে দেখা হইল না; যেদিকে নগর, সেদিকেও বনবালা গেল না, নগরপ্রান্তের বিজন পথ বাহিয়া, ক্রমে ক্রমে কামদেবপুরের সীমা ছাড়াইয়া পড়িল। পাঁচ মাস গর্ভবতী, প্রখর সূর্য্যতাপ, পথে উত্তপ্ত বালুকা, উদরে অন্ন জল নাই, দারুণ দুঃখভারে হৃদয় অত্যন্ত ভারী, দুঃখিনী গর্ভিনী আর বেশীদূর চলিতে পারিল না; আজন্ম বনবাসিনী, বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহরের সময় বনবালা আর একটা বনপ্রান্তে উপস্থিত হইল, সেটা নিবিড় বন নয়, স্থানে স্থানে বৃক্ষ, পথের ধারে ধারে কতকগুলি বৃক্ষশ্রেণী; অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া বনবালা পথের ধারে এক বৃক্ষছায়ায় শয়ন করিল, শয়ন মাত্রই ঘুমাইয়া পড়িল; যখন জাগিল, তখন প্রায় সন্ধ্যা! অনাথিনী অঞ্চলে হস্ত দিয়া দেখিল, যে খোঁটে সেই টাকা গহনা বাঁধা ছিল, তাহা নিদ্রিতাবস্থায় কোন্ পাষণ্ড সেই খুঁট খুলিয়া দুঃখিনীর সঞ্চিত ধনগুলি লইয়া পলায়ন করিয়াছে! বনবালা চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিল।

সপ্তম পল্লব।

ব্রাহ্মণের বাড়ী।

অনাথিনী গর্ভবতী এইরূপে নিঃসম্বল হইয়া, এই সন্ধ্যাকালে এখন যায় কোথা? কথা নাই, মানুষকে জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু জানিবে, বনবালার সে ভরসাও ছিল না। এ অবস্থায় বনবালা এখন যায় কোথা?

আঁচলের খুঁটে হস্তার্পণ করিয়া, বনবালা আবার অশ্রুবর্ষণ করিল। যে খুঁটে টাকা গহনা বাঁধা ছিল, সে খুঁট খোলা, জিনিষগুলি কিছুই নাই! যে খুঁটে সেই বৃক্ষপত্রটি বাঁধা ছিল, সে খুঁটে ত তাহা আছে। কিঞ্চিৎ ভরসার স্থল বটে।

আবার বনবালা কি দেখিল? দেখিল, তাহার সেই ফরসা কাপড়-খানি নাই! কাপড়খানি পার্শ্বে রাখিয়া, অবলা গর্ভবতী অলসাঙ্গে সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়াছিল, টাকা-চোর সেই কাপড়খানিও লইয়া গিয়াছে!

সব গেল! এদিকে অন্ধকার হয়, আর বিলম্ব নাই, দুঃখিনীর নূতন দুঃখ প্রাণে সহিবে না বলিয়া, দীননাথ অনেকক্ষণ পলায়ন করিয়াছেন, আর কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে অন্ধকারে পথ দেখা যাইবে না, অভাগিনী তখন অচেনা পথে দাঁড়াইয়া কি করিবে?

বাক্‌শক্তি ছিল না, শ্রবণশক্তি ছিল না, কিন্তু বনবালার বুদ্ধি ছিল; এক স্থানে দাঁড়াইয়া, চক্ষের জল ফেলিয়া, বৃথা চিন্তা না করিয়া, একটু একটু আলো থাকিতে থাকিতে, বনবালা সম্মুখের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। গতি উত্তর দিকে।

এক রশী পথ যাইতে না যাইতেই অন্ধকার;—আর পা চলে না;—চলাও ভাল নয়। বনবালা তবে এখন করে কি? নিরুপায়ের উপায় হরি, দয়াময় হরি সেই সময় একটি উপায় দেখাইয়া দিলেন। পথের বামদিকে একখানি বাড়ী। মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা পাঁচখানি চালাঘর। প্রাচীরগুলি দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ীর বাহিরে উত্তরদিকে একখানি চণ্ডীমণ্ডপ, সম্মুখে প্রশস্ত দূর্ব্বাক্ষেত্র, দক্ষিণদিকের পূর্ব্বকোণে একটি, আর পশ্চিম কোণে একটি নারিকেল বৃক্ষ, দূর্ব্বাক্ষেত্রের পূর্ব্বসীমায় সারি সারি গুটিকতক কামিনীফুলের গাছ। সে মহলে প্রাচীর দেওয়া ছিল না।

বনবালা ধীরে ধীরে সেই দূর্ব্বাক্ষেত্র পার হইয়া, প্রাচীরের দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা উদার মুক্ত ছিল, বনবালা সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। সন্ধ্যাকালে বাড়ীর উঠানে এক স্ত্রীলোক, বাড়ীর তিনটি স্ত্রীলোক তাহাকে দেখিয়া দ্রুতপদে সেইদিকে আসিতে লাগিল, একজনের হস্তে একটি প্রদীপ। যিনি গৃহিণী, তিনি একটু দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে গা?"

উত্তর নাই। নিকটে আসিয়া, মুখের কাছে প্রদীপ ধরিয়া, স্ত্রীলোকেরা বনবালার মুখ দেখিল, চিনিতে পারিল না। চেহারাতে বনবালা অসুন্দরী ছিল না, বেহাল থাকিলেও সে চেহারা দেখিবামাত্র মনে হইত, কায়স্থ ব্রাহ্মণের ঘরের কন্যা। কৃশাঙ্গী মলিনবসনা, সাশ্রুনয়না যুবতী গর্ভবতী।

গৃহিণী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা তুমি? কোথা থেকে আস্‌ছো?"

উত্তর নাই। বনবালা সেইসময় অঞ্চল হইতে সেই বৃক্ষপত্রটি খুলিয়া গৃহিণীকে দেখাইল; গৃহিণী সেইটী হাতে করিয়া লইয়া দেখিলেন লোক দিয়া গুটিকতক অক্ষর লেখা আছে; লেখাপড়া জানিতেন জন্য কয়েক-পারিলেন না, অবাক্ হইয়া বনবালার মুখ দেখিলেন, গ ইয়া দিলেন। দুটী স্ত্রীলোক ছিল, তাহারা গৃহিণীর পুত্রবধূ। একটি বধূ ধর্ম্মনিষ্ঠ দ্বিতীয় ভাগ বর্ণপরিচয় সমাপ্ত করিয়া, মদনমোহন তর্কলঙ্কারের তৃতীয় শিশুশিক্ষা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিল, শাশুড়ীর হস্ত হইতে পত্রিকাখানি লইয়া প্রদীপের নিকটে ধরিয়া, সেই বধূমাতা দেখিলেন; তিনিও সকল অক্ষর বুঝিতে পারিলেন না।

বধূমাতার হস্ত হইতে পত্রিকাখানি পুনঃ গ্রহণ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আচ্ছা, থাকুক, ছেলেরা আসিলে দেখাইব। এখন এই মেয়েটীকে তোমরা তোমাদের ঘরে লইয়া গিয়া, কাপড় ছাড়াইয়া অগ্রে কিছু খাইতে দাও, তাহার পর বৃত্তান্ত জানা যাইবে।"

তাহাই হইল। দুঃখিনীকে কিছু আহার করাইয়া বধূ দুটি তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, একটি কথারও উত্তর পাইলেন না; গৃহিণীও সেই ঘরে আসিলেন, তিনিও পাঁচ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর পাইলেন না। বনবালা অশ্রুমুখী। হস্তে নয়নে দুই এক প্রকার ইঙ্গিত।

ভাবভঙ্গী দেখিয়া গৃহিণী শেষকালে স্থির করিলেন, মেয়েটি বোবা। বোবাকে বারবার বৃথা প্রশ্ন করা নিষ্ফল, অথচ পথশ্রান্তিতে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, বিশ্রাম করিতে দেওয়া আবশ্যক; একটি পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করিবার ইঙ্গিত করিয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী অন্য কার্য্যে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন; বনবালা, শয়ন করিল, বধূ দুটী তাহার নিকটে বসিয়া রহিলেন।

বাড়ীখানি ব্রাহ্মণের বাড়ী। কর্ত্তার নাম রামসেবক ভট্টাচার্য্য; তিনি বর্ত্তমান আছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী ঠাকুরাণী সংসারের লক্ষ্মী স্বরূপিনী; তাঁহার গর্ভে দুটী পুত্র আর একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম প্রসাদকুমার, বয়স প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম হরপ্রসাদ, বয়স অনুমান বাইশ বৎসর; কন্যাটির নাম প্রসাদকুমারী, বয়স প্রায়

সপ্তদশ বর্ষ। ...করের প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া সন্তান হইয়াছিল, সেই কারণে সন্তানগুলি! কাপ... প্রসাদের যোগ। প্রসাদকুমারী শ্বশুরালয়ে আছে, ...তলে শয়ন ক... আর ঐ দুটী পুত্রবধূ। দুটী পুত্রেরই বিবাহ হইয়াছে, গিয়াছে!

সব গেল! এদিকে... র প্রসাদকুমার বাড়ী আসিলেন, অন্য কথার অগ্রে দুঃখ প্রাণে সহিবে... না যুবতীর হঠাৎ আগমনের কথা তুলিয়া, বনবালা প্রদত্ত আর কিঞ্চিৎ ...টা প্রসাদকুমারকে দেখাইলেন; প্রসাদকুমার পাঠ করিলেন, তথন অ...

...হরেন্দ্রকুমার মিত্র, রঘুনাথপুর, হুগলী।"

প্রসাদকুমার জননীর সঙ্গে গিয়া বনবালাকে দেখিলেন, বনবালা ঘোমটা দিতে জানে না, ঘোমটা দিল না। মুখ দেখিয়া প্রসাদকুমারও স্থির করিলেন, ভদ্রলোকের কন্যা। জননীর মুখে বৃত্তান্ত শুনিয়া, নিজেও দুটী তিনটী প্রশ্ন করিয়া, তিনিও বুঝিলেন, এ মেয়েটী বোবা।

আর কিঞ্চিৎ পরে পিতার সহিত হরপ্রসাদ প্রত্যাগত হইলেন, তাঁহারাও সকল কথা শুনিলেন; তাঁহারাও বনবালাকে দেখিলেন; তাঁহারাও স্থির করিলেন, ভদ্রঘরের কন্যা, দুঃখিনী বোবা।

রামসেবক ভট্টাচার্য্য কৃষ্ণভক্ত ধার্ম্মিক লোক; হরিনাম জপ, হরিগুণ গান, হরিভক্তি গুণ-গাঁথা শ্রবণ, পবিত্র ভাবে যথাশক্তি ধর্ম্মাচরণ এবং অতিথি অভ্যাগতের সেবায় তাঁহার একান্ত নিষ্ঠা, শরণাগতকে—নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে, পথশ্রান্ত পথিককে আশ্রয় দান করা তাঁহার জীবনের এক মহৎ ব্রত। সযত্নে বনবালাকে গৃহে স্থান দান করিয়া আপন পরিবারের ন্যায় প্রতিপালন করা তিনি অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞান করিলেন; অকপট হরিভক্তের দয়ার কার্য্যই এইরূপ। তিনি স্বয়ং যাহা অবশ্য কর্ত্তব্যজ্ঞান করিলেন, ধর্ম্মশীলা সহধর্ম্মিণীকে আর পুত্র দুটীকে সেইরূপে তাহা পালন করিতে আজ্ঞা দিলেন। বনবালা পরমাদরে সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রহিল।

রামসেবক ভট্টাচার্য্য নিতান্ত নিষ্ঠুর লোক ছিলেন না; তাঁহার পৈত্রিক নিস্কর ভূমীর বার্ষিক উপস্বত্ব প্রায় আটশত টাকা; তদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে তাঁহার অনেকগুলি ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিল, শিষ্যমহলেও বৎসর বৎসর তিন চারিশত টাকা আয় হইত; নানাস্থানে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ শান্তি ও পুরাণ পাঠাদি উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াও তিনি উচ্চ উচ্চ বিদায়প্রাপ্ত হইতেন, সংসারে কোনও প্রকার অস্বচ্ছলতা ছিল না।

আর একটী পরিচয় আবশ্যক। রামসেবক এদিকে হরিভক্ত হইলেও বাড়ীতে প্রতি বৎসর কালীপূজা হয়, রাস, দোল, জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্ব্বেও সম্ভবমত উৎসব হয়, গ্রামের সকলে তাঁহাকে একজন ক্রিয়াবান লোক বলিয়া জানে; সকলের কাছে তাঁহার সম্মানও যথেষ্ট।

সেই বাড়ীতে বনবালা রহিল। গৃহিণী ঠাকুরাণী বনবালার জন্য কয়েকখানি বস্ত্র, আর অল্পমূল্যের দুই তিনখানি অলঙ্কার আনাইয়া দিলেন। বনবালার বুকের ভিতর—মনের ভিতর আগুন জলিলেও, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ বিপ্র-পরিবারের আদর-যত্নে বনবালা সেখানে এক প্রকার শান্তিজলে সিক্ত হইতে থাকিল।

এক মাস কাটিল। বনবালা সেই আশ্রয়দাতার সংসারে কোনও প্রকার কাজ কর্ম্ম করে না; করিতে যায়, গৃহিণী তাহাকে কোনও কার্য্য করিতে দেন না। বাড়ীতে একজন দাসী আছে, বাহিরের কাজকর্ম্ম দাসী করে, রন্ধনাদি কার্য্য গৃহিণী স্বহস্তে নির্ব্বাহ করেন। বধূ দুটী এক একদিন শাশুড়ীর সাহায্য করিতে যান, এক একদিন অন্যান্য লঘুকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। বনবালা কাজ করিতে পায় না, কিন্তু যিনি যখন যে কার্য্য করেন, নিকটে থাকিয়া বনবালা সেই সকল কার্য্য ভাল করিয়া দেখে, দেখিয়া দেখিয়া শিক্ষা করিয়া রাখে।

দিন যাইতে লাগিল। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই বাড়ীতে একজন অতিথি আসিলেন, সঙ্গে একজন চাকর। অতিথিটী ব্রাহ্মণ নহেন, কায়স্থ। দাসী আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বিছানা পাতিয়া দিল, পদপ্রক্ষালনের জল দিল, কায়স্থের হুকায় তামাক সাজিয়া দিল, একটু পরে একটী চতুষ্পদ... করিয়া আলো জালিয়া দিয়া গেল। গৃহিণীর আদেশে, আর একটু পরে, সেই দাসী পুনরায় আসিয়া চাকরটীকে এক ঘটী জল আর কিছু জলথাবার প্রদান করিল।

কর্ত্তা বাড়ীতে ছিলেন না, পুত্র দুটীও আপনাদের কার্য্যে বাহির হইয়াছিলেন; বলিতে গেলে, স্ত্রীলোকের বাড়ীতেই অতিথি। স্ত্রীলোকের হস্তেই অগ্রে অতিথি-সেবা আরম্ভ।

অতিথির বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরের কিছু অধিক; তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু; সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা তাঁহার নিত্য অভ্যাস। আহ্নিক করিতে হইবে, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, দাসীকে তিনি এই কথা বলিলেন। দাসীর

মুখে সেই কথা শুনিয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী বনবালার হস্তে দিয়া একখানি আসন, এক ঘটী গঙ্গাজল আর কোশাকুশী, পঞ্চপাত্র, চণ্ডীমণ্ডপে পাঠাইয়া দিলেন; বনবালা প্রতিদিন ঠাকুরসেবার স্থান মার্জ্জনা, পাত্রাদি সজ্জা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য দেখিত, সমস্ত শিখিয়াছিল, পবিত্রভাবে, নৈপুণ্যের সহিত বনবালা সেইখানে অতিথির সন্ধ্যা উপাসনার আয়োজন করিয়া দিল; তাহার পর পরিষ্কার পরিষ্কার পাত্রে অতিথির উপযোগ সামগ্রী, পানীয় জল, ক্ষুদ্রাধারে দুটী তাম্বুল আনিয়া উপযুক্ত স্থানে রাখিল; রাখিয়াই চলিয়া গেল না, আসনের একটু দূরে বসিয়া রহিল।

অতিথির উপাসনাকার্য্য সমাপ্ত হইল। বনবালা অঙ্গুলী দ্বারা উপযোগ দ্রব্যগুলি তাঁহাকে দেখাইয়া দিল; বনবালার ম্লানমুখপানে বারম্বার চাহিয়া চাহিয়া, বৃদ্ধ অতিথি সেই সকল দ্রব্যের কিছু কিছু উপযোগ করিলেন। তিনি জানিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের বাড়ী; বনবালা হয় ত ব্রাহ্মণকন্যা, ইহা ভাবিয়া বনবালাকে তিনি প্রসাদ গ্রহণে অনুমতি করিতে পারিলেন না। প্রসাদপাত্রগুলি সেইখানেই রহিল। এবারে আর দাসীকে আসিতে হইল না, বনবালা নিজেই অতিথিকে তামাক সাজিয়া দিল। বনবালার রূপ দেখিয়া, বনবালার কার্য্য দেখিয়া, অতিথি চমৎকৃত হইলেন, মনে মনে পরম সন্তুষ্ট।

আসন আর পাত্রগুলি লইয়া মন্থরগমনে বনবালা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল; যাইবার সময় প্রসাদী দ্রব্যগুলি চাকরটীকে দিয়া গেল।

কর্ত্তা আসিলেন। অব্যবহিত পরেই পুত্র দুটী আসিলেন। বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত, দেখিয়া তাহাদের অন্তরে পরমানন্দ। পুত্রেরা বাড়ীর ভিতর গেলেন, কর্ত্তা মহাশয় অতিথির নিকটে চণ্ডীমণ্ডপে বসিলেন। অতিথির সময়োচিত সৎকার হইয়াছে, তিনি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতিথির মুখে সেই পরিচয় পাইয়া অতিথিবৎসল ভট্টাচার্য্যের পরম পরিতোষ জন্মিল।

অতিথির সহিত শাস্ত্রালাপনে এবং নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে রামসেবক ভট্টাচার্য্য সবিশেষ আমোদ প্রাপ্ত হইলেন। কথায় কথায় অতিথি কহিলেন, এই অঞ্চলের অনেকদূরে তাঁহার এক জমিদারী আছে, তিনি সেই জমিদারীতে যাইতেছেন, এই গ্রামের ভিতর দিয়া আসিবার সময় খানিক দূর আসিয়া আর গাড়ী চলিল না, গাড়োয়ানের ভাড়া চুকাইয়া দিয়া, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ পথ তিনি হাঁটিয়া আসিতে বাধ্য হন। রাস্তা অতি

সঙ্কীর্ণ, ঠাঁই ঠাঁই ভগ্ন, একদিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়াছে, ঠাঁই ঠাঁই কর্দ্দম, দুর্গম। পদব্রজে অর্দ্ধক্রোশ আসিতে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছে।

অতিথির কষ্টের কথা শুনিয়া অতিথিভক্ত রামসেবকের কষ্ট হলে শয়ন দাসীকে ডাকিয়া তিনি অতিথির পদবেদনা নিবারণের জন্য গরম আর সর্ষপ তৈল আনিবার আদেশ দিলেন। দাসী গেল, তাহাকে আ আসিতে হইল না, তৈল জল লইয়া বনবালা আসিল; গরম জলে অতিথির চরণ ধৌত করিয়া সর্ষপ তৈল মালিস করিয়া দিল। অতিথি অনেকটা আরাম পাইলেন। কর্ত্তব্য পালন করিয়া বনবালা বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

কর্ত্তার সহিত অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে অতিথি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়! ও মেয়েটী কে? অতি ধীর, অতি শান্ত, কাজকর্ম্ম অতি পরিষ্কার; উহার সেবায় আমি পরম প্রীত হইয়াছি। অগ্রে ভাবিয়াছিলাম, হয় ত আপনার কন্যা, কিন্তু এখন দেখিলাম, আমার পায়ে হাত দিয়া তৈল মালিস করিল; ব্রাহ্মণের কন্যা তেমন কাজ করিতে পারেন না; ও মেয়েটী কে তবে?"

কর্ত্তা উত্তর করিলেন, "পরিচয় আমি জানি না। আমাদের পরিবারের কেহই নয়। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাকালে ঐ মেয়েটী আমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হয়, কথা কহিতে পারে না, বড় গরীব, তাহার উপর গর্ভবতী। আমি ওটীকে কোথাও যাইতে না দিয়া যত্নপূর্ব্বক বাড়ীতেই রাখিয়াছি; প্রায় দুই মাস এখানে আছে; অতি শান্তস্বভাব।"

অতিথি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, যেন একটু চিন্তাকুলবদনে কহিলেন, "বোধ করি ব্রাহ্মণের কন্যা হইবে। মুখশ্রীতে তাহাই যেন প্রকাশ পায়। অধিকন্তু যেরূপ নৈপুণ্যে, যেরূপ পবিত্রভাবে আমার সন্ধ্যা-উপাসনার আয়োজন করিয়া দিয়াছিল, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকন্যারা সেইরূপ পারেন, ব্রাহ্মণকন্যা ভাবিয়াই আমি সেটিকে আমার জলখাবারের অবশিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতে বলিতে পারি নাই; তাহার পর সে যখন আমার পায়ে সর্ষপ-তৈল মালিস করিয়া দিয়া গেল, তখন আমার সন্দেহ জন্মিল।"

অল্প চিন্তা করিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "আমার বোধ হয়, ব্রাহ্মণকন্যা নয়। কেন না"—

অসমাপ্ত কথা মুখে রাখিয়া, কর্ত্তা সেই সময় একবার বাড়ীর ভিতর

—ন, কি একটি বস্তু হাতে করিয়া আনিয়া, অতিথিকে দেখাইলেন। মুখে পত্রটি বনবালার আঁচলে বাঁধা ছিল, নিজে দেখিয়া, বাড়ীর সকলকে আসন, া, বুদ্ধিমতী গৃহিণী ঠাকুরাণী সেই পত্রটি আপনার বাক্স মধ্যে চাবি দিয়ে রাখিয়াছিলেন; সেখানি হারাইলে বনবালার হয় ত কোন প্রকার মন্দ হইবে, এই ভাবিয়াই ঐ পত্রটির উপর তাঁহার তত যত্ন। কর্তা এখন সেই পত্রটি বাহির করিয়া আনিয়াছেন; আনিয়াই তিনি সেই পূর্ব্বের অসমাপ্ত কথার সূত্র ধরিয়া পত্রটি অতিথিকে দেখাইয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "কেন না,—এই দেখুন, এই পত্রে কি লেখা আছে। এই পত্রটি ঐ কন্যাটির আঁচলে বাঁধা ছিল।"

কর্ত্তার হস্ত হইতে পত্রটি লইয়া, অতিথি পাঠ করিলেন। সেই কথা,—
"শ্রীহরেন্দ্রকুমার মিত্র, রঘুনাথপুর, হুগলী।"

পাঠ করিয়াই অতিথি মহাশয় যেন অল্প অল্প শিহরিলেন;—কর্ত্তাকে কহিলেন, "যদিও ইহাতে কন্যাটির জাতির পরিচয় পাওয়া যায় না, তথাপি আপনি একটি কাজ করুন। আমার অনুরোধ, যতদিন পর্য্যন্ত কন্যাটি সন্তান প্রসব না করে, ততদিন আপনি ওটিকে কোথাও যাইতে দিবেন না, যত্ন করিয়া সাবধানে আপনার বাড়ীতেই রাখুন; যত্নে রাখিবার জন্য আপনাকে আমি আপাততঃ একশত টাকা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ করুন। আমি জমিদারীতে যাইতেছি, অনেকটা দূর, অনেক দিন যাওয়া হয় নাই, এবারে সেখানে আমার প্রায় ছয়মাস বিলম্ব হইবে, ফিরিয়া আসিবার সময় এইখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব, কন্যাটির অন্নপালনের জন্য আপনার যাহা অতিরিক্ত খরচ হইবে, তাহাও আমি দিব—টাকার জন্য কোন চিন্তা নাই, সমস্তই আমি প্রদান করিব। কন্যাটি যেন কষ্ট পায় না, কোথাও যেন চলিয়া যায় না, কেবল এইটুকু মাত্র আপনি দেখিবেন।" এই বলিয়া তিনি রামসেবকের হস্তে দশ টাকা করিয়া দশখানি ব্যাঙ্কনোট প্রদান করিলেন।

নোটগুলি গ্রহণ করিয়া রামসেবক ভট্টাচার্য্য সবিস্ময়ে অতিথির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িয়া উঠিয়াছিল, অতিথির আহারের আয়োজনের জন্য তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; যাইবার সময় অতিথির হস্ত হইতে বনবালার সেই পত্রখানি লইয়া গেলেন।

বিবিধ সুস্বাদু উপকরণে রামসেবক ভট্টাচার্য্য অতি যত্নপূর্ব্বক অতিথিকে ভোজন করাইলেন; উত্তম শয্যা প্রস্তুত করাইয়া শয়ন করিতে দিলেন। অতিথির চাকরটীও পরিতোষরূপে ভোজন করিয়া যোগ্যস্থলে শয়ন করিল।

বনবালাসম্বন্ধে নানা তর্ক ভাবিতে ভাবিতে অতিথি ঘুমাইলেন। পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া তাঁহার গন্তব্যস্থানে যাত্রা করিবার উদ্যাগ। রাস্তা খারাপ, গাড়ী চলিবে না, ভট্টাচার্য্য একখানি পাল্কি আনাইয়া দিলেন;—দিলেন বটে কিন্তু স্নানাহার না করাইয়া অতিথিকে বিদায় দিতে তাঁহার মন সরিল না; নিজের পুষ্করিণীতে জাল ফেলাইয়া রোহিত মৎস্য ধরাইলেন, উত্তম দুগ্ধ আনাইলেন, সেস্থানের যথাপ্রাপ্য মিষ্টান্নও সংগ্রহ করাইলেন। বেলা একপ্রহরের মধ্যে পঞ্চব্যঞ্জন, উত্তমান্ন, পরমান্ন প্রস্তুত হইল, অতিথি ভোজন করিলেন। অল্পক্ষণ বিশ্রামান্তে, পুনর্ব্বার সেই অপরিচিতা কন্যাকে সাবধানে যত্নে রাখিবার অনুরোধ জানাইয়া, শিষ্টাচারে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া, তিনি শিবিকারোহণ করিলেন। শিবিকা চলিল। একটা পুটুলি মাথায় করিয়া, চাকরটি সেই পাল্কী-বেহারার সঙ্গে, সেই কর্দ্দমপূর্ণ ভগ্নপথে যথাশক্তি দৌড়িতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা আছে, অতিথি যখন বাড়ীতে উপস্থিত হন, বাড়ীতে তখন কেবল স্ত্রীলোকেরা ছিলেন। পিতাপুত্রেরা অনেক বিলম্বে বাড়ী আইসেন। ইতিমধ্যে বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাই একমাত্র দাসীর সাহায্যে অতিথির উপযুক্ত ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন, কর্ত্তাদের অপেক্ষা রাখেন নাই। এই প্রমাণে পাঠক মহাশয় বুঝিবেন, অতিথিসেবানুরক্ত, ধর্ম্মনিষ্ঠ রামসেবকের পরিবারবর্গ ভক্তিপূর্ব্বক অতিথিসেবায় কতদূর ভক্তিমতী।

অতিথির পাল্কি অদৃশ্য হইয়া যাইবার পর, রামসেবক মনে মনে ভাবিলেন, লোকটি কে? বনবালার যত্নের নিমিত্ত তিনি টাকা দিলেন কেন? পত্রিকায় নামধাম দর্শন করিয়া, তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন কেন? লোকটি কে?

ভট্টাচার্য্য অনেকক্ষণ ভাবিলেন এইরূপ, মীমাংসা যোগাইল না। অতিথি যতক্ষণ বাড়ীতে থাকেন, অতিথির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সদালাপ হইলেও ততক্ষণ তিনি অতিথি। অতিথির নাম জিজ্ঞাসা করা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ, সাধারণত ব্যবহারবিরুদ্ধ, নিয়ম-বিরুদ্ধ, ভদ্র ভদ্র সমাজ-বিরুদ্ধ;

অতএব অতিথিসেবক ভট্টাচার্য্য মহাশয় অতিথির নাম জিজ্ঞাসা করেন নাই। যেখানে এমন অবস্থা, সেখানে মানসিক তর্কের মীমাংসা নাই।

অষ্টম পল্লব।

বনবালার সন্তান।

ব্রাহ্মণের বাড়ীতে বনবালা রহিল। অতিথির অনুরোধ না থাকিলেও, সে বাড়ীতে বনবালার অযত্ন হইত না। যত্নের জন্য গৃহস্বামী টাকা পাইয়াছেন, সেই অনুরোধে স্নেহযত্নের বেশী নিদর্শন এই হইল যে, বনবালার সেবার জন্য স্বতন্ত্র একজন দাসী নিযুক্ত হইল।

পূর্ণ দশ মাস।—বনবালার প্রসবকাল উপস্থিত। পঞ্চম মাস গর্ভাবস্থায় বনবালা এই বাড়ীতে আসিয়াছিল, এই বাড়ীতে আর পাঁচ মাস অতীত। বনবালার নম্রতায়, বনবালার শিষ্টাচারে, বনবালার কার্য্যনৈপুণ্যে, বনবালার ধর্ম্মনিষ্ঠায়, এই পাঁচ মাসে বাড়ীর পরিবারবর্গের বিশেষ আনন্দ হইয়াছিল। বিশেষতঃ বনবালা বোবা, সেই জন্য তাহার প্রতি অধিক দয়া হইয়াছিল, তাহার প্রতি তাঁহাদের স্নেহ বাড়িয়াছিল।

বনবালার প্রসবকাল উপস্থিত। প্রসববেদনায় বনবালা কাতরা হইতেছে, বাড়ীর গৃহিণী ঠাকুরাণী ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন, নবীনা বধূ দুটী চক্ষের জল ফেলিতেছেন; অধিক কি, দাসী,—পরের মেয়ে, দাসী দুটীও বনবালার কাতরতায় কাতরা হইতেছে। কর্ত্তামহাশয় সেই সময় গ্রামের একজন যশস্বিনী ধাত্রীকে সঙ্গে লইয়া গৃহে আসিলেন। স্ত্রীলোকদিগের ভাবনা কিছু কমিল; ভয় হইয়াছিল, ধাত্রীদর্শনে সাহস আসিল।

বনবালা একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল। শিশুর মুখখানি অবিকল বনবালার মুখের তুল্য। বনবালার নবকুমার জন্মিল, রামসেবক ভট্টাচার্য্যের পুত্রবধূরা জোড়া শাঁখ বাজাইলেন; গৃহিণী আনন্দে উলুধ্বনি দিলেন, সকলেরই পরমানন্দ।

ধাত্রী দিবারাত্রি থাকে। সারারাত্রি সূতিকাগারে আলো জ্বলে, সারারাত্রি আগুন জ্বলে। বনবালার অল্প অল্প নিদ্রা হয়, ধাত্রী ঘুমায় না।

একটী স্ত্রীলোক প্রতি রজনী জাগিয়া কাটাইবে, অল্পদিনে তাহার পীড়া জন্মিবে, এই আশঙ্কা করিয়া দয়ালু ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই ধাত্রীর একজন সহকারিণী রাখিয়া দিলেন। রজনীর প্রহরভেদে উভয়ের নিদ্রার পালা অবধারিত হইল।

একে একে দিন যাইতে লাগিল। বনবালা সূতিকাগারে দশদিন। সে গ্রামের নিকট নিকট পাঁড়াগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। এক এক পাড়ায় অতি কম পঁচিশ ত্রিশ ঘর লোকের বাস ছিল। ভট্টাচার্য্য-বাড়ীতে একটী বোবামেয়ে এসেছে, সে মেয়ে সব রকম কাজ করে, বাড়ীতে তাহার বড় আদর, পাড়ার লোকেরা সে সব কথা শুনিয়াছিল; বিশেষতঃ মেয়েমহলে। সেই বোবা মেয়ের পুত্র হইয়াছে, এই সংবাদ প্রচার হওয়াতে, পাড়ার মেয়েরা প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে সেই পুত্রটীর মুখ দেখিতে আইসে; দেখিয়া দেখিয়া কতই প্রশংসা করে। বনবালার মুখ আর সেই শিশুটির মুখ ঠিক এক ছাঁচে গড়া, এই কথা বলিয়া, তাহারা বনবালার রূপেরও কত সুখ্যাতি করে।

এইরূপে দিন যায়। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচদিন অতীত হইয়া গেল। সূতিকাগারে বনবালা একপক্ষ। বনবালার পুত্রটীর বয়সও এক পক্ষ। এই এক পক্ষকাল নবপ্রসূতির প্রতি ভট্টাচার্য্য-পরিবারের অধিক যত্ন। বনবালার শরীর সুস্থ, দিন দিন কিছু কিছু সবল; শিশুটীকে ক্রোড়ে লইয়া বনবালা স্তন্যদান করে, চক্ষে কাঁজল দেয়, মুখ দেখিয়া দেখিয়া চক্ষের জলে ভাসে। বোবার চক্ষে জল দেখিয়া ধাত্রী দুটীও অঞ্চল দ্বারা আপনাদের অশ্রুমার্জ্জন করে।

নবম পল্লব।

বনবালার পলায়ন।

বনবালা সূতিকাগারে। সূতিকাগারে একপক্ষ। এক পক্ষের শেষ দিন। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। বনবালা ঘুমাইতেছে;—ঘুমাইতেছে কি শুধু শুধু চক্ষু বুজিয়া আছে, তাহা কেবল বনবালাই জানে, আর কেহ

জানে না। একজন ধাত্রী বাহিরে গিয়াছে, একজন সূতিকাগারের দ্বারে ঠেস দিয়া বনবালার দিকে চাহিয়া আছে। বনবালার কোলের কাছে ছেলেটী ঘুমাইতেছে।

বনবালা জাগিল, উঠিয়া বসিল; ঘুমন্ত শিশুটীর মুখপানে একবার চাহিল; মুখে হাসি আসিল; পরক্ষণে ধাত্রীর দিকে চক্ষু পড়াতে সে হাসি সেই মুখে মিলাইয়া গেল।

ধাত্রী বিস্ময়াপন্ন। সে বিস্ময়ের কারণ কি?—একপক্ষ আছে, ইহার মধ্যে ধাত্রী একদিনও বনবালার মুখে হাসি দেখে নাই; সেই দিন সেই মুখে হাসি দেখিয়াই ধাত্রীর বিস্ময়।

ধাত্রীর বিস্ময় ছোট কথা। খোলসা করিয়া বলা যাইতে পারে, এই বাড়ীতে আসিয়া অবধি, পাঁচ মাসের অধিক দিন, এ পর্য্যন্ত বনবালা একবারও হাসে নাই; কেহই তাহার মুখে হাসি দেখে নাই; এ হাসি এক প্রকার নূতন।

সন্ধ্যা হইল, সূতিকাগারে আলো জ্বলিল, অগ্নিকুণ্ডে আরও অধিক পরিমিত সুগন্ধীকাষ্ঠ নিক্ষেপ করা হইল; ধাত্রীরা আপন কর্ত্তব্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিল। যথাসময়ে বনবালার আহার-সামগ্রী আসিল, বনবালা আহার করিল; সন্তানকে স্তনদান করিতে করিতে বনবালা শীঘ্র শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল। ধাত্রীরা আহারাদি সমাপন করিয়া আপনাদের নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিল। সে রাত্রে আর পালা থাকিল না। প্রধানা ধাত্রী মনে করিল, বনবালা হাসিয়াছে; তাহার আর কোন অসুখ নাই, স্বচ্ছন্দে ঘুমাইতেছে, এ রাত্রে আর তাহাদের জাগিয়া থাকিবার দরকার নাই। ধাত্রী নিজেও উহা মনে করিল, সহকারিণীকেও ঐ কথা বলিল। পরামর্শ স্থির, শয্যা গ্রহণ করিয়া তাহারা উভয়েই অচেতনে ঘুমাইল; ঘরে আলো জ্বলিতে লাগিল।

বনবালা একবার উঠিল, ধীরে ধীরে সূতিকাগারের বাহিরে আসিল, আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিল, আবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বিছানার উপর বসিল, পুত্রটীর মুখ দেখিতে দেখিতে আবার একবার শয়ন করিল। আবার উঠিয়া বসিল, বসিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ কি ভাবিল, আবার উঠিয়া বাহিরে গেল, আবার আকাশপানে চাহিল, আবার ঘরের ভিতর ফিরিয়া আসিল; এই রকম তিনবার। [ক্রমশঃ]

শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রায় ষোড়শবর্ষকাল সুনীতিজ্ঞতার সহিত সুবিচার বিতরণ পূর্ব্বক সকলের প্রশংসাভাজন হইয়া, শ্রীযুক্ত মাননীয় জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের জানুয়ারি মাসের শেষে কলিকাতার হাইকোর্টের বিচারাসন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। চিপ্‌জষ্টিস, অপরাপর জষ্টিস্‌গণ, ব্যারিষ্টারগণ, এটর্ণীগণ, উকীলগণ এবং অন্যান্য মহোদয়গণ, এক সভা করিয়া সগৌরবে তাঁহাকে বিদায়ী অভিনন্দন দান করিয়াছেন। অভিনন্দন যথার্থ, তথাপি তাদৃশ সুবিচারকের পদত্যাগে সকলেই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। অধিক কথা কি, হাইকোর্টের বিচারের সহিত যাঁহাদের সম্বন্ধ কিছুই নাই, গুরুদাস বাবুর পদত্যাগের সমাচার শ্রবণ করিয়া, তাঁহারাও আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছেন।

বিচারপতির গুণের বিচার কিসে হয়? বিদ্যায়, আইনজ্ঞতায়, নিরপেক্ষতায়, সৌজন্যে এবং বহুদর্শীতায়। গুরুদাস বাবুর এই পঞ্চগুণ প্রকৃষ্ট, বস্তুত তিনি সর্ব্বগুণে বিভূষিত। বিজ্ঞ পাঠকেরা একটি সূক্ষ্ম বিষয়ের বিচার করুন। মকর্দ্দমায় বিজয়ী পক্ষ স্বভাবতঃ সচরাচর বিচারকের উপর সন্তুষ্ট হন, গুরুদাস বাবুর বিচারে পরাজিত পক্ষ পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণমনে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে এক একটি গুরুতর মকর্দ্দমায় জষ্টিস্‌ গুরুদাস সসম্ভ্রমে চিপ্‌ জষ্টিসের সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক যেরূপ সুমীমাংসা করিয়াছেন, তাঁহার যুক্তি, ব্যবহারজ্ঞতা এবং পরামর্শ হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিপ্‌ জষ্টিসেরা যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, বিষয়ী লোকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন; গুরুদাস বাবুর মতের সহিত কোন অংশে প্রধান বিচারপতির মতভেদ হয় নাই। যেখানে তিনি বসিয়াছেন, সেইখানেই সুবিচার হইয়াছে। ইহা আমাদের দেশের অসামান্য গৌরব। হাইকোর্টের বিচারাসন উজ্জ্বল করিয়া নিজগুণে গুরুদাস বাবু বঙ্গদেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বহুদর্শী প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র, এক্ষণে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গুরুদাস বাবুর জন্ম। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টের জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এক্ষণে তাঁহার বয়ঃক্রম ষষ্ঠিবর্ষ। বরিশাল জেলায় তাঁহার পৈতৃক নিবাস, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথা হইতে আসিয়া সহর কলিকাতার সন্নিহিত নারিকেল ডাঙ্গায় বাস করেন। নারিকেল ডাঙ্গাতেই গুরুদাস বাবুর জন্ম হয়। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার আর্থিক অবস্থা তাদৃশ উন্নত ছিল না, তথাপি পুত্রের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দর্শনে তিনি প্রায়

দৈববাণী করিয়াছিলেন যে, সময়ে এই শিশু দেশের মধ্যে একজন বড়লোক হইয়া উঠিবে। দৈববাণীই বলুন অথবা ধর্ম্মশীল পিতার আশীর্ব্বাদ বাণীই বলুন, সর্ব্বাংশে সেই বাণী সফল হইয়াছে। গুরুদাস বাবুর বয়স যখন আড়াই বৎসর মাত্র, সেই সময় তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। স্নেহবতী ভাগ্যবতী পুণ্যবতী জননীর যত্নে গুরুদাস বাবু লালিত পালিত। জননীর যত্নেই তিনি উদার শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা হইতে এম, এ, বি, এল, পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য ব্যবহার শাস্ত্রের সম্ভ্রম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি এল, এল, ডি, উপাধি লাভ করেন, সেই উপাধি-যোগে তিনি ডাক্তার গুরুদাস নামে বিখ্যাত। সংস্কৃত, আরব্য, পারস্য, ইংরাজী এবং বঙ্গভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি, সবিশেষ অধিকার। আমরা শুনিয়াছি, এক একখানি আরবীকাব্যের কূটার্থ ব্যাখ্যায় কোন কোন মৌলবী সাহেব নতশির হইয়া মহাগৌরবে তাঁহাকে সেলাম করিয়াছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের একটি নিদর্শন এই যে, সামবেদ উক্ত সন্ধ্যাবিধি এতদঞ্চলে প্রায় নির্ভুল ছিল না, গুরুদাস বাবু এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আশুতোষ বাবু বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সেই বিধিখানির বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সুব্রাহ্মণগণকে বিনামূল্যে দান করিতেছেন।

স্বদেশের সমাজ মঙ্গলের এবং বিদ্যার উন্নতিতে গুরুদাস বাবুর যথেষ্ট অনুরাগ। কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় সভার সদস্যশ্রেণীতে তিনি গৌরবান্বিত, সেই সভাতেই ঘনিষ্টতা হওয়াতে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব চিপ্‌ জষ্টিস্‌ সার কোমার পিথারামের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সার কোমার পিথারাম তাঁহাকে হাইকোর্টের জজিয়তী পদে নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রণালী সংশোধনে গুরুদাস বাবুর একান্ত যত্ন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে এবং তৎসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তিনি যেরূপ উদার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, কার্য্যে তাহার অনুরূপ ফল হইবে না। কিন্তু গুরুদাস বাবুর যুক্তিগুলি সমস্ত বিজ্ঞ বিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুমোদিত।

গুরুদাস বাবুর মাতৃভক্তি অসাধারণ। ভাগ্যবতী দেবী যতদিন জীবিতা ছিলেন, তাঁহার চরণামৃত পান ও পদধূলি মস্তকে ধারণ না করিয়া মাতৃবৎসল গুরুদাস বাবু কদাচ কোন কার্য্যে বহির্গত হইতেন না। ১৮৮৬

খৃষ্টাব্দে সেই রত্নগর্ভা পুণ্যবতী দেবী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার দেবতুল্য পুত্র হাইকোর্টের জজ হইলেন, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই; ইহা এক আক্ষেপের বিষয়।

সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়ে গুরুদাস বাবুর সমান সুখ্যাতি ও সমান প্রতিপত্তি। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া আইনের অধ্যাপক, আইনের উপদেশক এবং ওকালতি ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া তিনি সবিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। সামাজিকতায় তিনি অমায়িক, সর্ব্বজনরঞ্জন, দাতা, পর উপকারী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সঙ্গীতরসজ্ঞ, এবং সাধারণ মঙ্গলকর সকল কার্য্যেই অগ্রগামী। অকপটে স্বধর্ম্ম পালনে তিনি এখন অদ্বিতীয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এখনকার দিনে ইংরাজী শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণের মধ্যে সকলেই প্রায় স্বধর্ম্মের প্রতি উদাসীন, কিন্তু গুরুদাস বাবুর ধর্ম্মনিষ্ঠ অচলা; নিত্য গঙ্গাস্নান ও দেবপূজা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত। তাঁহাকে আমরা কি বলিয়া পূজা করিব জানি না, নররূপে তিনি একজন সজীব দেবতা, শ্লাঘা করিয়া আমরা একথা বলিতে পারি। শিক্ষিত বঙ্গ সমাজ সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে আদর্শস্থলে গ্রহণ করেন, ইহাই আমাদের বাসনা। বহু শ্রমসাধ্য, বহু চিন্তাসাধ্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি এখন স্বদেশের সমাজ-মঙ্গলে মনোনিবেশ করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। জগদীশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্রগণকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখুন, স্বগৌরবে তাঁহারা সুখসৌভাগ্য উপভোগ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, হাইকোর্টে দেশীয় জজ নিয়োগের ব্যবস্থা হইয়া অবধি এ দেশের যে কয়েকজন ভাগ্যবান পুরুষ সেই উচ্চ আসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সদ্বিদ্বান ও সদ্গুণশালী হইলেও গুরুদাস বাবু তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান, দেশের গৌরবে এ কথা আমরা অবশ্যই মুক্তকণ্ঠে বলিব, সকলেই একথা স্বীকার করিবেন। হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতি বাবু রমাপ্রসাদ রায়, নিয়োগপত্র প্রাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরেই তিনি পরলোক প্রাপ্ত হন, একদিনও বিচারাসনে উপবেশন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়, বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত। তৃতীয়, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র। চতুর্থ, বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পঞ্চম, বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র; ইনি কিছুদিন চিপ জষ্টিসের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ, শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব ঘোষ। সপ্তম, শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস বন্দ্যো-

পাধ্যায়। অষ্টম, আমীর আলি, ইঙ্গন্য অর্থাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে কয়েকটি দোষ
বসু। দশম, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী
দশ, শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ স্বিনেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতি।
ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মর্ ক্রোধ মালস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥"
যোগ্য যোগ্য ব্যক্তিগণ পর্য্যায় তাঁহারা স্বভাবতই উদ্যমী, পটু এবং কুসঙ্গ-
ষ্ঠিত হইয়া বঙ্গের মুখোজ্জ্বল কট দোষ দরিদ্র ব্যক্তিরই চিরন্তন সম্পত্তি।
না, দরিদ্রকে উঁহারা স্বতঃই বরণ করিয়া থাকে।
ক্রমণ করিলে কুবেরকেও ভিখারী করিতে পারে।
াই? চক্ষের উপর সহস্র সহস্র উদাহরণ বিদ্যমান।

মানব-জীবনে বিধ ব্যক্তিতেই পরিপূর্ণ, কিন্তু দেখিয়াও, কাহার মনে উদ্দেশ্য। ব্যক্তি না। শত শত ব্যক্তি কুসঙ্গে পড়িয়া যৌবনসুলভ ঔদ্ধত্য সম্মান, প্রভুত্ব সম্ভাবনকে চিরদিনের জন্য দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিতে- সকল দরিদ্রে স্ফূর্তি প্রাপ্তন বহুব্যাপক হইয়াছে, সমাজে অনেকেই বাহ্য সম্পন্ন হয় না। যদিও নিষ্কাম ধর্ম্ম অকেরিতে গিয়া পশুবৃত্তি অবলম্বন ব্যক্তির অনবকাশ, অভাব এবং চিত্তের চই "অদৃষ্ট" এই কথাটি অধিক অসম্ভব। চাটুবৃত্তি, পর্য্যটন, চিন্তা, বিমনাজের অপকর্ম্ম দোষে দুর্দ্দশাগ্রস্ত আক্রমণেই তাহাদের জাগ্রদাবস্থা অতিবাহিচিত নয় কি? দেশীয় উন্নতি- সমুদয় সদ্গুণরাশি উবা তারকাবলীর ন্যায় রর চরিত্র আচার ও আচরিত ব্যক্তির যথার্থ সদ্গুণ থাকিলেও কেহ তচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই দারিদ্রদোষ সমুদায় গুণরাশিকে আবরিত করে অবস্থার অবনতি হইলেই মধ্যে পরিগণিত হওয়া বড়ই সুকঠিন ব্যাপ হইয়া বসেন। এরূপ অদৃষ্টবাদ
প্রথমে নার্জ্জিতাবিদ্যা দ্বিতী দ্বারাই মানবপ্রকৃতি ক্রিয়াবতী
তৃতীয়ে নাজ্জিতং পুণ্যং চর সংশোধিত হয় না, অগ্নিতে অল্প

প্রথমে বিদ্যা অর্থাৎ সে সময় পিতা প্রবল হইয়া উঠে, নির্ব্বাণ অনলের সুতরাং নিশ্চিন্তকাল, এই জন্য ধর্ম্ম ও অতএব দৈবে নির্ভর করিয়া পুরুষ- প্রথমেই উপার্জ্জন করিতে হয়। দ্বিতীয় দৈব কি? কর্ম্মের জড়াবস্থাই দৈব, পার্জ্জনের প্রশস্তকাল। কেন না, যৌবচেতন ব্যক্তিই নিদ্রিতকে জাগাইতে সকল সতেজ থাকে, এই জন্য উদ্যমশীল কার্য্যরূপে পরিণত করে। অতএব মাত্রায় বিকাশ প্রাপ্ত হয়; অতএব মূল জানিয়া তাহারই আশ্রয় লওয়া কদর্য্য মনোবৃত্তি সকল দমন করিয়া অ—

দৈবং নিহত্য কুরু পৌরষমাত্ম শক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কো পুত্র দোষঃ॥

তাহা না করিয়া কেবল অদৃষ্ট অদৃষ্ট করিয়া দুরাদৃষ্ট ঘটান নিতান্ত বুদ্ধি লোপের কার্য্য। চেষ্টা সকল উন্নতির মূল; একবার করিলাম, হইল না, ইহা বলিয়াই চেষ্টার অসাধ্য ভাবিয়া ক্ষান্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এ স্থলে বরং উপযুক্ত চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়াই স্থির করা উচিত। যে কার্য্য যত গুরুতর, তাহার চেষ্টাও উত্তরোত্তর তত গুরুতর হওয়া আবশ্যক। চেষ্টার অসাধ্য, এটি অলস প্রকৃতির বাক্য। দেখ, উদ্যমী উন্নতিশীল প্রাচীন কবিগণ এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন,—

"উদ্যোগিনঃ পুরুষ সিংহ উপৈতি লক্ষ্মী।
দৈবেন দেয় মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

যে কার্য্য যখন করিবে, তখন তদুপযুক্ত লোকের বাক্যই গ্রহণীয়। যুদ্ধবিষয়ে ভীরুর পরামর্শ লওয়া যেমন অনুচিত, উন্নতি বিষয়ে অলসীর বৈরাগীর বাক্যও তেমনি অগ্রাহ্য। অন্ধকে দৃশ্যমান বস্তুর বিচার করিতে কে ডাকে? মূর্খকে বেদান্তের অধ্যাপক করিতে কে যায়? যদি নিজের সুখ ইচ্ছা কর, তবে ন্যায়পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জনে তৎপর হও, মিতব্যয়ী হও, সঞ্চয় করিতে শিক্ষা কর, নিজের চেষ্টার প্রতি নির্ভর কর, সামান্য লাভকে তাচ্ছিল্য করিও না, কেন না—

"জলবিন্দু নিপাতেন ক্রমশঃ পূর্য্যতে ঘটঃ।"

অল্প অল্প লাভও সঞ্চয়শীলতাগুণে কালে বৃহৎ হয়। একবারেই কেহ উচ্চে উঠিতে পারে না। একবারেই কেহ নদী পার হইতে পারে না। ক্রমোন্নতিই সকলের মূল। একপদ একপদ অগ্রসর হইয়া লোক দ্বীপ-দ্বীপান্তর গমন করিতেছে,—অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালাকেও অতিক্রম করিতেছে। ক্রমোচ্চ সোপানাবলীর সাহায্যেই লোকে অনায়াসে দ্বিতল বা ত্রিতলে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়; একবারেই সমুদয় সুখের অধীশ্বর হইব, এরূপ ইচ্ছা করাও অপরিণামদর্শিতার কার্য্য। এরূপ ইচ্ছাশীল ব্যক্তি কখনই সুখের মুখদর্শন করিতে পারে না বরং নিয়তই নিরাশায় নিপীড়িত হয়। নিরাশা যে কি বস্তু, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই, তাহার যন্ত্রণার আস্বাদও প্রায় ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। উচ্চ আশাই নিরাশার জননী, মানব উচ্চ আশা বশতই ইহার কবলিত হয়। যাঁহারা

মুখে হুকার নল লাগাইয়া অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে বসিয়া বসিয়া কল্পনার সুখ স্বপ্ন দেখেন, তাঁহারাই অধিকতর নিরাশার তুষানলে দগ্ধ হন। "কালে রাজা ভবিষ্যতি", এদিকে আজ কি হইতেছে, খবর নাই; এবম্ভূত অলস ব্যক্তি কখন সংসারে সুখী হইতে পারে না। সংসারে অর্থগত সুখ উপার্জ্জন করিতে হইলে পশুপক্ষী প্রভৃতি কতকগুলি ইতর প্রাণীর নিকট হইতেও গুণ গ্রহণ করিতে হয়। যথা—

"কাক চেষ্টা বক ধ্যানং শ্বাননিদ্রা তথৈব চ।"

কাক ভ্রমণ করে বটে, কিন্তু সে কেবল আহার লাভের চেষ্টাতেই। বক একস্থানে বসিয়া নিশ্চেষ্টবৎ ধ্যান করে সত্য, কিন্তু নিকটে আহার্য্য উপস্থিত হইলেই অমনি সচেষ্টভাবে গ্রহণ করে। কুক্কুর নিদ্রা যায় সত্য, কিন্তু তাহার কর্ণ জাগ্রত থাকে। এ সংসারে যাহারা উদ্যমী স্বকার্য্যকুশল ব্যক্তি, এই সকল গুণ বিনা উপদেশেই তাহাদের স্বভাবে ধর্ম্মবৎ প্রকাশ পায়। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখ, স্বকার্য্যতৎপর ব্যক্তি সকল ঐরূপ গুণে বিভূষিত হইয়া লক্ষ্মীশ্রীতে উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাঁহারা কাহার নিকট বৃথা সময় কাটাইতে যায় না। যদি সুখ ইচ্ছা থাকে, ঐ সকল ব্যক্তির অনুসরণ কর এবং যাহারা অসৎ অপরিণামদর্শী, তাহাদের সংশ্রবে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করিও না। জগতের সর্ব্বনাশকারী প্রলোভন হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত কর, বৃথা অর্থব্যয় করিয়া নাম লইতে ইচ্ছা করিও না, বরং অর্থ বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা কর। দম্ভ, অহঙ্কার, অসূয়াদি দোষ-বিবর্জ্জিত হইয়া বিনয়াদি সদ্‌গুণে সকলের প্রিয় হও, এবং অর্থের অন্বেষণে দেশকালপাত্র বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। কাহারও দয়াপেক্ষী না হইয়া আত্ম নির্ভর কর। উন্নত হইতে ইহা ব্যতীত আর অধিক কিছুই আবশ্যক হয় না।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।
এক্তারপুর মদনমোহন বাড়, পোঃ বাসুদেবপুর।

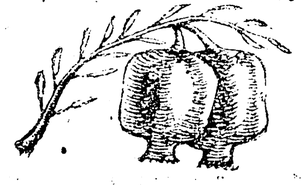

বসন্তরোগ নিবারণ।

বসন্ত অতি ভীষণ ব্যাধি। প্রচলিত চিকিৎসায় এ ব্যধিতে প্রায়ই সুফল ফলে না, সকলেই ইহা দেখিতে পান। সম্প্রতি আমরা দেখিয়া অহ্লাদিত হইলাম, এই রাজধানির সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত কবিরাজ শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশারদ এতৎ সম্বন্ধে সাধারণের একটি বিশেষ উপকার করিতেছেন। সংক্রামক বসন্তরোগ কোন স্থানে প্রবল হইলে, যাহাতে তাহার আক্রমণ হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, বিশারদ মহাশয় তাহার এক অমোঘ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। ঔষধের উপাদান আমাদের উদ্ভিজ্জক্ষেত্রের সম্পত্তি, তাহা প্রস্তুত করিতে কোন প্রকার দুর্ল্লভ সামগ্রী অন্বেষণ করিতে হয় না। ঔষধের উপকরণ ও প্রস্তুত প্রক্রিয়া সাধারণের উপকারার্থ আমরা তাহা নিম্নভাগে প্রকটন করিলাম। যথা :—

তেলাকুচার পাতা অর্দ্ধ তোলা, মাধবীলতার পাতা অর্দ্ধ তোলা, অশোক বৃক্ষের পাতা অর্দ্ধ তোলা, পাকুড়বৃক্ষের পাতা অর্দ্ধতোলা, মোট দুই তোলা। পাতাগুলি টাট্‌কা হওয়া আবশ্যক। এই চারি প্রকার দ্রব্য একটি নূতন হাঁড়িতে অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হয়, তাহার পর পরিষ্কার বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেই ক্বাথটুকু একটি পাথরের অথবা কাচের পাত্রে ঢাকা দিয়া রাখিতে হয়। পূর্ব্বদিন সায়ংকালে ঐরূপে ঐ ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে মুখপ্রক্ষালনের পর সবটুকু একবারে সেবন করা কর্ত্তব্য। এই মাত্রাটি একজনের পক্ষে বিহিত, তিন চারিজনে অথবা তদপেক্ষা অধিক লোকে পান করিবার প্রয়োজন হইলে, ঐরূপ মাত্রানুসারে ক্বাথ প্রস্তুত করা উচিত। মনে করুন, যদি দুইজনের জন্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রকারের পাতার পরিমাণ একতোলা, সিদ্ধ করিবার জলের পরিমাণ এক সের, শেষ রাখিতে হইবে এক পোয়া। এইরূপে জনসংখ্যা হিসাবে মাত্রা বর্দ্ধিত হইবে। অবাধে সকলেই ইহা পান করিতে পারেন। অতি শিশুকেও অতি অল্প মাত্রায় সেবন করান যায়। উহা সেবনে শরীরে বসন্ত রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। পথ্যাপথ্যের কোন নিয়ম নাই। তিনদিন মাত্র ঔষধ সেবনেই বসন্তের আক্রমণ ভয় নিবারিত হয়।

কবিরাজ বিশারদ মহাশয়কে অনেকেই জানেন, সাধারণের নিকটে

তিনি ঈশান বিশারদ নামে বিখ্যাত; আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত, তাঁহার ঔদার্য্য এবং লোকহিত ইচ্ছা অসাধারণ। ঐ ঔষধের নিমিত্ত তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে না, দর্শনী দিতে হইবে না। ঔষধেরও মূল্য নাই। উপকার যথেষ্ট। আমরা ঈশ্বরের নিকটে বিশারদ মহাশয়ের দীর্ঘজীবন চিরশান্তি কামনা করি।

আসিও না আর!

(১)

দেখা দিতে আসিও না আর!
তোমার সে হাসিমুখ, মুছিয়াছি স্মৃতি সুখ,
ভুলিব না ওছলে তোমার।
যদিও আস দেখা দিতে, কেঁদে ম্লানমুখে,
ফিরে যা'বে আপনার দুখে!

(২)

ভালবাসা নহে ছেলে খেলা!—
অনন্ত হৃদয় পারে, তুমি যাও খেলিবারে,
তাই আস প্রভাতের বেলা।
দেখা দিতে কেন আস, পরের পরাণ?
সাজিবে না আর অভিমান!

(৩)

সে সুখের দিন গেছে চলে।—
তুমি মোর হৃদি পাশে, আকাশে জোছনা হাসে,
পাখী কাঁদে 'চোখ গেল' ব'লে।
জনমে কি কভু আর ফিরিবে সে দিন,
ছিঁড়ে গেছে জীবনের বীণ!

(৪)

তোমা পানে চাহিব না আর,
তুমি গো মোহিনী বেশে, আসিও না হেসে হেসে,
ধরিও না পরাণ আমার!

যতনের যাহা কিছু ছিল ঘরে,
ল'য়ে গেছ তুমি চুরি ক'রে।

(৫)

যাও তুমি আপনার কাজে।—
কিছু নাহি চাহি আর, তোমার সে ফুলহার
ঝরে গেছে হৃদয়ের মাঝে!
নিশ্বাস পবন আজি মাঝে মাঝে চেয়ে,
বহে যায় প্রাণে ব্যথা পেয়ে!

(৬)

জীবনের সব ফুরায়েছে!
আমি মরণের কোলে, চাহিও না আঁখিজলে,
সুখ শান্তি সকলি গিয়েছে!
তুমি যদি থাক কাছে, মরণেও মোর
ঘুচিবে না বিষাদের ঘোর!

(৭)

চিতানল রবে যতক্ষণ,
তুমি সে চিতার কোলে, ভাসিও না আঁখিজলে,
তুমি বিনা সুখের মরণ!
ফেলিও না অশ্রুনীর চিতারজঃ মাঝে,
চলে যাও আপনার মাঝে!

(৮)

তাই বলি আসিও না আর,
তোমার সে হাসি মুখ, মুছিয়াছি স্মৃতি সুখ,
শান্তি-আশা মিটে'ছে আমার!
আসিও না দেখা দিতে, কেঁদে ম্লান মুখে,
ফিরে যা'বে মরমের দুঃখে!

শ্রীপ্রিয়নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

বিদ্যাদম্ভে মত্ত যবে স্বর্ণ বঙ্গদেশ
শত শত চতুষ্পাটী, শাস্ত্র আলোচনা,
জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যা নাহি ভক্তিলেশ
শুষ্ক কূটতর্ক মাত্র সার অধ্যাপনা।

কে তুমি পুরুষসিংহ এ হেন দুর্দ্দিনে?
বিদ্যাভূমি নদীয়ায় হয়ে আবির্ভাব,
বিদ্যাবলে পরাজিয়া অধ্যাপকগণে
জ্ঞান হ'তে বুঝাইলা ভক্তির প্রভাব।

বিলাতে সে ভক্তি জীবে, সন্ন্যাসীর বেশে
সুধাময় হরিনাম করিয়া কীর্ত্তন,
ভ্রমিলা আপনহারা, প্রতি দেশে দেশে
ভক্তিরসে মাতাইলা চণ্ডাল-ব্রাহ্মণ।

ধন্য এ ভারতভূমি বঙ্গভূমি ধন্য,
যে ভূমিতে অবতীর্ণ "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

শ্রীশ্রীরাস পঞ্চাধ্যায়।—বিবিধ শাস্ত্রানুবাদক সুপণ্ডিত প্রভুভক্ত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী প্রণীত। এখানি বঙ্গ ভাষায় কবিতায় বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের একাংশ এই রাস পঞ্চাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত কৃষ্ণ-ভক্তগণের জীবন অপেক্ষাও প্রিয়তর। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অতি সরল সুললিত মধুর ভাষায় কবিতাগুলির সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি এখন দুঃসাধ্য রোগে শয্যাশায়ী, তথাপি কৃষ্ণপ্রেমে তাঁহার মধুময়ী লেখনী এই রাস পঞ্চাধ্যায়ের বর্ণে বর্ণে মধু বর্ষণ করিয়াছে। ভক্তগণ ইহা পাঠ করিয়া কৃষ্ণানন্দে মুগ্ধ হইতে পারিবেন।

পুরন্দর খাঁ।—শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র এম-এ, বি-এল প্রণীত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে সজ্জিত। সেন-রাজ-বংশের অবসানে যবানাধিকারে বঙ্গের যেরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, পৃথিবীর অপরাপর দেশের তাৎকালিক রাজবিপ্লবাদির সহিত তুলনা করিয়া বাবু সারদাচরণ সংক্ষেপে তৎবিবরণ এই প্রবন্ধে অতি প্রশংসনীয়রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

এই পুস্তিকার নায়ক পুরন্দর খাঁ। তাঁহার প্রকৃত নাম গোপীনাথ বসু। রাজা আদিসুরের যজ্ঞে যে পাঁচজন কায়স্থ আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বঙ্গের বসুবংশের আদিপুরুষ দশরথ বসু। দশরথ হইতে গণনায় পুরন্দর ত্রয়োদশপুরুষ। মাহিনগর সমাজের বসু বংশে তাঁহার উদ্ভব। আলাউদ্দিন হোসেন খাঁ যখন বঙ্গদেশের সুলতান, সেই সময় পুরন্দর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে খাঁ উপাধি প্রদান করেন, পুরন্দর নামটিও বোধ হয় সুলতানের প্রদত্ত। মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়া, রাজকার্য্য সম্পাদনে তিনি বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঈশান বসু। হুগলী জেলার অন্তঃপাতী পুরন্দর খাঁ একজন বিখ্যাত লোক। সারদাবাবু সংক্ষেপে তাঁহার জীবন-চরিত যেরূপ চিত্র করিয়াছেন, তাহা যথার্থই উপযুক্ত হইয়াছে। পুস্তিকাখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি-লাভ করিলাম।

অমৃত-মদিরা। ষ্টার থিয়েটারের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু বিরচিত, কালিকা যন্ত্রে সুচারুরূপে মুদ্রিত, মূল্য দেড় টাকা। পুস্তক-খানি আদ্যোপান্ত কবিতায় রচিত, সর্ব্বশুদ্ধ ৬৩টি কবিতা আছে। কৌতূহলবশে একে একে আমরা সকলগুলি পাঠ করিলাম। ইহাতে ঠাকুর আছে, মানুষ আছে, মানুষের সমাজ আছে; পশু পক্ষী আছে, এক একটি কবিতায় প্রকৃতির ক্রীড়াও আছে। সকলগুলিই সুললিত। বাবু অমৃতলাল যেরূপে সমাজ-তত্ত্বদর্শী, প্রকৃতির মর্য্যাদা রক্ষক, অথচ যেরূপ সুরসিক, অমৃত-মদিরার প্রত্যেক কাব্যাংশে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গেল। মধ্যে কিছুদিন কবিবরের দর্শনশক্তি নিস্তেজ হইয়াছিল, অমৃত-মদিরার অনেকগুলি কবিতা সেই অবস্থায় লিখিত, তাদৃশ অসুখের সময় এরূপ সুখময়ী মধুময়ী কবিতা রচনা অসামান্য প্রশংসার বিষয়, পদে পদে প্রতিভার পরিচয়। এক একটি কবিতায় কবি আপন যৌবনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়া সুকৌশলে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন, তাহাতে

মানসিক রসিকতার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়, অমৃত-মদিরা পাঠ করিয়া আমরা পরম সন্তোষলাভ করিলাম। সুরসজ্ঞ ভাবুক পাঠকেরা এতৎপাঠে বিশুদ্ধ আমোদ ও উপদেশ লাভ করিবেন, এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

ইতিপূর্ব্বে "ভারতী" পত্রিকায় এই পুস্তকের এক সুদীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছে, সেই সমালোচনায় ভারতী প্রায় ৯ পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ। সমা-লোচক অমৃত-মদিরার শেষ বাক্যটির অধিক আদর করিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল। মাত্রার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রসাস্বাদন করিলে ঐ উভয় বস্তুরই গুণে তিনি মোহিত হইতে পারিতেন, আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম, মাত্রা ঠিক রাখিতে না পারিয়া তাঁহার নেশা হইয়াছে, সেই ঘোরে তিনি সমালোচকের প্রকৃত ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছেন, কবির মনোভাব নির্ণয় করিতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে, কবিতার আলোচনা করিতে গিয়া, ছলান্বেষী অরসিকের ন্যায় কবিকেই তিনি আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণ করা উচিত ছিল, প্রতিভার কল্পনা এবং উচ্ছ্বাস, এই উভয়ই কাব্যালোচনায় বিচার্য্য। কল্পনাও অলঙ্কৃত, উচ্ছ্বাসও অলঙ্কৃত, অলঙ্কারই কাব্যের শোভা, প্রকৃত ঘটনাও অলঙ্কার যোগে সুন্দর শ্রীসম্পন্ন হয়, সমালোচক সেটি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাঁহারা প্রতিভার আদর করিতে জানেন না, কাব্যের সমালোচনায় তাঁহাদের হস্তক্ষেপ না করাই ভাল। অমৃত-মদিরার মিষ্টরস পরিহার করিয়া ভারতীর সমালোচক কেবল তিক্ত রসের আস্বাদন করিয়া-ছেন মাত্র। পণ্ডিত কবি অমৃতলালের অমৃতময়ের মিষ্টতা কত দূর, তাহা অমৃত-মদিরা পাঠে সুধীসমাজ জ্ঞাত হইয়াছেন, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা।—মাঘ মাসের প্রথমেই আমরা ১৩১১ সালের গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। গণনা উত্তম, ছাপা উত্তম, ছবি উত্তম, বাঁধাই বিলাতী। ভট্টপল্লী ও নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিত সমাজের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা এই পঞ্জিকার গণনা ও ব্যবস্থা ইত্যাদির বিশুদ্ধতার সাধন করিয়া দিয়াছেন। অতএব এই পঞ্জিকাই আমাদের হিন্দুসমাজে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই পঞ্জিকাই এতদ্দেশ প্রচলিত সমস্ত পঞ্জিকার আদর্শ স্থলে গণ্য।

হত্যাকারী কে?—শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। ইহা একটি ডিটেক্-টিভের গল্প, গল্পে বিশেষ কৌশল কিছুই দৃষ্ট হইল না। ছবি ছাপা, কাগজ, বাঁধাই, সমস্তই উৎকৃষ্ট।

রচনাদর্শ।—সেণ্টমেরি স্কুলের সংস্কৃত ভাষাধ্যাপক শ্রীযুক্ত মধুসূদন কবিভূষণ মহাশয় এইখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের বালকেরা বঙ্গভাষায় কোন প্রবন্ধ রচনার শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না; প্রবন্ধ রচনার নামে ভয় পায়, সেই অভাব পূরণ আশয়ে, রচনার আদর্শ দেখাইয়া, কবিভূষণ মহাশয় এই রচনাদর্শ লিখিয়াছেন। পুস্তকে বিবিধ বিষয়িণী বিংশতিটী রচনা আছে। এই আদর্শ দর্শনে ছাত্রেরা রচনা করিতে শিখিবে এরূপ আশা করা যায়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক মধ্যে এই পুস্তক গণ্য হইলে উপকার হইতে পারে। ভাষাটি আর একটু সরল হইলে ভাল হইত।

রস-শৃঙ্খলা।—দ্বিজানন্দ দাস কৃত। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বসু, সম্পাদিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সংক্ষিপ্ত আদি রসপ্রসঙ্গ। নায়ক নায়িকার প্রেম, নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, মিলন ও বিরহ, এই সকল কথা এই পুস্তিকার সার। কথা পুরাতন হইলেও লেখাগুলি বেশ হইয়াছে।

প্রকৃতি ও পুরুষ বা রাধাকৃষ্ণ।—দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রণীত ও শ্রীযুক্ত ঘনেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত। রাধাকৃষ্ণকে প্রকৃতি পুরুষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া প্রকৃতি পুরুষের লীলা মহিমা এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। পাঠ করিয়া দেখা গেল, রচনা প্রাঞ্জল এবং সুমিষ্ট।

সচিত্র কবিতা কোরক।—শ্রীরমেশচন্দ্র জোয়ারদার প্রণীত। আগা গোড়া কবিতায় লিখিত। কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না, যত্নে আশা করি, এই কোরক বিকশিত হইলে সুগন্ধ বিতরণ করিতে পারিবে তায়

অশ্রুধারা।—শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পত্নীর বিয়োগে পতির চক্ষে যেরূপ অশ্রুধারা নির্গত হয়, এ অশ্রুধারা সেইরূপ। পত্নী বিয়োগে প্রিয়পতি যেরূপে বিলাপ করেন, এই অশ্রুধারায় সেইরূপ বিলাপ বিবর্ণিত। একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, গ্রন্থকার স্বয়ং বলিতেছেন, তাঁহার পত্নী বাঁচিয়া আছেন। বিলাপের কারণ উপস্থিত না থাকিলেও অনুকূলবাবু যে সত্য সত্য বিলাপ বাক্য বর্ণন করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বাহাদুরী আছে। বিলাপগুলি সরল গদ্যে লিখিত, ভাব ভাষা উৎকৃষ্ট, পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। করুণরস কবিতায় লিখিলেই ভাল মানায়।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিক-পত্রিকা ও সমালোচনী।)

১২শ বর্ষ। } চৈত্র, ১৩১০ সাল। { ৯ম সংখ্যা।

জীবনীশক্তি।

ইংরাজী শরীরতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যদেহ পুংবীজ এবং স্ত্রীবীজের মিলনে উৎপন্ন হয়। পুংবীজ এক ইঞ্চের ৩৬০০ ভাগের ১ ভাগ এবং স্ত্রীবীজ এক ইঞ্চের ১২০ হইতে ২৪০ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। পুংবীজ মুষ্কাণ্ড Testicle হইতে উৎপন্ন হয়, এবং স্ত্রীবীজ, বীজকোষ ovary হইতে উৎপন্ন হয়। এই উভয় বীজই রাসায়নিক উপাদানে বিভিন্ন নহে। শরীরের অন্যান্য কোষ (Cells) যে উপাদানে প্রস্তুত, এই সকল জীবাঙ্কুর (Protoplasm) প্রায় তদ্রূপ। আমাদের দেহ মধ্যে অনেক জীবনীশক্তি-সম্পন্ন কোষ (Cells) আছে। ইহারা এক পদার্থে গঠিত হইলেও, ইহাদের ক্রিয়ার যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আমাদের দেহের প্রতি (Cell) কোষই চৈতন্যগুণসম্পন্ন, ইহারা সমগ্র দেহের এবং আপনাদের কিসে হিত ও কিসে অহিত হয়, তাহা বুঝিতে পারে। ইংরাজীতে এই শক্তিকে Selective power (নির্ব্বাচনী শক্তি) কহে। আমাদের শরীরে যাবতীয় অংশ রক্তের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইতেছে। সেই অন্নপূর্ণা-রূপিণী জীবনী-শক্তি অহোরাত্র রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার দ্বারা শরীরকে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে আপ্যায়িত ও পোষণ করিতেছে।

একই পোষণকারী রস হইতে ভিন্ন ভিন্ন Cellsগুলি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ভিন্ন পরিমাণে আকর্ষণ করিতেছে। পৈশিক কোষগুলি যেরূপ পেশীর উপাদান, অস্থির কোষ (Cell) অস্থির উপাদান এবং স্নায়ুকোষ সকলও (Nerve cell) তদনুরূপ স্ব স্ব উপাদান আকর্ষণ করিতেছে।

টেষ্টিকেল (Testicle) তদ্রূপ রক্ত হইতে শুক্র প্রস্তুত করণের উপাদান আকর্ষণ করিয়া শুক্র প্রস্তুত করিতেছে। এই শুক্রের একবিন্দুতে বহুসংখ্যক পুংবীজ আছে। ইহাদের এক একটি পিতার ন্যায় জীব উৎপাদন করিতে সমর্থ। Testicle হইতে শুক্র প্রস্তুত হইয়া শুক্রকোষে (Vesiculae Seminalis) সঞ্চিত হয়। এইরূপ পুংবীজ প্রস্তুতকরণ ব্যতিরেকে অণ্ডকোষের অন্য ক্রিয়াও আছে বলিয়া বোধ হয়। Testicle দ্বয় যদি বাল্যাবস্থায় নষ্ট করা যায়, তাহা হইলে সে পুরুষের অনেক চিহ্ন যৌবনাবস্থায়ও পরিলক্ষিত হয় না। দামড়া গরু এবং বলীবর্দ্দের অবয়বের পার্থক্য বোধ হয়, সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন। দামড়া গরুর ককুৎ প্রভৃতি না হইবার কারণ কি? Testicle না থাকা ছাড়া আর ত ইহার কিছুরই অভাব নাই। ইহাতে বোধ হয়, Testicle রক্তে কোন প্রকার আভ্যন্তরিক নিঃসরণ প্রদান করে, যেরূপ Pancreas এর আভ্যন্তরিক নিঃসরণ বহুমূত্র রোগ হইতে দেয় না। যেমন থাইরয়েড্ গ্রন্থি মাইক্সিডিমা পীড়া হইতে দেয় না, যেমন Suprarenal gland Addisions disease বন্ধ করে, সেইরূপ টেষ্টিকেল হইতে এমন এক প্রকার পদার্থ রক্তে যায়, যাহাতে দেহে পুংচিহ্ন সকল পরিলক্ষিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদে লিখিত হইয়াছে যে, "শুক্রধাতু সমস্ত ধাতুর সারভাগ।" অর্থাৎ রস হইতে শুক্রধাতু সকলের শেষে উৎপন্ন হয়। দুগ্ধে যেরূপ সর্পি থাকে, শুক্রধাতু দেহের সর্ব্বত্রই সেইভাবে অবস্থান করে। অন্নের সারভূত রস স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই ভাগে বিভক্ত হইলে শুক্রের স্নেহময় সূক্ষ্মভাগ ওজঃরূপে পরিণত হয়। ওজঃ সর্ব্বশরীরেই অবস্থান করে। উহা শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, শীতল, শরীরের বলবর্দ্ধক এবং পুষ্টিকর। ঘৃত যেমন দুগ্ধের স্নেহময় বিকার, ওজঃ তেমনি সকল ধাতুর স্নেহময় ভাগ। ইহার প্রধান স্থান হৃদয়। অনেকে না জানিয়া ইহাকে এলব্যুমেনের সহিত তুলনা করিয়া এক পদার্থ বলেন। ইহা ভ্রমাত্মক। এলব্যুমেন জীবাঙ্কুর (Protoplasm) মাত্রেই আছে এবং রক্তেও আছে, সুতরাং ইহা এলব্যুমেন্ নহে। এক মাসের মধ্যে রসের সারাংশের স্থূলভাগ হইতে পুরুষের শুক্র এবং স্ত্রীলোকের আর্ত্তব উৎপন্ন হয়। শুক্রের প্রভাবে যৌবনকালে পুরুষের রোমরাজী, শ্মশ্রু প্রভৃতি জন্মে এবং স্ত্রীলোকের রোমরাজী, পয়োধর, আর্ত্তব প্রভৃতি যৌবনের চিহ্ন সকল প্রকাশিত হয়। শুক্র সৌম্য, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ এবং

বল ও পুষ্টিকারক। ইহা শরীরের সার পদার্থ, গর্ভের বীজস্বরূপ এবং জীবনের প্রধান আশ্রয়।

ডাক্তার ব্রাউন সেকার্ড টেষ্টিকেলের সারভাগ inject করিয়া আপনাকে যুবার ন্যায় বলবান্ করিয়াছিলেন। এখনও ইহার ইঞ্জেক্সন্ বলাধানের জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে কোন কোন সম্প্রদায় গুপ্তভাবে শুক্র পান করে বলিয়া শুনা যায়। ইহাতে তাহাদের দেহের বল ও তেজ বৃদ্ধি পায়, এইরূপ ধারণা। আয়ুর্ব্বেদে কুম্ভীরের শুক্র ব্যবহার আছে;—

শাস্ত্রে লেখা আছে, "শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ"

ইউরোপের চিকিৎসকেরা এবিষয়ে কিছুই মনোযোগ দেন না বলিলেই চলে। ট্রসো বলেন যে, শুক্রক্ষয়ে বলক্ষয় হয় না এবং শুক্রক্ষয়ে দেহের অন্য কোন ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু যিনি স্থিরভাবে দেখিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারেন যে, শুক্রক্ষয়ে সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর ক্রিয়া স্তম্ভিত হয়।

কে না জানে যে, শুক্রক্ষয় হইলে স্বরভেদ হয়। গায়কেরা এ বিষয়ে বিশেষরূপ অবগত আছেন। শুক্রক্ষয় হইলে ঘর্ম্ম, রোমহর্ষ, দৌর্ব্বল্য, শ্রান্তি, সমবেদক (সিম্প্যাথেটিক্) স্নায়ু প্রভৃতির ক্রিয়া অস্বাভাবিকত্ব প্রাপ্ত হয় কেন? শিরোঘূর্ণন, চক্ষুতে অন্ধকার দেখা, হস্ত-পদাদির কম্পন, স্নায়ুশূল, এ সকল লক্ষণ অতিরিক্ত শুক্রদ্বয়ের ফল ইহা কে না জানেন? ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, শুক্রে অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা জীবনী-শক্তি বিশেষরূপে বর্ত্তমান। শুক্রক্ষয়ে যাবতীয় ধাতুক্ষয়ের লক্ষণ দেখা যায়। অতি শুক্রক্ষয়ে শরীরের সমস্ত ক্রিয়া বিকৃতভাবাপন্ন হয়—স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্য এবং শেষে ক্ষয়রোগে বা বাতব্যাধিতে দেহ ধ্বংস করে।

যেমন অশ্বত্থবীজে অশ্বত্থ-বৃক্ষ-উৎপাদিকা-শক্তি নিহিত থাকে এবং কালে সেই ক্ষুদ্র বীজ বৃহৎ অশ্বত্থবৃক্ষে পরিণত হইতে পারে, সেইরূপ মনুষ্যের প্রত্যেক পুংবীজে মনুষ্যদেহ উৎপাদিকাশক্তি আছে, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। একটি পুংবীজে সন্তান হইতে পারে সত্য, কিন্তু পিতার শরীরের অবস্থা এবং মনের ভাবের উপর শুক্রের সন্তানোৎপাদিকা শক্তি কতক পরিমাণে নির্ভর করে। যদি পিতা ও মাতার মনের অবস্থা ঈশ্বরপরায়ণ সুতরাং আনন্দময় থাকে, সন্তানও সুসন্তান হয় এবং মনের অবস্থার বৈলক্ষণ্য থাকিলে সন্তানও রুগ্ন বা দুষ্ট প্রকৃতিযুক্ত হয়।

সকলেই জানেন, দুর্ব্বল বা অতি-মৈথুন-রত পুরুষের বীর্য্য সন্তান রুগ্ন

বা স্বল্পায়ু হয়। জীবজন্তুরও এই নিয়ম। এইজন্য সতেজ বলীবর্দ্দের অভাবে কলিকাতার গোবৎস এত অধিক পরিমাণে মরে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা এক পিতামাতার বীজে উৎপন্ন ভিন্ন সন্তানের ভিন্ন গঠন এবং মনোবৃত্তি কেন হয়, জানেন না। এক রসায়নিক উপাদান এবং গঠনের বীজ ভিন্ন প্রকার দেহ এবং মনের বৃত্তি উৎপন্ন করে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন।

এই অপূর্ব্বশক্তি কি তাহা আমরা বুঝি না। এ সম্বন্ধে প্রাচীন সভ্যজাতিরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া যে সকল সুসন্তান হইবার কারণ নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলিলে কি ফল হয়, এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা পরীক্ষা করিয়া অনায়াসেই দেখিতে পারেন। আমার ধারণা, ঋষিদিগের নিয়ম পালন করিলে অনেক বিষয়ে আমাদের শ্রেয়ঃ হয়। গ্রহ-নক্ষত্রগণের মনুষ্যদেহে কোন ক্রিয়া থাকিতে পারে, আজ কাল বৈজ্ঞানিকেরা উহা ধারণা করিতে পারেন না। যখন Double Donvexlens (সূর্য্যকান্তমণি) সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাতে রাখা যায় এবং তাহার কেন্দ্র স্থানে কাগজাদি রাখিলে তাহা জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু কেন্দ্র ঠিক না হইলে সূর্য্য এবং আতুষী কাচ উভয় বর্ত্তমান থাকিলেও কাগজ জ্বলে না। এইরূপ স্থানের গুণে ফলের তারতম্য হয়, এ বিষয়ে সহস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সামান্য সূর্য্যকান্তমণির যদি স্থানের ভেদে গুণের তারতম্য হয়, তবে শনি সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহের হইবে ইহার আর বৈচিত্র কি ?

গ্রহদিগের স্থানভেদে আকর্ষণ প্রভৃতির গুণ ভেদ হয়, সূর্য্যের রশ্মি যেদিকে যায়, সেইদিকে Positive thermic electricity জন্মায় এবং তাহার বিপরীত দিকে Negetive electricity বিকাশ পায়।

সৌর জগতের গ্রহগণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আছে, নতুবা মধ্যাকর্ষণ শক্তির অভাবে পৃথিবী কোথায় থাকিত। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীকে আকর্ষণ করে বলিয়া জোয়ার ভাটা হয়, ইহা সকলেই জানেন।

চন্দ্রের মনুষ্যদেহের সহিত বিশেষ আকর্ষণ। চন্দ্র ভ্রমণ করিতে করিতে পাপগ্রহের দৃষ্টি স্থানে উপস্থিত হইলে তখন মনুষ্য-শরীরে ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা।

চন্দ্র যখন রবির নিকটে কিম্বা রবি হইতে ৪৫, ৯০, ১৩৫ ও ১৮০ অংশ অন্তরে উপস্থিত হয়, তখন চন্দ্রের প্রতি রবির অশুভ দৃষ্টি থাকে বলিয়া, লঘু আহার বিধেয় এবং নানাপ্রকার অনিয়ম অকর্ত্তব্য। চতুর্থী, অষ্টমী,

একাদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র উক্ত অশুভস্থানে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ঐ সকল তিথিতে আহার বিহারাদি সাবধানে করা উচিত।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং সংক্রান্তি দিবসে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ সময়ে আহার পরিপাকের পূর্ব্বে এবং উভয় পক্ষে কোন প্রকার ক্লান্ত, অসুস্থ ও মনের বিকৃতাবস্থায়ও স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত যে দিবসে মঙ্গল ও শনির নিকটে বা তাহাদের সপ্তমে চন্দ্র থাকে, সেই সকল দিবসে স্ত্রীসহবাস ও ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত প্রথম চারি দিবস সহবাস অবশ্যই পরিত্যজ্য। যে সকল ব্যক্তি পুত্র কামনা করেন, তাঁহারা ঋতুমতী স্ত্রীর প্রথম চারি দিবসের পর যুগ্ম দিবসে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন-কালে পবিত্র ও প্রসন্নচিত্তে স্ত্রীসহবাস করিলে সুসন্তান লাভ করিতে পারেন। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু হইবার ১৬ দিবসের মধ্যে সচরাচর গর্ভাধান হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে রজোদর্শনাবধি অষ্ট রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রির মধ্যে গর্ভাধান হইলে সেই গর্ভজাত সন্তান পুষ্ট, বলিষ্ঠ, সুস্থ ও দীর্ঘায়ুঃ হয়।

বিকটভাবে বীজগ্রহণ করিলে Placenta Praevia প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জরায়ু দোষ হইতে পারে। চরকে ও বৃদ্ধবাগভটে বীজ গ্রহণ করিবার উপদেশ আমার মতে বিশেষ উপকারী। অনেক স্ত্রীরোগ এবং ভ্রূণরোগ এবং প্রসবকালীন রোগ ইহাতে নিবারিত হয়। উক্ত গ্রন্থে লেখা আছে, অশিতা (ভুক্ত) ক্ষুধিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনা, শোকার্ত্তা, ক্রুদ্ধা, অতি মেহুরা (অতি মেদযুক্তা) অন্য কামা, অব্যবয়কামা (মৈথুনকাম শূন্যা) গর্ভং নধত্তে বিগুণং বা তথা পুরুষোপি নচাসৌ অধস্তিষ্ঠেৎ তথাহি স্ত্রীচেষ্টঃ পুমান্ জায়তে পুং চেষ্টা বা স্ত্রী ন চ ন্যুব্জাং পার্শ্বগতাং বা সংসেবেত ন্যুব্জায়া বাতো বলবান্ স যোনিং পীড়য়তি। পার্শ্বগতায়া দক্ষিণে পার্শ্বে শ্লেষ্মা সংবৃতঃ পিদধাতিগর্ভাশয়ং। বামপার্শ্বে পিত্তং তদস্যাঃ পীড়িতং বিদহতি রক্তংশুক্রঞ্চ, তস্মাৎ উত্তানা সতীবীজং গৃহ্ণীয়াৎ তস্যাহি যথা স্থানমেব তিষ্ঠন্তি দোষাঃ।—চরক শারীর স্থান ৮ম অঃ। বামপার্শ্বস্থ হইয়া শয়ন করিলে দক্ষিণ নাসিকা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ী বহে, তজ্জন্য ভ্রূণ পিত্ত দ্বারা বিদগ্ধ হয়। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ হইয়া শয়ন করিলে বাম নাসিকা বা চন্দ্রনাড়ী বহে। সুতরাং গর্ভাশয়ে শ্লেষ্মা পীড়া জন্মায়। এইরূপ করিলে বায়ু, পিত্ত ও

কফ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং গর্ভও স্বাভাবিক হইবে। প্রাচীন ঋষিদের পরামর্শ মানিয়া চলিলে সুসন্তান হইবে এবং সেই পুত্রের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা যথেচ্ছাচার করিবেন, তাঁহাদের ধাত্রী, স্ত্রীরোগ চিকিৎসক এবং কুলাঙ্গার সন্তানের যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে। এখন যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।

যে বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একবারে উদাসীন, সে বিষয়ে ঋষিরা বহুদর্শনে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলাই ভাল। যাঁহারা না জানার দরুণ এই নিময় পালন করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লেখা হইল। এ সম্বন্ধে পরামর্শ লওয়া প্রত্যেক যুবকেরই আবশ্যক।

পিতা হইতে কৌলিক ব্যাধি, দৈহিক আকৃতি, শরীরের হাব ভাব প্রভৃতি সন্তানে আইসে, ইহা সকলেই জানেন। একটি কাফরির ঔরসে এক শ্বেতাঙ্গিনীর গর্ভে মিশ্র বর্ণের পুত্র জন্মায়। পুংবীজের সংস্কারগত প্রভাবেই ইহা হইয়া থাকে। কমলেকামিনী সৃষ্টি গ্রাস করেন এবং বাহির করেন। ইহা এই বীজ এবং পূর্ণ দেহ দেখিলেই বুঝা যায়। বীজে সূক্ষ্মভাবে যে শক্তি নিহিত থাকে, তাহারই প্রভাবে কালে মহাবৃক্ষ বা জীবদেহ উৎপন্ন হয়। এক পুংবীজে যদি যাবতীয় পিতৃভাব নিহিত থাকিতে পারে এবং সময়ে উহা পিতার মত দেহে পরিণত হইতে পারে, তাহা হইলে গীতার "একাংশেনস্থিতো জগৎ" ধারণা করা অসম্ভব নহে। সেই অপূর্ব্ব জীবনীশক্তির ইয়ত্তা করিতে না পারিয়া হিন্দুরা তাহাকেই বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া পূজা করেন।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।
৩৪ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জীবন সঙ্গীত।

তুচ্ছ হীন অর্থদার্থ মত যেতেছি এ কোথা তলইয়া?
নীচমতি কোথা নিয়ে যায় জীবনের সামর্থ্য টুটিয়া?
এই সবে আরম্ভ সংগ্রাম—এই সবে প্রথম সমর;
আগে হ'তে বিভীষিকা হেরে, প্রাণ কেন পাও ভয়?

চলিতে দুর্গম বনপথে, পথভ্রম যদি ঘটে যায়,
বিবেকে ধিক্কারি পুনঃ ফিরে চল, কেন অধীরতা হায়!
কেন এ হীনতা? বাঁধ বুক, সহিষ্ণুতা—মনুষ্যত্ব-বল;
নিন্দকের নিন্দাবাদ সে ত আবর্জ্জনা, নরকের মল।
মূঢ় মন! কেন অধীরতা? মুছে ফেল নয়নের জল;
তোষামোদ নীচত্ব আত্মার, তোষামোদে প্রেতাত্মা সকল
যাক্ তারা ঐশ্বর্য্যের দেশে, ক'দিন অনিত্য তুচ্ছ ধন?
কয়দিন বিষয়-মত্ততা, লোক ত সম্মান, উচ্চাসন?
সূক্ষ্মদর্শী বিধাতার চক্ষু, এড়াবার সাধ্য আছে কার?
তাঁরি পায় মান অপমান, সুখ-দুঃখ জীবনের ভার
রেখে সাধু পদাঙ্কিত পথে ধীরে ধীরে হও আগুয়ান,
জীবনের আরম্ভ সংগ্রাম এই সবে, কেন ম্রিয়মান?

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।

প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী।

(১)

নিধুবনে বিহরই যুগল কিশোর,
ফাগু অঙ্গে আজু হইয়া বিভোর;
চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি,
শ্যাম নাগর অঙ্গে দেয়ত ডারি;
ললিত বিশাখা সখিগণ মেলি,
রহে নিয়তে সবে ফাগুলেহ গেলি;
সব সখি ডারত নাগর অঙ্গে,
নাগর খেলত রসিক সঙ্গে;
বীণ বাবহার জকাপি না বিবিধ,
যন্ত্র লেহ করয়ে বিলাস,
কোই কোই ডারত নব নব তাল;
জ্ঞানদাস কর্ণ পবিত্র ভেয়াল।

(২)

হোরি।

বসন্ত রাগ।

নতুল বসন্ত, নতুল বৃন্দাবন নতুলহি রাধাশ্যাম,
নতুল সখি সভা সব নব নব নতুন লীলা অনুপাম;
রাধা-মাধব হোরি রসে সানন্দে সহচর সহচরী বৃন্দে,
ললিত বিশাখা সেনাপতি আগে লই হেম পিচকারি;
মধু মঙ্গল সুবোল সেনাপতি সাজল রসিক মুরারি,
হিস মরত মুল খেলি উপজন সমতুল ছুঁহবরে;
ছুটে পেচকারি গোলাপ ডরি ভরি-কুঙ্কুম চন্দন অগোরে,
উড়ত আবীর অরুণ গগণা বরি,
চুরে চুরে আবরক উড়ে;—
পুহুঁপক গুচ্ছ চলল শিখিপুচ্ছ সাজবিহিন ডেল চূড়ে,
ডব ডব উম্ফ উঙ্কার গন্তের নাচত গায়ত বসন্ত;
হোরি হোরি বল ঘন দুহুঁ করতালি আনন্দ নাহি অন্ত।
লুটইতে সুবোল ললিতা আগে ধায়ল মুরতি বিন্দ করি সাথে,
ভাগল মধু-মঙ্গল আসি মিলল বিশাখা ধরিল গোপীনাথে;
শ্যামরুক কর পাকরি সব সহচরী রাই নিয়তে উপনীত,
ঢাল লাগী শীল পহু কসীর উপরি মৃগমদ গণ্ডে লেগিত;
হরি হরি বলি বলি দুন হেই করতালি রঙ্গিনী মণ্ডলী নাচে
পলহে এ পহু নাহি সবাস্তরল বহুচর কোই নাহি কাছে।
করুণা ভরিল বৃষভানু নন্দিনী,
নাগর এবে কাতর হেরি;
বাহু পশারিয়া কো আগে বল,
বল্লভ কহে বলিহারি।

শ্রীরজনীকান্ত বসু।

বিপিনবাসিনী।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

এইখানে একটী বিশেষ কথা প্রকাশ রাখা আবশ্যক। প্রসবের অগ্রে বনবালা একদিন ইসারা করিয়া গৃহিণীর কাছে সেই নাম লেখা পাতাটী চাহিয়া লইয়াছিল, তদবধি সেই পাতাটী সে নিজে পূর্ব্ববৎ আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আর গৃহিণীকে দেয় নাই; সূতিকাগারেও পরিহিত বসনে সেই পাতাটী বাঁধা ছিল।

ধাত্রীরা বেশ ঘুমাইতেছে, একজনের নাক ডাকিতেছে, বিলক্ষণ সুযোগ। বনবালা চুপি চুপি উঠিয়া চতুর্থবার বাহিরে আসিল; পূর্ব্ববৎ আকাশপানে চাহিয়া খিড়কী দরজার দিকে চলিয়া গেল, অতি সাবধানে খিড়কী দ্বার খুলিয়া রাখিল, উঠানের মাঝখানে আসিয়া আবার আকাশপানে চাহিল।

বার বার আকাশপানে চাহিতেছে, আকাশে বনবালার কি আছে? বস্তু কিছুই নাই, মনের ভাব বনবালা যেন আকাশে মিশাইয়া দিতেছে। বনবালা চাহে কি? বনবালা হয় ত উষা চায়। পল্লীগ্রামে উষাকালে অনেক রকম পাখী ডাকে, বনবালা তাহা শুনিতে পাইবে না, বনবালার শ্রবণশক্তি নাই, অথচ হয় ত বনবালা উষা চায়; আকাশ দেখিয়া উষা-লক্ষণ স্থির করিবে, এই তাহার অভিপ্রায়; সেই অভিপ্রায়েই বারম্বার আকাশ দর্শন।

আকাশে উষা-লক্ষণ সকলে যেমন জানে, বনবালাও সেইরূপ জানে। চতুর্থবার দর্শনে বনবালা বুঝিল, উষা আগত, তাহা বুঝিয়াই খিড়কী দরজা খুলিয়া রাখিল, সূতিকালয়ে পুনঃ প্রবেশ করিল, কাপড় ছাড়িল, যে কাপড় পরিল, সেই কাপড়ের আঁচলে মনের মত পথের দোসর সেই বৃক্ষ-পত্রটী খুব শক্ত করিয়া বাঁধিল, দুই তিনখানি কাপড় জড়াইয়া ছেলেটীকে বুকে করিয়া লইল; পনের দিনের ছেলে; জননীর সাহস কম নয়;—ছেলে বুকে করিয়া বনবালা টিপি টিপি উঠানে বাহির হইল।

ধাত্রীরা ঘুমাইতেছিল, জাগিল না; বাড়ীর সকলে ঘুমাইতেছিলেন, কেহই জাগিলেন না; ছেলে বুকে করিয়া, খিড়কী দ্বার দিয়া বনবালা পলায়ন করিল। পলাইয়া কোথায় যাইবে—স্থির নাই, তথাপি বনবালা আশ্রয় ত্যাগ করিয়া, দ্রুতপদে যেন ছুটিতে আরম্ভ করিল।

আমি ভাল করিয়া দু-দিন কাঁদি, তাহার পর যতদূর পারি, বলিব। দুটি দিন গত হইতে দাও।”

একাদশ পল্লব।

পরিচয়;—শুভ সম্মিলন।

দুটি দিন গেল। তৃতীয় দিবসের সন্ধ্যার পর হরেন্দ্রকুমার আপন শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিলেন; বনবালাকে ডাকিয়া নিকটে বসিতে বলিলেন। জয়াবতী একখানি বিচিত্র কাটির মাদুর বিছাইয়া দিলেন, হরেন্দ্রকুমার বসিলেন, জয়াবতী বসিলেন, ছেলেটিকে মাই দিতে দিতে বনবালাও একদিকে বসিল। বনবালার দিকে চাহিয়া হরেন্দ্রকুমার বলিলেন, “দুটি দিন দুটি রাত্রি সংশয়ের আগুনে আমি দগ্ধ-বিদগ্ধ হইয়াছি, তোমার কথা রক্ষা হইয়াছে, দুটি দিন গত হইয়া গিয়াছে, আজ তুমি তোমার জীবন-কাহিনীটি আনুপূর্ব্বিক আমাকে শুনাও।”

শিশুটিকে স্তন্য দান করিতে করিতে, শিশুটির শনিমুখ দেখিতে দেখিতে বনবালার চক্ষে জল আসিয়াছিল, জীবনকাহিনী বলিতে হইবে, তাহা ভাবিয়াই চক্ষে জল। একহস্তে উভয়নেত্র মার্জ্জন করিয়া বনবালা বলিতে আরম্ভ করিল:—

“আমরা অত্যন্ত গরীব। একখানি গ্রামের প্রান্তভাগে ছোট একখানি কুঁড়ে ঘরে আমরা থাকিতাম; আমার মা ছিলেন, বাবা ছিলেন, আমার ছোট একটি ভাই ছিল, আমি—” এই কটি কথা বলিতে বলিতে বনবালার চক্ষে আবার অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, আবার অশ্রুমার্জ্জন করিয়া একটী নিশ্বাস ফেলিয়া, অশ্রুমতি আবার বলিতে লাগিল;—

“আমি আমার সেই ভাইটিকে কোলে করিয়া খেলা দিতাম, মা আমার চরকায় সূতা কাটিতেন, দেওয়ালে ঘুঁটে দিতেন, বন-শাক-পাতা তুলিয়া আনিয়া রন্ধন করিতেন, স্বহস্তে তাঁহাকে অনেক কাজ করিতে হইত, ছেলেটিকে কোলে লইবার সময় পাইতেন না; বাবা আমার গ্রামের একখানা ময়রার দোকানে খাতা লিখিতেন; সেই চাকরিতে যাহা কিছু পাইতেন, অতি কষ্টে তাহাতেই আমাদের দিন চলিত। [ক্রমশঃ]

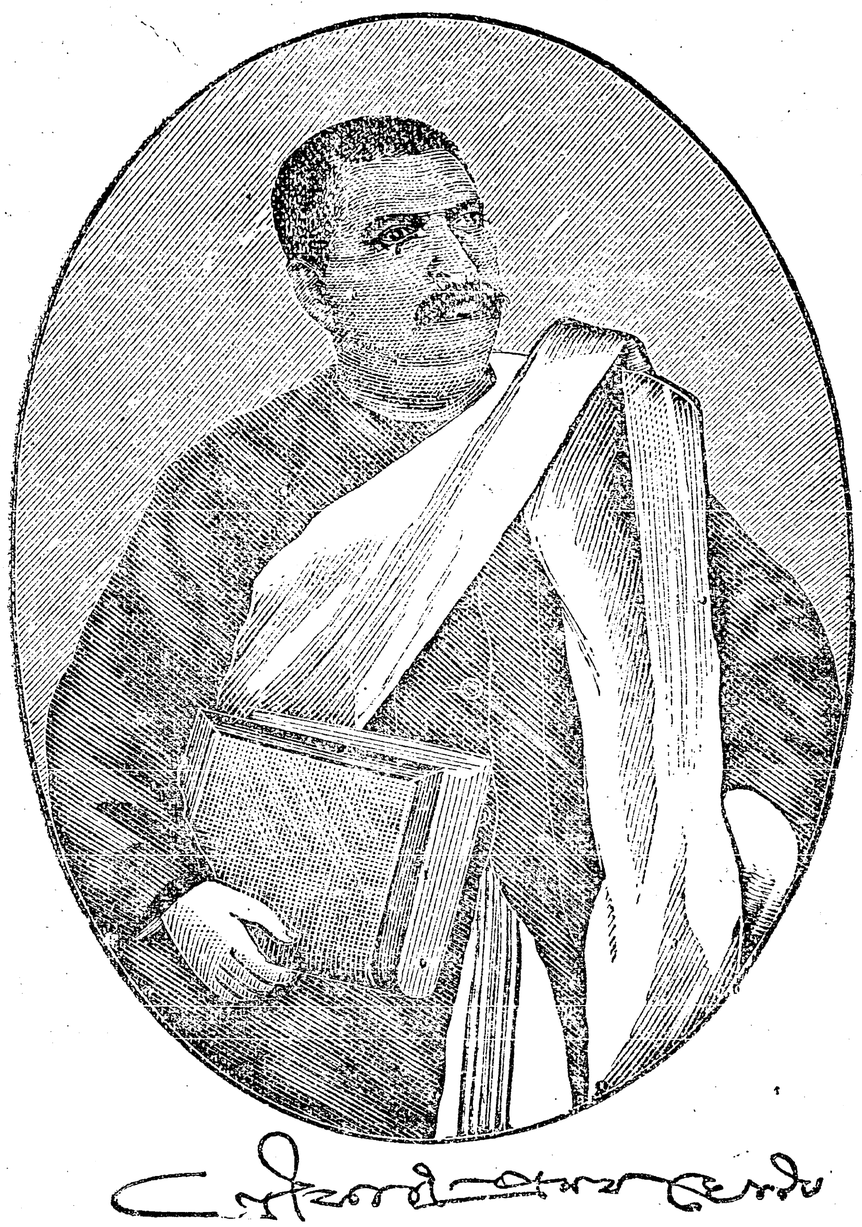

বঙ্গীয় সাহিত্য-সংসারে যাঁহারা সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের সকলের জীবনী নাই। যে কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ লোকের জীবন-চরিত আছে, তাহাও তাঁহাদের জীবনান্তে লিখিত। সজীব সাহিত্যসেবকের জীবন-চরিত আমাদের মতে অতি উপাদেয়; অতএব আমাদের বঙ্গ-সাহিত্যের বর্ত্তমান গৌরব সূর্য্য শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী সাদরে এইস্থলে প্রকটন করিলাম।

১২৫০ সালের শ্রাবণ মাসে বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্নের জন্ম। ইহাঁর পিতার নাম ৺শিবনাথ ঘোষ। শিশুকাল হইতেই ইনি প্রতিভাসম্পন্ন মেধাবী। তাঁহার পিতৃ-পিতামহ মহোদয়েরা

পারস্য ভাষার আদর করিতেন। তাঁহাদের বাড়ীতে সেই ভাষা শিক্ষার একটি মক্‌তব্‌ (পাঠশালা) ছিল। দুইজন মুন্সী সেই মক্‌তবে ছাত্রগণকে শিক্ষাদান করিতেন। তিন বৎসর বয়সের শিশু কালীপ্রসন্ন সেই পাঠশালে ভর্ত্তি হন। প্রথমে তাঁহাকে পার্শী না শিখাইয়া সচিত্র বাঙ্গালা বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয়। পাঠশালার ছাত্রেরাই তাঁহাকে বাঙ্গালা পড়াইত। পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমে হাতে খড়ি হইলে, তিনি শিশুবোধক পুস্তকের সহিত পারসী পড়িতে আরম্ভ করেন, ক্রমশঃ বয়ঃবৃদ্ধি সহকারে বাঙ্গালা রামায়ণ মহাভারত পড়িতে শিখেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি তখন এত তেজস্বিনী ছিল যে, ঐ দুই মহা-কাব্যের অনেক স্থল তিনি মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেই সময় একজন পণ্ডিতের নিকটে তিনি কলাপ ব্যাকরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্র আবৃত্তি করিতে শিক্ষা করেন।

তাহার পর বরিশাল। সে সময় বরিশালে দুটি মিশনারী স্কুল ছিল, গবর্ণমেণ্ট স্কুল ছিল না। শিশু কালীপ্রসন্ন একটি মিশনারী স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন, অনন্তর গবর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হইলে, কিছুদিন তথায় অধ্যয়ন করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন, বিবিধ প্রতিকূল ঘটনায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া, কলিকাতায় চলিয়া আইসেন।

কলিকাতায় তিনি কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন নাই, পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই বলিয়া, ভগ্নোৎসাহ হন নাই, বরং আরও অধিক উৎসাহে, অধিক অধ্যবসায়ে গৃহে বসিয়া ইংরাজী আলোচনা করিতে থাকেন, ভাল ভাল গ্রন্থকারের ভাল ভাল গ্রন্থ আলোচনা করিয়া ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অধিকার জন্মে; রাজনীতি ও সমাজের উপর ইংরাজীতে তিনি উত্তম উত্তম বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন। ইংরাজী আলোচনার সঙ্গে পানিনি ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের আলোচনা করিয়া, তিনি অমৃতময়ী সংস্কৃত ভাষার রসজ্ঞ হন।

দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালীপ্রসন্ন বাবু ঢাকা ছোট আদালতের জজের হেডক্লার্ক হইয়া ঢাকায় যান। বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সাহিত্যের আলোচনায় তিনি কিছুমাত্র আলস্য বোধ করেন নাই। বয়সের সহিত তাঁহার একটি অপূর্ণ জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তিনি বুঝিতে পারেন, বাঙ্গালীর ছেলে রাজভাষা বলিয়া ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভে অনুরাগী

হইতে পারে; হওয়াও উচিত, কিন্তু জানিতে হইবে, ইংরাজী আমাদের আটপৌরে ভাষা নহে, ইংরাজী আমাদের পোষাকী ভাষা, সে ভাষায় প্রবন্ধ লিখিয়া অথবা বক্তৃতা করিয়া দেশের কোন উপকার করিতে পারা যায় না। এই জ্ঞান উদয় হওয়াতে, বাবু কালীপ্রসন্ন তদবধি বাঙ্গালা সাহিত্য চর্চ্চায় অধিক মনোনিবেশ করিলেন, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর বাঙ্গালা বক্তৃতা যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, ভাষা চাতুর্য্যে ও ভাব মাধুর্য্যে তাঁহারা সকলে মোহিত হইয়াছেন। যে বিষয় যখন তিনি ধরিয়াছেন, তন্ন তন্ন করিয়া তখন তাহার বাদ প্রতিবাদের মীমাংসা দেখাইয়াছেন। ১২৮১ সালে "বান্ধব" নামক সুপ্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের জন্ম। বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাহার সম্পাদক। যে সকল সারগর্ভ প্রবন্ধ সুললিত ভাষায় বান্ধবে প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গের সাহিত্য সমাজ তাহা বিশেষরূপে অগবত আছেন, "বান্ধব" সৃষ্টির অল্পদিন পরে কালীপ্রসন্ন বাবু ভাওয়ালের সুবিখ্যাত ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রধান মন্ত্রীরূপে নিয়োজিত হন; তদীয় মন্ত্রীত্বে ভাওয়াল ষ্টেটের যথা-উচিত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ পদপ্রাপ্ত হইয়া অবধি তিনি জয়দেবপুরে অবস্থান করেন। রাজা কালীনারায়ণ বাহাদুরের মৃত্যুর পর তাঁহার সদ্‌গুণশালী পুত্র আশু মৃত রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বাবুর সুনীতিজ্ঞতায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সেই গৌরবান্বিত পদেই প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন, রাজকার্য্যের সুবন্দোবস্তের সৎ উপদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণকে তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের বন্ধু করিয়া তুলিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন-বাবুর যত্নে জয়দেবপুরে একটি সাহিত্য সমালোচনী সভা স্থাপিত হইয়াছে। বঙ্গের অনেকগুলি গ্রন্থকার সেই সভা হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে সাহায্যলাভ করিয়াছেন। সভাটি নিষ্প্রভ হইয়া আজিও জয়দেবপুরে বর্ত্তমান আছে।

"বান্ধব" সম্পাদন ব্রতে ব্রতী থাকিয়া, জটিল রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও কালীপ্রসন্ন বাবু যৎসামান্য অবকাশকালে ইহসংসার এবং আমাদের সমাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। প্রথম, "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব।". এই পুস্তকের সমালোচনায় হিন্দু পেট্রিয়ট্ সম্পাদক লিখিয়াছিলেন, মাইকেল যেমন বাঙ্গালা কাব্য-সংসারে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন, বাঁচিয়া থাকিলে, ইনিও সেইরূপে গদ্য-সাহিত্য-

সংসারে যুগান্তর উপস্থিত করিবেন।” হিন্দু পেট্রিয়টের দৈব্যবাণী ঠিক ফলিয়াছে। দ্বিতীয় পুস্তক “সঙ্গীত মঞ্জরী”, এখানি কবিতায় বিরচিত। তৃতীয় “সমাজ-শোধিনী”, চতুর্থ “প্রভাতচিন্তা, পঞ্চম “নিভৃতচিন্তা”, ষষ্ঠ “প্রমোদলহরী,” সপ্তম “ভক্তির জয়”, অষ্টম “নিশীথ চিন্তা”, নবম ভ্রান্তি-বিনোদ প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি অমরত্বলাভ করিয়াছেন।

পুস্তকগুলি যথার্থই উপাদেয়। ভাষা যেমন সুললিত, সেইরূপ সুখপাঠ্য, তদনুরূপ গভীর ভাবপূর্ণ। অধিক প্রশংসার বিষয় এই যে, যাঁহারা ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়াছেন, পত্রিকায় পত্রিকায় যাঁহারা সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই উহার কোন অংশের প্রতিবাদ করেন নাই, প্রদর্শিত পুস্তকের উপকারিতাও অস্বীকার করেন নাই। “বান্ধব” প্রচারের অগ্রে কালীপ্রসন্ন-বাবু “শুভ সঙ্গিনী” নামে এক পয়সা মূল্যের একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেখানি অধিক দিন চলে নাই। না চলুক, তাহাতে সম্পাদকের গুণপনার অভাব ছিল না। বাস্তবিক কালীপ্রসন্নবাবু আমাদের সাহিত্য-সংসারের একটি রত্নবিশেষ, তাঁহাকে আদর্শ করিয়া অনেকেই বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যত্নবান হইতেছেন। এদেশে যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁহারা সকলেই প্রায় দরিদ্র, সকলেই প্রায় দরিদ্রের সন্তান। কালীপ্রসন্ন বাবু দরিদ্র সন্তান নহেন, তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা সম্ভ্রমশালী ধনবান। এ অবস্থায় তিনি যে আমাদের পরমারাধ্যা লক্ষ্মী সরস্বতী উভয়েরই প্রিয় পুত্র হইয়া স্বদেশ উপকারে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, ইহা আমাদের মহা গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

ভাওয়ার্ল রাজসংসারের মন্ত্রীত্ব পদ হইতে অবকাশ গ্রহণের পূর্ব্বে গুণ-গ্রাহী গবর্ণমেণ্ট কালীপ্রসন্ন বাবুকে “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। গুণের বিচার করিয়া যোগ্য পাত্রেই যোগ্য উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের বয়স এক্ষণে ৬০ ষষ্ঠি বর্ষ। তিনি আজকাল রাজনীতি সংসার হইতে দূরে অবস্থান করিতেছেন। গুটিকতক অপ্রতিবিধেয় কারণে “বান্ধব” পত্রখানি কিছুদিন অপ্রচারিত ছিল, সম্প্রতি নূতন শ্রীধারণ করিয়া পুনঃ প্রচারিত হইতেছে। আমরা জগৎ পিতার নিকটে প্রার্থনা করি, সর্ব্বজনপ্রিয় রায় বাহাদুর দীর্ঘজীবী হইয়া সাহিত্যের উপকার ও স্বদেশের উপকারে তৎপর থাকুন।

তড়িৎপ্রবাহ ও চুম্বকাকর্ষণ।

একদিন শিশুদিগের একখানি পাঠ্যপুস্তকে পড়িয়াছিলাম—

“বিদ্যুৎ ধরিয়া হার পরিব গলায়,
তোমরা অবাক হ'য়ে দেখিবে আমায়।”

বাস্তবিক বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইতেছে, তাহাতে শিশুদিগের ঐ কথাটী উপকথার মত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাড়িতের ক্ষমতা অসীম হইলেও বিজ্ঞানের নিকট উহাকে যেন ভৃত্যের ন্যায় কাজ করিতে দেখা যায়। ঐ সকল বিষয় আলোচনা করিলে বাস্তবিকই মনে আনন্দের ও আশ্চর্য্যের ভাব উদয় হয়। যদিও বিজ্ঞানের সহিত তাড়িতের অত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হইয়াছে, তত্রাচ উহা কি বস্তু, তাহা বিজ্ঞান অদ্যাপি স্থির করিতে পারে নাই। অনেক অনুসন্ধান করিয়া শেষ হতাশভাবে বিজ্ঞানকে বলিতে হইয়াছে যে উহা একটী শক্তিবিশেষ। তাড়িতের স্বত্ত্বা উহার কার্য্যেই প্রকাশ পায়, কিন্তু উহার প্রকৃতিগত ভাব (Inner nature) কি, তাহা জানা যায় নাই। দয়াময়, তোমার কার্য্য দেখিয়া তোমার স্বত্ত্বা উপলব্ধি করি, কিন্তু তুমি কি তাহা অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞান জানাইতে পারিল না।

আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণ এই তাড়িত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না, তবে বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে উহার ব্যবহার বা আবিষ্কার হইতেছে, পূর্ব্বে হয় ত সেরূপ ভাবে কার্য্য হইত না। রামায়ণে রাবণের পুরীতে বারমাস চন্দ্রালোকের বিষয় যাহা শুনা যায়, তাহা ঐ তাড়িতালোক ব্যতীত আর কিছুই নয় বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ সম্বন্ধে আলোচনার আবশ্যকতা নাই।

তাড়িত সম্বন্ধে বলিতে গেলে উহার ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু বলা অযৌক্তিক হইবে না। ইহার আবিষ্কারক গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত থালেশ (Thales) ৬০০ পুঃ খৃষ্টাব্দে যখন ঐ পণ্ডিতপ্রবর রেশমের সহিত অম্বর বা তৃণমণি (Amber) ঘর্ষণ করিয়াছিলেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা বস্তু (যেমন পালক) উহা দ্বারা আকৃষ্ট হইতেছে। তাহার পর ছয় শতাব্দী অতীত হইলে রোমদেশীয় পণ্ডিত প্লিনি (Pliny) দেখিলেন যে, অঙ্গুলি ঘর্ষণেও ঐরূপ কার্য্য হয়। তাহার পর ষোড়শ

শতাব্দীতে যখন রাণী এলিজাবেথ (Elizebeth ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরূঢ়া ছিলেন, তখন ভীষকপ্রবর ডাক্তার জিলবার্ট (Dr Gilbert) এ বিষয় একটু বিশদভাবে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে গন্ধক কাচ প্রভৃতি দ্রব্যের ঘর্ষণেও ঐরূপ কার্য্য হয়।

জগতে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহাদের সকলের মধ্যে তাড়িৎ বিদ্যমান আছে। জীবশরীর ও পৃথিবী তাড়িতের আকর। শুষ্ককাষ্ঠেও উহা বিদ্যমান আছে, দাবাগ্নিই তাহার প্রমাণ। দূর অতীতের ইতিহাস দেখিলেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঋষিগণ কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন। ঐ কাষ্ঠকে তাঁহারা অরণি বলিতেন। তড়িৎ তিন প্রকারে উৎপন্ন হয়, যথা (১) প্রাকৃতিক (২) যান্ত্রিক (৩) রাসায়নিক। এই তিনটী বিষয় ক্রমে আলোচনা করা যাইবে।

সকল বস্তুতে তড়িৎ সঞ্চিত থাকিলেও উহার প্রবাহ সকল বস্তুতে সমান হয় না। কতকগুলি বস্তু আছে যে, তড়িৎ উহাতে উৎপাদন করিলে সেই স্থানেই থাকিয়া যায়। কতকগুলিতে সামান্যমাত্র প্রবাহ হয়। আর কতকগুলিতে অতি সত্বর প্রবাহিত হইয়া যায়। এই স্থানে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, যে সকল বস্তু তাড়িতের পরিচালক, সেগুলি যে আলোক বা তাপেরও পরিচালক হইবে, তাহা নয়। কাচ, শুষ্ককাষ্ঠ ও লৌহ তাহার দৃষ্টান্ত। যে দ্রব্যে অতি শীঘ্র তড়িৎ প্রবাহ চলিয়া যায়, সেগুলির নাম তড়িৎ-পরিচালক ; যে গুলির মধ্যে অল্প পরিমাণে তড়িৎ প্রবাহিত হয়, সে গুলির নাম অর্দ্ধ-তড়িৎ-পরিচালক এবং যে গুলিতে তড়িৎ-প্রবাহ স্থির থাকিয়া যায়, সেগুলির নাম তড়িৎ-অপরিচালক। নিম্নে তাহার কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।—

তড়িৎ-পরিচালক	অর্দ্ধ-তড়িৎ-পরিচালক	তড়িৎ-অপরিচালক
ধাতুদ্রব্য	আলকোহল	শুষ্ক অক্সিজেনিক বস্তু
গ্র্যাফাইট	ইথর	শুষ্ক বায়ু ও শুষ্ক বাষ্প
অম্ল	কাচচূর্ণ	শুষ্ক কাগজ
জল	শুষ্ককাষ্ঠ	রেশম, হীরক, বহুমূল্য প্রস্তর
বরফ		কাচ
সজীব বৃক্ষ		গন্ধক
জীব-শরীর		ধূনা ও রজন

ভাই, তুমি আমি শুষ্ককাষ্ঠ ; পরের সাহায্যে যদি একটু ঘর্ষিত হইলাম, দুই এক ফোঁটা চখের জল ফেলিলাম, তাহা কিন্তু সেই ঘর্ষণের সংকীর্ণ স্থানেই আবদ্ধ থাকে, বড় জোর দুই একদিন থাকে, দয়াময়ের নাম হৃদয়ে পৌঁছে না।

সকল ধাতুই তড়িৎ-পরিচালক। তন্মধ্যে রজত সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তন্নিম্নে তাম্র। লৌহ তাম্রাপেক্ষা ছয়গুণ, সীসক বারগুণ এবং পারদ ষাটগুণ কম পরিচালক। রৌপ্য অপেক্ষাকৃত মূল্যবান ধাতু, সুতরাং উহার ব্যবহার হয় না। তাম্র প্রায় সমগুণসম্পন্ন, সুতরাং অনেক স্থলে উহার ব্যবহার হয়। লৌহ ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয়, কারণ উহা আরও স্বল্প মূল্য। তবে লৌহ ব্যবহার করিলে তাম্রাপেক্ষা ছয়গুণ মোটা তার ব্যবহার করা উচিত।... (হৃদয়ে সামান্য আবেগবিশিষ্ট লোক অধিক চেষ্টা না করিলে আপেক্ষিক পূর্ণতায় উপনীত হইতে পারে না)। দুইটী তড়িৎ-পরিচালক ধাতুর মিশ্রণ দুইটি তড়িৎ-পরিচালক ধাতুর মিশ্রণ উভয় ধাতুর তাড়িতের পরিচালনার শক্তি হইতে বিভিন্ন হয়। যদি শতকরা ১ ভাগ রৌপ্য ও ৯৯ ভাগ তাম্র মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে শতকরা ৯০ ভাগ তাড়িত পরিচালক শক্তি থাকে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে তাম্র প্রায় রৌপ্যের তুল্য-পরিচালক এবং রৌপ্য সমধিক তড়িৎ-পরিচালক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঐরূপ মিশ্রণে গুণের হ্রাস হয়।...তাই সন্ন্যাসী গৃহীর সহিত মিশে না—যিনি মিশিলেন, তাঁহার অবশ্যম্ভাবী গুণের হ্রাস হইবে।

যদিও সমস্ত বস্তুতে তড়িৎ সঞ্চিত আছে, তত্রাচ উহা প্রকাশ হইবার সময় দুইরূপ গুণবিশিষ্ট দেখা যায়। একটীতে আকর্ষণ (Attraction) হয় ও অপরটীতে বিকর্ষণ (Repulsion) হয়। একটী রেশমের সূত্র প্রান্তে একটী সোলা বা কর্ক ঝুলাও। তৎপরে একটী পরিষ্কার ও শুষ্ক কাচদণ্ডের সহিত রেশমবস্ত্র ঘর্ষণ কর এবং ঐ কর্কখণ্ডের নিকট লইয়া যাও। এইরূপ করিলে দেখিবে, ঐ কর্কখণ্ড আকৃষ্ট হইয়া কাচদণ্ডে সংলগ্ন হইবে কিন্তু পরক্ষণেই দেখিবে, উহা কাচখণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া দূরে যাইতেছে। কিন্তু ঐ সময় যদি আর একটী গালার বাতি ঐরূপে রেশমী বস্ত্রে ঘষিয়া ঐ কর্কের নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তবে দেখা যায়, উহা আকৃষ্ট হইতেছে। প্রথমে যখন রেশম ঘর্ষিত-কাচে কর্কখণ্ড

সম ও বিষম তড়িৎ

আকৃষ্ট হইয়া সংলগ্ন হইয়াছিল, তখন কর্কখণ্ডে কিঞ্চিৎ তড়িৎ সংবদ্ধ হইয়াছিল; কারণ কর্ক তড়িৎ-অপরিচালক। এক্ষণে গালাখণ্ডে ঘর্ষণে যে তড়িৎ উৎপন্ন হইল, উহা দ্বারা কর্কখণ্ড বিপ্রকর্ষিত না হইয়া আকৃষ্ট হইল। সুতরাং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ দুইটী সঞ্জাত তড়িৎ বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। প্রথমটী অর্থাৎ কাচে উৎপন্ন তড়িৎকে সম (Positive) এবং গালায় উৎপন্ন তড়িৎকে (Negative) বা বিষম তড়িৎ বলা যায়।

(১) একধর্ম্মাক্রান্ত তাড়িতের সহিত সেই ধর্ম্মাক্রান্ত তড়িতের বিকর্ষণ হয়।...পাশ্চাত্য জগতে তাই এত Divorce case হয়। (খ) এক ধর্ম্মাক্রান্ত তাড়িতের সহিত বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত তাড়িতের আকর্ষণ

তড়িৎ আকর্ষণ ও বিকর্ষণের নিয়ম

হয়।...দয়াময়, আমরা সংসারী জীব, সগুণ, আর তুমি চিৎস্বরূপ নির্গুণ, তাই আমাদের পরস্পর এত আকর্ষণ !! (২) দুইটী সঞ্জাত তড়িৎ বিশিষ্ট বস্তুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ উহাদের দূরত্বের বর্গফলের বিপরীত অনুপাত। অর্থাৎ যদি দুইটী বস্তুকে কিঞ্চিৎ সঞ্জাত তড়িৎ করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ শক্তি তড়িৎ-উৎপত্তির পার্থক্য বা সাম্যভাব অনুসারে হইবে। যদি ঐ দুই বস্তুকে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ পরিমিত দূরে রাখা যায়, তাহা হইলে তাহাদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ প্রথমাবস্থায় $\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৯}$ হইবে। যদি ঐ বস্তুকে পূর্ব্ব দূরত্বের অর্দ্ধেক দূরে আনা যায়, তাহা হইলে উহাদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ ৪ হইবে ($\frac{১}{২২}$: $\frac{১}{৪}$ ইহার বিপরীত অনুপাত ৪)। (৩) যদি দুইটী সঞ্জাত তড়িৎ বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যের দূরত্ব সমান থাকে, তাহা হইলে তাহাদের আকর্ষণ বা বিকর্ষণ শক্তি, যে পরিমাণে তড়িৎ শক্তি বৃদ্ধি করিবে, তাহার গুণফলের সমান আকর্ষণ বা বিকর্ষণ হইবে। মনে কর, দুইটী বস্তুতে তড়িৎ উৎপাদন করিয়া কিছু দূরে রাখা হইয়াছে। এখন উহাতে যদি দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ পরিমাণে তড়িৎ শক্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দুই বস্তু প্রথম অপেক্ষা দুই বা তিনগুণ প্রভাবে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিবে।...ঐ আকর্ষণের জন্য গুরুর আবশ্যক। হৃদয়ের অন্তস্তলে যেটুকু সদিচ্ছা, ধর্ম্মানুরাগ বা প্রেম থাকে, তাহা ঐ ভাবেই বৃদ্ধি করা যায়।

সম ও বিষম তড়িতোৎপত্তি, যে বস্তু দ্বারা ঘর্ষণ করা যায়, তাহার উপর নির্ভর করে। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলিতে কোন্ প্রকার তড়িৎ উৎপন্ন হয়, তাহার একটী সাঙ্কেতিক নিয়ম লিখিত হইল।

সম ও বিষম তড়িৎ উৎপত্তির একটী নিয়ম

যথা—পূর্ব্ববর্ত্তী দ্রব্য দ্বারা পরবর্ত্তী দ্রব্য ঘর্ষণ করিলে বিষম এবং তৎ বিপরীত সম তড়িৎ উদ্ভূত হয়। ইহা দৃষ্টান্তে দেখান যাইতে পারে যে, বিড়াল-চর্ম্ম দ্বারা কাচ ঘর্ষণ করিলে বিষম তড়িৎ উৎপন্ন হয়, কিন্তু রেশম দ্বারা ঘর্ষণ করিলে সম তড়িৎ উৎপন্ন হয়।

দ্রব্যগুলির নাম যথা—১ বিড়াল-চর্ম্ম ২ ফ্লানেল ৩ কাচ ৪ রেশম ৫ হস্ত ৬ কাষ্ঠ ৭ Caoutchon ৮ রজন ৯ গন্ধক ১০ গটাপার্চ্চ ১১ Gun Cotton (ইহা নাইট্রিক এসিড ও সলফিউরিক এসিডে তুলা ডুবাইয়া শুষ্ক করিয়া লইলেই প্রস্তুত হয়। ইহা বারুদের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়।

আকৃতি।—তবে আরও দুইটী প্রক্রিয়ায় ঐ যন্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদন হয়। সেগুলির উদ্দেশ্য যে, বোতলের ভিতরে এবং বাহিরে তড়িৎ অপরিচালকত্ব ভাব রাখা। ইহার জন্য ঐ বোতলের উপরিভাগে পাতগালার বার্ণিস লাগান হয় এবং বোতলের ভিতরের বায়ু শুষ্ক রাখিবার জন্য কলিচূণ (Quicklime) বা গন্ধকদ্রাবক (Sulphuric acid) ভিজান পিউমিস প্রস্তর রাখা হয়। পূর্ব্বোক্ত পিতলের শলাকার উপরিভাগ বর্ত্তুলাকার করিবার উদ্দেশ্য এই যে, উহাতে তড়িৎ-প্রবাহ বিকীরণ বা সঞ্চালিত হইবে না, সূক্ষ্মাগ্র হইলে সেই মুখ দিয়া ঐ প্রবাহ চলিয়া যাইতে পারে। এক্ষণে ঐ যন্ত্র দিয়া কিরূপে তড়িৎ-উৎপত্তির অস্তিত্ব জানা যায়, তাহার বিষয় বলা যাইতেছে।—একটী গালার বাতি (Sealing wax) ফ্লানেলে ঘর্ষণ করিয়া ঐ বর্ত্তুলাকার পিতলের দণ্ডের নিকট লইয়া যাও, (স্পর্শ করিবার আবশ্যকতা নাই) তাহা হইলে দেখিবে, বোতলের ভিতরের সুবর্ণপাত দুইটী পরস্পর বিচ্ছিন্ন (Diverge) হইয়াছে। ঐ যন্ত্রটী এরূপ সামান্য উত্তেজনায় কার্য্যকরী (Sensitive) যে, উটপক্ষীর (Ostrich) পালকের ঝাড়ন দিয়া ঐ বর্ত্তুল সামান্য ঘষিলে উক্তরূপ সুবর্ণপাত বিচ্ছিন্ন হয়। ঐ যন্ত্রটীকে দুইরূপে তড়িত্বান করা যায় (Electrify) যথা (১ম) চাক্ষুষ স্পর্শন (Condection) (২য়) দূরত্বিক স্পর্শন (Induction) অর্থাৎ স্পর্শ না করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া দেওয়া। এই যন্ত্রের সাহায্যে সম কিম্বা বিষম তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও জানা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ফ্লানেলের সহিত গালা বাতি ঘর্ষণ করিলে বিষম তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এখন দূরত্বিক স্পর্শন দ্বারা ঐ যন্ত্রটীকে তড়িত্বান কর। এখন সম

তড়িৎ বিষমের সহিত বদ্ধ (Bound) রহিল। এই সময়ে যদি তড়িৎ-নিরূপক যন্ত্র (ইহার বিষয় পরে বক্তব্য) দুই উপায়ে তড়িত্বান করা যায়। ১ম উপায় এই যে, কোন বস্তুকে তড়িত্বান করিয়া উহা উক্ত যন্ত্রে স্পর্শ করিয়া যন্ত্রটীকে তড়িত্বান করা হয়। ইহাকে চাক্ষুষ স্পর্শন (Conduction) কহে। দ্বিতীয় ঐ বস্তুটিকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাতেও উক্ত কার্য্য সমাধা হয়। ইহাকে দূরত্বিক স্পর্শন (Induction) কহে। এই দুই প্রকার কার্য্যের উদাহরণ পরে দেওয়া যাইবে। ১ম উপায় দ্বারা ঐ যন্ত্রটীকে তড়িত্বান করিলে যে তড়িৎ (সম বা বিষম) দিয়া ঐ কার্য্য করা যায়, সেই তড়িৎ-প্রভাবে তড়িৎ-নিরূপক যন্ত্রের সুবর্ণ পত্র বিচ্ছিন্ন হয় এবং ২য় উপায়ে করিলে যে সঞ্জাত তড়িৎবিশিষ্ট বস্তুটী দূরে রাখা যায়, সেইটী বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত তড়িৎকে টানিয়া রাখে এবং নিজ ধর্ম্মাক্রান্ত তড়িৎ ছাড়িয়া দেয় এবং তাহাতেই সুবর্ণ পত্রদ্বয়ের বিচ্ছেদ ঘটে। এই টানিয়া রাখা অবস্থাকে বদ্ধাবস্থা (Bound) ও ছাড়িয়া দেওয়ার অবস্থাকে মুক্তাবস্থা (Free) বলে।

চাক্ষুষস্পর্শন (Conduction)
দূরত্বিক স্পর্শন (Induction)

এই যন্ত্রের আর একটী নাম বেনেটের তড়িৎ-নিরূপক যন্ত্র (Bennetts Electroscope)। ইহার কারণ এই যে, এই যন্ত্রের প্রথম উদ্ভাবক Bennett সাহেব কোন দ্রব্য তড়িৎ উৎপত্তি হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য এই যন্ত্রের আবশ্যক। অতি সামান্যরূপে দুইটী বস্তু ঘর্ষিত হইলে মনে হয়, হয়ত উহাতে তড়িৎ উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে উহা বিশেষরূপ লক্ষিত হয়। যন্ত্রের বিবরণ।—সাদা কাচের (তাহা হইলে বাহির হইতে ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যাইবে) একটী মোটা বোতলের মুখে একটী কর্কের ছিপি আছে। ঐ ছিপির মধ্যদেশ দিয়া একটী পিতলের শলাকা আঁটভাবে প্রবিষ্ট করান আছে। ইহার উপরদিকটী বর্ত্তুলাকার এবং নিম্নদিকটীতে (যে মুখটী বোতলের ভিতর আছে) দুইখণ্ড অতিশয় পাতলা সুবর্ণপাত * সংলগ্ন আছে। ইহাই এই যন্ত্রের সাধারণ ঐ বর্ত্তুলটী

সুবর্ণপাতবিশিষ্ট তড়িৎ-নিরূপক যন্ত্র
Gold lafelectroscope

* "সুবর্ণকে পিটিয়া এত পাতলা করা যায় যে, তাহার দশ লক্ষখানি উপর্য্যুপরি রাখিলেও ১ইঞ্চি পুরু হয় না।"

হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে মুক্ত (Free negative electricity) বিষম তড়িৎ পৃথিবীতে চলিয়া যায়। এখন উহাতে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত তড়িৎ রহিল, সুতরাং বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত সুবর্ণ পত্রদ্বয় একত্র হইয়া যাইবে। এরূপ অবস্থায় যদি ঐ বর্ত্তুল হইতে অঙ্গুলি সরাইয়া লওয়া যায় এবং তৎপরেই ঐ গালাবাতি সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ পত্রদ্বয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; কারণ সমতড়িৎই উহাতে ছড়াইয়া পড়িল। এখন জানা রহিল; ঐ যন্ত্রে শুদ্ধ সমতড়িৎই প্রকাশ্যভাবে আছে। এখন যদি অন্য কোন দুইটী বস্তু ঘর্ষণ করিয়া ঐরূপভাবে দূরত্বিক স্পর্শ করা যায় এবং যদি তাহাতে সুবর্ণপত্রদ্বয় মিলিত হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, উহা বিষম তড়িৎ, কারণ আকৃষ্ট হইয়া মিলিত হইয়াছে। যদি উহা সম তড়িৎ হইত, তাহা হইলে আরও বিচ্ছিন্ন হইত। * * * ভাই, আমাদের এই দেহটা ঐরূপ তড়িৎ-নিরূপক যন্ত্র। মস্তক, বর্ত্তুল (Knob); হৃদয় সুবর্ণ পত্র (Gold leaf) শরীরটা কাচের বোতল তড়িৎ পরিচালক (Non-Conductor to Electricity); উপরের বার্ণিস সংযম। যখনই প্রেমময়ের প্রেমকণা আমাদের মস্তকে দূরত্বিক স্পর্শন হয়, তখনই স্বার্থপরতা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি তাঁহাতেই আকৃষ্ট হয়; তখন যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা সেই প্রেমকণা।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সরোবর তীরে

সময়—সন্ধ্যা।

যামিনী—

দেখলো সজনি, তৃষিত নয়নে
কমলিনী চায় রবির পানে;
রবি অস্ত যায়, তাই বুঝি বালা,
প্রাণেশ-মূরতি ধরিছে ধ্যানে।

মরি কি মধুর, প্রণয় আবেশ
বিভোর হইয়া পড়িছে ঢলে ;
প্রাণেশের ছবি, হৃদয় মাঝারে,
লুকায়ে রাখিছে কোমল দলে।
বিরহ যাতনা, কি যে তা জানে না,
ধ্যানে হেরি পতি যাতনা ভোলে,
শেখ লো মলিনা, এ হেন প্রণয়,
সুখে যাবে দিন স্বামীর কোলে।

সবাসনা—

সত্য বটে ভাই, পবিত্র প্রণয়
শিখিতে বাসনা যদি লো আছে,
মানব ছাড়িয়া, মনের আবেগে
ছুটিয়া যাও লো প্রকৃতি কাছে।
কুমুদিনী অই, হের পুনঃ সই,
নিশানাথ তার উদিছে বলে,
হৃদয় আপন, খুলিছে যতনে,
পাতিছে নবীন কোমল দলে।
বসাবে প্রাণেশে, মনের হরষে,
বড় সাধ বালা করেছে মনে ;
হিমহার দিয়া সাজাইছে তাই,
হৃদয় আসন অতি যতনে ॥

মলিনা—

বুঝিলাম কমলিনী বড় ভালবাসে,
ভক্তিভাবে সেবা করে হৃদয়-রতনে,
দিবাভাগে রহি নিত্য দিবাকর পাশে,
অর্পয়ে প্রণয়-নিধি স্বামীর চরণে ;—
কিন্তু ভাই বল দেখি এ কেমন কথা,
এ হেন প্রেমিকা হয়ে নিঠুর এমন,
নিজসুখে ভুলে যায় সহচরী-ব্যথা,
কুমুদীর দুঃখে হৃদে লাগে না বেদন !

কুমুদ নলিনী এরা থাকে এক স্থানে,
পাশাপাশি ফুটে রহে সলিল উপরে,
কিন্তু তবু ইহাদের—ব্যথা লাগে মনে,
সমবেদনায় কভু হৃদি না বিদরে।
হৃদয় পাষাণ সম কঠিন যাদের
কেমনে রহিবে সেথা পবিত্র প্রণয়,
একবিন্দু আঁখি জল ঝরে না তাদেয়,
স্মরি সহচরী দুঃখ, লাগিছে বিস্ময়।
আমি জানি সেই বালা আদর্শ প্রেমিকা
পরদুঃখে চোখে যার ঝরে অশ্রুজল ;
সুপবিত্র প্রেম-ফুলে শোভে যে লতিকা,
স্বার্থত্যাগী সেই, তার হৃদয় কোমল ॥

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ।

অই আঁখি পানে।

অই আঁখি পানে
চাহিলে—কতই কথা পড়ে মোর মনে ;
মনে পড়ে কত আশা, কত সাধ ভালবাসা,
কত হাস্য-পরিহাস সুখভরা গানে।
অই আঁখি পানে
চাহিলে—সকলি আর ভুলি সেইক্ষণে,
মনে মোর লয় হেন, আমার জীবন যেন,
তোমারি প্রতীক্ষা করি আছে ধরাধামে।
অই আঁখি পানে
চাহিলে,—ভুলিয়া যাই আমি কোন্ খানে ;
মন্ত্রমুগ্ধ সর্পমত, শক্তিহীন হস্ত পদ,
স্তম্ভিত হইয়া রই কি যেন কি টানে।

অই আঁখি পানে
চাহিলে,—ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আমার নয়ানে ;
জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পায়, লাজ ভয় দূরে যায়,
মুহূর্ত্তে ঝটিকা যেন ব'য়ে যায় প্রাণে !
অই আঁখি পানে
চাহিলে,—মরণ-সাধ জাগে মোর প্রাণে।
কি বলিব অই দৃষ্টি, শুধু হলাহল বৃষ্টি,
বিষাক্ত করিল মোর সমস্ত জীবনে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বসন্ত বর্ণন।

শীতরাজে হীনতেজ করি দরশন।
বসন্ত সামন্ত সহ আইল ভুবন ॥
বহিল মলয়ানিল পরশ মধুর।
শীতের উত্তর বায়ু ক্রমে হলো দূর ॥
দিন দিন প্রখর হইল দিনকর।
অশীত হইল তরু লতা জীব নর ॥
শীতের শির্শির পাত হৈল নিবারণ।
মুঞ্জরিল সহকার মুঞ্জ দরশন ॥
মধুগন্ধে মধুকর হয়ে অন্ধপ্রায়।
দলে দলে বসিতেছে শাখায় শাখায় ॥
ফুটিল করবী কুন্দ মল্লিকা মালতী।
কুসুম ভূষণে যেন সাজিল প্রকৃতি ॥
মাধবীলতায় কত ফুলের গাঁথানী।
যেন দোলে প্রকৃতির ফুলময়ী বেণী ॥
পল্লবিত তরুকুল কিশলয় সাজে।
সাজাইল সমাদরে নব ঋতুরাজে ॥
আইল কোকিল দল গাইল মধুর।
অলির গুঞ্জন মৃদু বাজিল নূপুর ॥
নাচিল লবঙ্গ-লতা নাচায় পবন।
কুসুম কুসুম রেণু করে বরিষণ ॥
গন্ধহীন শিমুলীর কুসুম প্রভায়।
দিক্ আবরিল যেন রক্ত সন্ধ্যা প্রায় ॥
ফুটিল পলাশ কত দেখিতে সুন্দর।
সুগন্ধ অভাবে কেহ করে না আদর ॥
জম্বীর সজিনা লুটাইল ফুলভরে।
সৌরভে ভরিল দেশ গৌরব না ধরে ॥
তথাপি সমাজে সমাদর নাহি পায়।
যে হেতু না লাগে কভু দেবতা পূজায় ॥
গুলাল চম্পক নাগেশ্বর বেলীফুল।
ফুটিল জুটিল মধুগন্ধে অলিকুল ॥
শীতের শিশিরপাত হইল বিরাম।
সরোবরে সরসীজ নয়নাভিরাম ॥

জল স্থল ফুলময় সুখময় দেশ।
সুখে মত্ত নরনারী নাই দুখ লেশ ॥
নাই নিদাঘের তাপ শীতের বাতাস।
ভুবনে উছলি পড়ে আনন্দ উল্লাস ॥
কি বিচিত্র হে মানব! নিয়োগে কাহার
কালে কালে হয় নব ঋতুর সঞ্চার ॥
পর পর যার যেই নির্দ্দিষ্ট সময়।
যথাকালে হইতেছে আপনি উদয় ॥
যথাকালে তরুকুল দেয় ফুল ফল।
যথাকালে জলধর বরিষয়ে জল ॥
শরতে বিমল শশী, শিশিরে মলিন।
নিদাঘে প্রখর রবি, শীতে তেজহীন ॥
কে সৃজিল এ জগৎ দেখিতে সুন্দর।
কে সৃজিল নৈশাকাশে তারকা-নিকর
জানকি চেন কি তারে কর কি স্মরণ।
সৃজিয়া তোমারে যেবা করিছে পালন
মরিয়া যাইবে তার সুকোমল কোলে
এমন অন্তিম বন্ধুজনে আছ ভু'লে ॥
জগৎ ঈশ্বর তিনি দয়ার আধার।
কায়মনে ভক্তি রাখ চরণে তাঁহার ॥
জীবের হিতের লাগি সতত চিন্তিত।
কে আছে দয়ালু সেই ঈশ্বরের মত ॥
নিদাঘ প্রাবিট্ আর শরৎ হেমন্ত।
নিদারুণ শীতকাল সুখের বসন্ত ॥
নিয়ত সাধিছে হিত নিয়োগে যাঁহার।
কায়মনে ভক্তি রাখ চরণে তাঁহার ॥
পিতার সোহাগে যিনি জননীর স্নেহ
শুধিতে তাঁহার ঋণ না পারিবে কেহ ॥
রবি-শশী তারকা আকাশ সমীরণ।
সলিল অনল ধরা গিরি নদী বন ॥
নিশি দিন মাস ঋতু অয়ন বৎসর।
বার তিথি দ্বিপক্ষ ত্রিসন্ধ্যা মন্বন্তর ॥
চক্ষু কর্ণ নাসিকা রসনা কলেবর।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদাদি প্রখর ॥
ভৃত্যপ্রায় রহিয়াছে শাসনে যাঁহার।
কায়মনে ভক্তি রাখ চরণে তাঁহার ॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়িয়া।
বাসুদেবপুর।

সমালোচনা।

গিরীশ গীতাবলী।—একখানি পুস্তক আমরা উপহার পাইয়াছি। রয়েল বত্রিশ পেজি, পাঁচশতাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। "নাট্যজগতের একচ্ছত্র সম্রাট্" শ্রীযুক্ত বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের সংক্ষিপ্ত জীবনীর সহিত তাঁহার বিরচিত, প্রকাশিত অপ্রকাশিত বহুসংখ্যক গীত এই পুস্তকে আছে। শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এই পুস্তক সম্পাদন করিয়াছেন।

বাবু গিরীশচন্দ্র ঘোষের জীবনচরিত জ্ঞাত হইতে অনেকের অভিলাষ, অবিনাশ বাবু কতকাংশে পাঠকের সে অভিলাষ পূর্ণ করিয়াছেন; এখন কথা হইতেছে গীতাবলীর। বাবু গিরীশচন্দ্রের বিরচিত গীত যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে গিরীশবাবুর রসজ্ঞতার পরিচয় দিবার আর প্রয়োজন নাই। গিরীশবাবু স্বয়ং গায়কখ্যাত নহেন, কিন্তু যখন যে গীতে যে যে রাগ রাগিণীর ধুয়া ধরিয়াছেন, সেই সেই স্থানে রস গড়াইয়া আসিয়াছে। গিরীশবাবু রচিত গান শুনিয়া হাসিতে হয়,—হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া পড়িতে হয়; আবার একস্থানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইতে হয়; কোথাও আতঙ্কে জড়ীভূত হইতে হয়, কোথাও ঘৃণায় মুখ বাঁকাইতে হয়; কোথাও আনন্দে উন্মত্ত হইতে হয়; কোথাও বা অমরাবতীর ভেরি শুনিয়া স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা হয়। গিরীশবাবুর গীতাবলীতে হাস্য, করুণ, বীভৎস্য, রৌদ্র প্রভৃতি সর্ব্বরসের সমাবেশ আছে। গিরীশবাবুর গীত আজকাল সর্ব্ব শ্রেণীর কর্ণে মিষ্ট লাগিতেছে; পথের ভিখারিরা, যাত্রার সখীরা, এমন কি, মাঠের রাখালেরা পর্য্যন্ত আজ কাল কেবল গিরীশ-বাবুর গীত গায়। মিষ্ট না লাগিলে এমনটি ঘটিত না। বাস্তবিক গিরীশ-বাবুর গীত অতি মিষ্ট।

গীতাবলীর দ্বারা আর একটি উপকার হইল। জীবন-চরিতে দেখা গেল, প্রথম অবস্থায় গিরীশবাবু অনেক রকমে অনেক গীত রচনা করিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন, খানকতক গীত অবশিষ্ট ছিল, তাহা ইতি-পূর্ব্বে কোন কাগজেও প্রকাশ হয় নাই, কোন পুস্তকেও প্রকাশ হয় নাই, নিজ্জনে পড়িয়াছিল; অবিনাশ বাবু সেই অপ্রকাশিত গীতগুলি সংগ্রহ করিয়া গীতাবলীর অঙ্গ পূর্ণ করিয়াছেন। গিরীশবাবুর অনেক গীত অনেক নাটকে ছাপা হইয়া গিয়াছে, তথাপি একসঙ্গে প্রকাশিত অপ্রকাশিত সমস্ত গীতগুলি প্রকাশ করিয়া বাবু অবিনাশচন্দ্র সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইলেন; গীতাবলীর দ্বারা পাঠক-সমাজের প্রীতি বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

১২শ বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩১১ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্র।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিন্মাত্রও সম্বন্ধ আছে, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিভা-প্রভাব, হেমচন্দ্রের সৎ-শিক্ষা এবং হেম-চন্দ্রের মহাগুণাবলীর বিষয় তাঁহারা অনেকেই জ্ঞাত আছেন। হেমচন্দ্র ১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ তারিখে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। হেমচন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতুলালয়ে থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। তৎপরে মাতামহের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়া খিদিরপুরে অবস্থিতি পূর্ব্বক উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু-কলেজে প্রবেশ করেন। তখন কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। হেমচন্দ্র তৎকালীন নিয়মানুসারে জুনিয়ার পরীক্ষা প্রদান করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে, ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনি একত্র সিনিয়র ও এফ, এ, এই উভয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে এক বৎসরমাত্র পাঠ করিয়াই তিনি অর্থাভাব বশতঃ কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া,"মিলিটারি অডিটর জেনারেলের অফিসে" মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনের কেরাণী হইয়াছিলেন। কেরাণীগিরি করিতে করিতে তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, অল্পদিন

পরেই "কলিকাতা ট্রেনিং" স্কুলে ৫০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিন বৎসর পরে (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হাবড়া ও শ্রীরামপুরে মুন্সেফের কার্য্য করেন। এই সময়েই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে হেমচন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন; ক্রমে ক্রমে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল হইয়া, যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। বিবিধ সৎকার্য্যে তাঁহার অনেক অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। সর্ব্বজনে তাঁহার অনুগ্রহ সমান ছিল। কিঙ্করকুলকেও তিনি আত্মীয় স্বজন বলিয়া ভাবিতেন।

বঙ্গের সাহিত্য-গৌরব প্রদর্শন করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। যে সাহিত্যে হেমচন্দ্রের ন্যায় কবি জন্মগ্রহণ করিতে পারে, সে সাহিত্য যে গৌরবান্বিত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু সে গৌরববোধ কয় জনের আছে? কবিকে বুঝিতে হইবে, কাব্যের রসাস্বাদন করিতে হইবে, তবে গৌরব বোধগম্য হইবে। অতিসান্নিধ্যে দর্শনশক্তির ব্যাঘাত ঘটে; নয়নের উপর কোন সামগ্রী রাখিলেও তাহা ভাল করিয়া দেখা যায় না। ভাল করিয়া কিছু দেখিতে হইলে একটু দূরে রাখিতে হয়। কবি হেমচন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আমাদের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহার এবং তাঁহার কবিত্বের সম্যক্ বোধ আমাদের হইতে পারে না। ভবিষ্য পুরুষগণ এ বিচার করিবেন। তথাপি কাছে রাখিয়া তাঁহাকে আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহারই একটু পরিচয় দিব।

অর্থ অনেকের হয়, বিদ্যা অনেকের হয়, সৎকার্য্যে ব্যয়ও অনেকে করেন, কিন্তু তাঁহাদের গুণের পুরস্কার অন্যপ্রকার; তাঁহাদের খ্যাতিও অন্য প্রকার। বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ধনশালী পুরুষ হইয়া যিনি বীণাপাণির পূজায় সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিতে পারেন, 'কবিনাম' লইয়া যিনি মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াও অমর নাম রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি, গুণ-গৌরব আর একপ্রকার। কবি মর্ত্ত্যধামে অমরত্ব লাভ করিয়া স্বর্গসুখ উপ-ভোগ করেন; দেশের সাহিত্য-সংসার তাঁহার নিকট ঋণী হইয়া চিরদিন তাঁহার গুণগান করেন। কবিবর হেমচন্দ্র সেই গৌরবেই গৌরবান্বিত। এ দেশীয় সাহিত্য-সংসারকে—কাব্য-সংসারকে—তিনি অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিভা-বিকাশের প্রথমেই হেমচন্দ্র বঙ্গীয় পাঠকের সহিত পরিচিত। কাব্যানুরাগি-পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে একজন প্রতিভাশালী মহাকবি ও মহা-পুরুষ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

কবিবর হেমচন্দ্র স্বদেশ-প্রেমিক, স্বদেশ-প্রিয়, স্বদেশ-ভক্ত, স্বদেশের হিতব্রতে অকপটভাবে অনুরক্ত ছিলেন। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার যেরূপ অচলা ভক্তি ছিল, জাতি-ভাষার প্রতিও তাঁহার তদ্রূপ অচলা ভক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রতিভা-প্রসাদে হেমচন্দ্র বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। বীর-করুণাদি সর্ব্ববিধ রসের সংস্ফুরণে তাঁহার কল্পনাশক্তির বিশেষ বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ছন্দঃ-সারল্য, শব্দ-লালিত্য ও ভাব-সৌন্দর্য্য, সর্ব্ববিষয়েই তিনি সমধিক প্রশংসনীয়। অধি-কাংশ কাব্যেই তাঁহার স্বদেশানুরাগিতার পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার কল্পনার প্রথম ফল—"চিন্তা-তরঙ্গিণী"; দ্বিতীয় ফল—"ভারত-সঙ্গীত"। স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-প্রেম, স্বাধীনতা-প্রিয়তা, এই তিনটি গুণের অতি রমণীয় চিত্র এই ভারত-সঙ্গীতে বিদ্যমান; কবিত্বের লালিত্যেও "ভারত-সঙ্গীত" রসজ্ঞ পাঠক-মাত্রেরই হৃদয়গ্রাহী; অক্ষরে অক্ষরে ইহা সুধাবর্ষণ করিতেছে;—সর্ব্বগুণ-সমষ্টিতে "ভারত-সঙ্গীত"কে বঙ্গীয় কাব্য-সরোবরের শতদল পদ্ম বলিলেও বোধ হয়, অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার বিরচিত বীরবাহু, চিত্তবিকাশ, আশা-কানন, ছায়াময়ী, বৃত্রসংহার, কবিতাবলী, দশমহাবিদ্যা, বিবিধ কবিতা, রোমিও জুলিয়েট, নলিনী-বসন্ত প্রভৃতি অন্যান্য কবিতা, কাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্যে তাঁহার আন্তরিক অকৃত্রিম স্বদেশপ্রিয়তা উচ্ছ্বসিত হইতেছে। বৃত্রসংহার ও বীরবাহু তাঁহার মহাকাব্য। মনোভাবের সহিত কবিত্বের অপূর্ব্ব সম্মিলন। বাস্তবিকই সোণায় সোহাগা!

হেমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ন্যায় প্রতিভা কেবল বঙ্গদেশে কেন, পৃথিবীর অন্য কোন দেশেও প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। উন্নত চরিত্রের আদর্শ চিত্র-প্রদর্শনে, কল্পনার উচ্চতায়, পবিত্রতায়, ভাব-সন্নিবেশের পারদর্শিতায়, চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্য প্রদর্শনে, হেমচন্দ্রের প্রভূত পাণ্ডিত্য ছিল।

কবি যতদিন জীবিত থাকেন, ততদিন তাঁহার প্রকৃত গুণের নিরপেক্ষ বিচার হয় না; সে বিচার করিতে কাহারও মন যায় না। পাঠক একাগ্র-চিত্ত হইয়া, তাঁহার সরল কবিতাগুলি পাঠ করেন; "উত্তম হইয়াছে"

বলিয়া প্রশংসা করেন, রসের কথা পাঠ করিয়া আমোদ প্রকাশ করেন; গুরু-কবিতা পাঠ করিবার সময় অভিধান অন্বেষণ করেন, অভিধানে শব্দার্থ পাইয়া কবির রসজ্ঞতার প্রশংসা করেন, এই পর্য্যন্ত সারগ্রহণ। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বা এক একস্থানে দুই একটা দোষ দেখাইয়া নিন্দা করেন। বস্তুতঃ কবির জীবদ্দশায় প্রকৃত গুণের বিচার হয় না; কেহই তখন প্রকৃত বিচার করেন না; এটি যেন মানুষের স্বভাবসিদ্ধ বোধ হয়। কবির লোকান্তে বিচার আরম্ভ হইয়া থাকে। হেমচন্দ্র মরিয়াছেন, এখন তাঁহার কবিতার দোষগুণের বিচার আরম্ভ হইয়াছে। কেবল কলিকাতায় নহে, বঙ্গের সীমান্ত ব্যাপিয়া মহান্দোলন পড়িয়া গিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, বঙ্গের কোনও কবির জীবনান্তে তাঁহার কবিতা লইয়া চতুর্দ্দিকে এরূপ বিচার, এরূপ আন্দোলন, কস্মিন্ কালেও সংঘটিত হয় নাই।

হেমচন্দ্রের কাব্যের বিচার হইতেছে। প্রশ্ন হইতেছে, হেমচন্দ্র কোন্ শ্রেণীর কবি ছিলেন? তাঁহার কবিত্বশক্তি কি প্রকার ছিল? তাঁহার বিরচিত কাব্য-পাঠে কোনও ভাবুক-চিত্ত উদ্বোধিত হইয়াছে কি না?

বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগি-মহোদয়গণ কর্ত্তৃক এই সকল তর্কের এখন বিচার হইতেছে। হেমচন্দ্র-বিরচিত কাব্য ও কবিতাদি পাঠে যিনি যে প্রকার ধারণা করিয়াছেন, তিনি সেইরূপেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোচনা করিতেছেন। কেহ বলেন—কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, তিলোত্তমাসম্ভব ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই হেমচন্দ্রের আবির্ভাব। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহারাদি অমিত্রাক্ষর কাব্য। মাইকেলের আদর্শ লক্ষ্য করিয়াই হেমচন্দ্র "বৃত্রসংহার" ও "বীরবাহু" মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন—রাজনীতি-ঘটিত কবিতা-কলাপেই হেমচন্দ্রের সবিশেষ দক্ষতা ছিল। কেহ বলেন—সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে, কেহ বলেন—আর্য্য-সমাজ সম্বন্ধে কেহ বলেন—জন্মভূমির গৌরবসম্বন্ধে তাঁহার কবিতা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন—হেমচন্দ্রের কবিতায় সুরুচিসঙ্গত হাস্য, রঙ্গ ও রসিকতার একান্ত অভাব। এই প্রকার নানামুনির নানা মত। বস্তুতঃ এইরূপ বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করিলে, কেবল অকারণ পরস্পর বিরোধ উপস্থিত করা হয়। তাদৃশ বিচার, কবির জীবদ্দশায় কোনও সমালোচনী পত্রিকায় প্রকাশ পাইলে বরং শোভা পাইতে পারিত। কবির জীবনান্তে যখন তদ্বিরচিত কাব্যের বিচার হইতেছে,

তখন সেই বিচারে মরালবৎ সারগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। কবিতার গৌরবে, ভাবের গৌরবেই—কাব্যের বিচার ব্যবস্থা-সঙ্গত। হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সেরূপ বিচারের পন্থা প্রায় কেহই অবলম্বন করিতেছেন না।

আর এক কথা। হেমচন্দ্রের কবিতায় কেহ কোন নূতনত্ব দর্শন করিয়াছেন কি না? কাহারও হৃদয়ে সেই বীণাস্বরের প্রতিধ্বনি হইয়াছে কি না? স্বরের সঙ্গে প্রকৃতিসিদ্ধ প্রতিভার বিকাশ হইয়াছে কি না? তাঁহার সেবায় বঙ্গসাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে কি না? এ সকল বিষয়ের বিচার কেহই করিতেছেন না। ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়গুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া অনেকের এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, হেমচন্দ্রের কবিতায় কেহই যেন কোন প্রকার নূতনত্ব ও বিশেষত্ব দর্শন করেন নাই, অথবা প্রতিভার দীপ্তিও যেন কাহারও জ্ঞানচক্ষে বিভাসিত হয় নাই। একি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত! কবির পবিত্র দেহের সহিত কবির কাব্যামৃতও কি ভস্মীভূত হইয়াছে? মাইকেলের আদর্শদর্শনে হেমচন্দ্রের কাব্য-রচনা, একথা যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্বভাব-কবির জন্ম অসম্ভব, এরূপ স্বীকার করিতে হইবে। হেমচন্দ্র স্বভাব-কবি; তাঁহার কবিতার উচ্চভাব ও প্রাঞ্জলতা দর্শনে ভাবুক ব্যক্তি মাত্রেই একথা স্বীকার করিবেন। একজন স্বভাব-কবি আর একজনের কবিতার অনুকরণ করিয়া কবি-নামে পরিচিত হইয়াছেন, তাঁহার কবিতার কিছুই বিশেষত্ব নাই, এরূপ অগ্রাহ্য কথা কদাচ স্বীকার্য্য হইতে পারে না। এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্তের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে মাইকেল মধুসূদনের বহু পূর্ব্বকালীন মহাকবিগণের মহাকাব্যগুলিকে রসাতলে দিতে হয়; মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতির অভ্যুত্থান সময়ে মাইকেল মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন নাই, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করেন নাই, অতএব তাঁহাদের রচিত কবিতাবলী কদাপি কবিতা নামে গণ্য হইতে পারে না, একথা বলিতে হয়। এই কথার উপর দৃঢ়তা রাখিলে হেমচন্দ্রকে নূতনত্ব-শূন্য বলা যাইতে পারে।

পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবল ও প্রতিভার কৃপা ব্যতীত প্রকৃত কবিত্বশক্তি জন্মে না; আবার প্রতিভার এমনই মোহিনী শক্তি যে, প্রতিভার প্রসাদে এক একজন নিরক্ষর লোকেও উচ্চ কবিত্ব লাভ করিয়া থাকে। এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বর্ত্তমান। রূপচাঁদ পক্ষী, ধীরাজ বাহাদুর, প্যারী কবিরত্ন, পান্না-উল্লা মুসলমান, প্রাচীন ওস্তাদি কবিতার রচয়িতৃগণ এবং

নিম্নকল্পে আধুনিক তরজাওয়ালারা এ বিষয়ের উত্তম দৃষ্টান্ত। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই আপনাদের নাম দস্তখত করিতে জানিতেন না, কেহ কেহ "ক" অক্ষর দর্শন করিলে ক্রন্দন করিতেন, কিন্তু তাহাদের কবিতায় এত রস, এত ভাব, এত লালিত্য যে, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত ও কবিগৌরব-প্রাপ্ত কবিগণ প্রায় কেহই সেরূপ ভাব, রস, শব্দবিন্যাস স্বপ্নেও ভাবনা করিতে অক্ষম। এ দৃষ্টান্তের সম্মুখে স্বভাব-কবি সুপণ্ডিত হেমচন্দ্রের কবিতাকে নূতনত্বশূন্য বলা অনেকটা দুঃসাহসের কার্য্য। কাব্য-রসাস্বাদনে যাঁহাদের তৃপ্তিলাভ হয়, সাহিত্য-রসাভিজ্ঞ মহারথগণ, যথার্থ বিচারে যাঁহারা সুদক্ষ, তাঁহারা সকলেই হেমচন্দ্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দান করিয়াছেন, কিন্তু এখনকার ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দেখিয়া মনে হয়, হেমচন্দ্র যেন কবিনামের অযোগ্য। হেমচন্দ্র, মাইকেলের 'আসল কাব্য' দেখিয়া 'নকল' করিয়াছেন মাত্র। 'নকল' কাব্য পাঠ করিতে 'আসলের' দিকে চিত্ত ধাবিত হয়, কতকগুলি লোকের এরূপ ধারণা। সে ধারণা ভ্রান্তিমূলক, একথা আমরা সহস্রবার বলিব।

তর্কের কথা দূরে রাখিয়া, বঙ্গীয় কবিগণের দৃষ্টান্তই অগ্রে ধরুন। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস কবি ছিলেন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস কবি ছিলেন; মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, রামনিধি গুপ্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, প্রভৃতি কবি ছিলেন; শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবি। ইহাঁদের কাব্যের অনুকরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-সংসারে কয়জন প্রকৃত কবি বলিয়া গণ্য হইতে সমর্থ হইয়াছেন? হেমচন্দ্রের প্রতিভা অসাধারণ ছিল। হেমচন্দ্রের কবিতায় কবিত্ব, লালিত্য, মধুরত্ব, স্থায়িত্ব—নূতনত্ব ও প্রচুর,—ইহাই আমরা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিব।

হেমচন্দ্রের কবিতাসম্বন্ধে বঙ্গ-সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচক স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"এখনকার কবিদিগের মধ্যে বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ দ্বারা সর্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার রচিত ভারত-সঙ্গীত অতি চমৎকার। উহা স্বদেশ-প্রেমাগ্নিতে চিত্তকে একেবারে প্রজ্বলিত

করিয়া তুলে এবং তুরীধ্বনির ন্যায় মনকে উত্তেজিত করে। তাঁহার রচিত ভারত-সঙ্গীতে মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবজীর গুরু মাধবাচার্য্য বলিতেছেন;—

"বাজ রে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
আরব্য মিসর, পারস্য তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
বিংশতি কোটি মানবের বাস,
এ ভারতভূমি যবনের দাস।
রয়েছে পড়িয়া শৃঙ্খলে বাঁধা।
আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ী পুরুষ যাহারা,
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা?
জন কত শুধু প্রহরী পাহারা—
দেখিয়া নয়নে লেগেছে ধাঁধাঁ।

* * * *

কিসের লাগিয়া, হলি দিশে-হারা,
সেই হিন্দুজাতি, সেই বসুন্ধরা,
জ্ঞান-বুদ্ধি-জ্যোতিঃ, তেমনি প্রখরা,
তবে কেন ভূমে পড়ি লুটাও।

অই দেখ! সেই মাথার উপরে,
রবি শশী তারা দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপ দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল;
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যাচল এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
কেন সে মহত্ত্ব হবে না উজ্জ্বল?
বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

স্বজাতীয়-অধঃপতন-দর্শনে দুঃখিতচিত্তে জাতিকে ভৎর্সনা করিয়া, কবি আর একস্থানে বলিয়াছেন;—

"হয়েছে শ্মশান এ ভারত-ভূমি!
কারে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছি আমি?
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি!
আর কি ভারত সজীব আছে?"

ভারত-সঙ্গীত।

হেমচন্দ্রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ তাঁহার রচিত, দেশপ্রসিদ্ধ ভারত-সঙ্গীতে। ভারত-সঙ্গীত পাঠ করিয়া কাহার হৃদয় স্থির থাকিতে পারে? তাঁহার এই মনঃপ্রাণ-হর মধুর সঙ্গীত শ্রবণে কোন্ পাষাণ প্রাণে না জাতীয় প্রেম জাগরূক হইয়া উঠে? ভারত-সঙ্গীত ইং ১৮৭২ সালে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, সম্পাদিত এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয়। সর্ব্বপ্রথমে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কবির "চিন্তা-

তরঙ্গিণী" নামক একখানি পয়ার লঘু ও দীর্ঘ ত্রিপদীচ্ছন্দে ক্ষুদ্র কাব্য প্রকাশিত হইলে জনসমাজে সমাদৃত হয়, এবং ১২৭১ সালে উক্ত উৎকৃষ্ট কাব্যখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (এফ, এ) উপাধিগ্রহণেচ্ছু ছাত্রগণের প্রথম পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যপুস্তকস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

রাজনারায়ণ বাবুর মতে হেমচন্দ্র বিরচিত সকল কবিতার মধ্যে 'গঙ্গার উৎপত্তি' সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এবং সনাতনধর্ম্মভাবোদ্দীপক। তাহারও কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে:—

১
"ঋষি কয়জন সন্ধ্যাসমাপন
করি' একদিন বসিলা ধ্যানে,
দেবী বসুন্ধরা মলিনা কাতরা,
কহিতে লাগিলা আসি' সেখানে।

২
রাখ ঋষিগণ, সমূলে নিধন
মানবসংসার হ'ল এবার,
হ'ল ছারখার ভুবন আমার,
অনাবৃষ্টি-তাপ সহে না আর।

৩
শু'নে ঋষিগণ ক'রে দৃঢ়পণ,
যোগে দিল মনঃ একান্তচিতে,
কঠোর সাধনা ব্রহ্ম-আরাধনা,
করিতে লাগিল মানব-হিতে।

৪
মানবমঙ্গলে ঋষিরা সকলে,
কাতরে ডাকিছে করুণাময়,
মানবে রাখিতে নারায়ণ-চিতে,
হইল অসীম করুণোদয়।

৫

দেখিতে দেখিতে হ'ল আচম্বিতে,
গগনমণ্ডল তিমিরময়,
মিহির-নক্ষত্র তিমিরে একত্র,
অনল-বিদ্যুৎ অদৃশ্য হয়।

৬

ব্রহ্মাণ্ডভিতর নাহি কোন স্বর,
অবনী অম্বর স্তম্ভিতপ্রায়,
নিবিড় আঁধার জলধিহুঙ্কার,
বায়ু বজ্রনাদ নাহি শুনায়।

৭

নাহি করে গতি গ্রহদলপতি,
অবনীমণ্ডল নাহিক ছুটে,
নদ-নদী-জল হইল অচল,
নির্ঝর না ঝরে ভূধর ফুটে।

৮

দেখিতে দেখিতে পুনঃ আচম্বিতে,
গগনে হইল কিরণোদয়,
ঝলকে ঝলকে অপূর্ব্ব আলোকে,
পূরিল চকিতে ভুবনত্রয়।

৯

শূন্যে দিল দেখা কিরণের রেখা,
তাহাতে আকাশে প্রকাশ পায়,
ব্রহ্মসনাতন রাতুল চরণ,
সলিল নির্ঝর বহিছে তায়।

১০

বিন্দু বিন্দু বারি পড়ে সারি সারি,
ধরিয়া সহস্র সহস্র বেণী,
দাঁড়া'য়ে অম্বরে কমণ্ডলু করে,
আনন্দে ধরিছে কমলযোনি।

১১

হায়! কি অপার আনন্দ আমার,
ব্রহ্মসনাতন চরণ হ'তে,
ব্রহ্মা কমণ্ডলে জাহ্নবী উথলে,
পড়িছে দেখিনু বিমানপথে।"

ইহাতে আর্য্য গার্হস্থ্য আশ্রমের সকল সারমর্ম্মের উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহুশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া এই অমৃত-কলস উত্থিত হইয়াছে। পণ্ডিত ও পুরনারী সমাদরে—আগ্রহসহকারে—হেমচন্দ্রের গঙ্গার উৎপত্তি পাঠ করিয়া, পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া, কেহ বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলে, পরমার্থ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এতাদৃশী কবিতার যিনি রচয়িতা, তাঁহাকে প্রণাম করি।

হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। কবিবর মাইকেল মধুসূদনের বিয়োগ-গীতিতে "বঙ্গদর্শনের" পবিত্রাঙ্ক উচ্ছ্বসিত করিবার সময় তাঁহাকে প্রসিদ্ধ সাহিত্যবন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"মহাকবির সিংহাসন শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র? মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক! বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।" * স্বদেশপ্রেমিক মহাকবি হেমচন্দ্র এখন আর নাই। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত মহাকবির সিংহাসন, প্রকৃতস্বদেশ-প্রেমিকের সিংহাসন অদ্যও শূন্য।

* বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০।

হেমচন্দ্র কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ সময় (প্রায় ৪২ বৎসরকাল) সমভাবে মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়া, বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন,—অপরূপ রত্নালঙ্কারে মাতৃভাষাকে সাজাইয়াছিলেন। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা-অনুবাদক সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন—"কবিবর হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতাগুলি সুদীর্ঘকাল ব্যবধানে পাঠ করিয়াছি; সুতরাং কবিবরের কাব্যগ্রন্থসমূহের যথাযথ সমালোচনা, আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে একটা কথা বলা যাইতে পারে, হেমচন্দ্রের কবিতায় যে সঙ্গীত আছে,—যে মধুরতা আছে,—তাহা অ-বর্ণনীয়। এমন কি, তেমন মাধুর্য্য মাইকেলেও নাই। কবিদ্বয়ের তুলনা অবশ্য বাঞ্ছনীয় নহে।"

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা বাবু দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, এই দুই কবি, বঙ্গের কবিতার রীতিপ্রবাহ ফিরাইয়া দিয়াছেন; করুণরসের একতন্ত্রীটা ছাঁটিয়া ফেলিয়া ইহাঁরা গম্ভীর তানপুরার সঙ্গে তাঁহাদের ওজস্বী পুরুষোচিত কণ্ঠ মিলাইয়া বাঙ্গালীকে এক নূতন সঙ্গীত-রসের রসিক করিয়া তুলিয়াছেন।"

বর্ত্তমানকালে স্বজাতীয় জীবনে যে অভিনব স্ফূর্ত্তি ও একতার কিঞ্চিন্মাত্র লক্ষণ চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার প্রাগ্‌ধ্বনি হেমচন্দ্রের জাতীয়-সঙ্গীত হইতে প্রাপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরং"—সত্যেন্দ্রনাথের "জয় ভারতের জয়"—কবিবর রবীন্দ্রনাথের "অয়ি ভুবনমোহিনী"—সেই ধ্বনির মন্দীভূত সুন্দর ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

প্রেমের কবিতাতেও হেমচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। হেমচন্দ্রের 'নিরাশ প্রেমের' কবিতাগুলি, বঙ্গীয় যুবক ও কুলবধূগণ মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। আকাশে চন্দ্রোদয় দেখিয়া—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে!
কেন হেন বারে বারে, কাঁদাইতে অভাগারে,
আকাশ-মাঝেতে কেন শশী দেখা দেয় রে!"

অনেকে আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

হেমচন্দ্রের রুচি মার্জ্জিত, প্রণয়ের চিত্র পঙ্কিলতা-বর্জ্জিত। অন্তঃসার-শূন্য বাক্যবিন্যাস হেমচন্দ্রের কবিতায় নাই। তাঁহার হৃদয় কপটতাশূন্য।

তাই সেই হৃদয়, সরল প্রাণের সরল কথা সরলভাবে ব্যক্ত করিয়াছে। প্রকৃত ভাবুকহৃদয়, কথার আড়ম্বর ভুলিয়া, ভাবের উচ্চতায়—গভীরতায় বিমুগ্ধ হইয়া, বিরহ-ব্যাকুলতায় চিরদিনই বলিবে:—

"দেখ প্রিয়ে! সূর্য্য-আভা, গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা, যেন, ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের'পরে, উঠিল আনন্দ-ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধ'রে, নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায় প্রিয়ে! সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে,
শূন্যমনে নিরশনে এ অভাগা রহিল॥"

হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে যে অলৌকিক শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন,—জাতীয় চরিত্রগঠনে যেরূপ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন,—অক্ষয়-কীর্ত্তিলাভে আপনাকে যেরূপ যশস্বী ও বঙ্গভাষাকে যেরূপ জগৎ-পূজিতা করিয়াছেন,—সারগ্রাহী লোকের হৃদয়ে তাহা অক্ষয় রেখায় রক্ষিত—অঙ্কিত। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম কখন নিস্তেজঃ হয় নাই। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি স্বদেশপ্রেমে বিহ্বল হইয়া "ভারত-সঙ্গীত" গাইয়াছিলেন;—আবার ইং ১৮৭৫ সালে স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ড যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখনও 'ভারতভিক্ষার' প্রতি পঙ্‌ক্তিতে হেমচন্দ্র, স্বদেশানুরাগে বিভোর হইয়া বলিয়াছিলেন;—

"এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি পূর্ব্বে যবে,
মধুমাখা গীত শুনাইল ভবে,
স্তব্ধ বসুন্ধরা শুনি' বেদ-গান,
অসাড় শরীরে পাইল পরাণ,
পৃথিবীর লোক বিস্ময়ে পূরিয়া,
উৎসাহ-হিল্লোলে সে ধ্বনি শুনিয়া,
দেবতা ভাবিয়া স্তম্ভিত রহে।

এই কৃষ্ণবর্ণ জাতি সে যখন,
উৎসবে মাতিয়া করিত ভ্রমণ,
শিখরে শিখরে জলধির জলে,
পদাঙ্ক অঙ্কিত করি' ভূমণ্ডলে,
জগতব্রহ্মাণ্ড নখর-দর্পণে,
খুলিয়া দেখা'ত মনুজ-সন্তানে,
সমর-হুঙ্কারে কাঁপিত অচল,
নক্ষত্র, অর্ণব, আকাশমণ্ডল,
তখন তাহারা ঘৃণিত নহে।
যখন জৈমিনি, গর্গ, পতঞ্জলি,
মম অঙ্কস্থল শোভায় উজলি'
শুনাইল বীর নিগূঢ় বচন,
গাইল যখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন,
জগতের দুঃখে সু-কপিলবস্তে,
শাক্যসিংহ যবে, ত্যজিলা গার্হস্থ্যে,
তখনো তাহারা ঘৃণিত নহে।
তাহাদেরই রুধিরে জনম এদের,
সে পূর্ব্ব গৌরব সৌরভের ফের,
হৃদয়ে জড়া'য়ে ধমনী নাচায়,
সেই পূর্ব্ব পানে কভু গর্ব্বে চায়,
এ জাতি কখন জঘন্য নহে।
হে কুমার !, মনে রেখো এই কথা,
যে ভারতে তুমি ভ্রমিতেছ হেথা,
পবিত্র সে দেশ—পূত-কলেবর,
কোটি কোটি প্রাণী, ঋষি পুণ্যধর,

কোটি কোটি জন শূর বীর নর,
কবি কোটি কোটি মধুর অন্তর,
রেণুতে তাহার মিশায়ে রহে !"

কেবল ইহাই নহে,—মৃত্যুকালাবধি হেমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগের প্রবাহ সমভাবে বহিয়াছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। কায়িক—বাচিক—মানসিক—বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, এমন কি, পরিশেষে চক্ষুরত্ন হারাইয়া, অস্থির হইয়াও সেই স্বদেশ-প্রেমিক একদিনের জন্যও স্বদেশানুরাগ পরিহার করেন নাই। শেষে তিনি জগৎপতির নিকটে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন :—

"হে জগৎপতি ! দাসের মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা-প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ,
যেখানেই থা'ক—যেখানেই যা'ক,
যতই সম্মান যেখানেই পা'ক,
না ভুলে স্বদেশ-ভকতি-স্নেহ।"

হেমচন্দ্র, গীতি-কবিতায় একাধিক সুললিত ছন্দের সমাবেশ করিয়াছেন। তাঁহার "বিবিধ কবিতা" "কবিতাবলী" প্রভৃতিতে কল্পনার বিকাশ, সুললিত-পদবিন্যাস, শব্দমাধুর্য্য, ছন্দোনৈপুণ্য প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। প্রত্যেক কবিতায় একটি অন্তর্নিহিত গভীর সুর যেন সর্ব্বদা জাগিয়া রহিয়াছে। বাস্তবিক কবিবরের স্বদেশ-প্রেমিকতা এতই উচ্চতমা, এতই সুমহতী, এতই সুগভীরা যে, প্রায় প্রত্যেক কবিতায় তাহার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের এ বঙ্গদেশ তাঁহার সে উচ্চ উদ্দেশ্য ও মহতী স্বদেশ-প্রীতি পূর্ণভাবে অনুভব করিতে অশক্ত। তাই তিনি আক্ষেপ করিয়া দেশবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

"তোমাদের দিবাসন্ধ্যা, প্রাতঃকাল রজনী।
সকলি সমান জ্ঞান, আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্ব্বের প্রায়, ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষী তুষ্ট হবে তখনি !

কি দোষ রে বিধাতার—কিবা দোষ প্রাক্তনে
কি না বল দিল বিধি? ধরিতে ধরার নিধি—
বিধাতার সাধ্য যাহা দিয়াছে এ ভুবনে।"

বাস্তবিকই আমাদের কিসের অভাব? জীবের জীবনদাতা মঙ্গলময় পরমেশ্বর আমাদিগকে সমস্তই তো দিয়াছেন:—

দিয়াছে এভই এরে, কখন স্বপনে
ইয়োরোপ না হেরে তায়,
হে কোথা সেথায়—
এমন পর্ব্বত, নদ, এমন দারু, নীরদ,
এত খনিজাত ধাতু; এত শস্যরতনে?
কোথায় সেখানে হায়, হেন রশ্মি তপনে?
এত জাতি ফুল ফল, এমন নিশি শীতল,
দেখেছে পাশ্চাত্য কোথা হেন শশি-কিরণে!"

এ সকল সুখসমৃদ্ধি সত্ত্বেও আমাদের এক মহান্ অভাব আছে, সে অভাবের নিমিত্ত, আমরা চিরলাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদদলিত হইতেছি; তাই ভারতভূমিকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন;—

"চিরদুঃখী আজি চির-পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
অত্যন্ত অভাগী অনাথা দুর্ব্বলা
ভজন-পূজন যাগ-মুগধা।"

প্রকৃত অভাবের প্রকৃতিসম্বন্ধেও কবি বলিতেছেন;—

"সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি;
আমাদের হৃদিতলে, সে স্রোত নাহিক চলে,
আশ্রয় করিয়া যায়, পাশ্চাত্য আগুয়ে ধায়,
বাঁচিতে মরিতে হায়, জানি না রে কেবলি।"

বস্তুতঃ, কবির এই উক্তি, অতীব সত্য, বড় মর্ম্মস্পর্শিনী। আমরা বাঁচিতেও জানি না,—মরিতেও জানি না। যে জাতি বাঁচিবার মত বাঁচিয়া থাকিতে জানে:—

"এ মর্ত্ত্যপুরীতে সেই ধন্য জাতি
একতার জ্যোতিঃ বদনেতে ভাতি,
তেজোগর্ব্ব ধরি' থাকে নিজ-বাসে,
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরিষে,
হাসিতে কাঁদিতে করে না'ক ভয়;
করে না কখনও পাদ্য-অর্ঘ্য-দান,
পর-পদতলে হ'য়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি ক'রে ভীরুতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকে জয়।

* * * *

একতাই মর্ত্ত্যে মানব-সম্বল,
একতা-বিহনে পরেরি সকল,
দারা পুত্র গৃহ যা আছে তোর।
সে ধন-বিহনে আলয়-বিপিনে,
জীবন-আস্বাদ পাবি-নে পাবি-নে,—
দিবস-শর্ব্বরী সকলি ঘোর।"

কবি আমাদের একতার অভাব ও অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হন নাই। অভাব-মোচনের উপায় এবং যে সাধনের প্রয়োজন, তাহাই কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "জীবনসঙ্গীতে" তিনি গাহিয়াছেন:—

"সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হইও না মানব!
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্ল্লভ।

মনোহর মূর্ত্তি হেরে', ওহে জীব! অন্ধকারে,
ভবিষ্যতে ক'রো না নির্ভর;
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হইও না কাতর।
সাধিতে আপন ব্রত, স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান্;
সঙ্কল্প সাধন হ'বে, ধরাতলে কীর্ত্তি র'বে,
সময়ের সার বর্ত্তমান।
মহাজ্ঞানী মহাজন, যে পথে করে গমন,
হ'য়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়;
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তি-ধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হ'ব বরণীয়।
সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত করে,
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর।
ক'রো না মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে;
সঙ্কল্প ক'রেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হ'য়ে নিজ নিজ কাজে।"

আমাদের জাতীয় চরিত্রে একটি প্রধান দোষ কপটতা। আমরা আমাদিগকে আপনা আপনি বড় স্বার্থশূন্য ও ধার্ম্মিক বলিয়া জানি। তামসিক ভাবকে গোপনে রাখিয়া সাত্ত্বিক ভাবের ভাণ করিয়া থাকি; কিন্তু দেশহিতব্রতে এই স্বার্থ, প্রাণপণে পরিত্যাগ করিতে হইবে:—

"যে মন্ত্র-সাধনে সুপটু উহারা,
সেই বীরব্রত একতার ধারা,

সে সাহস—সে উৎসাহ-ধারা,
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখ,—
তবে অগ্রসর হৈও কভু আর,
করিতে এরূপে স্বজাতি-উদ্ধার,
পণে যদি দাও প্রাণ আপনার—
নতুবা যা আছ তাহাই থাক।"

(মন্ত্রসাধন।)

ভারতবর্ষে ইংরাজ-রাজত্ব চিরস্থায়ী করিবার উপায় তাঁহার মতে কেবল ইংরাজগণের ভারতবাসীকে প্রীতির চক্ষে দেখা। তাই তিনি ভারতমাতার মুখ দিয়া বলাইতেছেন:—

"আমি বৎস! তোর জননীর দাসী,
দাসীর সন্তান এ ভারতবাসী,—
ঘুচাও দুঃখের যাতনা তা'দের,
ঘুচাও ভয়ের যাতনা মায়ের
শুনা'য়ে আশ্বাস মধুরস্বরে॥
বৃটিশ সিংহের বিকট বদন,
না পারি নির্ভয়ে করিতে দর্শন,
কি বাণিজ্যকারী অথবা প্রহরী,
জাহাজী গৌরাঙ্গ, কিম্বা ভেকধারী,
সম্রাট ভাবিয়া পূজি সবারে।"

হেমচন্দ্রবিরচিত সমুদয় কবিতাবলীর আলোচনা একটি প্রবন্ধে হওয়া অসম্ভব। "হেমচন্দ্রের মিলনের সঙ্গীত অপেক্ষা বিরহের সঙ্গীত আমাদের নিকট কেন অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়? সুখের আবেগময় সঙ্গীত ছাড়িয়া শোকের বিষাদময়ী গীতি শুনিতে আমাদের প্রাণ কেন আকৃষ্ট হয়? আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব জানি না। কোন্ অলক্ষ্য স্রোতে আমাদের জীবন-প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা আমরা বুঝি না।

আমাদের প্রাণ কি যেন চায়, পায় না। কোন্ সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়াছি, আবার কবে সেই দেশে যাইব, জানি না। কাহাকে ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছি, আবার কবে কাহাকে ফিরিয়া পাইব, বুঝি না, জানি না। কি যেন ছিল, কিন্তু তাহা আর নাই। কে যেন প্রাণের ভিতর হইতে অস্পষ্ট মধুরস্বরে ডাকিতেছে, শুনিয়াও শুনি না। তাই সংসারে কিছু ভাল লাগে না। একটা চিরন্তন অভাব যেন প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। তাই সুখের কথা, সুখের গীতি ভাল লাগে না। প্রাণের ভিতর মর্ম্মান্তিক যাতনা, নৈরাশ্যের ঘোর হাহাকার, তাই বিষাদের গীতি শুনিতে প্রাণ আকুল হয়। হৃদয়ের অভ্যন্তরে রাবণের চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, উৎসব-গীতি ভাল লাগিবে কেন? তাই সুন্দর-পুষ্প-শোভিত অশোক-তরু দেখিয়া হেমচন্দ্র গাহিয়াছেন :—

"তরু রে! আমার মনঃ, তাপ দগ্ধ অনুক্ষণ,
কেহ নাই শোকানলে ঢালে বারিধারা,
আমি, তরু জগতের স্নেহ-সুখ-হারা।
জায়া বন্ধু পরিবার, সকলি আছে আমার,
তবু এ সংসার যেন বিষতুল্য কারা,
মনে ভাল কেহ মোরে বাসে না তাহারা।

* * * * * *

বড় দুঃখী তরু আমি, জানেন অন্তরযামী,
তোমার তলায় আসি ভাসি অশ্রুনীরে,
দেখিয়া জীবের দুঃখ ভবের মন্দিরে।
এই ভিন্ন সুখ নাই, তরু তাই ভিক্ষা চাই,
পাই যেন এইরূপে কাঁদিতে গম্ভীরে,
যতদিন নাহি যাই বৈতরণীতীরে।" *

বিজ্ঞান ও কবিত্বের সংমিশ্রণে যে কি এক অপূর্ব্ব পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে—'বৃত্র-সংহারে'—তাহাই উজ্জ্বলভাবে প্রদর্শন

* "বঙ্গভাষা" বৈশাখ, ১৩১৩ ত্রিপুরাব্দ।

করিয়াছেন। তিনি স্বীয় কাব্যের কোন কোন স্থলে মেঘনাদবধের ছন্দঃ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে বৃত্র-সংহারের কিছুমাত্র অঙ্গহানি হয় নাই। আর—এইরূপ সাহায্যগ্রহণও অপরিহার্য্য। কেন না, মধুসূদন ও হেমচন্দ্র—উভয়েই সমকালিক কবি, এবং কাব্যক্ষেত্রে মধুসূদন তাঁহার আদর্শ ও পথপ্রদর্শক, কিন্তু বৃত্র-সংহারের কোন কোন বিষয় যে, মেঘনাদবধের অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ইহা হেমচন্দ্রের সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নহে। হেমচন্দ্র, বৃত্র-সংহারে যে সকল চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা অতীব মনোহর ও স্বাভাবিক। তাঁহার ঐন্দ্রিলা, ইন্দুবালা, শচী, বৃত্র ও রুদ্রপীড়কে আমরা ভুলিতে পারিব না। ইন্দ্রের দধীচির আশ্রমে গমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন এবং দেবগণের হিতার্থ দধীচির কলেবর পরিত্যাগের ন্যায় উদার, গম্ভীর ও সকরুণ দৃশ্য বঙ্গ-সাহিত্যে হেমচন্দ্রের ন্যায় আর কোন কবি দেখাইতে পারেন নাই; সর্ব্বোপরি হেমচন্দ্রের এই মহাকাব্যে যে প্রজ্বলিত স্বদেশানুরাগ-বহ্নি, যে পবিত্র আর্য্য-ভাব, যে বজ্র বিদ্যুন্ময় সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, বঙ্গভাষার আর কোন কাব্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বৃত্র-সংহার কবির চমৎকার-জনক সৃষ্টি। এই কাব্যে ব্রাহ্মণের অনন্ত মহিমা পরহিত-ব্রতের অতুল মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। হেমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভা। অসীম ধৈর্য্যসহকারে, তিনি বৃত্র-সংহার মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। বৃত্র-সংহার বঙ্গসাহিত্যের একটি উজ্জ্বলরত্ন, জাতীয় সাহিত্যের গৌরব। মাইকেলের মেঘনাদবধ এবং হেমচন্দ্রের বৃত্র-সংহার, এই দুইখানিই আমাদের জাতীয় মহাকাব্য। স্বদেশানুরাগ ও চরিত্রসৃষ্টির দক্ষতার তুলনায়, মেঘনাদবধ অপেক্ষা বৃত্রসংহার উৎকৃষ্ট,—অনেকেই এই কথা বলিয়া থাকেন। বৃত্র-সংহার কাব্যের বীর্য্যবহ্নিপূর্ণ জ্বালাময়ী উক্তি শ্রবণ করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। বৃত্রাসুর-বিনাশের মন্ত্রণায় দেব বৈশ্বানর, দেবসেনাপতিকে বলিতেছেন :—

"অসুর-উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর,
অসুর-পদাঙ্ক-রজঃ ভূষণ মস্তকে,
তার চেয়ে শত বার পশিব গগনে,
প্রকাশি' অমরবীর্য্য, সমরের স্রোতে,

ভাসিব অনন্ত কাল দনুজ-সংগ্রামে,
দেবরক্ত যত দিন না হইবে শেষ।”

বৃত্র-সংহার কাব্যের প্রধান নায়িকা ইন্দুবালা;—মেঘনাদ বধের প্রমীলার সহিত ইন্দুবালার তুলনা করিলে দেখা যায়, প্রমীলার হৃদয় স্বার্থময়, প্রমীলা বীরভাবে গর্ব্বিতা; ইন্দুবালার স্নেহ স্বার্থশূন্য, হৃদয় কোমল। সে হৃদয় দয়া-ধর্ম্মবিনির্ম্মিত; অপূর্ব্ব চারুচিত্র। পতি, রণে উন্মত্ত,—বহুসংখ্যক প্রাণিনাশ করিতেছেন, ওদিকে পতির হস্তে অন্য রমণীর প্রাণপতি গতাসু হইয়াছে। রমণীর বৈধব্য ঘটিয়াছে। সেই দুঃখ ভাবিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ইন্দুবালা বলিতেছেন:—

“পুত্র-শোকাতুরা আহা মাতার রোদন,
সখি রে, বিদরে হিয়া, বিদরে লো প্রাণ
স্বামিহীনা রমণীর করুণ ক্রন্দন;
ভগিনীর খেদ-স্বর ভ্রাতার বিয়োগে!
হায়, সখি! বল তোরা—বল কি উপায়ে,
দনুজের এ দুর্দ্দশা ঘুচাইতে পারি,
এ দেহ করিলে দান হয় যদি বল,
নিবাই সমরানল তনু সমর্পিয়া।”

যিনি পরহিতব্রতধারী—তাঁহার গুণে ও পুণ্যে, স্বর্গচ্যুত অমরবৃন্দ আবার সুরলোকে প্রবেশ করেন, এবং তিনি নিজে ব্রহ্মলোক লাভ করেন। বৃত্র-সংহারের পরহিত ব্রত এমনই মহৎ, এমনই শক্তিযুক্ত, ব্রাহ্মণের নিষ্কাম যোগ এমনই মহীয়ান্ যে, দেবতারা স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পরহিতব্রত ব্রাহ্মণের কৃপায়, ব্রাহ্মণের স্বার্থত্যাগে, তাহা লাভ করিতে পারেন। তাই ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—“উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।” ব্রাহ্মণের দেহ, সনাতন ধর্ম্মের সাক্ষাৎ সনাতন মূর্ত্তি।

ব্রাহ্মণ, পরহিতে নিজ প্রাণ দিতে কখনও কাতর নহেন। তাই মুনীন্দ্র দধীচি বলিতেছেন:—

“এ ভবমণ্ডলে—
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন!
হিতব্রত-সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা?
হায় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বরদেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে?
লভি' জন্ম নরকুলে কি ফল' হে তবে?
হে শিষ্যমণ্ডলী—
জগত-কল্যাণ, হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে;
নিঃস্বার্থ মোক্ষের পথ, এ জগতীতলে।”

আবার দেখুন, দধীচির প্রাণ-বিসর্জ্জনের অপূর্ব্ব দৃশ্য:—

“বাহিরিল ব্রহ্মতেজঃ ব্রহ্মরন্ধ্র ফুটি',
নিরুপম-জ্যোতিঃপূর্ণ—ক্ষণে শূন্যে উঠি',
মিশাইল শূন্যদেশে। বাজিল গম্ভীরে
পাঞ্চজন্য—হরিশঙ্খ; শূন্যদেশ যুড়ি'
পুষ্পাধার বরষিল মুনীন্দ্রে আচ্ছাদি'!—
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।”

ভারতে যেদিন ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার পরহিতব্রতে তনু ত্যাগ করিতে পারিবেন,—সেই দিন দেবতারা সুরলোকে প্রবেশ করিবেন। সংসারে মাতা ও পুত্রের পরস্পর যে কি প্রগাঢ় স্নেহসম্বন্ধ,—তাহা শচীর খেদোক্তিতে প্রস্ফুটিত হইয়াছে:—

“সখি রে বাসব-সম, আছে ত জয়ন্ত মম,
ইন্দ্রাণী ত বীর-প্রসবিনী।
কোথা পুত্র হে জয়ন্ত, জননীর দুঃখ-অন্ত,
কর শীঘ্র আসিয়া হেথায়।

তোমার প্রসূতি, হায়! দৈত্যের দাসীত্বে যায়,
রক্ষ আসি পুত্র তব মায়।
এত কহি' ইন্দ্রপ্রিয়া, ধ্যানে দৃঢ় মনঃ দিয়া,
জয়ন্তেরে করিলা স্মরণ—
জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি নদী,
ভেদি, সুতে করে আকর্ষণ॥"

বৃত্রসংহার-কাব্যে ইন্দুবালা-চরিত্র হেমচন্দ্রের অতি উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি। এমন বিশ্বজনীন সহানুভূতি,—শত্রুর প্রতিও আন্তরিক অকপট স্নেহ, এমন বিশ্বব্যাপিনী করুণা,—পাত্র-পাত্রীর মধ্যে যিনি ফুটাইতে পারেন, তাঁহার শক্তি সাধারণ নহে। হেমচন্দ্রকে তাই আমরা বঙ্গসাহিত্যের প্রধান কবির আসনে বরণ করিতে সমুৎসুক। ইন্দ্রাণীর শোকে কাতর হইয়া, দৈত্য-কুলবধূ ইন্দুবালা বলিতেছেন:—

"আমিও রমণী, রমণীও শচী,
তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর
ধরিতে গেলা ধরায়?
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই—
মহাবীর পতি মম,
আমিও যদ্যপি পড়ি সে কখন,
বিপদে শচীর সম!"

দেবাসুরে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছে; ইন্দুবালা প্রতিক্ষণে কাতর অন্তরে ভাবিতেছেন, তাহার স্বামী মহাবল রুদ্রপীড়ের হস্তে অসংখ্য দেবসৈন্য নিহত হইতেছে;—সহসা দনুজদলে হাহাকার উঠিল; কিন্তু পরদুঃখ-কাতরা ইন্দুবালা ভাবিল, এবারও তাহার স্বামী কোন দেবতাকে নিষ্যাতন রিয়াছে:—

(ক্রমশঃ)

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

বিপিনবাসিনী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"আমরা কায়স্থ। আমার বাবার নাম খুদিরাম দত্ত। শুনিয়াছিলাম, বাবা পূর্ব্বে এক জমীদারের তালুকে গোমস্তাগিরি চাকরি করিতেন, ঠকের ঠকামিতে সে চাকরিটি গিয়াছিল, দুঃখের দশায় ময়রার দোকানে চাকরি স্বীকার করিয়াছিলেন, আমাদের কষ্টের সীমা ছিল না, বেশী কথা কি বলিব, সকল দিন আমরা দুইবেলা খাইতে পাইতাম না, এক একদিন আসলেই খাওয়া হইত না। এক একদিন রন্ধন করিয়া মা আমার বাবাকে দিতেন, আমারে খাওয়াইতেন, আপনি উপবাস করিতেন, কুলাইয়া উঠিত না।

"আমার যখন সাত বৎসর বয়স, সেই সময় পশ্চিম দেশ হইতে বাবার নামে একখানা চিঠি আসিল, বাবার একজন জ্ঞাতি খুড়া পশ্চিম দেশে চাকরি করিতেন, বাবার দুঃখের দশা মনে করিয়া তিনি সেখানে একটি চাকরি স্থির করিয়া, তিনিই সেই চিঠি লিখিয়াছিলেন, মাহিনা হইবে ২০৲।

"বড় দুঃখের সময় মাসে মাসে কুড়ি টাকা পাইবেন, বাবার আহ্লাদ হইল, পশ্চিমে যাওয়াই স্থির করিলেন। মা তাঁহাকে কোন মতেই যাইতে দিবেন না, যাইবার নামে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। মা বলিলেন, আমি সূতা কাটিয়া সূতা বেচিব, ঘুঁটে দিয়া ঘুঁটে বেচিব, ভিক্ষা করিতে হয় লোকের বাড়ী ভিক্ষা করিব, তবু তোমাকে বিদেশে যাইতে দিব না। বাবা সে কথা শুনিলেন না, মাকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়া, সেই খুড়ার নামে পত্র লিখিলেন, রাহা খরচ চাহিয়া পাঠাইলেন, কুড়ি টাকা রাহা খরচ আসিয়া পৌঁছিল। বাবা তখন পাঁজি দেখিয়া দিন স্থির করিলেন।

"দিন আসিয়া উপস্থিত হইল, মা কাঁদিতে লাগিলেন। বুঝাইয়া বুঝাইয়া বাবা বলিলেন, চিঠিতে লেখা আছে, এক বৎসরের জন্য। দেখিতে দেখিতে এক বৎসর ফুরাইয়া যাইবে, এক বৎসর পরেই আমি ফিরিয়া আসিব, পথে আসিতে বিলম্ব হইবে দশদিন, এই এক বৎসর দশদিন মাত্র।

"যাত্রায় অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া মা আর কাঁদিলেন না। সকাল সকাল দুটি আহার করিয়া বাবা সেইদিন শুভ যাত্রা করিলেন। কুড়ি টাকা রাহা খরচ আসিয়াছিল, আমাদের খরচের জন্য দশটি টাকা রাখিয়া, বাবা কেবল দশটি টাকা লইয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন, মাসে মাসে খরচ পাঠাইবেন, পত্র লিখিবেন।

"বাবা চলিলেন; ছেলেটি কোলে করিয়া মা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, মায়ের পশ্চাতে পশ্চাতে আমিও চলিলাম। গ্রামের বাহিরে খানিক দূরে এক মাঠের উপর বৃহৎ একটা বটবৃক্ষ; সেই বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া বাবা বলিলেন, আর কেন তোমরা আমার সঙ্গে আসিতেছ, ঘরে ফিরিয়া যাও।

মা কাঁদিতে লাগিলেন, আমিও কাঁদিতে লাগিলাম। বাবা আবার বলিলেন, কেন কাঁদ? দুর্গানাম কর। এক বৎসর দশদিন; দেখিতে দেখিতে দিন চলিয়া যাইবে, শীঘ্রই আমি ফিরিয়া আসিব। আমি সেই সময় দেখিয়াছিলাম, বাবার চক্ষেও জল; মুখ ফিরাইয়া, তিনি দ্রুতগতিতে মাঠ পার হইয়া তিনি বরাবর উত্তর দিকে চলিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল, মা সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। বাবা যখন আমাদের চক্ষের অগোচর হইয়া গেলেন, মা তখন পুতুলের মত সেইখানে দাঁড়াইয়া চক্ষের জলে কাপড় ভিজাইলেন। আমার বেশ মনে আছে, বাবা বাবা বলিয়া আমি তখন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়াছিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে আমরা ঘরে ফিরিলাম।"

বনবালা এইখানে আবার চক্ষের জল ফেলিয়া চক্ষু মার্জ্জনা করিলেন; ছেলেটি তখন মুখের মাই ছাড়িয়া দিয়া মায়ের কোলে হাত পা ছুড়িয়া হাসিতেছিল, শিশুর মুখপানে চাহিয়া বনবালা আবার বলিতে লাগিল:—

"মা আমার ততবধি প্রতিদিন বৈকালে সেই বটবৃক্ষ-তলে যান, যে পথে বাবা গিয়াছেন, সেই পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষের জল ফেলেন, সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসেন। আমাদের ঘরের বেড়ার গয়ে মা এক গোছা দড়ি ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, বটতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া রোজ সন্ধ্যাকালে সেই দড়িতে একটি একটি গেরো বাঁধিয়া রাখিতেন, গেরো দেখিয়া দিন গণনা করা হইত। এক বৎসর পূর্ণ হইল, এক দুই করিয়া আর দশদিন। মা যেমন প্রতিদিন বৈকালে বটতলায় যান, সেই দিনও যাইবেন, সে দিন আর তিনি বন্ধন করিলেন না, দুটি পান্তাভাত ছিল, তাই আমাকে খাওয়াইয়া আপনি না খাইয়াই, বৈকাল, আসিবার অগ্রেই, সেই দড়ি গোছা হাতে করিয়া বটতলায় চলিয়া গেলেন; যখন তিনি যান, ছেলেটি তখন আমার কাছেই থাকে, সে দিনও আমার কাছে রহিল।

"বৈকালে আকাশে ভারি মেঘ। ঘোর অন্ধকার। আমার ভাইটিকে কোলে লইয়া ঘরের ভিতর আমি শয়ন করিলাম, কড়্ কড়্ করিয়া মেঘ

ডাকিতে লাগিল, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, আমার বড় ভয় করিতে লাগিল। আমার বয়স তখন আট বৎসর, ভাইটি আমার অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের ছোট, ভাইটির বয়স তখন তিন বৎসর; ক্রমশই বৃষ্টি বাড়িল, ঘন ঘন বিদ্যুৎ চক্‌মকি; ঘন ঘন মেঘের গর্জ্জন, বৃষ্টির সঙ্গে জোর জোর হাওয়া, আমার শীত ধরিল; ভাইটিকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া আমার ছোট কাপড়ের আঁচল ঢাকা দিয়া বুকের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিলাম। সন্ধ্যা হইয়া গেল, মা আসিলেন না। আমি দু'টি পান্তা খাইয়া দিন কাটাইয়াছি, ক্ষুধা হইয়াছিল, মা না আসিলে খাইতে পাইব না, কি করি, চুপ করিয়া শুইয়া রহিলাম। ভাইটিরও ক্ষুধা পাইয়াছিল, আমার বুকের কাছে শুইয়া, এক একবার মা মা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল, খাইতে দি, ঘরে এমন কিছুই ছিল না, আমি তাহার মুখে একটি অঙ্গুলি দিয়া রাখিলাম, মাই মনে করিয়া ভাই আমার সেই অঙ্গুলিটি চুষিতে লাগিল। ও বাবা! গড়্ গড়্ করিয়া বজ্রাঘাত! ক্ষণে ক্ষণে দূরে দূরে ভয়ানক চিক্কুর ঝন্ ঝনাও! ভাইটী আমার গলা জড়াইয়া ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, মুসলধারে বৃষ্টি! ভয়ে শীতে ক্ষুধায় কাতর হইয়া আমিও কাঁপিতে লাগিলাম। বার বার দূরে দূরে বজ্র-পাত! ভয়ঙ্কর শব্দ! তাহার উপর চতুর্দ্দিকে বাতাসের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ! পাতার ঘর, চাল ফুড়িয়া ঘরের ভিতর জল পড়িতে লাগিল, জড়াজড়ি করিয়া আমরা দুটিতে সেই বৃষ্টির জলে ভিজিতে লাগিলাম! মা আসিলেন না! চতুর্দ্দিক অন্ধকার!

"আর আমি কি বলিব! আর বলিতে পারি না! অকস্মাৎ আমাদের ঘরের চালের উপরে বজ্রাঘাত! বাজের আগুন আমাদের ঘরের ভিতর আসিল, আমার চক্ষু ধাঁধিঁয়া গেল, বজ্রের শব্দ! ঘরের ভিতর বজ্র, দূরে দূরে আমি অনেকবার বজ্রের শব্দ শুনিয়া ছিলাম, কিন্তু তেমন ভয়ানক শব্দ আর কখন শুনি নাই! শব্দের সঙ্গে আগুনের উত্তাপ!—আগুনের হল্‌কা! ভাইটির গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম, সর্ব্বনাশ। ভাইটি আর নড়ে না! আমার অঙ্গুলিটি তাহার মুখে ছিল, খসিয়া পড়িয়াছে। হাত দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম, অসাড়! বজ্রের উত্তাপে আর সেই ভয়ঙ্কর শব্দে আমার ভাইটির প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। চীৎকার করিয়া কাঁদিব, স্বর বাহির হইল না, চতুর্দ্দিকে শব্দ হইতেছিল, কিছুই আর শুনিতে পাইলাম না! মা আসিলেন না।"

বনবালার কণ্ঠস্বর স্তম্ভিত হইয়া গেল ; চক্ষের জল তাহাকে যেন আবার বোবা করিয়া দিল ; এই সময় জয়াবতীও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। পুরুষের কিছু কঠিন প্রাণ, হইলে কি হয়, সেই শোকাবহ কাহিনী শ্রবণে হরেন্দ্রকুমারও ঘন ঘন যুগল হস্তে নেত্র মার্জ্জন করিতে লাগিলেন।

গ্রাম্যদোষ পরিহরের নিমিত্ত বনবালার কথাগুলি আমরা আমাদের নিজের ভাষাতেই লিখিয়া দিতেছি, পাঠক মহাশয় এটি মার্জ্জনা করিবেন। বনবালার স্বরস্তম্ভ কাহিনীর উপসংহার ভাগ বনবালা তখন আর বলিতে পারিল না। এদিকেও উষাকাল সমাগত, উদ্যানের অগ্নি নির্ব্বাপিত ; উষাকালে সেই বাগানে পাখিরা গীত গাহিত, সে দিন নিকটে আর একটিও পাখী ডাকিল না। রজনী প্রভাত।

উপসংহার।

অভাবনীয় মহাশোচনীয় জীবনের পরিচয় দিতে দিতে চক্ষের জলে বনবালার যেন স্বরস্তম্ভ হইয়া আসিল, পাঁচদিন পরে কাহিনীর উপসংহারে বনবালা যে যে কথা বলিয়াছিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ যে, জননী ফিরিলেন না, বজ্রাঘাতে ভাইটি মরিল, নিজের বাক্‌শক্তি গেল, প্রভাতে খানিকক্ষণ চৈতন্যও ছিল না, প্রতিবাসীরা কে কখন আসিয়া মৃত শিশুটীকে শ্মশানে রাখিয়া আসিয়াছিল, দুঃখিনী তাহা জানিতে পারে নাই। যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল, বজ্রাঘাতে দগ্ধ কুটীর, শিশুশূন্য বুকের ভিতর শোকোচ্ছ্বাস, বরফ ঢাকা অগ্নিগিরীর-অগ্নি!

ইহাই কি শেষ ?—না,—আরও শেষ আছে। দুই একজন প্রতিবাসিনী কিছুক্ষণ গোলমাল করিয়া চলিয়া যাইবার পর, এক জায়গায় বসিয়া খানিকক্ষণ বনবালা কি ভাবিয়াছিল,—গুম হইয়া ভাবিয়াছিল, ভাবনা ফুরাইতে না ফুরাইতে অনাথিনী যেন পাগলিনীর ন্যায় ছুটিয়া সেই বটবৃক্ষতলে গিয়াছিল, দেখিয়াছিল কি ?

হায় হায়! বনবালা দেখিয়াছিল, দুটি মৃতদেহ! এক জায়গায় মা, দুই হাত তফাতে বাবা! গত রজনীর বজ্রাঘাতে মাঠের মাঝখানে তাঁহারা উভয়েই মরিয়া রহিয়াছেন! খুদীরাম দত্ত, ঠিক সময়েই বাড়ী আসিতে

প্রতিবেশিনীসহ জয়াবতী ও তরুলতার উদ্যান-বিহার।

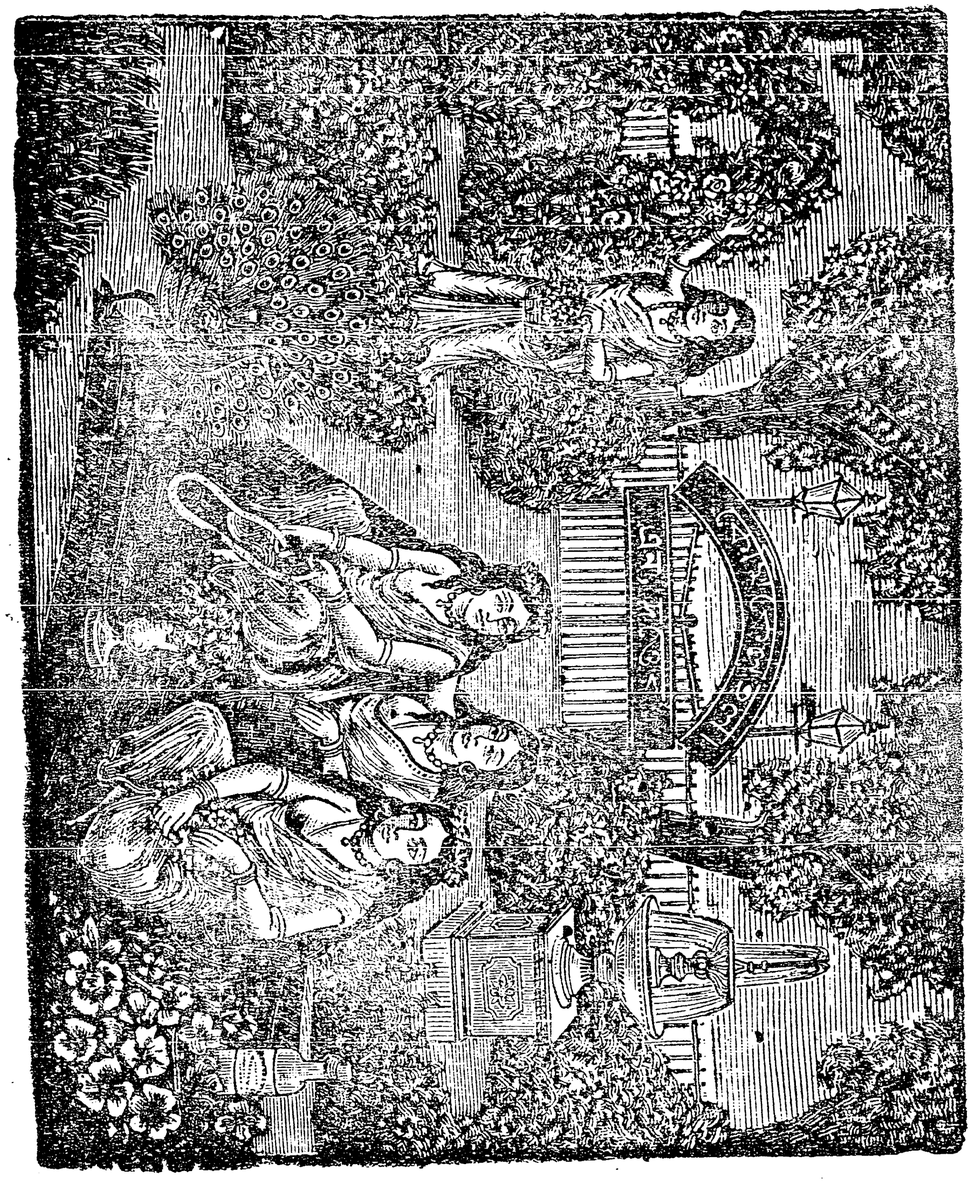

ছিলেন, পথে ঝড় বৃষ্টি দুর্য্যোগ, বটতলায় আসিয়া পত্নীকে সজীব দেখিয়া ছিলেন, কিংবা দগ্ধ দেহ দর্শন করিয়াছিলেন, বনবালা তাহা জানিতে পারে নাই। তাঁহার পিতাও সেইখানে বজ্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রমাণ—বজ্রতাপে মুখ দু-খানি ঝলসিয়া গিয়াছিল!

বটতলাই তাঁহাদের অন্তিম শ্মশান! দশাদর্শনে বনবালা আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে নাই, চক্ষের জলে মাঠের মাটী ভিজাইয়া, সেই মাটীর উপর গড়াগড়ি খাইয়াছিল, কতক্ষণ সেখানে ছিল, স্মরণ করিয়া বলিতে পারিল না। তাহার পর গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া একজন ভদ্রলোকের বাড়ীর দ্বারে আছাড় খাইয়া পড়িল, বাড়ীর কর্ত্তা তখন একটা গাড়ু হাতে করিয়া বাহির হইতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে যাইতে ছিলেন, অশ্রুমুখী বনবালা তাঁহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া হস্ত সঙ্কেতে দুই তিন প্রকার ইসারা করিল, ঠিক বুঝিতে না পারিয়াও তিনি সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, বার বার মুখ ফিরাইয়া তাঁহার দিকে চাহিতে চাহিতে বনবালা অগ্র পথে চলিল, গাড়ু হাতে করিয়াই সেই ভদ্রলোকটি তাহার সঙ্গে চলিলেন।

সেই বটতলা। বনবালা অঙ্গুলী নির্দ্দেশে সেই লোকটীকে মৃতদেহ দেখাইল, তিনি কাতর হইয়া বাড়ীতে আসিয়া নিজের লোকের দ্বারা নিজ খরচে বনবালার মাতা পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ করাইলেন। বনবালা আর শূন্য কুটিরে ফিরিয়া গেল না, সপ্তাহকাল সেই ভদ্রলোকের বাড়ীতেই রহিল। তাহার পর তাহার পিসীমা আসিয়া পূর্ব্বকথিত বনপ্রান্তে সেই পত্র কুটীরে তাহাকে লইয়া রাখিয়াছিল, ছয় বৎসর বনবালা তাহার সেই পিসীমার কাছে ছিল, তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, পাঠক মহাশয় তাহা অবগত হইয়াছেন। বনবালার মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহার জননী তাহার নাম রাখিয়াছিলেন, তরুলতা।

তরুলতার এই পর্য্যন্ত পরিচয়। বিবাহের পর হরেন্দ্রকুমার চলিয়া আসিলে, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তরুলতা অতি সংক্ষেপে হরেন্দ্রকুমারকে তাহা শুনাইল;—পিসীমার মৃত্যু, গরু ছাগল বিক্রয়, ঘর বিক্রয়, বন পরিত্যাগ, পথে টাকা গহনা চুরি যাওয়া, রামসেবক ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে আশ্রয় লওয়া, পুত্র প্রসব করা; পনের দিনের পুত্র লইয়া পলায়ন করা, পথে পথে সেই বৃক্ষপত্র দেখাইয়া পথ চিনিয়া চিনিয়া লোকনাথপুরে উপস্থিত হওয়া, জয়াবতীর দয়াগুণে সেই বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়া ইত্যাদি সকল কথাই একে

একে বলিল। হরেন্দ্রকুমার অত্যন্ত কাতর হইলেন, বোবা মেয়ের বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহার অসীম বিস্ময় জন্মিল।

তরুলতা শ্বশুরালয়ে বাস করিতে লাগিল। তাহার শ্বশুর বসন্তকুমার মিত্র, তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন, পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল, বৃক্ষপত্রে নিজ পুত্রের নাম দেখিয়া সে সময় তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক, ইহাতেই তাঁহার অধিক আনন্দ।

পরিচয়ে তরুলতা এখন জয়াবতীর সতিনী। এদেশে সতীনের প্রতি সতীনেরা সচরাচর যে প্রকার ব্যবহার করে, দয়াময়ী জয়াবতীতে তাহার কোন লক্ষণ লক্ষিত হইল না। জয়াবতী তরুলতাকে সহোদরা ভগ্নির ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন। ছেলেটি ক্রমে ক্রমে বড় হইতে লাগিল, দয়াবতী সেই পুত্রের নাম রাখিলেন, বনস্পতি।

কামদেবপুরের বাবা ঠাকুরের চরণামৃত পান করিলে বন্ধ্যানারী পুত্রবতী হয়, জয়াবতী সেই চরণামৃত পান করিয়াছিলেন, তাহার পুত্র জন্মিল না; জয়াবতী তজ্জন্য কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না; তরুলতার গর্ভজাত বনস্পতিকে তিনি নিজ গর্ভজাত পুত্র তুল্য স্নেহ যত্ন করিয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তরুলতা বোবা কালা হইয়াছিল, অকস্মাৎ গৃহদাহের বিপদে কথা ফুটিল; শ্রবণশক্তি ফিরিয়া আসিল। কেহ কেহ মনে করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য। বাস্তবিক কিছুই আশ্চর্য্য নয়; প্রকৃতির এমন খেলা প্রকৃতি-সঙ্গত। যাহারা বধির হইয়া জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তাহাদের মূকত্ব স্বাভাবিক, তাহারা জন্মাবধি কোন শব্দ শুনিতে পায় না, সুতরাং বাকশক্তি থাকে না, কোন প্রকার চিকিৎসায়ও তাহা আরাম হয় না; তরুলতার ভাগ্যের দুর্ঘটনার ন্যায় কোন প্রকার দৈব্যদুর্ঘটনায় জন্মের পর যাহারা ঐ দুই শক্তি হারায়, অন্য কোন প্রকার অভিনব ঘটনায় তাহারা সেই দুই শক্তি পুনরায় প্রাপ্ত হয়, তাহার এই দৃষ্টান্ত তরুলতা। বহু দুঃখসংকুল হৃদয়-ভেদিনী আখ্যায়িকা হইলেও, এই আখ্যায়িকার ইহাই সার তাৎপর্য্য।

সমাপ্ত।

লোহিত আলোকদ্বারা বসন্তরোগের চিকিৎসা।

যাঁহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, সূর্য্যরশ্মি একটী Prison (ঝাড় লণ্ঠনের কলমের মত ৩টী শিরাবিশিষ্ট একখণ্ড কাচ) এর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত করাইলে, তাহা পাটল, নীল, লোহিত, পীত, হরিত ইত্যাদি রামধনুর সপ্ত বর্ণে বিশ্লেষিত করিতে পারা যায়। সূর্য্যই সৌরমণ্ডল পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসমূহের ও পরিদৃশ্যমান্ সর্ব্বপ্রকার জৈবশক্তির আদ্য প্রাণ। সূর্য্যের এই জীবনীশক্তি না থাকিলে গ্রহসমূহের অস্তিত্বই থাকিত না। সূর্য্যই যে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সর্ব্বপদার্থের জীবনীশক্তি বেদে তাহার উল্লেখ আছে।

"সূর্য্যআত্মা জগতঃ তস্থশশ্চ।" যে গ্রহ যেরূপ বর্ণের আলোক কিরণ প্রতিক্ষেপ করে, সেই গ্রহ তদ্বর্ণবিশিষ্ট হয়। তৈজস অঙ্গারের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া "মঙ্গল" গ্রহের অপর একটী সংস্কৃত পর্য্যায় "অঙ্গারক"। এই গ্রহ ও অন্যান্য লোহিতবর্ণবিশিষ্ট বস্তু যে লোহিতবর্ণ বিশিষ্ট, তাহার কারণ, ইহারা আপনাদিগের অভ্যন্তর দিয়া সূর্য্যকিরণের লোহিত রশ্মি সঞ্চারণ করিতে দেয় এবং অন্যান্য বর্ণের রশ্মি যাইতে দেয় না। প্রাণন ক্রিয়া উত্তেজনা করা লোহিত রশ্মির ধর্ম্ম। ইহা উত্তেজক ও বিস্তৃতিধর্ম্ম-বিশিষ্ট। ইহাতে নর-শরীর-বিধানের জড়ভাব দূর করিবার শক্তি আছে। বসন্ত রোগে লোহিত আলোক দেহের শোণিতকে এরূপ ক্রিয়াবিশিষ্ট করে যে, তন্নিবন্ধন অতি শীঘ্র পূয়ঃ বা বিষ (Virus) নিঃসারিত হয়। এই সন্তাপন ধর্ম্ম আছে বলিয়া, ইহা দ্বারা পীড়কা সকল (Vesicles) অধিকতর স্থূলকায় ও পূর্ণায়তন হয়। ইহা দ্বারা cold-inflammation (শ্লেষ্মাজনিত শোথ) এরও আরোগ্য দেখা যায়। Elliot Roadএ টীকা দিবার অভিপ্রায়ে যে গবালয় আছে, তথায় লোহিত আলোকে আলোকিত গৃহে টীকাযুক্ত গোবৎস রাখিয়া তাহাদিগের উপর অনেক পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের পীড়কা সকল হইতে নির্গত রস যত অধিক দিন স্থায়ী, গোবৎস সকল সাধারণ সূর্য্যকিরণে রাখিলে যে রস বাহির হয়, তাহা ততদিন ব্যবহার্য্য থাকে না; শীঘ্রই পূঁজে পরিণত হয়; কারণ সচরাচর গোবীজের টীকা সম্বন্ধীয় পীড়কা সকলের যেরূপ পূঁজ উৎপত্তি হয়, ইহাতে সেরূপ হয় না।

নীলরশ্মি ফলতঃ লোহিত রশ্মির প্রতিকূল, সুতরাং লোহিত আলোক দ্বারা চিকিৎসায় আলোকের অন্যান্য উপাদানগুলি পৃথক করা আবশ্যক। আমি পাঠকের অবগতির জন্য এইটী জানাইতে ইচ্ছা করি যে, বসন্ত রোগ চিকিৎসায় লোহিত আলোক বিশেষ প্রয়োজনীয়। (১৯০৪ সালে ৫ই মার্চ্চের Lancet পত্রিকায় Dr Nash লোহিত আলোকে আলোকিত গৃহে দ্বাদশটী বসন্ত রোগী চিকিৎসা করিয়া যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—I can not but feel that the suppurative stage was considerably modified and rendered less severe and dangerous by the beneficial influence of the red rays or rather by the exclusion of the other elements of light. In none of these cases there was secondary fear of suppuration.

বসন্তরোগের আরোগ্য সম্বন্ধে Norway এবং অন্যান্য স্থানে রোগীর শরীরোপরি লোহিত আলোক প্রয়োগের উপকারিতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। আমার প্রবন্ধ লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, সকলে এই অতি সহজসাধ্য চিকিৎসায় বসন্ত ও অন্যান্য রক্তদুষ্টিজনিত রোগে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই চিকিৎসা কাহারও বিরোধী নহে। কি হোমিওপ্যাথ, কি এলোপ্যাথ, কি কবিরাজ সকলেরই ইহা একবার পরীক্ষা করা আবশ্যক, কারণ সূর্য্যরশ্মি কাহারও নিজস্ব নহে এবং ইহার সহিত কাহারও দ্বেষ রাখা উচিত নহে।

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম, ডি।

পরম কল্যাণ গীতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

নিরাকার, সাকারব্রহ্মের ধ্যানাদি নির্ণয়।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত মন পবিত্র হইয়া জ্ঞানোদয় বা স্বরূপ বোধ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে পরমাত্মাকে ধারণ কিম্বা ধারণা করিবার চেষ্টা বা ধ্যান করিতে পারে না। যেমন যে ব্যক্তি কখনও রমণীয় পদার্থ দেখে নাই, সে ব্যক্তি কখনও ঐ রমণীয় পদার্থ

হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেক না; এবং উক্ত রমণীয় পদার্থ দ্বারা আকৃষ্ট হইবে না। সেই প্রকার যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে নিরাকার সাকার অখণ্ডাকারে দর্শন না করিয়াছেন, সে ব্যক্তি কি প্রকারে পূর্ণরূপে পরমাত্মাকে ধারণ বা ধ্যান করিবেক, বা পরমাত্মার ভাবাদি বুঝিবেক এবং কি করিলেই বা তাহার বৃত্তি পরমাত্মার দিকে ধাবিত হইবেক। যাহা কখনও দেখে নাই, যাহার বিষয় কিছুই বোঝা যায় না, তাহা কখন কেহ ধারণ কিম্বা ধ্যান অথবা তাহার দিকে মনের বৃত্তি যাইবার চেষ্টাও হয় না।

যেমন একটী পত্র যদি কোনপ্রকার প্রতিবন্ধক না পাইয়া বায়ু দ্বারা উড়িতে থাকে, তাহা হইলে ঐ পাতার কোন নিরূপিত স্থান থাকে না; ক্রমাগত পরিভ্রমণই করে, কিন্তু যদি কোন বৃক্ষাদির দ্বারায় গতিরোধ হয়, তাহা হইলে সেইখানেই পত্র থাকিয়া যায়। সেই প্রকার পত্ররূপী জীব, অবিদ্যারূপ বায়ু দ্বারা চঞ্চল হইয়া, দেশ, বিদেশ, তীর্থে তীর্থে এবং এক সাকার হইতে অন্য সাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, শান্তি পাইবার কোনও উপায়ই প্রাপ্ত হইতেছে না। কিন্তু যদি বৃক্ষরূপ পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিস্বরূপ গুরু মাতা পিতা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণের আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জীবের অজ্ঞান ভ্রমণ রোধ হইয়া শান্তি আইসে। তখন আর জীবকে অবিদ্যা দ্বারা চালিত হইয়া, এখানে সেখানে ভ্রমণ করিতে হয় না। কাহারও সহিত তাহার ভেদাভেদ থাকে না। দ্বেষ, হিংসা, মান, অপমান, আসক্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে কষ্ট পাইতে হয় না, তিনি সদা পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকেন।

জ্যোতি স্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান প্রভৃতি নাম সাকার বিরাট ব্রহ্মের। নিরাকার ব্রহ্মে কোনও উপাধি নাই বা নাম রূপ নাই। ভাগবতে কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথোপকথন বিষয়ে এই ধ্যান বিষয় লিখিত আছে, অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

অদৃশ্যে ভাবনা নাস্তি দৃশ্যমান বিনশ্যতি
অবর্ণমীশ্বরং ব্রহ্ম কথং ধ্যায়ন্তি যোগিনঃ।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

অন্তপূর্ণং বহিঃ পূর্ণং মধ্যপূর্ণং তু সংহিতম্
এবং পূর্ণময়ং পশ্যাৎ সমাধিস্থস্য লক্ষণম।

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

নিরাকার যাহা দেখা যায় না, তাহার ধ্যান ধারণা হয় না এবং দৃশ্যমান জগৎ বিনাশশীল, অতএব বর্ণ রূপাদি রহিত যে ব্রহ্ম তাহা ভক্ত যোগীগণ কি প্রকারে ধ্যান করেন ?

শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিলেন,—

সকলের অন্তরে, বাহিরে এবং মধ্যে পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র আমি (ব্রহ্ম) আছি, এই প্রকারে স্বরূপ অবস্থাপন্ন যোগীগণ ধারণা বা চিন্তা করিয়া থাকেন।

ইহার সার ভাব এই যে, একমাত্র পূর্ণ পরব্রহ্ম সকলের ভিতরে বাহিরে পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন। যে জ্যোতি তোমরা চেতনরূপে কার্য্য করিতেছ, সেই জ্যোতিই নিরাকার ও সাকার পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র রহিয়াছেন এবং প্রকাশ হইয়া চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি স্বরূপ নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরমাত্মাই কারণ, সূক্ষ্ম, স্থূলরূপে বিস্তারমান আছেন। পৃথিবী জল আদি রূপান্তরিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে নশ্বর বলে। কিন্তু ইহাও পরব্রহ্ম রূপই। কারণ জ্যোতিস্বরূপ সূর্য্যনারায়ণ যখন সৃষ্টি লোপ করিতে ইচ্ছা করেন, তখন দ্বাদশ কলায় প্রকাশ হইয়া সমস্ত স্থূল জগতকে আপনার রূপ করিয়া নিরাকারণে স্থিত হন।

জগৎ ক্ষণস্থায়ী বলিয়া ইহাকে নশ্বর এবং জ্যোতিস্বরূপ পরমাত্মা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ চিরস্থায়ী বলিয়া ইহাকে অবিনশ্বর বলে। ইনি অনাদিকাল হইতে একই ভাবে জ্ঞান স্বরূপে বিরাজমান আছেন। ইহারই নাম ত্রিকালজ্ঞ, অন্তর্যামী সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টি, পালন, লয়কারী প্রভৃতি উক্ত আছে এবং ইহাঁকেই সত্য বলিয়া জানিবে।

যোগ বিষয়।

পরমাত্মা জ্যোতি স্বরূপের সহিত জীবাত্মার অভেদ ভাবকে যোগ বলে। সূর্য্যনারায়ণ জ্যোতি স্বরূপে যজ্ঞেশ্বর অর্থাৎ জীবাত্মাকে আপন রূপ করিয়া নিরাকারে স্থিত করিবার কর্ত্তা। মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ ইহার পূর্ণভাব অবগত না হইয়া যৎকিঞ্চিৎ বস্তু মনে করে। এ বিষয় ভাগবতে লেখা আছে। এক সময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন! তুমি আমার প্রিয় ভক্ত ও সখা, এজন্য তোমাকে আদিত্য সূর্য্যনারায়ণরূপে দর্শন দিয়াছি এবং আরও বলিয়াছিলেন যে, "সৃষ্টির আদিতে আমি সূর্য্য নারায়ণকে পুরাতন যোগবিষয় শিক্ষা প্রদান করিয়াছি, সূর্য্যনারায়ণ মনুকে,

মনু ইক্ষ্বাকুকে প্রদান করেন। এবম্প্রকারে রাজর্ষি পরম্পরায় প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কালপ্রভাবে উহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন অর্জ্জুন বলিলেন যে, আপনি ত সম্প্রতি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে আপনি সূর্য্যনারায়ণকে যোগ দিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস-যোগ্য হইবে ? তখন পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বলিলেন,—"আমি এবং তুমি অনেকবার জন্ম লইয়াছি, কিন্তু আমার সমস্তই স্মরণ আছে, তোমার কিছুই স্মরণ নাই।"

সূর্য্যনারায়ণই যে নিরাকার ব্রহ্ম এবং ইনি জগতের মঙ্গলের জন্য সময়ে সময়ে অবতার রূপ ধারণ অর্থাৎ মনুষ্যাদি রূপ ধারণ করিয়াও অবিদ্যাজনিত জীবভাব না রাখিয়া পূর্ণব্রহ্ম ভাব প্রকাশ রাখিয়া জগতের উদ্ধার সাধন করিয়া থাকেন। নিরাকার ব্রহ্ম হইতে একেবারে স্থূল ইন্দ্রিয়াদি বিশিষ্ট শরীর এবং নির্গুণ ভাবে জগতের মঙ্গল সাধিত হয় না। নিরাকার ব্রহ্মই সর্ব্বশক্তিমান জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশ হইয়া জগতের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইনি নিরাকার কারণ হইতে সূক্ষ্ম জ্যোতি-স্বরূপ চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণরূপে প্রকাশ হইয়া স্থূল জগৎ চরাচররূপে বিস্তার হইয়া রহিয়াছেন। যোগনষ্টের অর্থ এই যে, জীব অজ্ঞানবশতঃ পূর্ণপরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ভাব মনে করিতেছে, এই ভিন্ন ভাব মনে করাকে যোগ নষ্ট জানিবে। নিরাকার ব্রহ্ম মন বাণীর অতীত হওয়ায় তাঁহার প্রতি নিষ্ঠা ও ভক্তি রাখা দুরূহ। কিন্তু সাকার জ্যোতিস্বরূপ গুরু মাতা পিতা চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ প্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন। মনুষ্যগণ ইহা হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় অর্থাৎ ইহাতেও ভক্তি নিষ্ঠা না রাখায়, জগতের এত অমঙ্গল হইয়াছে ও হইতেছে। যখন জীবাত্মা শ্রদ্ধা ভক্তিসহকারে ও উপাসনা দ্বারা পরমাত্মার সহিত অভেদ হইবেন, তখন ঐ অবস্থাকে যোগ জানিবে। ভক্ত রাজা জমিদার প্রজাদিগকে রাজর্ষি বলে। আর যাঁহারা ইন্দ্রিয়ের ভোগ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতি স্বরূপে মগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মর্ষি বলে।

বেদে লেখা আছে, চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ, পরমাত্মাকে প্রকাশ করিতে পারেন না, অতএব অগ্নি কি প্রকারে পরমাত্মাকে প্রকাশ করিবেন বরং সকলেই পরমাত্মার প্রকাশেই প্রকাশমান রহিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভগবানও বলিয়াছিলেন যে, আমাকে চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ করিতে

পারে না। ইহার ভাবার্থ এই যে, একমাত্র পূর্ণপরব্রহ্মই বিদ্যমান আছেন, এবং তাঁহার প্রকাশকে লোকে চন্দ্র, সূর্য্য, ও অগ্নি নামে অভিহিত করে। অতএব স্বতঃপ্রকাশমান পরমাত্মা ব্যতীত চন্দ্র সূর্য্য ও অগ্নি বলিয়া পৃথক কোন পদার্থ আছে, যাহা তাঁহাকে প্রকাশ করিবেন, অর্থাৎ আপনাকে আপনি কি প্রকাশ করিবেন।

যজুর্ব্বেদে লেখা আছে, যথা—বিজ্ঞাতারং অরে কেন বিজানীয়াৎ অর্থাৎ যিনি বিজ্ঞাতা চৈতন্য জ্ঞান স্বরূপ, তাঁহাকে অন্য কিসের দ্বারা জানা যাইবেক। কারণ পরমাত্মাকে মন বাণীর অতীত বা অগোচর বলে। যেমন অগ্নি প্রকাশ হইলে, প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা প্রভৃতি নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, প্রকাশ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়, কিন্তু প্রকাশ উষ্ণতাদি অগ্নি হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে, অগ্নি রূপই। সেই প্রকার পরমাত্মার প্রকাশ পরমাত্মা রূপই। যেমন তোমার প্রকাশকেই তোমার বুদ্ধি মন প্রভৃতি নাম কল্পনা করা হয়, সেই প্রকার পরমাত্মার প্রকাশকেই চন্দ্র সূর্য্য বলে। বস্তুতঃ পরমাত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় মন বাণীর অস্তিত্ব পৃথক কিছুই থাকে না, সেই প্রকার যখন চন্দ্রমা সূর্য্য নারায়ণ নিরাকার স্বরূপে স্থিত হন, তখন চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ বলিয়া পরমাত্মা হইতে কোন পৃথক প্রকাশ বোধ হয় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব আপনাকে পূর্ণ ভাবে বুঝিতে সক্ষম না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রমা সূর্য্যনারায়ণ যে একমাত্র পূর্ণ সর্ব্বশক্তিমানরূপে বিদ্যমান আছেন, তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিবেক না।

শ্রীশিবনারায়ণ স্বামী।

শিবাখ্যা-কিঙ্কর কাব্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কাতর কিঙ্করে করুণা-নয়নে,
চাহ গো জননি ডাকিছে দীন।
দনুজ-দলনি! তোমা বিনা কেবা
এ দনুজদলে করিবে ক্ষীণ॥
এত বলি ধর্ম্ম নিরবিলা দুঃখে
দর দর বহে নয়নে জল।

অচেতন তবু কাঁদে বনস্থলী
কাঁদিল কাননে পাখী সকল॥
উঠিল চমকি দেখি ধর্ম্মদেব
অদূরে মানবী মূরতি এক।
তাহার বদন দশন বিশাল
অতি ক্ষুদ্র আঁখি বিষম ভেক॥
ক্ষীণ কলেবর দুলে বায়ুভরে
শোলামত শোলা শরীর-ভার।
দুঃখমাখা মুখ চাহে মিটি মিটি
কোটরে ঢুকেছে নয়ন তার॥
কুঁজা হয়ে চলে বিষম কাতরে
সর্ব্বাঙ্গে যেমন ধরেছে বাত।
আলু থালু চুল ধূলি উড়ে তায়
দু' হাতে কামড়ে খিঁচিয়া দাঁত॥
হেন ভয়ঙ্কর বিকৃত আকার
হেরিয়া ধরম চমকি কয়।
একি একি হেরি একি ভয়ঙ্কর
মানুষী বলিয়া মনে না লয়॥
এ বিজন বনে নিশীথ সময়ে
কে তুমি ভ্রমিছ বল আমায়।
মম হিত আশে যদি আ'স তবে
আইস, নচেৎ ঠেকিবে দায়॥

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জাগাও না।

ভুল না অতীত কথা—জাগাও না আর,
ভুলে আছি—ভুলে যাও—মোছ অশ্রুধার,
কি হবে শুনিয়া হায়! বিষাদ-যাতনা
চাপা আছে—চাপা থাক মরম-বেদনা।

কণ্ঠেতে কেন গো আর শুষ্ক ফুলমালা!
ফেল ওগো ছিঁড়ে! কাজ কি বাড়ায়ে জ্বালা?
এ নহে ত্রিদিবভূমি—অমর-কেতন,
নাই প্রীতি—ভালবাসা সুখের মিলন;
এ যে গো নশ্বর ধরা—প্রবাসীর গেহ,
দু'দিন মায়ার খেলা—দুদিনের স্নেহ।
মরমে বিষাদ গীতি—অশ্রুসিক্ত আঁখি,
তুলিও না যবনিকা—দাও দূরে রাখি;
তুলিও না—গাহিও না আর স্মৃতিগান,
ভুলে আছি—বেশ আছি—ভাঙ্গিও না ধ্যান!

ভুল।

ভুলিয়া অতীত কথা—মরম-বেদনা যত,
ভবিষ্যৎ পানে চাহি' পড়ি প্রলোভনে শত,
সুখ আশে মুছি আঁখি আগ্রহে পরিনু মালা;
এখন পরাণ কাঁদে, বাড়িছে দ্বিগুণ জ্বালা!
আশার মরীচি' মাঝে—করুণ-বাঁশীর স্বরে,
লুব্ধ হিয়া—প্রত্যাগত দারুণ অবজ্ঞাভরে;
সাধের নেশার ঝোঁকে বিলাস-বাসনা আসি'
কুসুমিত উপবন পলকে গিয়াছে নাশি;
বিহীন সৌন্দর্য্য এবে—ছিন্ন ভিন্ন সব আজি,
চ্যুত বৃন্ত—ধূসরিত কোমল প্রসূন-রাজি;
আর ত বাজে না বাঁশী—হৃদি পূর্ণ হাহাকারে,
কোথায় প্রাণের হাসি?—অশ্রুরাশি শতধারে!
লক্ষ্যভ্রষ্ট—পথহারা সংসার আবর্ত্তে হায়!
কোথা শান্তি—প্রীতি-প্রেম—স্নেহের শীতল ছায়?

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

১২শ বর্ষ। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

মৎস্য-পূজা।

সমগ্র বিশ্বমণ্ডলকে "ব্রহ্মময়" এবং "ব্রহ্মশক্তির প্রকাশমান মূর্ত্তি" ভাবিয়া, ভক্তাধিক ভক্ত হিন্দু সমগ্র বিশ্বের পূজা করিতে সম্মত হইয়াছেন। পশু, পক্ষী, সূর্য্য, চন্দ্র, কীট, পতঙ্গ, তরু, লতা, গুল্ম, প্রস্তর, মৃত্তিকা প্রভৃতি যাবতীয় জীবে ও যাবতীয় পদার্থে ব্রহ্মের চিৎশক্তির আভাষ উপলব্ধি করিয়া সমুদয় উপাদানের অভ্যন্তরস্থ পরমপুরুষের উপাসনায় হিন্দু আনন্দানুভব করেন।

তিলোদক ক্রিয়ায় (তর্পণকালে) এইজন্য সমগ্র বিশ্বব্যাপী চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ পদার্থের পিপাসার শান্তির জন্য হিন্দু জলদান করিয়া তৃপ্ত হয়েন। সাগর, সরোবর বা স্রোতস্বতীর মৎস্য পর্য্যন্ত হিন্দুর উপাসনার পাত্র। মৎস্য-পূজার প্রথা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। ভারতের ইতিহাসে, সংস্কৃত সাহিত্যে এবং বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে মৎস্য ও মৎস্যধারী ধীবরের সম্মানের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত আছে। পুরাণ পাঠ করিয়া দেখা যায়, শ্রীভগবান একসময়ে মীনরূপ ধারণ করিয়া অবতার হইয়াছিলেন। কবিবর জয়দেব লিখিয়াছেন, "প্রলয় পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদং"।

প্রলয় পয়োধিজলে,
বেদ উদ্ধারিলে,
জয়দেব মীনরূপী,
জয় জগদীশ হরে॥

নক্ষত্রমণ্ডলে 'রাশি' দিগের তালিকায়, 'অন্যতম প্রধান রাশির নাম মীন' (মৎস্য)। বেদবিভাগ-কর্ত্তা, ভাগবতপ্রণেতা, মহর্ষি ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা

নাম্নী ধীবরজাতীয়া রমণীর গর্ভে উদ্ভূত বলিয়া কথিত আছেন। রাজা যযায়ণ "আপনাকে "মৎস্যপুত্র" বলিয়া কৌরবদিগের নিকটে পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে অথবা বিদেশযাত্রাকালে মৎস্যদর্শন করা শুভ লক্ষণ বলিয়া জ্যোতিষ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশে মৎস্যধারী ধীবর (জেলে) জাতি, অধম ও অনাচরণীয় জাতি মধ্যে গণ্য। চাষী কৈবর্ত্ত-(হালিক কৈবর্ত্ত) গণ মাহিষ্য নাম ধারণ করিয়া, জালিক কৈবর্ত্তগণকে "জেলে" ও মৎস্যধারী" বলিয়া উপেক্ষা করেন। হালিক কৈবর্ত্তের নিকটে জালিক কৈবর্ত্তেরা অনার্য্য, অধম, অনাচরণীয় এবং শূদ্রাদপি শূদ্র।

পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা মৎস্যের পূজা ও সম্মানের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকি। তৎসঙ্গে সঙ্গে ধীবর জাতিরও গুণপনা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হই। সুপ্রসিদ্ধ নাবিক ও ভ্রমণকারী কুক সাহেব (Cooke's Travels) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকে নানাস্থানে মৎস্যের মন্দির ও পূজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আমি আফ্রিকা দেশে ভ্রমণকালে প্রায় দ্বাদশটি স্থানে মৎস্যের মন্দির ও মৎস্য-পূজা দর্শন করিয়াছি। পুরোহিতেরা ধীবরজাতীয় পুরুষ; ইহারা শান্ত প্রকৃতিক, সুবুদ্ধিমান্, নিরহঙ্কারী এবং অতিথি-সেবায় অনুরক্ত। কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, ইহারা মৎস্যকে দেবতা বা অবতার ভাবিয়া পূজা করে অথবা মৎস্য ভিন্ন ইহাদের ভোজন সম্পূর্ণ হয় না; প্রতিদিবস প্রচুর পরিমাণে ইহারা মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে।" কুকসাহেবের এই কৌতুকময়ী উক্তি মৎস্যভোজী হিন্দু সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। লেমিংটন নামে আর একজন সাহেব লিখিয়াছেন, "পৃথিবীর অনেক স্থানে মাছের পূজা হয় বটে, কিন্তু মৎস্যধারী ধীবরগণ প্রায় সর্ব্বত্র নিন্দিত হইয়া থাকে।" হিন্দুশাস্ত্র পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, মৎস্যধৃতকারী অপেক্ষা মৎস্যবিক্রেতা শতগুণ অধিক অপরাধী এবং জেলে ও মাছবিক্রয়কারী অপেক্ষা মৎস্যখাদক সহস্রগুণ মহাপাপী।

যাহা হউক, পৃথিবীর যে যে স্থানে মৎস্য পূজার প্রথা প্রচলন আছে, সেই সমুদয় স্থান অপেক্ষা পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত কুরুক্ষেত্র অঞ্চলের মৎস্য-পূজা সর্ব্বাধিক আশ্চর্য্য ও কৌতুককর। কুরুক্ষেত্রের সুবিশাল প্রান্তরে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য তুলনা রহিত। কুরুক্ষেত্র গ্রাম হইতে প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে এক প্রাচীন ও প্রশস্ত হ্রদ আছে, ইহার নাম "মীনাতলাও" ইংরাজিতে

ইহাকে ফিস্ লেক্ (Fish Lake) কহা হইয়া থাকে। এই মীন-হ্রদে মৎস্য থাকে না এবং বাস্তবিক ইহাতে মৎস্য নাই; ইহার জলে মাছ ফেলিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ সেই মৎস্য মরিয়া যায়। ইংরাজেরা চল্লিশ বৎসর কাল ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করতঃ ইহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অদ্য পর্য্যন্ত কেহ ইহাতে মৎস্য দেখে নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রতি বৎসর একদিন মাত্র একটি বৃহদাকার মৎস্যকে এই হ্রদের জলের উপরে ভাসিতে অথবা খেলা করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। যেদিন "মীন" রাশি সম্পূর্ণভাবে সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, সেই দিনকে পঞ্জাব প্রদেশে "মীনরোজ্" বলা হইয়া থাকে। বৎসরের কোন্ দিনে মীনরাশি সূর্য্যে প্রবেশ করিবেন, পণ্ডিতগণ তিনমাস পূর্ব্ব হইতে তাহা গণনা করিয়া দেন, কখনও বা তিনবৎসরের গণনা একত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ দিনে দলে দলে অসংখ্যাসংখ্য পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানাস্থান হইতে পুষ্প, চন্দন, মিষ্টান্ন, দধি, দুগ্ধ, নারিকেল, বিল্বফল, শর্করা প্রভৃতি উপাদান লইয়া ঐ পুকুরের ঘাটে উপস্থিত হয় এবং মৎস্য দর্শন করিবামাত্র তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করে। ইহাকে "মচ্ছি পূজা" (Fish Worship) কহে। মহাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐদিন নিশ্চয়ই ঐ পুকুরে একটা বড় মাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য দিনে কোনও মৎস্যই দেখা যায় না। এরূপ হ্রদ ও এরূপ মাছের পূজা অতীব কৌতুককর বটে। পৃথিবীর অনেক দেশে মীনপূজা হইয়া থাকে কিন্তু এরূপ ভাবের হ্রদ, এরূপ ভাবের জল এবং এরূপ অদ্ভুত মৎস্য আর কোনও দেশে নাই, ইহা নিশ্চয়।

য়িহুদীর ধর্ম্মশাস্ত্রে (Old Testament) লিখিত আছে, জোণা নামক এক ভবিষ্যদ্বক্তা তিন দিবস পর্য্যন্ত এক মৎস্যের উদরে বাস করিয়াছিল। মহামতি যীশুখৃষ্টের দ্বাদশ প্রধান শিষ্যের মধ্যে পিটর, এন্দ্রু প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধীবরবংশোদ্ভূত পুরুষ, ইহাঁরা প্রথমে মৎস্য ধরিয়া তাহা বিক্রয় করতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তীর্থযাত্রার সময়ে শিকার করা অথবা ক্রীড়া করা মুসলমানদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ, কিন্তু মৎস্য ধরা অবিধি নহে। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে রোমান কাথলিক পাদ্রীদিগের সর্ব্বপ্রথম শিষ্যগণ ধীবর জাতীয় ছিল। কোচবিহারের ইতিহাসে দেখিতে পাই, মহাদেব স্বয়ং মৎস্য-ব্যবসায়িনী কোচ-স্ত্রীলোকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেন। পূর্ব্ববঙ্গের ছড়ায় ও কবিতায় পাঁচজন পীরের কথা শুনা যায়, "দরিয়ার এই পাঁচ পীরের"

মধ্যে বদর সাহার বংশধরগণ মৎস্যপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র মাছের দেবতার নাম "মাকাল ঠাকুর।" অনেক স্থানে ইহার পূজা হয়, জেলেদিগের মধ্যে বিশ্বাস এই যে, মাকাল ঠাকুরের নামে জাল ফেলিলে নিশ্চয়ই মাছ ধরা পড়িবে। কবি দাশরথী রায় লিখিয়াছিলেন,—

কোথায় রে মীন আয় চারে।
আমি মাকাল ঠাকুরের নাম কোরে,
এসেছি, বোসেছি ঘাটে,
সুধুই যেন যাই না ফিরে॥"

বাইবেলে দেখা যায়, যীশুখ্রীষ্ট পুনঃ পুনঃ মৎস্য ব্যবহার করিয়াছেন, এমন কি, এক সময়ে মৎস্যের মুখ হইতে তিনি টাকা বাহির করিয়াছিলেন বলিয়া বাইবেলে লিখিত আছে। কালিকট্ প্রভৃতি প্রদেশে দেবীমন্দিরের সম্মুখে মাছের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে। হিন্দুর গ্রহপূজায় মৎস্যের প্রয়োজন হয়। গুজরাটের "স্বামীনারায়ণ" নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সুপ্রসিদ্ধ গুরু শ্রীমৎ সহজানন্দ স্বামী "মৎস্য দেবতা" উপাধিতে আখ্যাত হয়েন; শুনা যায়, এক সময়ে দ্বারিকাধামে ইনি দশলক্ষ মৃত মৎস্যকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ মকারের মধ্যে মৎস্য অন্যতম। লক্ষ্ণৌ নগরীর একটা সুপ্রসিদ্ধ ও সুমনোহর অট্টালিকার নাম "মচ্ছীভবন"। প্রাচীন গ্রীক জাতির মৎস্য-দেবীর নাম মার্ম্মেথ্ (Mermaith) ইফীশীয়ানদিগের জগদ্বিখ্যাত ডায়েনা মন্দিরে (The Acts. Ch. xix Verse 24) সর্ব্বপ্রথম দৃশ্য—সুবর্ণ মৎস্য। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে মৎস্য এরূপে সম্মানিত হইয়া থাকে যে, নদ, নদী বা পুকুরে কেহ মাছ ধরিলে গ্রামের লোকেরা তাহাকে জাতিচ্যুত অথবা কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করে। এটাওয়া চিত্রকূট, দ্বারিকা, ওঁকারনাথ প্রভৃতি স্থানে মৎস্যধরার বিরুদ্ধে স্থানীয় হিন্দুরা আইন পর্য্যন্ত পাশ করিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে অনেক হিন্দুর উপাধি মকর, মীন, মৎস্য, মচ্ছি ইত্যাদি। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে একটা হিন্দুজাতির নাম "মীন"। পাদ্রী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব লিখিয়াছেন, "স্কট্‌লণ্ডের প্রাচীন কেল্‌ট্‌গণ গৃহদ্বারের সম্মুখে মৎস্যের মূর্ত্তি আঁকিয়া দিত"। (Indian Evangelical Review. April 1891) প্রাচীন মিশরে মৎস্যের খুব খাতির ও সম্মান ছিল। Plutarch on totemism) য়িহুদীদের পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রে ফিলিশটাইনদিগের মৎস্য-দেবতার নাম ড্রাগণ (Dragon) বলিয়া লিখিত আছে। (Vide the old Testament. Exodus) চিকিৎসাশাস্ত্রে মৎস্যের উপকারীতা এবং অনেক গুণের বর্ণনা আছে। চিকিৎসকদিগের মতে ইহা রুচিজনক, মেধাবর্দ্ধক, কেশরক্ষক এবং স্নেহগুণের পোষক। যাহা হউক, মৎস্যভোজী বাঙ্গালীর ভাতের প্রধান উপাদানের (অর্থাৎ মাছের) গুণ, খাতির, সম্মান ও পূজার কথা পাঠ করিয়া বোধ হয় অনেক বঙ্গবাসী পাঠক পরিতৃপ্ত হইতে পারেন। জেলে ও মৎস্য চিরদিনই গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং যাঁহারা মৎস্য-ভোজী, তাঁহাদের নিকটে ধীবর জাতি কখনই অপদার্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে কৌতুকের বিষয় এই যে, যাঁহারা অভ্যস্থ মৎস্যাশী, তাঁহারাই ধীবরের প্রধান নিন্দুক, এবং যাঁহারা মৎস্যাবতারের প্রধান ভক্ত, তাঁহারাই মৎস্যের অভ্যস্থ খাদক।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সরস্বতী-স্তোত্রম্।

(ভগবৎ-শঙ্করাচার্য্য-বিরচিতম্)

[ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথবর্ত্তী তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ও তাহাতে সরস্বতী-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই এই কয়েকটী শ্লোকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।]

(১)

সাকারশ্রুতিমুল্লঙ্ঘ্য নিরাকারপ্রবাদতঃ।
যদঘং মে কৃতং দেবি তদ্দোষং ক্ষন্তুমর্হসি॥

তুমি নিত্য নিরাকার,—এই জনশ্রুতি,
তাই না ভজিনু তব সাকার মূরতি।
ইহাতে যে দোষ আমি করেছি সম্প্রতি,
কৃপা করি ক্ষম তাহা, ওমা সরস্বতি!

(২)

ত্বমেব জগতাং ধাত্রী সারদেহক্ষররূপিণি।
প্রসাদাৎ তব দেবেশি মূকো বাচালতাং ব্রজেৎ॥

তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি অক্ষররূপিণী,
সংসার করিছ রক্ষা দিবস-যামিনী।
বিচিত্র মহিমা তব বলা নাহি যায়,
বোবাও বাচাল হয় তোমারি কৃপায়!

(৩)

বিচারার্থে কৃতো যশ্চ বেদার্থানাং বিপর্য্যয়ঃ।
দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চ্চনম্।
স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং যৎ ভূরি দুষ্কৃতম্।
তৎ ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্মস্বরূপিণি॥

বিচারে বেদের অর্থ করেছি লঙ্ঘন,
দেব-পূজা-জপ-যজ্ঞ করেছি খণ্ডন।
সর্ব্বদাই নিজ মত করিতে প্রচার,
কত পাপ করিয়াছি, সীমা নাই তার।
তুমি মহামায়া, তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপিণী,
যত কিছু অপরাধ ক্ষমহ জননি!

(৪)

কৃতাঘপরিহারায় তবার্চ্চা স্থাপিতা ময়া।
অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাভূতসংপ্লবম্॥

মোর অপরাধ যত করিতে খণ্ডন
এই তব মূর্ত্তিখানি করিনু স্থাপন।
ভিক্ষা এই, এই স্থানে ওমা সরস্বতি!
প্রলয় পর্য্যন্ত তুমি করহ বসতি।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি-এ।

বালবিধবা।

ক্ষুদ্র গল্প।

(১)

অপরাহ্ণ। অস্তগমনোন্মুখ লোহিতপ্রভ রবিকর-প্রভায় মধুমতীর পূর্ব্বোপকূলস্থিত সলিলরাশি ও তরুরাজি কিয়ৎক্ষণের জন্য হেমহার পরিধান করিয়াছে।

বিলাসপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের অন্তঃসারবিহীন দ্বিতল অট্টালিকার মুক্তবাতায়নে বসিয়া অনিমিষ-শূন্য-দৃষ্টিতে সুখতারা মধুমতীর সেই জল, সেই ঈষন্মলয়-মারুতান্দোলিত মধুর লহরী-লীলা সন্দর্শন করিতেছিল।

কেন দেখিতেছিল? কি দেখিতেছিল? জানি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহা তাহার স্বভাব ও অভ্যাস।

সুখতারা ত্রয়োদশবর্ষীয়া বয়ঃসন্ধিমধ্যগতা। ঈষদুদ্ভিন্ন পল্লবা লতিকার ন্যায় মনোহারিণী। কিন্তু প্রফুল্লা নহে,—বিষাদিনী চিন্তাকুলা।

ক্রমে রবিমণ্ডল অস্তাচল বিলীন হইতেন। নবরাগময়ী সন্ধ্যাবধূ শশাঙ্ক মিলনাশায় প্রাচীললাটে তারকা সিন্দূর বিন্দু পরিধান করিতেন। সকল দিন আশা পূরিত না। শশী আসিতেন না। দুঃখে ও বিষাদে যামিনীসতী গাঢ় কৃষ্ণবর্ণা হইয়া উঠিতেন। সুখতারাও ধীরে ধীরে উঠিয়া যাইত।

বসন্ত ঋতুরাজ। এ সময়ে জগৎ নব সজ্জায় সজ্জিত, নবীন ভাবে অনুপ্রাণিত ও নূতন রাগে অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে। অচেতন তরুলতাগণও এই সময়ে নবীন পল্লবে ও প্রফুল্ল কুসুমচয়ে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমা বিকাশ করে।

কাননের কুসুম আপনি ফুঠে, সৌরভ বিলায়, আবার আপনিই শুখাইয়া যায়। সুখতারার যৌবন-কুসুমও আপনি ফুটিয়াছে। সৌরভ বিস্তার করিবে কি না, জানি না, কিন্তু আপনিই শুখাইবে। পাঠক! সুখতারা বালবিধবা!

(২)

কালচক্রের আবর্ত্তনে, সময় সাগরের সৈকত-পুলিনে পদাঙ্ক রাখিয়া, দুইটী মাস অনন্তকাল সাগরে মিশিয়া গিয়াছে। এখন বৈশাখ মাস। সময় অপরাহ্ণ। আজ গগনমণ্ডল গভীর মেঘকালিমাচ্ছন্ন। যেন একখানি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ অবিচ্ছিন্ন মসীময় পট্টিকা আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

পর্য্যন্ত বিলম্বিত। গভীর কালিমাময়ী রজনী-হৃদয়ে মাঝে মাঝে তড়িন্মালা চমকিত হইয়া নিকোষোপলে সুবর্ণ রেখার ন্যায় বিভীষিকাময়ী ক্ষণস্থায়িনী তীব্রতর শোভা সমুৎপাদন করিতেছিল। মহা প্রকৃতির সেই ঘোর কৃষ্ণিমা, মধুমতীর স্বচ্ছ হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া, আজ তাহাকেও কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। অনন্ত বিশ্বমণ্ডল ধীর স্থির ও গম্ভীর মূর্ত্তিতে মহাবিরাটের মহাযোগ সাধনে ব্যাপৃত।

চঞ্চল ক্ষেপণীবিক্ষেপে মধুমতীর সলিলরাশি তাড়না করিতে করিতে একখানি নৌকা বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের পাদদেশে আসিয়া সংলগ্ন হইল।

নৌকার আরোহী শশীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সুখতারার পিতা ধরণীধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনী জামতা।

শশীবাবু তীরে উঠিয়া, মাঝিদিগকে পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন। পরে ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থান অভিমুখে চলিলেন। ভৃত্য বস্ত্রাদি লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিল।

সুখতারার চঞ্চলদৃষ্টি একবারের জন্য শশীকুমারের নবযৌবন প্রভাপ্রদীপ্ত মুখমণ্ডলে নিপতিত হইয়া, আবার তৎক্ষণাৎ নিমীলিত হইয়া পড়িল। যেন এক অভূতপূর্ব্ব নবীন ভাবে, বালিকার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। এক প্রকার তাড়িতের প্রবাহ, তাহার প্রাণের প্রাণে—হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবাহিত হইয়া গেল। সর্ব্বনাশিনী আজ হইতে অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইল।

নবজামতা তিন দিন পর্য্যন্ত মামাশ্বশুর গৃহকে আনন্দোচ্ছ্বাসে অনুপ্রাণিত করিয়া, আমোদে আহ্লাদে প্লাবিত করিয়া, চতুর্থ দিবসের প্রাতঃকালে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শাশুড়ীগণ অর্থ ও নববস্ত্র দ্বারা কুলীন জামাতাকে পুরস্কৃত করিলেন। শ্যালিকা ও শালাজবধূগণ বিদ্রূপ ব্যঙ্গে তাঁহাকে আনন্দিত করিতে ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু সে সরলা সুখতারা কোথায়? সে নির্জ্জনে নিভৃতে সেই বাতায়ন-প্রান্তে একাকিনী বসিয়া তাহার উজ্জ্বল নয়ন দুটীর দুইবিন্দু অশ্রু ও নিজের প্রাণটী শশীবাবুর চরণে উপহার দিল। পরে নয়নের জল নয়নে শুকাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে শূন্যমনে উদাস প্রাণে গৃহে প্রবেশ করিল।

শশীবাবু বাটীতে আসিয়া, নানাপ্রকারের নানাছাঁদের বহুবিধ পত্র পাইলেন। কেহ বা আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে তাঁহার সন্তোষ বিধানে চেষ্টা করিয়াছেন; কেহ বা বিনয় নম্রতা প্রকাশে তাঁহাকে প্রীত করিতে ত্রুটী করেন নাই।

আবার কাহারও বা রসিকতা-প্রকাশক সুদীর্ঘপত্রে তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কোনখানি পদ্য, কোনখানি বা গদ্য। আবার কোনওখানি পদ্য-গদ্য-মিশ্রিত ডালখিচুড়ী ধরণের। উত্তর দিতে দুই তিন টাকা ব্যয় হইয়া গেল। কিন্তু উপকার কিছু হইল কি? আমাদের বিশ্বাস, টিকিট ও পোষ্টকার্ডের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের ভালবাসাও কিছু সস্তা হইয়া পড়িয়াছে।

প্রায় ৫।৭ দিন পরে আর একখানি পত্র আসিল। তাহার উপরের লেখাটী যেন কি রকম ত্যাড়া বাঁকা। আবার দু-এক জায়গায় একটু একটু মুছিয়া গিয়াছে। বোধ হইল, যেন কষ্টসঞ্চালিত লেখনী দ্বারা লিখিত হইয়াছে। লিখিবারকালে লেখক বা লেখিকার অজস্র অশ্রুধারায় কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে।

শশীবাবু পত্রখানি খুলিয়া পাঠ করিলেন। একটু বিমনায়মান হইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সে পত্রের উত্তর লিখিত হইল না।

পাঠক মহাশয় বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এখানি সুখতারার লিখিত পত্র।

(৩)

শ্রাবণের অবিরল বারিধারার সহিত শশীবাবু মামাশ্বশুর গৃহে উপস্থিত হইলেন। অবশ্য যথাসম্ভব আদর যত্নের ত্রুটী হইল না। সুখতারা শশীবাবুকে দেখিয়া মনে করিল, যে হয় ত ইহার সহিত প্রাণটী ফিরিয়া আসিয়াছে। সে কিছু আশ্বস্ত হইল।

শশীবাবু মামাশ্বশুরের নিকট সুখতারাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। ধরণী বাবু মনে মনে অসম্মত হইলেও কুলীন, অর্থশালী ও শিক্ষিত জামাতার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না।

সুখতারা শশীবাবুর সহিত নৌকায় উঠিয়া মধুমতীতে অথবা অধঃপাত-সাগরে ভাসিল। নৌকায় খড়্গপুরে পৌছিতে তিন ঘণ্টা সময় লাগিল। ইহার মধ্যে সে একবার প্রাণ ভরিয়া তাহার প্রাণের প্রাণকে দেখিয়া লইল। তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। হৃদয়, আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। কিন্তু সে জানিল না যে, তাহার কি হইল।

শশীবাবুর প্রেয়সী গৃহিণী সুধামুখী ভগিনীকে পাইয়া মহানন্দে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। আদর যত্নের সীমা নাই। বঙ্গবাসিনী আজ বাগাড়ম্বরে

বৃহস্পতি-বিজয়িনী। ভালবাসার কথায় ভগিনীর কাণ ঝালাপালা হইয়া উঠিল। সুখতারা কিন্তু নির্ব্বাক্। আদর করিয়া ভগিনীর অযত্ন-সংরক্ষিত অসম্বদ্ধ কেশগুচ্ছ সরাইতে সরাইতে সুধা বলিল, "কি লো সুখি! আজকাল যে তুই বড়ই গম্ভীর হয়েছিস্?" সুখতারা নীরবে রহিল।

(৪)

বলা আবশ্যক, সুখতারা, বালিকা বলিয়া, এতদিন সে বৈধব্যচিহ্ন ধারণ করে নাই। সে পাড়ওয়ালা কাপড় পরিত; গহনা গায়ে দিত, এবং নিজের কোমল ওষ্ঠাধর দুইখানিকে তাম্বুলরাগে সুরঞ্জিত করিত। কেবল সীমন্তটীকে সিন্দূর বিন্দু হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল।

শশীবাবুর সংসারে সুধা ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোক ছিল না। কেবল একজন দাসী তাঁহার বাটীর বাহিরের কাজ করিত। কিন্তু সে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বাটী যাইত; সুতরাং সুখতারাকে একাকিনী একটী গৃহেই শয়ন করিতে হইত। ইহাতে সে পূর্ব্ব হইতে অভ্যস্তও ছিল।

রজনী দ্বিপ্রহর। জগৎ সুপ্ত, সুতরাং শান্ত। আকাশ নির্ম্মল চন্দ্রকরোজ্জ্বল। পৃথিবী হাস্যময়ী। তরুলতাগণ সুধাকরকিরণে স্নাত হইয়া, স্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল কান্তিতে জগতের মনোহরণ করিতেছিল।

শশীবাবু সুধামুখীর গাঢ় আলিঙ্গন বিচ্ছিন্ন করিয়া উঠিয়া বসিলেন। সুধা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাও?"

শশী। বিশেষ কোন প্রয়োজনবশতঃ আমি এখন এক জায়গায় যাইব। তোমাকেও আমার সঙ্গিনী হইতে হইবে।

সুধা। কোথায় যাইবে?

শশী। যেখানে গেলে তোমার সন্দেহ হইতে পারে।

সুধা। কোথায়? স্পষ্ট করিয়া বল না? গোপন রাখার আবশ্যক কি?

শশী। আমি সুখতারার গৃহে যাইব। তোমাকে বাহিরে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

সুধা। তুমি যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইতে পার। আমি বাহিরে আড়ি পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকিব কেন?

শশী। তোমার সন্দেহভঞ্জনের জন্য।

সুধা। পুরুষের বুদ্ধি আছে, ক্ষমতা আছে, দশ জায়গায় যাইবার ক্ষমতাও আছে। ইচ্ছা করিলেই সে শিকল কাটিতে পারে। সুতরাং তাহাকে

অবিশ্বাস না করিয়া বিশ্বাস সহকারে ছাড়িয়া দেওয়াই স্ত্রীলোকের উচিত নয় কি?

শশী। তুমি পরোক্ষে আমায় বিশ্বাস করিতে পার। এরূপ প্রত্যক্ষ বিষয়ে কি প্রকারে বিশ্বাস করিবে?

সুধা এবার উঠিয়া বসিল। উজ্জ্বল নয়নদ্বয়কে আরও উজ্জ্বলীকৃত করিয়া সমুন্নত স্ফীতশির গ্রীবাকে বামভাগে ঈষৎ হেলাইয়া কম্পিতকণ্ঠে অথচ তীব্রস্বরে বলিল;—

"প্রভু! দাসী তোমাকে দেবতা বলিয়া জানে। যদি তুমি পিশাচ হও, হইতে পার। তাহাতে আমার কি? তুমি স্বর্গের দেবতা, কি নরকের কীট, সে বিচারে আবশ্যক বা অধিকার আমার নাই। আজ যদি তুমি এরূপ প্রেমের পূর্ণাবতার না হইয়া, মদ্যপান পূর্ব্বক কম্পিতদেহে কর্দ্দমলিপ্ত শরীরে গৃহে আসিয়া আমাকে পদাঘাতে দূর করিতে, তাহা হইলেও বোধ হয় আজ সুধা তোমাকে ইষ্টদেবতাজ্ঞানে—আরাধ্যদেবতাবোধে প্রাণের প্রাণে পূজা করিতে ভুলিত না। স্বামিন্! তুমিই আমার শিক্ষক, তুমিই আমার একমাত্র গুরু। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রমণীকে পতির প্রতি অবিশ্বাস করিতে শিক্ষা দেওয়া কি তোমার উচিত?"

শশীবাবু নিরুত্তর। ক্ষণেক স্তম্ভিত ও স্তিমিতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সুধার সেই সমুজ্জ্বল মুখখানির উপর সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, ধীরভাবে বলিলেন, সুধা! "তুমি মানবী না দেবী?"

অভিমানিনী সুধা উত্তর করিল না। শশীবাবু ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

সুখতারা আশার আশ্বাসে গৃহদ্বার রুদ্ধ করে নাই। সুতরাং বিনা আয়াসেই শশীবাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। ডাকিলেন, "সুখতারা!" সুখতারার কর্ণে অমৃতসিক্ত বীণার ঝঙ্কার প্রবেশ করিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

শশীবাবু দেখিলেন, অযত্নসংরক্ষিত কেশরাশির মধ্যে শৈবালদামের উপরে নীহারসিক্ত প্রভাতকমলের ন্যায়, কিম্বা নীলাম্বরমণ্ডলে কৌমুদীবিধৌত চন্দ্রের ন্যায় তাহার অশ্রুকলুষিত মুখখানি ভাসিতেছে।

একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া শশীবাবু পুনরায় ডাকিলেন, "সুখতারা!" সুখতারা ধীরে ধীরে তপ্তপোষ হইতে নামিল। গলবস্ত্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া অস্ফুট ও অনুচ্চস্বরে বলিল, "আমি প্রাণ দিয়াছি।"

শশী। দানের ফল অবশ্য পাইবে। কিন্তু আমার একটী অনুরোধ রাখিবে কি ?

"দানের ফল পাইবে" এই কথাটী সুখতারার হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করিল। সে ঈষৎ প্রফুল্লমুখে বলিল, "আদেশ করুন। আমি প্রাণ দিয়া যন্ত্রচালিত পুতুল হইয়াছি। যেদিকে চালিত করিবেন, সেইদিকে চলিব।"

শশী। সুখতারা! বলিব কি ? বড় ক্লেশ হয়। আবার না বলিলেও নয়। আজ তোমাকে বাড়ীতে আনিয়া, তোমার প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইল। সুখতারা! বল, ইহা কি বিধাতার লিখন ? না, আমার কর্ম্মফল ? শশীবাবু কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সুখতারা বলিল, "কাঁদিবার প্রয়োজন নাই। বিধাতা যার জন্য কাঁদিলেন না, তার জন্য মানবের রোদনে ফল কি ?"

শশীবাবু বিষাদজড়িতস্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে বলি, কাল হইতে তোমাকে একটী করিয়া শিব পূজা করিতে হইবে।"

সুখ। করিব।

শশী। আর একটী কথা।

সুখ। আদেশ করুন্।

শশী। কাল হইতে তুমি আর পাড়ওয়ালা কাপড় পরিতে পাইবে না। আর——

সুখ। আর কি ?

শশী। অলঙ্কার ত্যাগ করিতে হইবে।

সুখ। করিব।

শশী। আরও আছে। কিন্তু সুখতারা! আজ থাক্।

সুখ। না, বলুন। দুঃখ কি ?

শশী। তোমার ঐ ভ্রমরকৃষ্ণকেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিতে হইবে।

সুখ। আপনার আদেশ কল্যই পালিত হইবে।

শশী। হবিষ্যান্ন ও একাদশী—

সুখ। (ঈষৎ হাসিয়া) করিব। কিন্তু এ দাসীর একটী কথা থাকিবে কি ?

শশীবাবু মনে করিলেন, না জানি আবার কি কথা ? প্রকাশ্যে বলিলেন, "যোগ্য হইলে অবশ্য রাখিব।"

সুখ। আমার কাপড় ও গহনাগুলি দিদিকে দিতে হইবে। আর আমার সেই চুলগুলি লইয়া দিদির খোঁপা বাঁধিয়া দিব।

শশী। তোমার চুল দিয়া তাহার খোঁপা বাঁধিয়া দিতে পার, তাহাতে আমার কিছু আপত্তি নাই। কিন্তু—

সুখ। আবার কিন্তু কি ?

শশী। তুমি অনাথা বিধবা। সংসারে তোমার কিছু সম্বল আবশ্যক।

সুখতারা দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল, "সংসারে রমণীর যাহা সম্বল, বিধবা তাহা চিরকালের জন্য হারাইয়াছে। এখন সমুদ্রে শয্যা পাতিয়াছি, শিশিরের ভয় কেন ?

শশী। আর একটি কারণ আছে।

সুখ। কারণ আমি শুনিতে চাই না। বল, আমার কথা রাখিবে কি না ?

শশী। তোমার এত আগ্রহ কেন ?

সুখ। আমার একটী সাধ কি পুরিবে না ?

শশী। এখন না, কিছুদিন পরে।

সুখ। কেন ? কারণ কি ?

শশী। যদিও তুমি স্বেচ্ছায় দিতেছ, কিন্তু লোকে কি তাহা বুঝিবে ? বরং তোমাকে ভুলাইয়া লইয়াছি বলিয়া সমাজে আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে।

সুখ। তবে স্বীকার করুন্, যে আমার সাধ কোনও সময়ে পুরাইবেন।

শশী। অবশ্য পুরাইব।

সুখতারা নির্নিমেষ নেত্রে ভূমিপানে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল।

শশীবাবু বলিলেন, "সুখতারা! তুমি সংসার-আঁধারের আলোকদায়িনী সুখতারাই সত্য। কিন্তু দুঃখ এই যে, সে আলোকে যে লক্ষ্য স্থির করিবে, সে বহুপূর্ব্বে এ জগতে ত্যাগ করিয়াছে।"

সুখতারার গণ্ডদেশ অশ্রুপ্লাবিত হইল। শশীবাবুর নয়নযুগলও শুষ্ক রহিল না। তিনি বাষ্পবিজড়িতস্বরে বলিলেন, "সুখতারা! তবে এখন আসি!"

সুখ। আর একটু অপেক্ষা করিবেন না কি ?

শশীবাবু বসিলেন। সুখতারা শয়ন করিয়া দুই, চারি বিন্দু অশ্রুর সহিত হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়া লইল। পরে ধীরে ধীরে বলিল, "এখন যাইতে পারেন।"

শশীবাবু প্রস্থান করিলেন।

(৫)

পরদিন সে সুখতারার আর অস্তিত্ব ছিল না। যেন অপর সুখতারা সংসারে সমুদিত। বেলা ১ প্রহরের সময় মধুমতীর ঘাটে পল্লীবাসিনীগণ অভূতপূর্ব্ব অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিল। সুখতারার প্রফুল্ল মুখমণ্ডলে সুচারু প্রভাত-কমলে শুভ শিশিরবিন্দুর ন্যায় সে নোলক আর শোভা পাইতেছে না। সে মনোহর সুগোল বাহুযুগলে বলয়-যুগল আর নাই। সেই নিতম্ব-বিলম্বী ঘনকৃষ্ণকুটিলকেশপাশ কোথায় গিয়াছে। সেই চরণ-কমলসংসক্ত নূপুরধ্বনি-শ্রবণে পল্লীবাসিগণের মন আর উল্লসিত নহে। যেন ব্রহ্মচর্য্য আজ স্বয়ং দেবীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কক্ষে কলসী ও হস্তে শিবমূর্ত্তিকা লইয়া চলিয়াছে।

শশীবাবু উচ্চশিক্ষিত হইলেও পৈতৃক শালগ্রাম শিলাটীকে এখনও বাস্তভিটা হইতে বিচ্যুত করেন নাই। সুধামুখীও শিক্ষিতা। কিন্তু নভেল পাঠে মনো-নিবেশ না করিয়া, প্রত্যহ প্রাতঃকালে শুচি ও পবিত্র হইয়া পূজার সজ্জায় ব্যাপৃতা হইত। ইহা শালগ্রাম ও আমাদের মধ্যে কাহার সৌভাগ্য, তাহা বলিতে পারি না।

সুখতারা আজি হইতে দেবগৃহের সমস্ত ভার লইল। শশীবাবু নারায়ণের ধ্যান করিয়া মুদ্রিতনেত্রে ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। সুখতারা নির্নিমেষনেত্রে একমনে একপ্রাণে তাহাই দেখিত। দিবা আড়াই প্রহরের সময় হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া, পবিত্র মহাভারত পাঠে মনঃ সংযোগ করিত।

এখন কার্ত্তিক মাস। বর্ষার অবিরল জলধারাপ্লাবী ঘনকৃষ্ণ মেঘনিচয় শূন্যে—মহাশূন্যে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখন প্রকৃতি শান্ত ও স্তিমিত।

একদিন নিভৃতে শশীবাবু সুখতারাকে বলিলেন, "সুখতারা! এখন তোমার প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছ কি?"

সুখ। দত্তবস্তু ফিরিয়া পাইবার আশা কখনও করি না। তবে তখন বিনিময় চাহিয়াছিলাম; এখন আর তাহা চাই না।

শশী। কেন চাও না?

সুখ। তখন আপনাকে সামান্য মানব বিবেচনা করিয়াছিলাম। এখন বুঝিয়াছি, যিনি স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সুন্দরীর প্রণয়োপহার সামান্য তৃণমুষ্টির ন্যায় পরিত্যাগ করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই মানব-শরীরে দেবতা। যখন দেখি-লাম, সহস্রাধিক টাকা মূল্যের স্বর্ণালঙ্কাররাশি সামান্য মৃৎখণ্ডের ন্যায় তাঁহার নিকট উপেক্ষিত হইল, তখন সে বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ীভূত করিলাম। তখন

প্রাণ পাইব আশায় যাহা দিয়াছিলাম, এখন তাহা নিষ্কামভাবে ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিয়াছি মনে করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। অধিক কি বলিব, আপনি আমার গুরু। আপনিই ঐ হতভাগিনীকে নরকের অন্ধকারময় গভীর কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া অনন্ত স্বর্গের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। আজ দাসীর প্রণাম গ্রহণ করুন।

সুখতারা গলবস্ত্র হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।

শশী। এখন আমার আর একটী অনুরোধ।—

সুখ। আদেশ করুন।

শশী। তোমায় দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

সুখ। কার কাছে।

শশী। তোমার শ্বশুরের গুরুর কাছে।

সুখ। আমি মনে মনে আপনাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছি।

শশী। আমি ভূমিকর্ষণ করিয়াছি মাত্র। বীজ আমার নাই। সুতরাং আমার নিকট তুমি সে আশা করিতে পার না। সুকৃষ্ট ভূমিতে বীজ সত্বরই অঙ্কুরিত হইবে আশা করি। তাই বলি, আর বিলম্ব অনাবশ্যক।

সুখ। আপনার আদেশই শিরোধার্য্য। দয়া করিয়া গুরু আনাইয়া দিন।

শশী। তোমাকে আমার পিত্রালয়ে যাইতে হইবে।

সুখ। ওরূপ আদেশ করিবেন না। আমি আর সেখানে যাইব না।

শশী। কেন?

সুখ। সেখানে গেলে আবার বিলাসিনী সাজিতে হইবে। পিতামাতা আমার এ দৃশ্য দেখিতে পারিবেন না।

শশী। তাহার উপায় আমি করিব। সেজন্য তোমার চিন্তা করিতে হইবে না।

সুখ। তবে তাহাই হউক।

যথাসময়ে সুখতারা শশীবাবুর সহিত পিত্রালয়ে পৌঁছিল। মাতা সে দৃশ্য দেখিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন। সুখতারা নীরবে গৃহে প্রবেশ করিল।

শশীবাবু ধরণীধর বাবুকে সুখতারার লিখিত পত্র দেখাইয়া পূর্ব্বাপর সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। তিনি বুঝিলেন, কন্যার এ বেশধারণ উপযুক্তই হইয়াছে। দ্বিতীয় দিন শশীবাবু বাটী যাইবার সময় সুখতারার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সে বলিল, "বলিতে পারি না, যদি ইহার মধ্যে আমার

মৃত্যু উপস্থিত হয়, তবে সংবাদ পাইলে সুধাদিদিকে সঙ্গে লইয়া একবার আসিবেন।—নতুবা আমার অপমৃত্যু ঘটিবে।”

শশীবাবু স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলেন। ধরণীধর বাবু গুরু আনাইয়া সুখতারাকে দীক্ষা গ্রহণ করাইলেন। সুখতারার দেবতা ও গুরুজনে ভক্তি, আত্মীয়স্বজনে প্রীতি, বালক-বালিকার প্রতি অসীম স্নেহ ও ভালবাসা, দরিদ্রে দয়া, আতুরে সহানুভূতি ও পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি দেখিয়া বিলাসপুরের যাবতীয় লোকই মুগ্ধ হইল। কেবল রামের মা, শ্যামের ঠান্‌-দিদি প্রভৃতি কতকগুলি বর্ষীয়সী, পলিত কেশা, গলিত দন্তা, বৃদ্ধা তামাক-পোড়ারূপ মহৌষধে কৃষ্ণবর্ণ দন্তদ্বয়কে আরও কৃষ্ণতর করিয়া হাস্যধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্ত পূর্ণ করিয়া বলিলেন, “ও অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।” (ক্রমশঃ)

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

তিনি কে ?

(১)

বেসেছি যাঁহারে ভাল
সে কি ভালবাসে মোরে ?
যাঁহারে খুঁজি গো সদা,
কাঁদি আমি যার তরে।

(২)

কভু যাঁরে হেরি নাই,
কেন তাঁরে ভালবাসি ?
বারেক হেরিনি যাঁরে,
কেন তাঁর অভিলাষী ?

(৩)

যাঁহার স্মরণে মাগো !
প্রাণে বড় সুখ পাই,
তিনি কি বিশ্বের বিভো ?
বল না বল না তাই।

(৪)

জ্বেলেছে যে মোর হৃদে
জ্বলন্ত প্রেমের আলো,
তিনি কি বিশ্বের বিভো ?
যাঁরে আমি বাসি ভাল।

(৫)

যাঁহার দয়ায় মাগো,—
আকাশেতে চাঁদ উঠে,
তিনি কি বিশ্বের প্রভো ?
যাঁর তরে ফুল ফোটে।

(৬)

যাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি,—
আর মহিমা অপার—
“তিনি যে বিশ্বের বিভো”
করি তাঁরে নমস্কার।

শ্রীঅমরনাথ বসু বিদ্যাবিনোদ।

বঙ্গসাহিত্যে—হেমচন্দ্র।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

“জিজ্ঞাসিল ইন্দুবালা আতঙ্কে শিহরি’,
কে পড়িল রণস্থলে, কোন্ বামা-হৃদিতলে,
আবার হৃদয়নাথ ঘাতিল আমার—
কার ভাগ্যে ভাঙ্গিল রে, সুখের সংসার ?
চপলা অস্ফুটস্বরে রুদ্রপীড়-নাম
উচ্চারিলা অকস্মাৎ, হৃদে যেন বজ্রাঘাত,
না পশিতে সে বচন, শ্রবণের মূলে,—
পড়িল দানব-বধূ ইন্দ্রজায়া-কোলে !
* * * * *
শুকাইলা ইন্দুবালা, নিদাঘের ফুল !
হায় রে ! সে রূপরাশি, যেন স্বপনের হাসি,
লুকাইল নিদ্রাকোলে ফুটিবে না আর !
ছিন্ন যেন শচী-কোলে লাবণ্যের হার।

কবি এইরূপে তাঁহার মানসপ্রতিমার বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

বৃত্রসংহারের ইন্দুবালা ও মেঘনাদবধের প্রমীলা, উভয় চরিত্রে কত প্রভেদ, পাঠক মহাশয়েরা বিচার করিবেন। চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আলোচনা করিলে অবশ্যই বুঝিবেন, দেবীতে ও মানবীতে যত প্রভেদ, ইন্দুবালায় ও প্রমীলাতে তত প্রভেদ। ইন্দুবালার চরিত্রে বিন্দুমাত্র দোষ দৃষ্ট হয় না; সে চরিত্র—পবিত্র, নির্ম্মল, কোমল, প্রীতিকর। কবি, নির্দ্দোষ তুলিকায় সে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সুপবিত্র ভাবের সহিত বিশুদ্ধ চিন্তাশীলতার সংযোগ! এরূপ মণিকাঞ্চন-সংযোগ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয় না। মেঘনাদ-বধ কাব্যের আদর্শ চরিত্র প্রমীলাকে কাব্যকর্ত্তা নির্দ্দোষ করিতে পারিতেন, কিন্তু বীররসে পবিত্র প্রেম অঙ্কিত করিতে গিয়া কতকটা অসার পার্থিব প্রেমভাব আনয়ন করিয়াছেন।

উভয় কবির তুলনায় কাহারও দোষকীর্ত্তন আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মেঘনাদবধ-কাব্যে বহুরত্ন আছে। কাব্যের গুণ আলোচনা করিলে মেঘনাদ

বধে বীররসের বিশেষ মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মেঘনাদ-বধের তুলনা মেঘনাদ-বধ, বৃত্রসংহারের তুলনা বৃত্রসংহার।

ভক্তিরসাশ্রিত কবিতাতেও হেমচন্দ্রের অসাধারণ প্রতিভার প্রভা সুপ্রকাশ। দশমহাবিদ্যায়, দেবর্ষি নারদের চিত্রে হেমচন্দ্র উচ্চসুরে ভক্তি-গীতি গাহিয়াছেন :—

"আনন্দধ্বনি করি",— মুখে বলি' হরি হরি,
নারদ ঋষি রত সুললিত নটনে।
প্রবেশিলা হেনকালে, ত্রিতন্ত্রী বাজে তালে,
বিচেতন বিভু-গানে ত্রিভুবন-ভ্রমণে॥
কে বা হেন মতিমান্, কে ধরে সেই জ্ঞান,
জানিবে সুগভীর জগদীশ মরমে।
অনন্ত পরমাণু, বিকট বিদ্যুদ্‌ভানু,
উদ্ভব কোথা হ'তে, কি হইবে চরমে?
হর-হরি-ব্রহ্মান্, সচেতন জীবগণ,
আদিতে ছিল কি বা জনমিল কারণে?
মানব কিরূপ ধন, জড়েই কি বিশেষণ,
জড়-সনে সঞ্চারে কি বা বিধি-মননে?
সুখ কি জীবিত মানে? কিবা অর্থ নির্ব্বাণে?
কা' হ'তে জনমিল জগতের যাতনা?
অশুভ সৃজন কার? নিরমল বিধাতার,
মানস হ'তে কি এ মলিনতা রচনা?
ক্ষিতি অপ্ তেজঃ নভঃ, ভিন্ন কি একি সব,
পঞ্চ কি আদিভূত অগণন গণনা?
সেই তত্ত্ব-নিরূপণ, করিবারে কোন্ জন,
সমর্থ দেবঋষি মানবের ভাবনা?

গাও বীণা হরি-গান, দুর্লভ যেই জ্ঞান,
নিষ্ফল মানি তারে পরিহর মানসে।
প্রকাশ মন-সুখে, হরিনাম লিখি বুকে,
যে জ্ঞানে জীবলোকে প্রকটিত হরষে॥
জগত কি সুখধাম, মধুর কি বিভুনাম,
গাও রে প্রেমভরে মনোহর বাদনে।
ঝঙ্কার ঝঙ্কার, উল্লাসে বল আর,
আহ্লাদ সদা কি বা সাধুজন-জীবনে!
ধরম ধরমপুর, আপন ক্রিয়া কর,
সংযত করি মন, তাঁহাদেরি নিয়মে।
মোক্ষদ সার বাণী, শুনায়ে জাগায়ে প্রাণী,
সু-স্বরে নাদ করি রঞ্জিয়া পরমে॥
ত্রিগুণে যে গুণময়, যাঁহাতে এ সমুদয়,
উচ্ছ্বাসে ডাক্ বীণা অবিরত তাঁহারে।
দিবানিশি নাহি আন্, সপ্তমে তুলি' তান,
নারদ মনোমত-ধ্বনি বীণা বাজ রে।

এইরূপ সনাতন ধর্ম্মভাবমূলক উচ্চাঙ্গের গীতি-কবিতা যিনি গাহিতে পারেন,—তিনি সুধন্য! বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কাব্য অমর,—কাব্যকারও, চির-অমর। ফলতঃ—হেমচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যে অমরত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। অপিচ—

"রে সতি! রে সতি! কান্দিল পশুপতি,
পাগল শিব প্রমথেশ।
যোগ-মগন হর; তাপস যত দিন,
তত দিন না ছিল ক্লেশ॥"

হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যার এই যে শিব-বিলাপ, ইহা অতি অপূর্ব্ব। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, হেমচন্দ্রের অধিক সুখ্যাতি করিব কোন্ বিষয়ে?—তাঁহার স্বদেশানুরাগপূর্ণ উদ্দীপনাময়ী কবিতার, না এইরূপ ভক্তিগীতিকার?

ভাব-বিভোর নারদ দশমহাবিদ্যায়, আদ্যাশক্তি ভগবতীর দশরূপের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া, মায়ামুগ্ধ জীবকে সান্ত্বনা করিতেছেন :—

"জগৎ অনন্ত নয়, কালেতে হইবে লয়,
জীবে দুঃখ সমুদয় ত্রিগুণার ভজনে।
এই কথা বুঝে সার, আনন্দে নিনাদ তার,
সত্য পথে রাখি মন, অনাদ্যের স্মরণে।
লিখি' বুকে মোক্ষনাম, পূরা জীব! মনস্কাম,
নিখিল নিস্তার পাবে শিব কৈল্য আপনি।
লক্ষ্য করি' তারি পথ, চালা নিত্য মনোরথ,
জীব-জন্মে ভয় কি রে? জগদম্বা জননী॥"

অনেক স্থল হইতে এইরূপ অনেক রসময়ী কবিতা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্থানাভাব বশতঃ ও বাহুল্যভয়ে উৎকৃষ্ট স্থলগুলি উদ্ধৃত করিতে পারা গেল না। হেমচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা বঙ্গসাহিত্যের এক অতি উজ্জ্বল-রত্ন। জননী জন্মভূমিকে হেমচন্দ্র যেরূপ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন—আপন পর ভাবেন নাই; জীব দুঃখেও তিনি সেইরূপ কাঁদিতে জানিতেন এবং সেই দুঃখ বিমোচনের প্রকৃষ্ট পথ পাইবার উদ্দেশ্যে করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর করিয়াছিলেন; তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা "চিত্তবিকাশ।" উহার কবিতাগুলি, তাহার পূর্ণ বিকাশের পরিচায়ক।

হেমচন্দ্রের ভক্তিভাব স্বাভাবিক, তাই তিনি উত্তর জীবনে অশেষ দুঃখ-কষ্টে—মনস্তাপে প্রপীড়িত হইয়াও ভগবদ্বিশ্বাসে আস্থাশূন্য হন নাই; আস্থা বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্তই হইয়াছিল। তিনি যেন মর্ম্মে মর্ম্মে দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছিলেন, বিধাতার বিধানে নির্ভর না করিলে জীবের গত্যন্তর নাই; কেন না, মূল অদৃষ্ট ও জন্ম-জন্মার্জিত কর্ম্মফলে জীবকে সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় ভগবানের দৈব কৃপা ব্যতীত জীবের পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। ইহাই জীবের চরম লক্ষ্য। অবস্থার পরিবর্ত্তনে কবি মর্ম্মান্তিক শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"নিজ পুত্রকন্যামুখ, পৃথিবীর সার সুখ,
তাও আর দেখিতে পাব না।

অপূর্ব্ব ভাবের চিত্র, থাকিবে স্মরণে মাত্র,
স্বপ্নবৎ মনের কল্পনা।
কি নিয়ে থাকিব ভবে, কি সাধনা সিদ্ধ হ'বে,
ভবলীলা ঘুচে'ছে আমার;
বৃথা এবে এ জীবন হর না কেন এখন,
বৃথা রাখা ধরণীর ভার।
ধন নাই—বন্ধু নাই, কোথায় আশ্রয় পাই,
তুমিই হে আশ্রয়ের সার।
জীবনের শেষকালে, সকলি হরিয়া নিলে,
প্রাণ নিয়া দুঃখে কর পার—
বিভু কি দশা হ'বে আমার?"

কবি আবার আপন ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্থানান্তরে বলিয়াছেন:—

"কে পারে খণ্ডিতে অদৃষ্ট-শৃঙ্খলে,
ঘটে'ছে আমার যা ছিল কপালে।
কে পারে রাখিতে বিধাতা কাঁদালে,
বৃথা তবে কেন কাঁদিয়া মরি?
* * * *
কোথা আজি সেই অযোধ্যার ধাম,
কোথা পূর্ণব্রহ্ম সীতাপতি রাম,
কোথা আজি সেই পাণ্ডবের সখা,
কোথায় মথুরা? কোথায় দ্বারকা?
এস ভগবান, কর ধৈর্য্যদান,
* * * *
কর শান্তিময় অশান্ত পরাণ,
সৌভাগ্য-অভাগ্য ভাবিয়া সমান,
নিজকর্ম্ম যেন সাধিতে পারি।"

এইরূপে জীব-জগতের সহিত জগদীশ্বরের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, ঈশ্বরে নির্ভরই জীবনের উদ্দেশ্য বুঝাইয়া, ভাবে গদ্গদ চিত্তে কবি বলিয়াছেন :—

"জয় বিশ্বরূপ জয়, অনাদি পুরুষ জয়,
জয় প্রেমময় হরি ব্রহ্মাণ্ডতারণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন!
চরণে করিয়া নতি, বলি হে তার শ্রীপতি,
কর হে জীবের গতি দিয়া শ্রীচরণ,
জয় জগদীশ জয় বল রে বদন।"

বঙ্গ-সাহিত্যে যদি কোন কবি, আমাদের জাতীয় ভাবের উদ্দীপনায় সবিশেষ সহায়তা করিয়া থাকেন, তবে সেই শ্রেণীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি—আমাদের প্রিয় কবি হেমচন্দ্র। কাব্য আলোচনা করিলে জানা যায়, হেমচন্দ্রের রুচি আদ্যন্ত পরিমার্জ্জিত। যে অবৈধ প্রণয়-প্রসঙ্গ বর্ত্তমান কালের অস্থি মজ্জা কলঙ্কিত করিতেছে, তাহার নাম-গন্ধও হেমচন্দ্রের কাব্যে নাই। সংযত সুপবিত্র ভাবের সন্নিবেশ হেমচন্দ্রের বিশেষত্ব। তাঁহার চিত্রিত বৃত্রাসুর ও শচীদেবীর চিত্র মার্জ্জিত রুচির পরিচায়ক। মাইকেল মধুসূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রের চরিত্রাবতারণা অনেকাংশে প্রশংসনীয়; বৃত্র-সংহার-কাব্যে শচীর চরিত্র এতদ্বিষয়ে দেদীপ্যমান উদাহরণ। ইন্দুবালার চিত্রও পবিত্র, সুতরাং অতীব রম্য। *

হেমচন্দ্র উত্তম অনুবাদক। দৃষ্টান্তস্থলে, বক্তব্য—"মদন পারিজাত" আলেক্‌জাণ্ডার পোপের Eloisa to Abelardএর অনুবাদ; "কমল-বিলাসী" টেনিসনের Lotus eatorsএর অনুবাদ; "ইন্দ্রের সুধাপান" ড্রাইডেনের Alexander's feastএর অনুবাদ ইত্যাদি—উল্লেখযোগ্য কবিতাগুচ্ছ সুন্দর পদ্য কবিত্বময় বঙ্গানুবাদ। কবি হইলেই মানুষ স্বভাবতঃ সুরসিক হয়, গাম্ভীর্য্যপূর্ণ রসিকতায় প্রচলিত সামাজিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ থাকে না। কবিবর হেমচন্দ্র সমাজপ্রিয়, অথচ উদারসামাজিক। "কুলীন মহিলার বিলাপ" দ্বারা ইহা সপ্রমাণ হয়, হেমচন্দ্র সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন।

মাইকেল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও নবীনচন্দ্র এই কবিচতুষ্টয়ের

* "সাহিত্য-সভার" কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য।

কবিতাগুলির তুলনায় উৎকর্ষাপকর্ষের সমালোচনা করা গুরুতর কথা, অতএব তৎকল্পে বিরত থাকা উপস্থিত ক্ষেত্রে অশোভন বিবেচিত না হইবারই কথা। তৎ বক্তব্য এই যে, আমাদের ধারণা—বঙ্গসাহিত্যে হেমচন্দ্রের রচনা চিরস্থায়িণী হইবে।

হৃদয়োন্মাদিনী শক্তি যাহাতে নাই, তাহাকে কবিতা বলা যায় না। হেমচন্দ্রের রচনায় এই শক্তি প্রভূত পরিমাণে ছিল। তাঁহার রুচি সুমার্জ্জিত ছিল, অতএব সামাজিক সুপ্রথার বিরুদ্ধ ব্যবহার দর্শন করিলে তিনি নীরব থাকিতে পারিতেন না; সেরূপ ব্যবহার-সম্বন্ধে তাঁহার তেজস্বিনী লেখনী তীব্র শ্লেষ উক্তি ধারা পরিবর্ষণ করিত। ভবানীপুরে যুবরাজের অর্চ্চনাপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"বেঁচে থাকো মুখুর্য্যের পো, খেল্লে ভাল চোটে।
তোমার খেলায় রাঙ রূপো হয়, গোবোরে শালুক ফোটে॥"
"ফিব্রু" দানে এক তাড়াতে, কল্লে বাজি মাৎ।
মাছ, কাতুরে ভেকো হলো কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ॥"

হেমচন্দ্রের কাব্যাদি-সম্বন্ধে সাহিত্যানুরাগী স্বদেশপ্রিয় রাজা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, বলেন,—"হেমচন্দ্রের কাব্যকল্পনার উচ্চতা এবং ভাবের গভীরতার নিমিত্ত বঙ্গসাহিত্য সুবিখ্যাত। তাঁহার কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অদ্বিতীয়। কেবল মাধুর্য্য কিংবা গাম্ভীর্য্যই তাহার গুণ নহে। উহাতে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি অভিব্যক্ত। হেমচন্দ্র স্বদেশকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার 'ভারতসঙ্গীত' স্বদেশপ্রীতির জ্বলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছে। তাঁহার কাব্যগ্রন্থ, রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় বাঙ্গালীর হৃদয়-গ্রাহী এবং রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় উহার শিক্ষা বাঙ্গালী-হৃদয়ে সুফল উৎপাদন করিতেছে এবং করিবে। বঙ্গসাহিত্য হেমচন্দ্রের নিকট কত ঋণী, তাহা অবর্ণনীয়।"

প্রসিদ্ধ সাহিত্য-বন্ধু শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর হেমচন্দ্রের কাব্য ও কবিতার যথাযথ পরিস্ফুটরূপে আলোচনা করিয়াছেন। * তিনি

* রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কবিবর হেমচন্দ্রের বিপন্ন অবস্থায় সাহায্য করিবার জন্য উদ্‌যোগী হইয়া, মফঃস্বলের মধ্যে ঢাকায় প্রথম

বলেন—"হেমচন্দ্র মহাকবি"। "মহাকবি" এই অভিধান, সকল ভাষার অলঙ্কার শাস্ত্রে একভাবে বর্ণিত নয়। কিন্তু হেমচন্দ্র সকল ভাষার অলঙ্কার-শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুরূপ সর্ব্ববাদি-সম্মত "মহাকবি"। বঙ্গভাষার পুষ্টির তিনটি পথ—অনুবাদ, অনুকরণ এবং উদ্ভাবন, যুগপৎ তিনি অবলম্বন করিয়াছিলেন। আপন উদ্ভাবনীশক্তির গৌরবে অলঙ্কৃত হইয়া তিনি অনুকরণ অনুবাদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি তুলসীদাস, সেক্সপিয়র, শেলি প্রভৃতি—কাহারও দ্বারস্থ হইতে ঘৃণাবোধ করেন নাই। তিনি বিহঙ্গের ন্যায় যথা তথা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া আপন মাতৃভাষারূপ-নীড়ে সঞ্চয় করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, কিন্তু তাহাতে জ্বালা নাই, উহা স্নিগ্ধ মধুর। প্রাণমনঃ উহাতে সুশীতল করিয়া দেয়। সকল রসে সমান ক্ষমতা প্রায় দৃষ্ট হয় না। কিন্তু হেমচন্দ্রের এই ক্ষমতা পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। তিনি যেমন জলদগম্ভীর-রবে ভেরী বাজাইয়া প্রাণমনঃ মাতাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার গম্ভীরস্বরে তেমনই দেশ কাঁপিয়াছে। আবার তাঁহার হাস্যরসপ্রাচুর্য্যসমন্বিত কবিতাবলীতে স্বদেশের লোকে প্রাণের হাসি হাসিয়াছে। করুণরসেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা। তিনি যুবক যুবতীর মনোমোহিনী লালসা যেমন ফুটাইয়াছেন, আবার শান্তিরসের কবিতায় শান্তি ও মুক্তিপ্রার্থী পাঠকের মনঃ-প্রাণ তেমনই মাতাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার ধর্ম্মকাব্য রামপ্রসাদাদি সাধকের কবিতার ন্যায় অতি মধুর, ভাব-বিভব-পরিপূর্ণ এবং শিক্ষাপ্রদ। হেমচন্দ্রের সামাজিকতা ও স্বদেশপ্রীতির বর্ণনা অদ্বিতীয়। হেমচন্দ্র সমস্ত সমাজের প্রতি সমান সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার কোমল প্রাণ দেশের জন্য বাস্তবিকই কাঁদিয়া উঠিত। তাঁহার

সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে প্রথম সাহায্য করেন; ঢাকায় তাঁহার উদ্যোগে ও কলিকাতায় 'সাহিত্য-পরিষদ্' এবং 'সাহিত্য-সম্মিলনের' আন্দোলনের ফলে, কবিবর হেমচন্দ্র দেশের লোকের নিকট হইতে প্রায় ১২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হন, এবং গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তি দিতে আরম্ভ করেন। এতদ্ব্যতীত প্রথিতনামা "হিতবাদী" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়, তাঁহাকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া, নিজের উদারতা ও সহৃদয়তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। শুভ আন্দোলনের ইহা শুভ ফল সন্দেহ নাই।

জাতীয় কবিতা দেশের যাবতীয় সুধীবৃন্দের চিত্ত-স্তল প্রকৃতই বিহ্বল করিয়াছিল। কবি কলিকাতা খিদিরপুরস্থ ভবনে যোগীর ন্যায় বাস করিতেন। তাঁহার শান্তজীবন যথার্থই শান্তিপ্রিয় ঋষির ন্যায় ছিল। হেমচন্দ্রের কল্পনা কোনও কোনও স্থানে বাল্মীকিকেও অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি কবিত্বের প্রতিভা লইয়া তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে, অমরকীর্ত্তি মধুসূদন অবশ্যই হেমচন্দ্র হইতে উচ্চতর পদবী-রূঢ়; হেমচন্দ্র শব্দ-সম্পদে দরিদ্র; সময়ে সময়ে একটু কর্কশ এবং কোন কোন স্থানে রস-শূন্য। কিন্তু যদি কাব্যের পারস্পরিক উৎকর্ষ লইয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার,—মধুসূদনের মেঘনাদবধ হইতে তুলনায় অনেক, উর্দ্ধে অবস্থিত। বৃত্র-সংহারে যাহা ফলিয়াছে; মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার-দোষে মেঘনাদে তাহা ফলে নাই। হেমচন্দ্র বৃত্রসংহারে মধুসূদনের চরিত্রের যেরূপ অপূর্ব্ব পট দেখাইয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদ-বধে তাহা দেখাইতে পারেন নাই।"

কালীপ্রসন্ন বাবু সংক্ষেপে হেমচন্দ্রের কাব্য সম্বন্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, দেশের যাবতীয় সুপণ্ডিত সুধীমণ্ডলীর মতে তাহাই প্রকৃত। হেমচন্দ্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল ও আছে। আমাদের স্বজাতীয় সাহিত্য এখনও পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয় নাই; পূর্ণতা প্রাপ্তির সময় আসিয়াছে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ।

কবি হেমচন্দ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, তাঁহার রুচিও ব্রাহ্মণোচিত সুমার্জ্জিত ছিল। হেমচন্দ্র ইংরাজীতে সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ব্রাহ্মাচার্য্যপ্রধান শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম-এ, মহাশয় বলেন:—

"বারন্‌স্ যেমন স্কটলণ্ডবাসীদিগের জাতীয় কবি, বারন্‌স্ যেমন তাঁহাদিগের প্রাণে প্রবেশ করিয়াছেন, হেমচন্দ্রও তেমনি বাঙ্গালীর জাতীয় কবি, তাই তাঁহার কাব্য বাঙ্গালীর প্রাণের সামগ্রী, অতি প্রিয় পদার্থ। হেমচন্দ্র বারন্‌সের ন্যায় জাতীয় ভাব তাঁহার ভাষায় সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাই তাঁহার কবিতায় বাঙ্গালীর প্রাণ মন নাচাইয়া দেয়। জাতীয় আশা, জাতীয় ভাব ফুটাইতে হেমচন্দ্র অদ্বিতীয়। প্রাচীন কবিদিগের আশার যে সীমা ছিল, এখন তাহার অধিকতর প্রসার হইয়াছে; হেমচন্দ্রের কবিতাও ততদূর বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালী যাহা চায়, হেমচন্দ্রের প্রতিভা তাহাই দিয়াছে।

হেমচন্দ্রের কবিতায় তন্ময়তা, ভাবাবেশ ও চিত্রণ-শক্তি অবর্ণনীয়। সামান্য একটি পদার্থ দেখিয়া যিনি প্রকাণ্ড চিত্র আঁকিতে পারেন, যিনি সামান্য বিষয় হইতে আপনার বিশাল কল্পনার প্রচুর উপকরণ পান, তিনিই মহাকবি। হেমচন্দ্রের পদ্মের মৃণাল বৃক্ষ, ইত্যাদি কবিতা তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। প্রাচীন কবিদিগের সময়ের প্রান্ত হইতে আরম্ভ হইয়া ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত একটি সেতুর সৃষ্টি হইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন ও হেমচন্দ্র তাহার দুই দিকের দুইটি তীর।

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিয়োগে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন ;—

"হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর
কেন এ কুখ্যাতি ভবে ?
যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল,
সেই সে দরিদ্র হবে।"

হায় হায়! যার-পর-নাই পরিতাপের বিষয়, হেমচন্দ্রের নিজের এই উক্তিটি তাঁহার নিজের জীবনেই প্রযুক্ত হইয়া গেল! শেষ জীবনে বহুকষ্ট ভোগ করিয়া—১৩১০ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবসে কবিবর হেমচন্দ্র সংসার-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

এ নশ্বর সংসারের সব যায়, থাকে কেবল স্মৃতি আর কীর্ত্তি। স্মৃতি ও কীর্ত্তি কাল-স্রোতে ভাসিয়া যায় বটে, কিন্তু যতদিন সমাজ ক্ষেত্রের উপর বিদ্যমান থাকে, ততদিন সমাজ দেহকে সজীব করিয়া রাখে। হেমচন্দ্রের কাব্যকীর্ত্তি যতদিন বঙ্গ-সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন তাঁহার প্রতিভার স্মৃতিও বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে। তাঁহার জীবন কথা কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার প্রতিভার জ্যোৎস্না-রেখা অনন্ত কালের কোলে স্থির দামিনী দীপ্তির ন্যায় পরিস্ফুট থাকিবে।

"নরত্বং দুর্ল্লভং লোকে বিদ্যা তত্র সুদুর্ল্লভা।
কবিত্বং দুর্ল্লভং লোকে শক্তিস্তত্র সুদুর্ল্লভা॥"

সংসারে মানব-জন্ম দুর্লভ, মানব-জন্মে আবার বিদ্যা সুদুর্লভ ; বিদ্যাবান্ মানবের কবিত্ব দুর্লভ, কবিত্ব-শক্তি আরও সুদুর্লভ।

এই সুদুর্লভা শক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি মানব হইলেও দেবতা। কীর্ত্তিমান্ কবি স্বর্গীয় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা দেবতারূপে পূজা করিতেছি, তাঁহার দেবত্ব স্মরণ করিয়া, তাঁহার বিয়োগ শোক আমরা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছি।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

শোক-সঙ্গীত।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

কেন আজি কাঁদে প্রাণ, ধৈর্য্যহারা কার তরে ?
সকলে একত্র মিলি, কি হেতু রোদন করে ?
হৃদয়ে মূরতি আঁকা,
বিষাদ-কালিমা-মাখা,
সবার বদন কেন,—
নিরখি নয়ন ঝরে !
কাহার বিরহবাণ পশিছে হৃদি-ভিতরে !
কবি হেমচন্দ্র নাই ! সবাই কাঁদিছে তাই,
হাহাকার করিতেছে, নিদারুণ শোকভরে ;—
চলি' গেল হেমচন্দ্র, কোন্ দেশে, কার ঘরে ?
জগতে অমর কবি, বিকাশি' বিমল ছবি,
সুরম অমরপুরে, আনন্দে বিরাজ করে॥

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

দে মা দীন-দয়াময়ি, দে মা পদাশ্রয়!
কোলে তুলে' নে মা শ্যামা কবীন্দ্রতনয়।
সুরে সুরে কেঁদে কেঁদে, স্বদেশের ব্রত সেধে',
গিয়াছে মা তব কাছে, দেহ মা তারে অভয়॥
আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে, প্রবোধ নাহিক মানে,
চাহি মা যে দিকপানে, হেরি অন্ধকারময়;—
তব শান্তি-নিকেতনে, সদা আনন্দিত মনে,
মা তোমার শ্রীচরণে, কবি যেন সুখে রয়॥

ইমন্ কল্যাণ—আড়া।

দেশবন্ধু হেমচন্দ্র স্বর্গধামে পশিল।
খেলাধূলা সাঙ্গ করি' খেলা-ঘর ভাঙ্গিল॥
গাও সবে জয়-গান, কবি-গৌরবের সুরে;—
বাড়া'তে কবির মান, কালী কোলে করিল॥
হেমের ললিত গানে, মুগ্ধ হ'য়ে মহাপ্রাণে,
শান্তিময় কোল দানে, মা তাহারে তুষিল॥ *

* "সাহিত্য-সভার" চতুর্থ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে, সভায় মৎবিরচিত সঙ্গীতত্রয় গীত হইয়াছিল।

আক্‌বরের টঙ্কশালা।

মোগল সম্রাট্‌গণ মুদ্রার সৌন্দর্য্য ও উৎকর্ষ বিধানে সম্যক্ যত্ন করেন। ভারতবর্ষ-বিলুণ্ঠিত সুবর্ণরাশি দিল্লী ও আগরার রাজকীয় টঙ্কশালায় মুসলমান মুদ্রায় পরিণত হইয়া দেশে দেশে প্রচলিত হইল। বলা বাহুল্য, মোগল সম্রাট্‌দিগের সময়েই ভারতবর্ষের যত বিস্তৃত স্থানে' দিল্লীস্থ টঙ্কশালার মুদ্রা প্রচলিত হয়।

সম্রাট আক্‌বরের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের ৪২টী নগরে টাঁকশাল ছিল। ঐ সমস্ত টাঁকশালে যে যে দেশে যে যে প্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১ম,—দিল্লী, বাঙ্গালা, গুজরাটস্থ আহ্মাদাবাদ ও কাবুল, এই চারি স্থানের টাঁকশালে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র তিন প্রকার ধাতুরই মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

২য়,—এলাহাবাদ, আগরা, উজ্জয়িনী, সুরাট, দিল্লী, পাটনা, কাশ্মীর, লাহোর, মূলতান ও তাণ্ডা, এই দশ স্থানের টাঁকশালে কেবল রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা প্রস্তুত হইত।

৩য়,—আজমীর, অযোধ্যা, আটক, অল্‌বার, বদডিল, বারাণসী, ভাক্কর, বহিরা, পাটন, জৌনপুর, জালন্ধর, হরিদ্বার, হিসার, ফিরুজা, কল্পী, গোয়ালিয়র, গোরক্ষপুর, কলানুর, লক্ষ্ণৌ, মাণ্ডু, নাগর, সরহিন্দ, শিয়ালকোট, সরোঞ্জ, শাহরানপুর, সারঙ্গপুর, সম্বল, কনৌজ ও রন্তসডর (রণস্তম্ভপুর) এই অষ্টাবিংশতি নগরের টাঁকশালে কেবল তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত।

এই সকল টাঁকশালে যে সকল কর্ম্মচারী, শিল্পী ও মজুর প্রভৃতি থাকিত, তাহাদের নাম ও কার্য্য নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।—

(১) দারোগা। ইনি টাঁকশালের কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ এবং প্রত্যেকের কার্য্য পরিদর্শন করিতেন। সর্ব্ববিষয়ে নিপুণ ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই এইপদে নিযুক্ত হইতেন।

(২) শিরাফী বা শরাফ স্বর্ণ-পরীক্ষক, ইনি স্বর্ণ রৌপ্যাদির বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দিতেন। ইঁহার উপর মুদ্রার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ভর করিত, সুতরাং সুনিপুণ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিই এই পদের যোগ্য।

(৩) আমিন—দারোগার সহকারী।

(৪) সুশরিফ—দৈনন্দিন ব্যয়ের হিসাব-রক্ষক।

(৫) মহাজন—ইনি স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র ক্রয় করিয়া টাঁকশালে যোগাইতেন।

(৬) কোষাধ্যক্ষ—ইনি আয় ব্যয় ও লাভের হিসাব রাখিতেন। ৫ম ব্যতীত উপরোক্ত সকল কর্ম্মচারীই আহদী অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর কর্ম্মচারী মধ্যে গণ্য হইতেন।

(৭) ওজন সরকার—এই ব্যক্তি সমস্ত মুদ্রা সূক্ষ্মরূপে ওজন করিত।

(৮) ধাতু গলাইবার লোক—এই ব্যক্তি মিশ্র স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

(৯) মিশ্র স্বর্ণ রৌপ্যাদির চাক্তি প্রস্তুত করিবার লোক। এ ব্যক্তি স্বর্ণাদির চাক্তি প্রস্তুত করিয়া শরাফকে দেখাইত। শরাফ বা স্বর্ণ-পরীক্ষক উপযুক্ত বোধ করিলে ঐ সকল বিশোধন করিবার অনুমতি দিতেন। মিশ্রিত সোরা ও ইষ্টকচূর্ণ মধ্যে ঐ সকল চাক্তি ঘুঁটের আগুনে বহুবার পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইত।

(১০) বিশুদ্ধ ধাতু গলাইবার লোক। এ ব্যক্তি উপরোক্ত বিশোধিত চাক্তি সকল গলাইয়া বাট প্রস্তুত করিত।

(১১) জরাব—এই ব্যক্তি প্রস্তুত বাট কাটিয়া মুদ্রার আকার ও পরিমাণানুযায়ী খণ্ড প্রস্তুত করিত।

(১২) খোদকার। এই ব্যক্তি ইস্পাতের উপর চিত্র ও অক্ষরাদি খোদিত করিয়া মুদ্রার জন্য ছাঁচ প্রস্তুত করিত। আকবরের সময়ে দিল্লীনিবাসী মৌলনা আলি আহ্মদ নামে একজন অতি সুদক্ষ খোদকার ইস্পাতের ছাচ প্রস্তুত করিত।

(১৩) সিক্কাচি। এই ব্যক্তি গোলাকার ধাতুখণ্ড লইয়া দুইটী ছাঁচের মধ্যে ধরিত এবং অপর এক ব্যক্তি (পাট্‌কচি) হাতুড়ির আঘাতে ঐ ধাতুখণ্ডে মুদ্রাঙ্কিত করিত।

(১৪) সব্বাক। বিশুদ্ধ রৌপ্যের গোল পাত প্রস্তুত করিত।

(১৫) কুর্শকুব। এই ব্যক্তি বিশুদ্ধ রৌপ্যের পাতা পোড়াইয়া হাতুড়ি দ্বারা পিটিতে থাকিত। যতক্ষণ উহাতে সীসার গন্ধ মাত্র থাকিত, ততক্ষণ এইরূপ পুনঃ পুনঃ করা হইত।

(১৬) কস্‌নিগীর।—এই ব্যক্তি স্বর্ণ ও রৌপ্য বিশুদ্ধ কি না পরীক্ষা করিত এবং বিশুদ্ধ না হইলে ইচ্ছানুযায়ী বিশুদ্ধ করিয়া লইত।

(১৭) নিয়ারিয়া।—এই ব্যক্তি খাঁক্ অর্থাৎ স্বর্ণাদির ক্লেদ ধুইয়া উহা হইতে স্বর্ণ পৃথক করিয়া লইত।

(১৮) পানিবার কড়াল অর্থাৎ মিশ্রিত রূপার গাদ গলাইয়া রূপা বাহির করিয়া লইত।

(১৯) পাইকার।—নগরস্থ স্বর্ণকারদিগের নিকট হইতে খাঁক এবং ধুলা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া উহা হইতে স্বর্ণ রৌপ্য পৃথক করিয়া লইত।

(২০) নিকোই বালা।—পুরাতন তাম্রমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া গলাইত।

(২১) থক্‌শো। উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যথাসাধ্য স্বর্ণ রৌপ্যাদি বিশুদ্ধ করিয়া লইলে থক্‌শো টাঁকশাল ঝাঁটাইয়া ধূলা বাড়ী লইয়া যায়, এবং উহা হইতে স্বর্ণ রৌপ্যাদি বাহির করিত। ইহারাও এই উপায়ে বিস্তর উপার্জ্জন করিত।

সম্রাট আকবরের সময়ে মুদ্রাদি অতি বিশুদ্ধ স্বর্ণ রৌপ্যে নির্ম্মিত হইত। তিনি উৎকৃষ্ট শিল্পিগণ নিযুক্ত করিয়া উহাদের গঠন ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশ মনোহর করেন।

আকবরের টাঁকশালে ২৬ প্রকার স্বর্ণমুদ্রা, ৯ প্রকার রৌপ্যমুদ্রা, ৩৪ প্রকার তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হইত। ঐ সকলের মধ্যে কতক গোল ও চতুরস্র।

স্বর্ণ-রৌপ্যাদি হইতে মুদ্রা প্রস্তুত হইলে উহার যে মূল্য বৃদ্ধি হইত, তাহার কতকাংশ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বাবত খরচ হইত, অবশিষ্ট হইতে মহাজনকে কতক দিয়া সমুদায় রাজকোষে জমা হইত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাহন্তা।

শিবাখ্যা-কিঙ্কর কাব্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

উত্তরিলা তবে, বিকৃতি আকৃতি,
অতি ক্ষীণতর কাতর স্বরে।
"নাহি ভয় বাছা, স্থির কর মন,
কার সাধ্য তব অহিত করে॥"
আমি মহামায়া, স্মরিছ যাঁহারে,
দুর্ণিবার দুঃখে হইতে পার।

আসিয়াছি তব, হিতের লাগিয়া,

একাকী কাঁদিতে হবে না আর ॥

ধরম কাতরে, কহে যোড়করে,

নিরখি ভয়াল বদন তাঁর।

"এ কি মা তাহায়, কভু শোভা পায়,

ভয়-বিনাশিনী নাম যাহার ॥

বুঝিলাম হায়, ভাঙ্গিলে কপাল,

মায়েরো মমতা মলিন হয়।

হায়রে বিপদ, একাকী না আসে,

প্রভঞ্জন ধূলি বালুকা বয় ॥

দুঃখ বিমোচনে, স্মরিনু তোমায়,

দুঃখের তুফানে ভাসালে হায়।

মুখ দরশনে, কাঁপে হিয়া মোর,

শোণিত শরীরে সুখায়ে যায় ॥

বল বল গো মা, এ মূরতি কেন,

হেন রূপ নাহি মা তোমায়।

স্নেহময়ী তুমি, সতত সকলে,

সন্তানে ছলনা শোভা না পায় ॥

কহিলেন মায়া, শুনরে কারণ,

কি কারণে মম এমন রূপ।

নাহি রূপ মম, করে জীবগণ,

রূপের কল্পনা মন স্বরূপ ॥

সময় স্বরূপ, আমি এ জগতে,

সময় স্বরূপ রূপ আমার।

যখন যাহার, সময় যেরূপ,

সেইরূপ আমি নিকটে তার ॥

দুখের মূরতি, দেখিছ আমার,

দুখেতে তোমার দহিছে মন।

জন্মিয়াছে ঘোর, সময়ের জ্বরে,

সুরূপ সম্ভব নহে এখন ॥

নিদাঘ পীড়িত, তৃষিত চাতক,

নব জলধর সতত চায়।

কিন্তু দেখ তার, সময়ের দুঃখ,

ভয়ঙ্কর রবি দেখিতে পায় ॥

আকুল পরাণে, কাতর নয়নে,

চাহি'মুখপানে মহামায়ার।

কহিলা ধরম, ধর মা সুবেশ,

বিমলে বঞ্চনা করো না আর ॥

কি বলিব মাগো, দুঃখের কাহিনী,

কপালে আমার পড়েছে ছাই।

দেখ ত্রিনয়নি, ভিখারীর হালে,

একাকী—কাননে কাঁদি বেড়াই ॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

জন্মতিথি।

শ্রীগুরুপদারবিন্দ করিয়া স্মরণ।

নববর্ষে আজি করিলাম পদার্পণ ॥

নব নব কত মত আশা প্রলোভনে।

বাধিয়া বালির বাঁধ নিরাশ পুলিনে ॥

প্রতিকুল ভাগ্যস্রোত করিতে নিরোধ।

মিটাইতে সুখ সহ দুঃখের বিরোধ ॥

কে জানে কি হবে পরিণাম অন্ধকার।

সুখের উল্লাস কিম্বা দুঃখ হাহাকার ॥

গগনে উঠিল মেঘ চাতক নাচিল।

নীরদে নীর দে বলি নীরদে যাচিল ॥

কে জানে বা শিলাঘাতে অঙ্গ হবে চুর।

অথবা হইবে চির পিপাসা বিদূর ॥

ভবিতব্য গর্ভে যাহা রয়েছে নিহিত।
অবশ্য অবশ্য হবে হিত বা অহিত॥
একমাত্র ভগবান্ ভরসা আমার।
সুখে থাকি দুখে থাকি করুণা তাঁহার॥

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র পড়্যা।

সাং এক্তারপুর, মদনমোহন বাড়।

নিরজনে।

১। জ্যোছনা যামিনী,
পুলক ধরণী,
আধ স্বপনের কোলে।
নিশীথ সমীর,
বহিছে সুধীর।
কুসুম হাসিছে ঢলে॥

২। রাগিনী গাহিয়া,
যমুনা বাহিয়া,
চলেছে সাগর পানে।
অনিলে ভাসিয়া—
মরমে পশিয়া,
ভাসিছে বিরহী প্রাণে॥

৩। অলস কাননে,
প্রকৃতি আননে,
নীরবে মধুর হাসি।
পাদপ লতায়,
মলয় জাগায়,
ঘুমন্ত প্রণয় রাশি॥

৪। সুদূর সীমায়,
জীমূত শিরায়
ধবল সুষমা আঁকা।
সপ্তস্বরী স্বর,
ঝরিছে নির্ঝর,
তরল রজত আঁকা॥

৫। নীলিমার পর
চারু নিশাকর
পড়িছে ঢলিয়া প্রান্তে।
বেহাগ অমিয়া,
রজনী মাখিয়া,
ভাসিছে নয়ন বৃন্তে॥

৬। সুষুপ্ত জগতে
তোমাতে আমাতে
একটী বীণার তান।
এস নিরজনে,
গাহি একমনে,
বিভু যশোগুণ গান॥

শ্রীললিতমোহন রায়।

থেকো না'ক দূরে।

মধুর বসন্ত সখা
বহে যায় ধীরে।
বহে যায় সমীরণ
ফুলরেণু মাখি গায়
সুদূরে প্রান্তরে॥
সুনীল অম্বর গায়
কণ্ঠভরা কুহুতান
ভেসে যায় দূরে।
চাঁদের জ্যোছনা রাশি
পড়িতে পড়িতে সব
ডুবে যায় নীরে।
জাগিয়ে জাগিয়ে নিশি
শ্রান্তিভরা কলেবর
ঢলে পড়ে ধীরে॥
বালার্কের ক্ষীণ আভা
আসিয়ে উঠায়ে দেয়
ধরি যেন করে।
এমনি করিয়া মোর—
কত নিশি দিন হায়
বৃথা গেল স'রে।
এ ভাবেতে কতদিন
চেপে ধরে ভাঙ্গাবুক
থাকিব গো পড়ে॥
তাই সখা সদা তোরে
মিনতি করিয়া বলি
থেকো না'ক দূরে।
নৈলে বুঝি কোন্ দিন
ভাঙ্গাবুক তোমা বিনে
ছাই হবে পু'ড়ে।
তাই তোরে এ মিনতি
থেকো না'ক দূরে॥

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

সমালোচনা।

খোকার মার গান।—সুপ্রসিদ্ধ "পাক-প্রণালী" প্রণেতা—শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

আমরা এই সুন্দর সচিত্র সুখপাঠ্য পুস্তকখানি উপহার পাইয়াছি। লেখক মহাশয়ের পাক-প্রণালীর নাম অনেক খোকার মারই পরিচিত। তিনি পাক-প্রণালী প্রণয়ন করিয়া অনেক জননীরই পরম উপকার করিয়াছেন। আলোচ্য পুস্তকখানি শিশুমুগ্ধকর হইয়াছে। সন্তান লালন-পালন ও গৃহস্থালীর ব্যবস্থা—জননীর কর্ত্তব্য। লেখক পাক-প্রণালীর ও গৃহস্থালী সম্বন্ধে পুস্তকাদি লিখিয়া কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সন্তান-পালন সম্বন্ধেও তাঁহার লিখিত একখানি সুন্দর পুস্তক আমরা সমালোচনা করিয়াছিলাম। বাকি ছিল খোকাদের মন

ভুলাইবার জন্য ছড়া—তাহাও তিনি এইবার সমাধা করিলেন। খোকার মার গানের—ছাপা, কাগজ, বাঁধাই ও ছবিগুলি যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, ছড়াগুলিও সুনীতিসম্পন্ন উৎকৃষ্ট হইয়াছে। আশা করি, সকল পুরমহিলাই এই পুস্তক আদর করিয়া পাঠ করিবেন।

সচিত্র ভূবৃত্তান্ত প্রকাশিকা।—শ্রীমধুসূদন চক্রবর্ত্তী দ্বারা সম্পাদিত ও প্রকাশিত। আমরা ইহার দ্বিতীয় সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছি। এই মাসিক খণ্ডাকারে প্রকাশিত পুস্তকে প্রশ্নতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য গবেষণায় পূর্ণ; ভাষা সরল ও সুখপাঠ্য। প্রতি সংখ্যায় অতি প্রাচীন কালের ভৌগোলিক মানচিত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকের প্রচার ও উন্নতির সহিত মধুবাবুর সফলতা কামনা করি।

ভাষা পরিচ্ছেদ।—পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম-এ, বাহাদুর দ্বারা অনুবাদিত। "শ্রীশ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত" প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত। এই দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যথাসময়ে পাইয়াছি, বিস্তৃত সমালোচনা আমরা বারান্তরে করিব।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

আমরা আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স কোম্পানির প্রদত্ত বাঙ্গালা থার্ম্মমিটার উপহার পাইয়াছি। এই থার্ম্মমিটার আমদানি করিয়া আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স বাঙ্গালাদেশের সামান্য মাত্র গণিত বঙ্গাক্ষরজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই পরম উপকার করিয়াছেন। এই থার্ম্মমিটার এক একটি করিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের খরিদ করিয়া রাখা আবশ্যক। এই থার্ম্মমিটারের সাহায্যে বাটীর স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে জ্বরের হ্রাস বৃদ্ধির পরিমাণ জানিতে পারিবেন। আমরা এই বাঙ্গালা থার্ম্মমিটারের বহুল প্রচার কামনা করি।

পারিজাত-কুসুম তৈল।—শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় কৃত। মূল্য ১৲ এক টাকা, আমরা এই কেশ তৈল উপহার পাইয়াছি। পারিজাত-কুসুম ব্যবহার করিলে, শরীর ও মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে। সৌরভে মন প্রাণ প্রফুল্ল হয়, আমরা এই "পারিজাত-কুসুম তৈলের সর্ব্বত্র আরও অধিক সমাদর দেখিলে সুখী হইব।

জন্মভূমি।

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।)

১২শ বর্ষ। } আষাঢ়, ১৩১১ সাল। { ১২শ সংখ্যা।

ব্রহ্মচর্য্য।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে ও চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্য প্রধানতঃ ব্যবায় বিরক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা অদ্যকার প্রবন্ধে সেই ইন্দ্রিয়সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যের বিষয়ই উল্লেখ করিব। আজ ভারতের দুর্দ্দিন দেখিয়া, সকল শিক্ষিত ভারত-সন্তানেরই মনে দারুণ কষ্ট। অনেকেই ভারতের উন্নতির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এত চেষ্টা করিয়াও সুফল হওয়া দূরে থাকুক, ভারতের দুঃখ ক্রমশই বাড়িতেছে। সেই পরম কারুণিক পরমেশ্বর আজ ভারত-সন্তানের উপর এত বিরূপ বলিয়া আমাদের বোধ হইতেছে কেন? যিনি বুদ্ধিরূপে সকলের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, ("সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে") আজকাল ভারত সন্তানের এই দুর্বুদ্ধি দেখিয়া, তাঁহার দয়া হইতেছে না কেন? দয়াময়ের কি আবার ঘৃণা বা দ্বেষ থাকিতে পারে! আমরা যতই নীচ হই না কেন, তাঁহার কৃপা পূর্ণমাত্রায় আমাদের উপর বর্ষিত হইতেছে ও হইবে। মধ্যে মধ্যে কষ্ট না পাইলে ভক্তিরস বৃদ্ধি পায় না, এবং ভক্তি ভিন্ন আনন্দ লাভের অন্য উপায় নাই। আমাদের প্রতি সকল সভ্য জাতিরই দয়া না হইয়া বরং ঘৃণা হইতেছে কেন? ইহার কারণ অন্বেষণ করিতে অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। কারণ আমাদের পরস্পরের প্রতি সদ্ভাবের হ্রাস হইয়াছে। অনেক ভারত-সন্তান গঠিত Joint stock Company. সন্তূয়কারি বণিক্ সমিতি অঙ্কুরাবস্থাতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। স্বার্থত্যাগরূপ

মহাধর্ম্ম আজ আমাদের এককালে ত্যাগ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা প্রকৃত স্বার্থ কি তাহা না বুঝিয়াই পরস্পরকে সন্দিগ্ধভাবে দেখি। যে সূত্রে আমরা সকলে গ্রথিত, সে সূত্রের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই। আপাততঃ যাঁহাকে ঘৃণাই বলিয়া মনে করিতেছি কিম্বা প্রতারণা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, তিনি এবং আমি যে এক অপূর্ব্ব সূত্রে বদ্ধ, এ জ্ঞান এখন বড়ই বিরল। আমার উপাস্য দেবতা আমার শত্রুর হৃদয়ে বিরাজমান (ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি)। যাঁহাকে পদদলিত করিতেছি, তিনিও বিষ্ণুময়, এ জ্ঞান যদি সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহা হইলেই বা এত অশান্তি হইবে কেন? উত্তর গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন ;—

"পৃথিব্যাং যানি বস্তূনি জিহ্বোপস্থনিমিত্তকং।
জিহ্বোপস্থ পরিত্যাগে পৃথিব্যাঃ কিং প্রয়োজনং॥"

আজকাল যত প্রকার স্বার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রায় সকল প্রকার স্বার্থই গভীর অন্বেষণে হয়, জিহ্বায় বা জননেন্দ্রিয়ের তৃপ্তির জন্য এইরূপ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই তৃপ্তি ক্ষণস্থায়ী। এই নিমিত্তই ঋষিরা এই সকল তুচ্ছ সুখের পরিণাম যে মহাদুঃখ, তাহাই ভূয়োভূয়ঃ দেখাইয়া গিয়াছেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জননেন্দ্রিয়ই অতীব প্রবল। স্বভাবতঃ মানবের মন এই ইন্দ্রিয়চরিতার্থরূপ আনন্দের দিকে ধাবমান। মনের স্রোত এইদিক হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কি লাভ করা যায়, এস্থলে তাহাই কিছু আলোচনা হইবে। বর্ণাশ্রমের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম আশ্রম।

"সেবেতে মাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥
নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেববি পিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥
বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্র ধারণম্।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনম্ গীতবাদনম্॥
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথা নৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভ মুপঘাতং পরস্য চ॥

একঃশয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥
স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।
স্নাত্বার্কমর্চ্চয়েৎত্রিঃ পুনর্মামিত্যৃচং জপেৎ॥

ইতি মানবের ২য় অধ্যায়।

* * * * *

প্রত্যেক আর্য্যসন্তান গুরুগৃহে বিদ্যার্থী হইয়া বাসকালীন ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম অবলম্বন করিতেন, পাঠাবস্থায় কিংবা যোগশিক্ষা করিবার অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন না করিলে এই উভয়ের কোনটিরই সম্যক ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে, শুক্র ক্ষয়ে মস্তিষ্ক কষেরুকা মজ্জা Spinal cord এবং অস্থিমজ্জা বিকৃত হয়। এবং তৎপরে অন্যান্য ধাতু সকলও প্রতিলোমক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মস্তিষ্ক এবং কষেরুকা মজ্জা বিকৃত হয় বলিয়া, স্মৃতি মেধা এবং মনের একাগ্রতা প্রভৃতি গুণের হ্রাস হয়। বিদ্যার্জ্জন করিবার অবস্থায় মস্তিষ্কের বিকৃতি হইলে শিক্ষা কখনও ভাল হইতে পারে না, সমস্ত মনোবৃত্তি বিকাশের যন্ত্রই মস্তিষ্ক, ইহার বর্দ্ধোনোন্মুখ অবস্থায় যদি বাধা দেওয়া যায়, তাহা হইলে যেরূপ ক্ষতি হয়, পরিপুষ্ট মস্তিষ্কে ওরূপ বাধাতে তত ক্ষতি হয় না। একটি ছোট অলাবুতে (লাউতে) যদি একটি চিহ্ন করা যায়, ঐ অলাবুর সহিত ঐ চিহ্নও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। দেহের বর্দ্ধনকালে কোন বিঘ্ন ঘটিলে সেই বিঘ্নজাত চিহ্ন আজীবন থাকে। বাল্যকালের টিকার দাগ দেহের বর্দ্ধনের সহিত বর্দ্ধিত হয়।

বিদ্যা উপার্জ্জন শেষ করিয়া গৃহস্থ আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়।

"গৃহীত গ্রাহ্যবেদশ্চ ততোঽনুজ্ঞামবাপ্যবৈ।
গার্হস্থ্যমাবসেৎ প্রাজ্ঞো নিষ্পন্নগুরু নিষ্কৃতিঃ॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশ ৯ অঃ।

গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য প্রথম আশ্রমীর বা পাঠাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা কঠোর। চরক প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য বিষয় অনেক উপদেশ আছে। বেদের বিধি নিষেধ দেখিয়া স্পষ্টই অনুমান হয় যে, ভগবান্ আমাদের হাত পা বাঁধিয়া সর্ব্বতোভাবে জড় যন্ত্রের ন্যায় করিয়া পাঠান নাই। পরুষকারেরও যথেষ্ট শক্তি আছে।

"অত্যুৎকটৈঃ পুণ্যপাপৈ রিহৈব ফলমশ্নুতে"—

আমরা ভগবানের উপর কায়মনোবাক্যে নির্ভর করিয়া বেদের বিধি নিষেধ মানিতে চেষ্টা করিলে সে উদ্যমে সফল হইতে পারি। ভারতের উন্নতি ভারতসন্তানের উন্নতির উপর নির্ভর করে। বংশে সুসন্তানোৎপাদন যেমন গৃহস্থের আনন্দের বিষয় তদ্রূপ। দুর্বৃত্ত কুলাঙ্গারও গৃহস্থের জীবিত শল্য স্বরূপ হয়।

"অজাতমৃতমূর্খাণাং বরমাদৌ নচান্তিমঃ।
সকৃৎদুঃখকরাবাদ্যাবন্তিমশ্চ পদে পদে॥"

এই নিমিত্তই বংশে সুসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, এই উদ্দেশে গৃহস্থেরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতেন।

"ঋতাবুপগমেৎ ভার্য্যাম্" এই বিধি এবং নিম্নলিখিত নিষেধ মানিয়া চলিলেও গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করা হয়। এই সকল বিধি-নিষেধ পালন করিয়া চলিলে, পিতা মাতা রোগশূন্য হইয়া শান্তি সুখভোগ করেন, এবং বংশে সুসন্তান জন্মে। নিম্নে কএকটি নিষেধ উদ্ধৃত করা হইল।

চন্দ্র যখন রবির নিকটে কিম্বা রবি হইতে ৪৫, ৯০, ১৩৫ ও ১৮০ অংশ অন্তরে উপস্থিত হয়, তখন চন্দ্রের প্রতি রবির অশুভ দৃষ্টি থাকে বলিয়া, লঘু আহার বিধেয় এবং কোন প্রকার অনিয়ম অকর্ত্তব্য। চতুর্থী, অষ্টমী, একাদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র অশুভ স্থানে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ঐ সকল তিথিতে আহার বিহারাদি সাবধানে করা উচিত।

স্বাস্থ্যরক্ষার্থ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং সংক্রান্তি দিবসে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। প্রাতঃকাল, সন্ধ্যাকাল, সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণ সময়ে, আহার পরিপাকের পূর্ব্বে এবং দম্পতির কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক বিকৃতাবস্থায়ও স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত যে দিবসে মঙ্গলগ্রহ শনির নিকটে বা তাহাদের সপ্তমে চন্দ্র থাকে, সেই দিবসে স্ত্রীসহবাস ও ঋতুমতী স্ত্রীর সহিত প্রথম চারি দিবস সহবাস অবশ্যই পরিত্যজ্য। যে সকল ব্যক্তি পুত্র কামনা করেন, তাঁহারা ঋতুমতী স্ত্রীর প্রথম চারি দিবসের পর যুগ্ম দিবসে, বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষে দক্ষিণ নাসিকায় নিশ্বাস বহন-কালে পবিত্র ও প্রসন্নচিত্তে স্ত্রীসহবাস করিলে সুসন্তান লাভ করিতে পারেন। স্ত্রীলোকদিগের ঋতু হইবার ১৬ দিবসের মধ্যে সচরাচর গর্ভাধান হইয়া থাকে।

তন্মধ্যে রজোদর্শনাবধি অষ্ট রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রির মধ্যে গর্ভাধান হইলে সেই গর্ভজাত সন্তান পুষ্ট, বলিষ্ঠ, সুস্থ ও দীর্ঘায়ুঃ হয়।

বিকটভাবে বীজগ্রহণ করিলে Placenta Praevia প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জরায়ু দোষ হইতে পারে। চরকে ও বৃদ্ধ বাগভটে বীজগ্রহণ করিবার যে সমস্ত উপদেশ আছে, তৎসমস্ত আমার মতে বিশেষ উপকারী। অনেক স্ত্রীরোগ এবং ভ্রূণরোগ এবং প্রসবকালীন রোগ ইহাতে নিবারিত হয়। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, অশিতা (ভুক্ত) ক্ষুধিতা, পিপাসিতা, ভীতা, বিমনা, শোকার্ত্তা, ক্রুদ্ধা, অতি মেদুরা (অতি মেদযুক্তা) অন্যকামা, অব্যবায়কামা (মৈথুনেচ্ছা বিরহিতা) গর্ভং ন ধত্তে, বিগুণং বা, তথা পুরুষোপি নচাসৌ অধস্তিষ্ঠেৎ, তথাহি স্ত্রীচেষ্টঃ পুমান্ জায়তে পুং চেষ্টা বা স্ত্রী, ন চ ন্যুব্জাং পার্শ্বগতাং বা সংসেবেত নুব্জায়া বাতো বলবান্ স যোনিং পীড়য়তি। পর্শ্বগতায়া দক্ষিণে পার্শ্বে শ্লেষ্মা সংবৃতঃ পিদধাতিগর্ভাশয়ং। বামপার্শ্বে পিত্তং তদস্যাঃ পীড়িতং বিদহতি রক্তংশুক্রঞ্চ, তস্মাৎ উত্তানা সতীবীজং গৃহ্নীয়াৎ তস্যাহি যথা স্থানমেব তিষ্ঠন্তি দোষাঃ।—চরক শারীর স্থান ৮ম অঃ। বামপার্শ্বস্থ হইয়া শয়ন করিলে দক্ষিণ নাসিকা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ী বহে, তজ্জন্য ভ্রূণ পিত্ত দ্বারা বিদগ্ধ হয়। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ হইয়া শয়ন করিলে বাম নাসিকা বা চন্দ্রনাড়ী বহে। সুতরাং গর্ভাশয়ে শ্লেষ্মার পীড়া জন্মায়। তজ্জন্য উত্তানশয়া গর্ভ গ্রহণ আবশ্যক। এইরূপ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে এবং গর্ভও স্বাভাবিক হয়। প্রাচীন ঋষিদের পরামর্শ মানিয়া চলিলে সুসন্তান হইবে এবং সেই সুসন্তানের দ্বারা দেশের মঙ্গল হইবে। ইহা অগ্রাহ্য করিয়া যাঁহারা যথেচ্ছাচার করিবেন, তাঁহাদের ধাত্রী, স্ত্রীরোগ চিকিৎসক এবং কুলাঙ্গার সন্তানের যন্ত্রণায় জর্জ্জরীভূত হইতে হইবে। এখন যাঁহার যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন।

যে বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একবারে উদাসীন, সে বিষয়ে ঋষিরা বহুদর্শনে যে নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলাই ভাল। যাঁহারা অজ্ঞতানিবন্ধন এই সকল নিয়ম পালন করেন না, তাঁহাদের জন্যই এই সকল কথার উল্লেখ করা গেল। এ সম্বন্ধে, অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লওয়া প্রত্যেক যুবকেরই আবশ্যক।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের উপকারিতা।

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিলে মনুষ্য ব্যাধিশূন্য হয় ও দীর্ঘায়ু লাভ করে। প্রাচীন আর্য্যজাতি ব্রহ্মচর্য্যের প্রভাবে জগতের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। এই ব্রত অবলম্বনে দেহ ও মন কেন সুস্থ থাকে, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আমাদের শরীরে রোগ নষ্ট করিবার শক্তি Natural Immunity. স্বভাবতঃই আছে। ব্রহ্মচর্য্যে এই শক্তি বৃদ্ধি পায় বলিয়াই ব্রহ্মচর্য্যের বিষয় ঋষিরা ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ দিয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রোগোৎপাদক অণুগুলি প্রায় বায়ুর ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। পরন্তু এত প্রকার জীবননাশক রোগাণু Disease Germs সত্ত্বেও ভগবদনুগ্রহে সৃষ্টি লোপ হইতেছে। (ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ) যাহারা যক্ষ্মারোগের অণু Tubercle bocillus. শ্বাসের সহিত আকর্ষণ করেন, তাঁহারা সকলেই যে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন এরূপ নহে। প্লেগরোগাক্রান্ত রোগীর সেবায় নিযুক্ত সকল লোকই প্লেগরোগাক্রান্ত হন এরূপও দেখিতে পাওয়া যায় না। রোগের অণু সর্ব্ববাপী হইলেও ভগবদনুগ্রহে সৃষ্টিলোপ হইতেছে না। এক জাতীয় বীজ হইতে ক্ষেত্রের গুণে যেমন উদ্ভিদের তারতম্য হয়, রোগের বীজ সম্বন্ধেও সেইরূপ। প্রস্তরে বীজ পড়িলে তাহার যে অবস্থা ঘটে, ব্রহ্মচারীর দেহে রোগের বীজেরও প্রায় সেই অবস্থা ঘটে। ইন্দ্রিয়াসক্ত অন্তঃসারশূন্য মনুষ্যের দেহ রোগাণুর পক্ষে উর্ব্বর ভূমি। বীজ এক হইলেও জীবিত মনুষ্যের দেহরূপ ক্ষেত্রের পার্থক্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেহে একই রোগাণু হইতে এক রোগ অনেক ভাবে প্রকাশ পায়। অনেক সময় দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি সুবসন্ত রোগ ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করিল, কিন্তু অপর ব্যক্তির পূর্ব্বরোগীর সংস্পর্শে বসন্ত রোগাক্রান্ত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। বসন্তের বীজ এক হইলেও জীবনীশক্তির তারতম্য ভিন্ন দেহে বসন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে।

অতিশয় শুক্রক্ষয়ে যে রাজযক্ষ্মা হয়, তৎসম্বন্ধে চরকে এইরূপ পৌরাণিক কথা লেখা আছে। দেবতাদিগের নিকট ঋষিগণ চন্দ্র সম্বন্ধে এই পৌরাণিক কথা শুনিয়াছিলেন;—অংশুমান্ চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের অশ্বিনী প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন কিন্তু তিনি সকল ভার্য্যার সমবর্ত্তী হন না। কেবল রোহিণীতেই অত্যাসক্ত হইয়া নিজ শরীর রক্ষার প্রতি

দৃষ্টি না করিয়া অতি মৈথুন দ্বারা শরীরের স্নেহ ভাগ ক্ষয় করিয়া দেহকে ক্ষীণ করিয়া ফেলেন।

অশ্বিনী প্রভৃতি অপর স্ত্রীগণ সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়া চন্দ্রদেবের এই অসম ব্যবহারের কথা দক্ষ প্রজাপতির গোচর করেন। তাহাতে তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তাহার মুখ হইতে সেই ক্রোধ মূর্ত্তিমান হইয়া নিঃশ্বাসরূপে নিঃসৃত হয়। ক্রোধান্বিত প্রজাপতি অসমদর্শি রজোগুণান্ধ চন্দ্রদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন, তাহাতেই চন্দ্রদেবের যক্ষ্মারোগ হয়। গুরুর (শ্বশুরের) অতি প্রবল ক্রোধে অভিভূত এবং যক্ষ্মারোগে নিষ্প্রভ হইয়া চন্দ্র, দেব ও দেবর্ষিগণের সহিত গুরুর শরণাপন্ন হন। তখন প্রজাপতি দক্ষ চন্দ্রের শুদ্ধমতি (সকল ভার্য্যার প্রতি সমভাব) হইয়াছে বুঝিয়া, তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। গুরুপ্রসাদান্তর অশ্বিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে যক্ষ্মারোগ হইতে মুক্ত করেন। রোগমুক্ত চন্দ্রগ্রহ তখন বিশেষ শোভমান হইলেন এবং তাঁহার ওজঃ বর্দ্ধিত এবং মন সাত্ত্বিক হইল।

"দিবৌকসাং কথয়তামৃষিভির্বৈ শ্রুতা কথা।
কামব্যসন সংযুক্তা পুরাণী শশিনং প্রতি॥
রোহিন্যমতিসক্তস্য শরীরং নানুরক্ষতঃ।
আজগামাশপতামিন্দোর্দ্দেহঃ স্নেহপরিক্ষয়াৎ॥
দুহিতৃণামসন্তোগাচ্ছেষাণাঞ্চ প্রজাপতেঃ।
ক্রোধো নিশ্বাসরূপেণ মূর্ত্তিমান্ নিঃসৃতো মুখাৎ॥
প্রজাপতের্হি দুহিতৃরষ্টাবিংশতিমংশুমান্।
ভার্য্যার্থং প্রতি জগ্রাহ ন চ সর্ব্বাস্ববর্ত্তত॥
গুরুণা তমবধ্যাতং ভার্য্যাস্বসমবর্ত্তনম্।
রজঃপরীতমবলং যক্ষ্মা শশিনমা বিশৎ॥
সোঽভিভূতোঽতি বলিনা গুরুক্রোধেন নিষ্প্রভঃ।
দেবদেবর্ষি সহিতো জগাম শরণং গুরং॥
অথ চন্দ্রসমঃ শুদ্ধাং মতিং বুদ্ধ্বা প্রজাপতিঃ।
প্রসাদং কৃতবান্ সোমস্ততোঽশ্বিভ্যাং চিকিৎসিতঃ॥
স বিমুক্তো গ্রহশ্চন্দ্রো বিররাজ বিশেষতঃ।
ওজসা বর্দ্ধিতোঽশ্বিভ্যাং শুদ্ধং সত্ত্বমবাপচ॥

চরক চিকিৎসা স্থান ৪ ম অঃ।

এই পৌরাণিক কথায় গূঢ়তাৎপর্য্য আছে; জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে ইহার প্রকৃত অর্থের উপলব্ধি হয়। দক্ষপ্রজাপতি এই সৌরজগত Solar systemএর সূর্য্য এবং আমাদের দেহের আত্মা। ইহার আটাশটি কন্যাই আটাশটি নক্ষত্র। সচরাচর অভিজিৎ নক্ষত্র গণনায় ধরা হয় না বলিয়াই, লোকে সাতাশটি নক্ষত্রের কথাই জানে। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ ত্যাগরূপ পৌরাণিক ব্যাপার এই অভিজিৎ নক্ষত্র গণনায় বাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নহে। জ্যোতিষ শাস্ত্র মধ্যে চন্দ্রই মন এবং শুক্র (Venus) গ্রহই কামের অধিদেবতা, এবং শুক্রের বৃষরাশির রোহিণী নক্ষত্রই চন্দ্রের তুঙ্গ স্থান (অর্থাৎ প্রিয় স্থান)। চন্দ্র (অর্থাৎ মন) রোহিণী নক্ষত্রে অতিশক্ত হইয়াছিলেন বলাতে বুঝা গেল যে, শুক্র গ্রহের গৃহ অর্থাৎ কামচর্চ্চায় অতি আসক্ত হইয়াছিলেন। অতি মৈথুনে অত্যন্ত শুক্রক্ষয় নিবন্ধন তিনি ক্রমশঃ দেহের স্নেহ Fat পদার্থের অভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই পৌরাণিক বার্ত্তায় প্রতীয়মান হইতেছে, অতি মৈথুনই (শুক্রক্ষয়) যক্ষ্মা রোগের প্রধান কারণ। কুপিত প্রজাপতির ক্রোধই শুক্রক্ষয় জনিত দেহের পিত্তপ্রকোপ। পিত্তপ্রকোপে দেহের সমস্ত ধাতু দগ্ধ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। শুক্রক্ষয়ে যে কেবল রাজযক্ষ্মা রোগ উৎপন্ন হয় এমন নহে, অন্যান্য অনেক রোগই অতিব্যবায়ে হইতে উৎপন্ন হয়। কারণ আয়ুর্ব্বেদে লেখা আছে যে, শুক্রধাতু সোমগুণাত্মক, শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ, বল ও পুষ্টিকর, গর্ভের বীজ, শরীরের সার এবং জীবের প্রধান আশ্রয়।

শুক্রং সৌম্যং সিতং স্নিগ্ধং বলপুষ্টিকরং স্মৃতং।
গর্ভবীজং বপুঃসারো জীবস্যাশ্রয় উত্তমঃ॥

শুক্র শৈত্যকারক এবং পেষক শক্তি থাকাতে উহাকে ঋষিরা সোম গুণাত্মক বলিয়াছেন।

এই বিশ্ব অগ্নি সোমাত্মক (অগ্নি সোমাত্মকং জগৎ) অর্থাৎ এই বিশ্বে যত বস্তু আছে, সকল গুলিতেই আগ্নেয় এবং সৌম্যগুণ আছে। কেবল আগ্নেয় এবং সৌম্যগুণের পরিমাণের পার্থক্যে বস্তু সকল অসংখ্য ভাবে বিভক্ত হইয়াছে। শুক্রধাতু দেহে সাম্যাবস্থায় (Natural state) থাকিলে দেহ স্নিগ্ধ, শীতল ও সুস্থ থাকে। এই ধাতুর ক্ষয়ে দেহের উত্তাপ (Thermogenesis) বাড়ে। যাবতীয় দৈহিক যন্ত্রের ক্রিয়াসম্পন্ন হইতে গেলেই দেহের বিধানগুলির (Tissues) সেই পরিমাণে নাশ হয়, ইহাকেই ইংরাজীতে

(Tissue oxidation) কহে। শুক্রক্ষয়ে এই (Tissue oxidation) জনিত উত্তাপ বর্দ্ধিত হয়। উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে গেলেই দেহের বিধান-(Tissue) গুলির ক্ষয়ও সেই পরিমাণে হয়। এইরূপ উত্তাপ বৃদ্ধিকে আয়ুর্ব্বেদে পিত্তপ্রকোপ কহে। পিত্ত বর্দ্ধিত হইলে নাড়ী চঞ্চল হয় ("চপলা পিত্ত-বাহিনী")। এই প্রকোপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবহা শিরাসমূহ (Arterioles & Capillaries) প্রসারিত হয়। এইজন্য হস্ত-পদাদি জিহ্বা, চক্ষু প্রভৃতি স্থান অস্বাভাবিক রক্তবর্ণ হয় এবং অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বোধ হয়।

পুনশ্চ শুক্র সম্বন্ধে লেখা আছে;—

"যথা পয়সি সর্পির্ত্ত গুড়শ্চেক্ষুরসে যথা।
এবং হি সকলে কায়ে শুক্রং তিষ্ঠতি দেহিনাম্॥"

ঘৃত যেমন দুগ্ধের, গুড় যেমন ইক্ষুরসের সর্ব্বাবয়বে অবস্থিতি করে, তেমনি শুক্রও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করে।

আয়ুর্ব্বেদের এই কথার সহিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের আবিষ্কারের আপাততঃ পার্থক্য দেখা যায়। সকলে ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, শুক্র Semen অণ্ডকোষ (Testicle) নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন মুখের লালা Salivary Gland হইতে প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ অণ্ডকোষ (Testicle) হইতে শুক্র প্রস্তুত হয়। Spermatic artery (অণ্ডকোষের রক্তবহা শিরার) রক্ত হইতে Testicleএর cells (কোষ) গুলি পুষ্ট এবং বর্দ্ধিত হয়। এই cellগুলি বিভক্ত হইয়া ক্রমশঃ শুক্রের Spermatozoa হয়। আবার দেখা যায় যে, শুক্র কেবল অণ্ড-কোষের Secretion এরূপ নহে, ইহাতে prostrate gland, Cowper's gland প্রভৃতি গ্রন্থির Secretionও মিশ্রিত থাকে।

শুক্র Testicle হইতে নির্গত হইয়া Vesiculae semenalis নামক স্থানে শুক্রবহা শিরা দিয়া যায়। দুইটি Testicle হইতে এই দুই শুক্রবহা শিরা মূত্র বস্থির অধোদেশে Vesiculae semenalis নামক শুক্রস্থলির সহিত মিলিত হয়। Vesiculae semenalis নামক স্থলি হইতে দুইটি ejaculatory Duct (শুক্রক্ষরণ মার্গ্য) দিয়া শুক্র নির্গত হয়।

শুক্রে এক প্রকার পদার্থ পাওয়া যায়, উহাকে Spermin বা Testiculin কহে। Spermin নামক পদার্থ শুক্রে Phosphoric acidএর সহিত মিলিত হইয়া থাকে। ডাক্তার Secquard প্রমাণ করিয়াছেন যে,

teticular fluid inject করিলে মনুষ্য বৃদ্ধ বয়সেও তরুণের ন্যায় বলবান্ হয়।

আজ পাশ্চাত্য অধিকারে জানিতে পারিতেছি যে, Anophilis নামক মসকই ম্যালেরিয়া জ্বরের অণুর বাহক এবং মূষিক প্লেগরোগের অণুর বাহক। এইরূপ কত প্রকার রোগাণু এবং তাহাদের বাহক আবিষ্কৃত হইবে, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? ইহাদের সমূলে বিনাশ করা বোধ হয় জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ অপেক্ষাও কঠিন। যখন জন্মেজয় সর্পজাতি নির্ম্মূল করিতে পারেন নাই, তখন আমরা যে জগৎ রোগাণুশূন্য করিতে পারিব, ইহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ঝড়ের সময় নাবিকদের ঝড় নিবারণ করা যেমন কঠিন, ইহাও তদপেক্ষা কিছু পরিমাণে কম নহে। নাবিকের পক্ষে হাল ছাড়িয়া ঝড়ের সহিত মুষ্ঠিযুদ্ধ করিতে যাওয়া যেরূপ বাতুলতা, জগৎ রোগাণুশূন্য করিতে যাওয়াও আমাদের সেইরূপ বাতুলতা। এখন তাহা হইলে আমরা কি করি? দেখিতেছি, নাবিকের ন্যায় হাল ধরিয়া স্থির থাকাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। মনের বলের অপেক্ষা বল নাই। সকলের আশ্রয় স্বরূপ সেই বৈষ্ণবীশক্তি আমাদের আশ্রয়। ইহাতে মন প্রাণ অর্পণ করাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এক ভগবতী হইতে যেমন লক্ষ লক্ষ শক্তি নির্গত হইয়া দানবদের পরাভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ জীবনীশক্তির সেবা করিলেও সেইরূপ লক্ষ লক্ষ রোগাণু ধ্বংশ করিবার শক্তি বিকাশ পায় ও রোগাণু ধ্বংশ করে। ইন্দ্রিয়সংযমরূপ ব্রহ্মচর্য্যই জীবনীশক্তির পূজা। আমাদের রক্তে যে সকল Fagocyte নামক অণু আছে, তাহারাই জীবনী-শক্তির সেনা। ইহারা যাহাতে সবল থাকে, তাহাই আমাদের চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। চামুণ্ডা যেমন দৈত্যসেনা গ্রাস করিয়াছিলেন, ইহারাও সেইরূপ রোগাণু গ্রাস করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে। *

শ্রীহেমচন্দ্র সেন এম-ডি।

৩৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

* ২৬শে আষাঢ় (১৩১১ সাল) রবিবার অপরাহ্ণ ৬ (ছয়) ঘটিকার সময় "সাহিত্য সভার" ৫ম বার্ষিক ৩য় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বালবিধবা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

(৬)

বসন্ত-শোভায় শিশির শ্রী অপনীত হইল। খর্জ্জুর রসের আমোদ ফুরাইল। আম্রমুকুল-গন্ধে চতুর্দ্দিক সুরভীকৃত হইয়া উঠিল। কোকিলের কুহুগানে, পাপিয়ার পঞ্চম তানে জগৎ মাতিল।

ধরণীধর বাবুর প্রতিবেশিনী, শ্যামের ঠান্‌দিদি ভীষণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৃদ্ধার এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে আমার বলিতে আর কেহই নাই। সংক্রামক রোগের সংক্রমণ ভয়ে, কেহই তাহার শুশ্রূষা করে না। এমন কি, "বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে"। সুখতারার আহার নিদ্রা নাই। সে অবিরত তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে। প্রাতঃ-কালে উঠিয়া ক্ষত মুখ হইতে পূজ রক্ত সমুদয় বাহির করিয়া নিজের কাপড়েই মুছিয়া লইত, পরে ঔষধ লেপন করিত; পথ্য দিত, যথাসময়ে জল দিত। বৃদ্ধা কিন্তু এ সময়ে আশীর্ব্বাদের জোরে মুখে "খই" ফুটাইয়া থাকে।

১০।১২ দিবস পরে বৃদ্ধা আরোগ্যলাভ করিল বটে, কিন্তু সুখতারা অব্যাহতি পাইল না। এখন বসন্ত রোগে তাহার জীবন সংশয়। শ্যামের ঠান্‌দিদি একদিন দেখিতে আসিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দুই চারিটী "আহা উহু" করিয়া নাসিকাবদ্ধ বস্ত্রে পলায়ন করিলেন।

৫।৬ দিন পরে সুখতারার জীবন অবসন্ন হইয়া আসিল। একদিন সে পিতাকে বলিল, "বাবা! আমি ত চলিলাম। তোমরাও এই আগুনের নিত্য দাহ হইতে রক্ষা পাইলে। এখন আমার একটী সাধ পূর্ণ হইবে কি?"

ধরণীবাবু স্নেহময়ী কন্যার অবস্থা দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "বল্ মা! তোমার কি সাধ? মাগো! এ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এমন ভাবে মাতৃহীন করিয়া যাইতে পারিবি কি?"

সুখতারা। বাবা! কাঁদিও না। নিয়তির গতি কে রোধ করিতে পারে? কত লোকের উপযুক্ত পুত্র যাইতেছে, সে কি সহ্য করে না?

আমি ত কন্যা! তাহার উপর বিধবা! বাবা! আমার যাওয়াই কি ভাল নয়?

ধরণী। বল মা! কি করিতে হইবে?

সুখ। একবার শশীবাবুর কাছে একটী লোক পাঠাইয়া দাও। লিখিয়া দাও যে, আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত।

ধরণীবাবু প্রস্থান করিলেন। অবিলম্বে লোক প্রেরিত হইল।

পাঠক! যাহার কন্যা আছে, সেই জানে যে, পুত্র অপেক্ষা কন্যাতে স্নেহ শতগুণ অধিক। তাই বলি, আজ ধরণীধর বাবুর মানসিক অবস্থা তোমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। কারণ তাহা লেখনীমুখে ব্যক্ত হইবার নহে।

বেলা ১টার সময় লোক খড়্গপুরে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই শশী বাবুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। অনেক সময় দেখিয়াছি, কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলে বা ঘটিবার উপক্রম হইলে সামান্য পাতার শব্দেই প্রাণ চমকিয়া উঠে। আজও তাহাই ঘটিল।

শশীবাবু ক্ষিপ্রহস্তে পত্র লইয়া পাঠ করিলেন। দেখিলেন, তাঁহার সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে। সুধাকে ডাকিয়া বলিলেন, "এখনই বিলাসপুরে যাইতে হইবে। সুখতারা মৃত্যুশয্যায়।"

সুধা। আমিও যাইব।

শশী। সুখতারার প্রার্থনাও তাই।

অবিলম্বে নৌকা আসিল—উভয়ে যাত্রা করিলেন।

সন্ধ্যার তিমিরচ্ছায়ার সহিত ধীরে ধীরে সুখতারার হৃদয়েও মৃত্যু-চ্ছায়া পতিত হইতে লাগিল। দুই একটী তারার ন্যায় তাহার অন্তরেও দুই একটী করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি ধীরে ধীরে ফুটিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় শশীবাবু বাহির হইতে ডাকিলেন, "সুখতারা!"

এইবার সুখতারার হৃদয়াকাশে চন্দ্রোদয় হইল। সুখতারার সেই মরণ-যন্ত্রণা ক্ষীণমুখে, বিশুষ্ক ওষ্ঠাধরে একটু ক্ষীণহাস্য রেখা প্রকাশিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া গেল। যেন মুদ্রিতপ্রায় সায়াহ্ন কমলমুখে অস্তোন্মুখ রবিপ্রভা ক্ষণেকের জন্য ভাসিয়া উঠিল।

সুখতারা উঠিয়া বসিল, বলিল, "এসেছ? একবার পায়ের ধূলা মাথায় দাও। আর সুধা দিদি! তুমি আমার ভগিনী নও! তুমি আমার

গুরুপত্নী! তুমি আমার মা! এস মা! একবার দাসীকে আশীর্ব্বাদ কর! জীবনে কখনও সুখ পাই নাই! মরিয়া যেন একটু শান্তির অধিকারিণী হইতে পারি।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সুখতারা সমুদয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিল। আবার বলিল, "শশীবাবু! গুরুদেব! আর আমার সংসার সম্বলের আবশ্যক নাই। এখন এ দাসীর সাধ পূর্ণ করুন।"

শশীবাবু আকুল প্রাণে কাঁদিয়া উঠিলেন। সকলে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুখতারা! তোমার সাধ কি?"

ধরণীবাবু বাষ্পবিজড়িতস্বরে বলিলেন, "বল মা! তোমার সাধ কি?"

সুখতারা আবার ক্ষীণকণ্ঠে সমুদয় খুলিয়া বলিল। ধরণীধর বাবুর স্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া সুখতারার বস্ত্র ও গহনাগুলি আনিয়া দিলেন।

সুখতারা বলিল, "সুধাদিদি পর, আমার চক্ষু জুড়াইয়া দাও।"

সুধা নিরুত্তর!

সুখতারা পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তেজিতস্বরে আবার বলিল, "সুধাদিদি! আমার সাধ না পুরিলে আমি মরিতে পারিব না। আমাকে যদি যন্ত্রণারাশি হইতে মুক্ত করিতে চাও, তবে যাহা বলিয়াছি তাহাই কর।"

সকলের অনুরোধে সুধা সেই বস্ত্রালঙ্কারগুলি পরিধান করিল। সঙ্গে সঙ্গে সুখতারার নয়নদ্বয়ও স্থির হইল।

* * * * * *

সকলে শ্মশানে যাইয়া দেখিল; সুখতারা যেন প্রফুল্লমুখে কর ধরিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছে।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

সমাপ্ত।

প্রেমের জয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শৈলেন্দ্রনাথ শর্ম্মার বিবাহিত জীবনের প্রথম ভাগটা বড় সুখের ছিল না;—কেন না, দুঃখিনী ভিখারিণীর পুত্র হইয়া ধনশালী রাজার জামতা হইয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথের পঞ্চদশ বর্ষের লাবণ্যময়ী কুসুম সুকুমারী ভার্য্যা হেমপ্রভা অর্থশালী রাজা উপাধিধারী ধনীর একমাত্র কন্যা,—আপনার পিতার ধন গৌরবে সতত গৌরবান্বিতা; সুতরাং সংসারে কাহাকেও বড় একটা মানিতেন না;—এমন কি, স্বামী শৈলেন্দ্রনাথকেও নয়। নানা কারণে হেমপ্রভা শৈলেন্দ্রনাথের উপরে বড় বিরক্ত;—প্রথমতঃ, ধনীর কন্যা, কোথায় রাজার পুত্রবধূ হইবেন—না, বিধির বিধানে এক দরিদ্রা ভিখারিণীর পুত্রবধূ হইলেন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও বা দরিদ্রের পুত্রবধূ হইলেন, কিন্তু স্বামী শৈলেন্দ্রনাথ ভিখারিণীর পুত্র হইলেও রাজকন্যাকে বড় একটা মানিতেন না, বরং সময়ে অসময়ে বড় জ্বালাতন করিতেন। এদিকে শৈলেন্দ্রনাথ পত্নী হেমপ্রভার নিকট হইতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পত্নীপ্রেম না পাইলেও, অন্তরে অন্তরে হেমপ্রভাকে বড়ই ভাল বাসিতেন,—ভাল বাসিতেন—হেমপ্রভার সেই শরতের জ্যোৎস্নাময়ী সুন্দর মুখখানি দেখিয়া। শৈলেন্দ্রনাথ দরিদ্রের সন্তান, সুতরাং, বিবাহের পরই অগ্রজের ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর পরিত্যাগ করিয়া জমিদার শ্বশুর রাজা অন্নদাপ্রসাদের রাজ-প্রাসাদে অধিষ্ঠিত হন। শৈলেন্দ্রনাথের পিতৃগৃহে একমাত্র অগ্রজ দেবেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথের অষ্টাদশ কি ঊনবিংশ বর্ষের প্রেয়সী ভার্য্যা কমলকুমারী, আর বিধবা মাতা জাহ্নবী ঠাকুরাণী। দেবেন্দ্রনাথ গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে শিক্ষকতা করিয়া, যে দু-পয়সা উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারায় দুইবেলা দু-মুঠো অন্নের সংস্থান করিতেন। এদিকে শৈলেন্দ্রনাথ যখন বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন, সেই সময় হইতে বাটীতে ঘটক চূড়ামণিদের যাতায়াত আরম্ভ হইল, শেষে দেবেন্দ্রনাথ যখন অনুজের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন, তখন ঘটকচূড়ামণি হলধর শর্ম্মা, বিনোদপুরের জমিদার রাজা অন্নদাপ্রসাদ রায়ের একমাত্র দুহিতা রাজকুমারী হেমপ্রভার সহিত শৈলেন্দ্রনাথের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু, জানি না, প্রথমে কেন শৈলেন্দ্রনাথ, এ বিবাহে অমত করিয়াছিলেন; শেষে দেবেন্দ্রনাথ যখন বুঝাইয়া দিলেন যে, বড় লোক শ্বশুর হইলে, আর কোন উপকার হউক বা না হউক, জীবনে কখনও অন্ন-চিন্তার ভাবনা ভাবিতে হইবে না, তখন বিনা আপত্তিতে রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। যথাসময়ে পাণিগ্রহণ কার্য্য শেষ হইয়া গেল। বিবাহের পর একবার মাত্র হেমপ্রভা ভাসুর ও শাশুড়ীর চরণ দর্শন ও আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছিলেন। তার পর অষ্টাহ পরে স্বামীর সহিত জোড়ে যে, পিতৃগৃহে গিয়াছিলেন, তাহার পর এই দীর্ঘ দুই বৎসর মধ্যে আর শ্বশুরবাটী মুখে আইসেন নাই। এদিকে শৈলেন্দ্রনাথও সুন্দরী পত্নীর অঞ্চল ধরিয়া জোড়ে যে শ্বশুর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর আর কখন এক রাত্রিও ভ্রাতার পর্ণকুটীরে নিশি যাপন করেন নাই। তবে বৃদ্ধা মাতার শত অনুরোধে, দুই তিন মাস পরে, এক একবার আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মাতার চরণ দর্শন করিয়া যাইতেন। এইরূপে দুই বৎসর অতীত হইয়া, তৃতীয় বর্ষের প্রথমেই এমন একটী গুরুতর ঘটনা ঘটিল যে, হঠাৎ হেমপ্রভাতে ও শৈলেন্দ্রনাথে কিছুদিনের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নব বর্ষার ঘোরা তিমিরা নিশি। এ হেন অন্ধকারময়ী নিশীথে রজনী প্রায় দ্বিতীয় প্রহর বহির্ব্বাটীতে অতীত করিয়া, শৈলেন্দ্রনাথ আপনার শয়ন মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। নববর্ষার নিশি—টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, তার পর এতক্ষণ বাহিরে পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট উজ্জয়িনী শিরোরত্ন মহাকবি কালিদাসের অমৃতময় গীতিকাব্য মেঘদূত পাঠ করিয়া, শৈলেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং, তাঁহার হৃদয় প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়ে শৈলেন্দ্রনাথ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে সপ্তদশ বর্ষের কুসুম প্রতিমা-রূপিনী

পত্নীর পার্শ্বে পালঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে, শৈলেন্দ্রনাথের পদশব্দ শুনিতে পাইয়া পরীক্ষার মানসে, হেমপ্রভা আপনার কমল নয়ন দুইটী মুদিত করিয়া, স্বর্গের পারিজাতমালার ন্যায় শ্বেত শয্যোপরি শুইয়া পড়িয়া ছিলেন। শৈলেন্দ্রনাথ নিদ্রিতা পত্নীর পার্শ্বে বসিয়া, প্রদীপের উজ্জ্বল রজতালোকে অতৃপ্তনয়নে নিদ্রিতা পত্নীর অতুল্য সৌন্দর্য্যরাশি নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন;—দেখিতে লাগিলেন সত্য, কিন্তু দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি হইল না,—আবার দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পত্নীর সেই লোক-মনোমোহিনী সৌন্দর্য্যরাশি অতৃপ্ত-নয়নে দেখিয়া দেখিয়া, শেষে ধীরে ধীরে,—ভয়, পাছে মনুষ্যের কঠিন করাঘাতে, এ হেন শিরিষ-কুসুম কোমল দেহে ব্যথা পায়, এই ভয়ে—শৈলেন্দ্রনাথ প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয়ে ধীরে ধীরে হেমপ্রভাকে সম্ভাষণ করিলেন। স্বামীর সম্ভাষণে হেমপ্রভা হাসিতে হাসিতে শয্যোপরি উঠিয়া বসিয়া কহিলেন,—"ভাল লোক পুঁথি পেলে কি সব ভুলিয়া যায়।"

শৈলেন্দ্রনাথ আবার সাদর প্রেম-সম্ভাষণে ধীরে ধীরে কহিলেন,—"আজ মেঘদূতকাব্য পড়িতেছিলাম। আজিকার এই নববর্ষার সমাগমে বিরহি যক্ষের দুঃখ দেখিয়া পাষাণও বিদীর্ণ হইয়া যায়; তাই পুঁথি ছেড়ে আস্‌তে একটু বিলম্ব হইল।" তার পর স্বামী স্ত্রীতে কত প্রেমালাপ হইল, তাহা যে কি, জানিবার উপায় নাই। যিনি যৌবনে সুন্দরী জগৎমোহিনী পত্নী লাভ করিয়াছেন, আর যে জগৎ-মনোমোহিনী সুন্দরী ভীমকান্ত রূপগুণযুক্ত প্রাণেশ্বর লাভ করিয়াছেন, তাহারাই জানিতেছেন যে, যুবক যুবতীর পক্ষে রজনীর মিলন কি সুখের—কি শান্তির। অনেকক্ষণ এইরূপ কথোপকথনের পর শৈলেন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন, "হেমা!" শৈলেন্দ্রনাথ আদরে হেমপ্রভাকে "হেমা" বলিয়া ডাকিতেন। শৈলেন্দ্রনাথ আদর করিয়া কহিলেন,—"হেমা! আমিও বিরহি যক্ষ অপেক্ষা অধিক দুঃখী।"

হেমপ্রভা হাসিয়া কহিলেন,—"কেন? কিসে তোমার দুঃখ,—আমায় কি তাহা বলিবে না?"

শৈলেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"দেখ, আমি তোমার মত রূপগুণযুক্তা পত্নী পাইয়া যেমন সুখী হইয়াছি, ঠিক তেমনি যদি স্বাধীন হইতে পারিতাম, তবে, হয় ত আমার জীবন বড় সুখের হইত।"

শৈলেন্দ্রনাথের একথা হেমপ্রভার বড় ভাল লাগিল না, তাই তিনি হাসিয়া কহিলেন,—"রাজা মহারাজাদের মেয়েকে বিবাহ করিলেই তো, বাড়ীঘর, আত্মীয়স্বজন সব ছাড়িতে হয়,—তাহা কি তুমি জান না?"

শৈলেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"তা জানি, কিন্তু এতদূর হইবে পূর্ব্বে বুঝিতে পারি নাই।"

হেমপ্রভা।—"সে, দোষ কি আমার।" এবার হেমপ্রভার কণ্ঠস্বর একটু ঘৃণাব্যঞ্জক।

শৈলেন্দ্র।—"না, সে দোষ তোমার নয়,—আমার অদৃষ্টের।" এইরূপ দুই এক কথায়, স্বামী স্ত্রীতে একটু বিবাদ বাধিল,—এমন বিবাদ প্রায় প্রতিদিনই বাধিত, তা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হেমপ্রভা শৈলেন্দ্রনাথকে ভালবাসিলেও, সে যে রাজা অন্নদাপ্রসাদের একমাত্র দুহিতা, তাহার প্রমাণ দিতে ত্রুটী করিতেন না। আর রাজার মেয়ে বলিয়াই দরিদ্র স্বামীর উপর সাড়ে ষোল আনা কর্ত্তৃত্বও করিতে ছাড়িতেন না; কিন্তু নির্ব্বোধ শৈলেন্দ্রনাথ তাহাতে বড় একটা স্বীকৃত ছিলেন না। তবে এইমাত্র যে, শৈলেন্দ্রনাথ হেমপ্রভার রূপের শিকলে বাঁধা পড়িয়াছিলেন! আহা, কি রূপ!

অনেকক্ষণ উভয়ে চুপ করিয়া থাকিলে পর, হেমপ্রভা কহিলেন,—"এখন কি করিলে তোমার সুখ হয়?"

অন্যমনে শৈলেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"মনে হয়, এ পিঞ্জর হইতে উদ্ধার পাইলেই সৌভাগ্য জ্ঞান করিতাম। দেখ, আমি এ পরাধীনতার মধ্যেও সুখে জীবন কাটাইতে পারিতাম, যদি দাস দাসীরা আমাকে পরাধীন বলিয়া ঘৃণা না করিত।"—ইতিপূর্ব্বে, রাজবাড়ীর জনৈক নবীনা পরিচারিকা মোক্ষদা কোনও কারণে শৈলেন্দ্রনাথকে দুই চারিটা ঘৃণাসূচক দুর্ব্বাক্য বলিয়াছিল।

স্বামীর কথায় হেমপ্রভা হাসিয়া কহিলেন,—"দেখ, তোমার মত লোকের পক্ষে অভিমানকে দূর করাই ভাল। দাসীতে অপমান করিয়াছে বলিয়া কি করিবে?"

এবার হেমপ্রভার কথায় শৈলেন্দ্রনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সুতরাং শৈলেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বিনা বাক্যব্যয়ে শয্যোপরি শুইয়া পড়িলেন। শৈলেন্দ্রনাথ শুইয়া পড়িলে পর, হেমপ্রভা বুঝিতে

পারিলেন যে, শৈলেন্দ্রনাথ অভিমান করিয়াছেন,—এমন অভিমান প্রায় প্রতি রাত্রিতেই হইত। অমনি ধীরে ধীরে উঠিয়া তাম্বুল পরিপূর্ণ এক-খানি সুবর্ণপাত্র আনিয়া শৈলেন্দ্রনাথের হাতে দিয়া কহিলেন,—"এই, নাও; কাল দাসীর এই অপমানের প্রতিশোধ দিব।"

শৈলেন্দ্রনাথ কি করিবেন? যুবতী সুন্দরী পত্নীর স্বহস্ত প্রস্তুত তাম্বুলের রসাস্বাদন সুখে বঞ্চিত হইতে বড় একটা ইচ্ছা করিলেন না,—ইহ-সংসারে কে ইচ্ছায় সে সুখ পরিত্যাগ করিতে পারে? তাম্বুল লইয়া চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন। হেমপ্রভা তখন স্বামীর সঙ্গে পুনরায় হাসি তামাসা জুড়িয়া দিলেন। অনেকক্ষণ হাসি তামাসার পরে, হাসিতে হাসিতে হেমপ্রভা বলিলেন,—"কেমন, এখন তো সুখী হ'লে,—এখন গল্প কর।"

এতক্ষণ পরে শৈলেন্দ্রনাথের উপর শনিঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি হইল। তিনি ভাবিলেন, এই অবসরে একবার হেমপ্রভার মানসিক বৃত্তির পরীক্ষা করিয়া লই। এই ভাবিয়া হেমপ্রভাকে কহিলেন,—"এখনও সম্পূর্ণ সুখী হ'তে পারি নাই,—দরিদ্রের আশা বড় বেশী।" আবার হেমপ্রভা হাসিয়া কহিলেন,—"আর কি করিতে হইবে।"

শৈলেন্দ্রনাথ।—আমার জীবনের বড় সাধ, একবার তোমার ঐ কুসুম-কোমল হস্তে, তোমার স্বহস্ত প্রস্তুত তামাকের ধূমপান করিয়া মনের বাসনার তৃপ্তিসাধন করি,—দরিদ্রের এ সাধ কি পূর্ণ হইবে না?" এই বলিয়া প্রেমভরে পত্নীর মুখচুম্বন করিতে যাইতেছিলেন; কিন্তু সহসা হেমপ্রভা পিছাইয়া যাইয়া বিশাল নয়নে বিশাল ভ্রুকুটি করিয়া কহিলেন,—"তুমি কি জান না, যে, রাজাদের মেয়েরা কোন দিন তামাক সাজে না।" শৈলেন্দ্রনাথের কথাটা শুনিয়া হেমপ্রভার মস্তকের ভিতর একখানি বিদ্যুৎ খেলাইয়া গেল। বড় লোকের মেয়ে, বিশেষতঃ, রাজা অন্নদাপ্রসাদের একমাত্র মেয়ে,—সাত রাজার ধন, আঁধার ঘরের মাণিক, সে তামাক সাজিবে! আর দরিদ্র শৈলেন্দ্রনাথ সেই তামাক খাইবেন!—তাই কথাটা শুনিয়া হেমপ্রভার হাসি রাশি হঠাৎ অন্তর্হিত হইল, দরিদ্র স্বামীর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া, একটু রাগ হইল—একটু ঘৃণা হইল; তাই হেমপ্রভা গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"আমরা রাজাদের মেয়ে,—আমাদিগকে কি সাধারণের সহিত তুলনা কর?"

হেমপ্রভার কথা শুনিয়া শৈলেন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন,—"করি বৈ কি? রাজার মেয়েরা যে তামাক সাজে না, তাহা সত্য; কিন্তু, দরিদ্রের পত্নী তো স্বামীর চিত্তবিনোদনের জন্য স্বহস্তে তামাক সাজিয়া দেয়। তুমি রাজার মেয়ে হ'লেও তো, এখন তুমি দরিদ্রের পত্নী।"

শৈলেন্দ্রনাথের একথা হেমপ্রভার ভাল লাগিল না,—রাগে শরীর জ্বলিতেছিল,—কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ মনে পড়িল—

"নীচ যদি উচ্চ ভাসে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

এই মহাকাব্য মনে করিয়া, হেমপ্রভা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আজ শৈলেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে শনিঠাকুরের পূর্ণ আবির্ভাব হইয়াছে, তাই তিনি পত্নীকে মৌনাবলম্বন করিতে দেখিয়া তাম্বুলপূর্ণ সুবর্ণপাত্র হইতে পানের একটা বোঁটা লইয়া, তাহার দ্বারায় হেমপ্রভার সেই অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপরঙ্গ-লাঞ্ছিত কপোলে একটা ঠোন্‌কা দিলেন। ঠোন্‌কা দিতে বোধ হয় একটু লাগিয়াছিল, তাই হেমপ্রভা একটু রাগে,—একটু ঘৃণার সহিত কহিলেন,—"যাও ছাই, ভাল লাগে না—বড় লাগিয়াছে।"

হেমপ্রভার কথায় শৈলেশীনাথ আবার একটু ক্ষুদ্র রসিকতা করিবার মানসে কহিলেন,—"কোথায় লেগেছে,—নাকে, না, গালে,—আহা! কি ননীর পুতুল রে!"

এবার আর হেমপ্রভা চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শৈলেন্দ্র-নাথের তীব্র ব্যঙ্গে হেমপ্রভা ক্রোধভরে কহিলেন,—"অত ঠাট্টা ভাল লাগে না,—ছোট লোকের ছেলের ঐ সব দোষ।"

"ছোট লোকের ছেলে,"—আপনার পত্নীর মুখে হঠাৎ "ছোট লোকের ছেলে,"—কথাটা শুনিয়া শৈলেন্দ্রনাথের বড় রাগ হইল; এবার আর হেমপ্রভার সেই চাঁদমুখখানিতে শৈলেন্দ্রনাথের ক্রোধকে সংযত করিতে পারিলেন না, সুতরাং ঘৃণার সহিত কহিলেন,—"আমি ছোট লোকের ছেলে সত্য, কিন্তু তোমার বড় লোক বাপও একদিন এই ছোট লোকের ছেলের পা পূজা করিয়াছিলেন। আর ছোট লোক বলিয়া যদি তোমার এতই ঘৃণা, তবে তুমি বড় লোকের মেয়ে, একদিন তুমি এ কণ্ঠে বরমাল্য দান করিয়াছিলে কেন?"

হেমপ্রভা।—ঝক্‌মারি করিয়াছিলাম,—"এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

ব্যঙ্গস্বরে শৈলেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"কি করিবে?"

হেমপ্রভা রাগে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিলেন,—"আজিকার এই অপমানের প্রতিশোধ একদিন দিব।"

পূর্ব্বের ন্যায় ব্যঙ্গস্বরে শৈলেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"কি প্রতিশোধ দিবে?"

হেমপ্রভা আর কোন উত্তর না করিয়া, আপনার মনে পালঙ্কোপরি পাশ মুড়িয়া শুইয়া পড়িলেন। এদিকে, এতদিন পরে শৈলেন্দ্রনাথের পত্নীর স্বহস্ত প্রস্তুত তাম্রকুটের ধূমপান করিবার সাধ পূর্ণ হইল। আজিকার এই গভীর নিশীথে পত্নীর ব্যবহার ভাবিতে ভাবিতে শৈলেন্দ্রের আর নিদ্রা হইল না। রজনী প্রভাতমাত্র উঠিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শৈলেন্দ্রনাথ প্রভাতে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিলে পর, গৃহ-শিক্ষক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গৃহ-শিক্ষককে দেখিয়া শৈলেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ বদনে কহিলেন,—"আজ আমার অসুখ করিয়াছে,—আমি পড়িতে পারিব না।"—কথাটা শুনিয়া, গৃহ-শিক্ষক মহাশয় মনে মনে শৈলেন্দ্রনাথের প্রতি প্রীত হইয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে শৈলেন্দ্রনাথ আপনার পাঠাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া, পালঙ্কোপরি চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া গত রজনীতে পত্নী যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন;—ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে হইল—

"Of all the blessing on earth is a good wife.
A bad one is the bitterest curse of human life."

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এদিকে প্রভাতে উঠিয়া, অন্নদাপ্রসাদের পত্নী ভুবনমোহিনী হঠাৎ তনয়ার মুখের প্রতি চাহিয়া, মেয়ের বিষাদ-মলিন মুখখানি দেখিয়া কহিলেন,—"কেন, মুখ মলিন কেন? কোন কিছু অসুখ করেছে?"

মাতার প্রশ্নে হেমপ্রভা ছোট গলায় একটী ক্ষুদ্র "না,"—বলিয়া অন্যত্র উঠিয়া গেলেন।

"মেয়ের কোন অসুখ করে নাই, তবে হঠাৎ মুখ মলিন কেন?"—ভুবনমোহিনী সারাদিন বসিয়া বসিয়া, ইহার কারণ ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ভিতরের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বুঝিতে না পারিয়া অপরাহ্ণে মেয়েকে ডাকিয়া নিজের নিকট বসাইয়া, মেয়ের সেই অবিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণকুন্তলরাশি আপন করে অপসারিত করিতে যাইয়া, দেখিলেন যে, মেয়ের সেই কপোলে কিসের একটী দাগ পড়িয়াছে, আর সেই দাগের চারিদিকে চক্রাকারে ফুলিয়া উঠিয়াছে। মাতা কারণ জানিবার জন্য স্নেহ-পরিপূর্ণস্বরে কহিলেন,—"হেমা, এখানে এ কিসের দাগ,—কিছু লাগিয়াছিল কি?"

মাতার স্নেহপূর্ণ-স্বরে মুগ্ধ হইয়া হেমপ্রভা কিছুই বলিতে পারিলেন না,—হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন।

একমাত্র স্নেহ-পুত্তলিকাকে কাঁদিতে দেখিয়া, ভুবনমোহিনীর অন্তরে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। নানা উপায়ে দুহিতার বিষাদের কারণ জানিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু মেয়ের পেট হইতে কোন কথাই বাহির করিতে লাগিলেন না। শেষে সন্ধ্যাকালে প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য যমুনা নাম্নী জনৈক অল্প বয়স্কা পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যমুনা প্রভু-পত্নী কর্ত্তৃক নিযুক্তা হইয়া, নানাছলে নানা কৌশলে রাজকন্যা হেমপ্রভার নিকট হইতে গত রজনীর সব ইতিহাস শুনিয়া লইল। তার পর আপনার বয়স ও রূপের গৌরবে ঢিমে তেতালা গোছের পদবিক্ষেপ করিতে করিতে ভুবনমোহিনীর সমীপে আসিয়া, অলঙ্কারের মাত্রা একটু বৃদ্ধি করিয়া, গত রাত্রির সমুদয় ইতিহাস ব্যক্ত করিল।

দরিদ্র জামাতার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া, রাগে ফুলিতে ফুলিতে কপালে করাঘাত করিয়া রাণী ভুবনমোহিনী কহিলেন,—"হায়, বানরের গলায় মুক্তমালা শোভিবে কেন?" ঠিক এমনই সময়, শৈলেন্দ্রনাথ

অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন; সহসা শাশুড়ীর মুখনিঃসৃত অমিয়-সিঞ্চিত বাক্যাবলী শুনিয়া, আর অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হইল না। ক্ষণকাল বজ্রাহত পথিকের ন্যায় দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শেষ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া আপনার পাঠাগারে শয্যোপরি শুইয়া নিভৃতে আপনার মনে আপনি অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। তার পর, অশ্রুমোচনে চিত্তবেগ কতকটা প্রশমিত হইলে, শৈলেন্দ্রনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল,—"একদিন, আজিকার এই অপমানের প্রতিশোধ লইব।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রজনীতে রাজা অন্নদাপ্রসাদ শয়নমন্দিরে আসিয়া বসিলে, প্রৌঢ়া-পত্নী ভুবনমোহিনী আপনার হাতের দুইগাছা সুবর্ণবলয় উজ্জ্বল প্রদীপালোকে মৃদুমন্দ আন্দোলিত করিতে করিতে, অধিক অলঙ্কারের সহিত, স্বামীর নিকট একে একে শৈলেন্দ্রনাথ ও হেমপ্রভা ঘটিত গত রজনীর সমুদয় ইতিহাস সবিস্তারে বলিয়া কহিলেন,—"হায়, বানরের গলায় মুক্ত-মালা শোভিবে কেন?"

এদিকে রাজা অন্নদাপ্রসাদ প্রেয়সী ভার্য্যার নিকট একে একে সব শুনিয়া, নৈদাঘকালীন জলদমালার ন্যায় গম্ভীরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিলেন,—"কি, হতভাগার এতদূর স্পর্দ্ধা;—কালই ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব।" দরিদ্র জামাতার স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া শত বৃশ্চিক দংশন জ্বালার অধিক জ্বলিতে জ্বলিতে মহামহিম রাজা বাহাদুরের আর সে রাত্রিতে নিদ্রা হইল না। এই প্রকারে রজনী-প্রভাত করিয়া, প্রথম বিহগ-কাকলীর সঙ্গে সঙ্গে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অন্যদিকে হৃদয়ের অসহ্য যন্ত্রণায় শৈলেন্দ্রনাথও রজনীতে অন্তঃপুর মধ্যে শয়ন করিতে আসিলেন না এবং শরীর অসুস্থের ভান করিয়া সেদিন জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। সারারাত্রি শয্যায় পড়িয়া শুধু

আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে অতিকষ্টে রজনী অতিবাহিত করিতেছিলেন। রজনী প্রভাতে, প্রভাতের নির্ম্মল-বায়ু-সেবন করিয়া চিত্তের প্রফুল্লতা সম্পাদন মানসে পাঠাগারের সংলগ্নস্থ পুষ্পোদ্যানে পায়চারি করিতেছিলেন; এমন সময়ে ধরমসিংহ জমাদার আসিয়া সেলাম করিয়া কহিল,—"মহারাজ! আপ্‌কো হুজুর তলপ্ কিয়া?"

ধরমসিংহের কথা শুনিয়া, শৈলেন্দ্রনাথ বিষণ্ণ মনে ধীরপদ-বিক্ষেপে শ্বশুরের বিচার-গৃহে আসিয়া, যেমন উপবেশন করিবেন, অমনি রাজা অন্নদাপ্রসাদ কঠিন কর্কশকণ্ঠে একজন মুসলমান পাইককে আদেশ দিলেন,—"দাঁড়া-গারদে কয়েদ কর।", দরিদ্র প্রজার রক্তশোষণ করিবার জন্য, বাঙ্গালার জমিদারবর্গের দাঁড়া-গারদের সৃষ্টি। যে নিরন্ন প্রজা জমিদারের প্রার্থিত অর্থ দিতে অসমর্থ হয়, হুজুরের আদেশে, তাহাকে সেই দাঁড়া-গারদে কয়েদ করিয়া বিনামা প্রহারে পুরস্কৃত করিয়া, দরিদ্র প্রজার বড় কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থ ফাঁকি দিয়া লওয়া হয়। শৈলেন্দ্রনাথের প্রতি রাজার আদেশ শুনিয়া, দেওয়ান, পেস্কার প্রভৃতি কেহই ভয়ে তাহার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না দেখিয়া, একজন মুসলমান পাইক শৈলেন্দ্রনাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিল,—"কি করিব, হুকুম,—আপনি চলুন।" রোষে ও ক্ষোভে বিনা বাক্যব্যয়ে শৈলেন্দ্রনাথ পাইকের সহিত দাঁড়-গারদে গমন করিলেন। অন্য দিকে, অল্পক্ষণ মধ্যেই রাজা বাহাদুরের দরবার ভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নীরব নিশীথে দাঁড়-গারদে একাকী বসিয়া বসিয়া, দাঁড়-গারদের ক্ষীণ প্রদীপালোকে, শৈলেন্দ্রনাথ একখানি পত্র লিখিতেছিলেন,—পত্র লিখিতেছিলেন, একমাত্র অগ্রজ দেবেন্দ্রনাথকে? সন্ধ্যার সময় প্রদীপ দিবার জন্য বদন ভাণ্ডারী আইসে, সেই সময় শৈলেন্দ্রনাথ বদনের নিকট পত্র লিখিবার উপযোগী কাগজ কলম ও মসীপাত্র প্রার্থনা করেন। বদনভাণ্ডারী শৈলেন্দ্রনাথকে বড় ভালবাসিত,—শৈলেন্দ্রনাথের মধুর-চরিত্র দেখিয়া বড় ভক্তি করিত। কেন না, শৈলেন্দ্রনাথের সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কেবল স্নেহ ও দয়ায় পরিপূর্ণ ছিল। পেটের দায়ে বদন এই হিংসা-দ্বেষ পরিপূর্ণ রাজপুরীতে চাকুরী করিতে আসিয়াছিল;—কিন্তু যে

দিন হইতে জামাই বাবুকে দেখে, জামাই বাবুর চরিত্রের মধুরতা দেখিয়া, সেইদিন হইতেই তাঁহার প্রধান ভক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল; সুতরাং, আজিকার এই দুর্দ্দিনে শৈলেন্দ্রনাথের প্রার্থনায়, বদন পত্র লিখিবার সব উপকরণ আনিয়া দিল। শৈলেন্দ্রনাথ পুনরায় কহিলেন,—"বদন, আর একবার আসিয়া পত্রখানি লইয়া যাইয়া ডাকে দিয়া আসিও।" বদনচন্দ্র স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল।

এদিকে পত্র লিখিবার উপকরণ পাইয়া, শৈলেন্দ্রনাথ অগ্রজকে পত্র লিখিতে বসিলেন; কিন্তু নয়নজলে পত্র মুছিয়া যাইতেছিল। বড় কষ্টে পত্র সমাপন করিয়া, আপনার মনে আপনি পত্র পাঠ করিলেন;—

আমার শত সহস্র প্রণাম জানিবেন।—

দাদা! বড় দুঃখে পড়িয়া, দীর্ঘকাল পরে আজিকার এই নীরব নিশীথে, আপনার এই নরাধম ভ্রাতা আবার আপনাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে,—আশা আছে, আজিকার এই চিত্তবেগ কোন দিন পরিবর্ত্তিত হইবে না। এতদিনে আমার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু কত দিনে এ প্রায়শ্চিত্তের শেষ হইবে, বিধাতাই বলিতে পারেন। আমি দরিদ্র,—ভিখারিণীর পুত্র—ভিখারীর ভ্রাতা; আপনারা কি সুখ-ভোগ করিবার জন্য আমাকে এ বিবাহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ছিলেন। আপনারা যদি আমাকে এ বিবাহ না দিয়া, পথের কোনও ভিখারিণীর কন্যার সহিত আমার বিবাহ দিয়া, আপনার কষ্টার্জ্জিত শাকান্নের ক্ষুদ্রতম একাংশ দান করিতেন, মনে হয়, তাহা হইলে আমি আজ সসাগরা ধরণীপতির অপেক্ষা অধিক সুখী হইলাম। কিন্তু, কি করিব; আপনার কোনও দোষ নাই,—সবই আমার অদৃষ্টের লিখন। এখন মনে হয়, বিষ পাইলে খাইতাম,—বিষপানে এদেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিলেই অধিক সুখী হইতাম। আমি আর এ হৃদয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারি না। সময়ে সময়ে মনে হয়, বিষপানে এ দেহ পরিত্যাগ করি; আবার পরক্ষণেই মনে হয়, না, দেহ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার পাপের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিব। যাহা হউক, আমি মরিব না,—মরিতে পারিব না; কেন না, মরণে আমি বড় ভীত। আমি একবার, সাধের এ সুবর্ণ শৃঙ্খল কাটিতে পারিলে, মনের সুখে একবার উড়িয়া বেড়াইতাম। আপনি আমার পত্র পাঠ করিয়া উতলা হইবেন না,—আমি কখনই

মরিব না। যদি কোনও প্রকারে এ শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে পারি, তবে নিজের দিন যাপনের উপায় স্থির করিবার জন্য বিদেশে—বহু দূরদেশে যাইব। আপনি মাকে দেখিবেন,—আমি অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলে আবার প্রীতি-প্রফুল্লমনে শ্রীচরণ দর্শন করিয়া মনের যাতনার লাঘব করিব; তৎপূর্ব্বে শ্রীচরণ দর্শনের আর আমার ইচ্ছা নাই,—আপনিও আর অনুরোধ করিবেন না। আপনি ও আমার স্নেহময়ী বউ-ঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানিবেন এবং জানাইবেন। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

আপনার স্নেহের—

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ।

পত্র সমাপন হইলে, যথাসময়ে বদন ভাণ্ডারী আসিয়া পত্র লইয়া চলিয়া গেল।

—

নবম পরিচ্ছেদ।

পরদিন এক প্রহর বেলার সময়ে, রাজ-সংসারের প্রাচীনা পরিচারিকা হরমণি আসিয়া রাজমহিষি ভুবনমোহিনীকে কহিল,—"মা! কাজ ভাল কর নাই,—জামাই বাবু আজ তিনদিন জলবিন্দুও গ্রহণ করেন নাই।"

হরমণির কথায় ভুবনমোহিনী চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"কেন?" রাগের মাথায় ভুবনমোহিনী স্বামীর নিকট শৈলেন্দ্রনাথ ও হেমপ্রভার সব কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু, পরিণামে যে এতদূর ঘটিবে, তাহা তিনি একবারও ভাবেন নাই এবং কল্যকার ঘটনাও শুনেন নাই।

ভুবনমোহিনীর উত্তরে হরমণি কহিল,—"কেন মা! তুমি কি শুন নাই যে, কাল হ'তে জামাই বাবু কারাগারে আবদ্ধ আছেন। পরিচারক ঠাকুর কা'ল খাবার দিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু জামাই বাবু কিছুই আহার করেন নাই। সুধু বলিয়াছেন,—হয় বিষ খাইব, নয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আহা! হাজার হ'ক, ছেলে-মানুষ বৈ তো নয়; তা এত কষ্ট সহ্য হবে কেন?" এই বলিয়া হরমণি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

হরমণির কথা শুনিয়া ভুবনমোহিনীর হৃদয়ে একটু আঘাত লাগিল,—জামাতার জন্য হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একটু স্নেহের প্রেম-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইল। তার পর অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—

"আচ্ছা, দেখি।" এই বলিয়া বিরাজ নাম্নী পরিচারিকার দ্বারায় স্বামীর নিকট হইতে জামাতার কারামুক্তির আদেশ আনাইয়া হরমণিকে কহিলেন,—"মে'য়ে! তুমি গিয়ে শৈলেন্দ্রনাথকে লইয়া এস,—সে তো তোমার বাধ্য।" এই বলিয়া হরমণিকে বিদায় দিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে শৈলেন্দ্রনাথ কারামুক্ত হইয়া আসিলে পর হরমণিদাসী প্রভুপত্নীর অনুজ্ঞামত শৈলেন্দ্রনাথের নিকটে গিয়া কহিলেন,—"বাবা শৈলেন! একবার এদিকে এসো।"

শৈলেন্দ্রনাথ অন্যমনে কহিলেন,—"কোথায় যাইব?"

হরমণি।—বাড়ীর ভিতরে,—রাণী মা ডাকিতেছেন।

এবার শৈলেন্দ্রনাথ বিশাল ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন,—"আবার! এ জীবনে আবার বাড়ীর ভিতর যাইব!—কখনই না। আমি আর তাঁহাদের মুখ দেখিতে চাহি না। তুমি, তাঁহাকে বলিও, শৈলেন্দ্র মরিয়াছে ভাবিলেই সব গোল মিটিয়া যাইবে।"

শৈলেন্দ্রনাথের মুখের কথা শেষ হইতে না হইতে, হরমণি যাইয়া শৈলেন্দ্রের হাত দুইখানি ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"ছি বাবা! রাগ কর্ত্তে কি আছে। তোমার মা যদি এমনই ব্যবহার করিতেন,—তবে কি করিতে?" এবার শৈলেন্দ্র কিছু নরম হইলেন। হরমণি দাসী হইলেও প্রাচীনা। তার পর একদিন বড় ঘরের মেয়ে ছিল; অদৃষ্টের দোষে জীবনের অপরাহ্ণে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে; সুতরাং সকলেই হরমণিকে একটু মানিতেন,—এমন কি, খোদ রাজা অন্নদাপ্রসাদ পর্য্যন্ত মানিতেন। এমন অবস্থায় শৈলেন্দ্রনাথ আর থাকিতে পারিলেন না, পরিচারিকার সঙ্গে বিষণ্ণ-বদনে ধীরপদে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে তিন রাত্রির অসহ্য কষ্টে ও অপমানে জামাতার শারীরিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া, ভুবনমোহিনী সহসা চমকিয়া উঠিলেন; তার পর, ধীরে ধীরে স্নেহ-পরিপূর্ণ মধুরস্বরে কহিলেন,—"শৈলেন—বাবা!"

আজিকার এই দুর্দ্দিনে শাশুড়ীর স্নেহ-পরিপূর্ণ-স্বরে শৈলেন্দ্রনাথের অসহ্য যাতনাময় হৃদয়ও ক্ষণকাল তরে চন্দ্রোদয়ে জলোচ্ছ্বাসের ন্যায়

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। শৈলেন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-সংবরণ করিতে যাইয়া তাহা পারিলেন না, সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

* * * * *

কতক্ষণ পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, শৈলেন্দ্রনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলেন, অমনি ভুবনমোহিনী যাইয়া জামাতার হাত ধরিয়া কহিলেন,—"বাবা! আমার অনুরোধ,—আমার দোষ কি?"

"বানরের গলায় মুক্ত-মালা কি শোভা পায়"—শাশুড়ীর এই মন্তব্য শৈলেন্দ্রনাথের হৃদয়ের প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় জ্বলিতেছিল। কিন্তু সে কথার কোনও উল্লেখ না করিয়া, শুধু ধীরে ধীরে কহিলেন,—"জীবনে এ বাড়ীতে আমি কখনও জলবিন্দু গ্রহণ করিব না। মরিতে হয়, অক্লেশে মরিব, তবুও এ বাড়ীতে জলগ্রহণ করিব না, অথবা——" আর বলিতে পারিলেন না, লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভুবনমোহিনী একে একে সব বুঝিলেন,—বুঝিলেন যে, কাজটা বড় ভাল করেন নাই, আর বুঝিলেন যে, এতদিনে আদরের আদরিণী কন্যা হেমপ্রভার কপাল ভাঙ্গিল। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া জামাতাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন,—কিন্তু, কিছুতেই কিছু হইল না। শৈলেন্দ্রনাথ শুধু হৃদয়ের পূর্ণ-আবেগ-ভরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা, আমি তো দরিদ্র ছিলাম, ভিখারিণীর পুত্র আমি,—কেন আমায় তোমরা এই রাজ-সিংহাসনে বসাইয়াছিলে? চির-দরিদ্র আমি,—সুখে হউক, দুঃখে হউক,—শাকান্নে হউক বা উপবাসে হউক, বিধাতা আমার দিন যাপনের উপায় করিয়া দিতেন। কেন তোমরা আমার সে সুখের সুখস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া দিয়া আমার জীবনের সব সুখ নষ্ট করিলে? আমি দরিদ্র,—দরিদ্রের মতন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া, আমার দিন আমি কাটাইতাম, আর সেই ভিক্ষাতেই অতুল্য-সুখ বোধ করিতাম। কেন তোমরা আমায় এই বাহ্য-সৌন্দর্য্যের মোহে মুগ্ধ করিয়া, আমার জীবনের সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিয়া, আমার জীবনের সব শান্তি দূর করিলে? আর না,—আর আমায় অনুরোধ করিও না। আর তোমাদের শত আদরেও হৃদয়ের এ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবার নহে। বৃথা তোমাদের এই যত্ন,—এতদিন পরে, আমার এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। আমি দরিদ্র ছিলাম,—

আবার দরিদ্র হইতে চলিলাম,—ইহাতে আমার দুঃখ কি ? আর তোমারা,—লোকের তো জামাই মরিয়া থাকে ? আমি মরিয়াছি ভাবিলেই, তোমাদের সব যাতনার শেষ হইবে।" এই বলিয়া দ্রুতহস্তে শাশুড়ীর হাত ছাড়াইয়া, নিজের অঙ্গুলী হইতে বিবাহ-প্রদত্ত হীরক-খচিত সুবর্ণাঙ্গুরীয় খুলিয়া প্রাঙ্গনের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দ্রুতপদে বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। তার পর, একমাত্র মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া জন্মশোধ শ্বশুর-গৃহ পরিত্যাগ করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে ভ্রাতৃপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ প্রিয়তমানুজ শৈলেন্দ্রনাথের পত্র পাঠ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—ধীরে ধীরে বিন্দুর পর বিন্দু করিয়া অশ্রু আসিয়া গণ্ডস্থল বাহিয়া পড়িতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া পরে, মন্ত্রণাদাত্রী-প্রাণাধিকা-পত্নী কমলকুমারীর সময়োচিত মন্ত্রণানুসারে শৈলেন্দ্রনাথের শ্বশুর রাজা অন্নদাপ্রসাদকে একখানি পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইয়া ছিলেন। যথা সময়ে লোক পত্রের উত্তর লইয়া আসিল। শৈলেন্দ্রনাথের শ্বশুর পত্রের উত্তরে লিখিয়াছেন,—"অদ্য কয়দিন হইল, শৈলেন্দ্রনাথ রাগ করিয়া গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং, তাহার সংবাদ আমি জ্ঞাত নহি।" রাজার পত্র পাঠ করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ আবার চিন্তা-সাগরে ভাসিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এই প্রকার দুশ্চিন্তায় দুই বৎসর অতীত হইয়া গেল। দুই বৎসর অতীত হইবার পর, হঠাৎ একদিন শৈলেন্দ্রনাথের একখানি পত্র আসিয়া দেবেন্দ্রনাথের হস্তে পড়িল। দ্রুতহস্তে দেবেন্দ্রনাথ পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন,—

দাদা! সংসার-কাননের হতভাগ্য-জীব আমি,—আমি সংসার-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, অদ্য দুই বৎসর অতীত হইল, কলিকাতায় আসিয়া বি, এ, পড়িতেছিলাম,—এবার বি, এ, পরীক্ষা দিলাম। বড় কষ্টে আমার

এই দীর্ঘ দুই বৎসর কাটিল। দুই তিনটী ছেলেকে গৃহে পড়াইয়া যাহা পাইলাম, বড় কষ্টে তাহার দ্বারা এই দুই বৎসর কাটিল। বড় দুঃখে আমার দুঃখপূর্ণ জীবনের দুই বৎসর কাটিলেও এখন আমি প্রকৃতই সুখী, কেন না, এখন আমি স্বাধীন—আর পর-প্রত্যাশী নহি। আর কি লিখিব, আমার জন্য চিন্তা করিবেন না,—আমি শারীরিক ভাল আছি। যে দিন নিজে উপার্জ্জন করিতে পারিব, সেই দিনই শ্রীচরণ দর্শন করিব। তৎপূর্ব্বে দেশে ফিরিতে আমার ইচ্ছা নাই,—আপনারাও অনুরোধ করিবেন না। মা ও বউঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইবেন এবং আপনিও জানিবেন। ইতি

আপনার স্নেহের—
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ।

শৈলেন্দ্রনাথের পত্র পাঠ করিয়া, দেবেন্দ্রনাথের চিন্তার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইল সত্য, কিন্তু ভিতরের রহস্য বড় একটা বুঝিতে পারিলেন না। অনেক চিন্তায়ও যখন পত্রের রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারিলেন না, তখন পত্নী কমলকুমারীর হাতে পত্রখানি দিয়া হাসিয়া কহিলেন,—"পণ্ডিত ম'শয়,—পত্রখানির ভাবোদ্ধার করিয়া দিন।"

স্বামীর হাত হইতে পত্রখানি লইয়া, কমলকুমারী বার বার পত্রখানি পাঠ করিলেন; তার পর আপনার তাম্বুল-রাগ-রক্ত-অধরে মধুরিমাময় হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"ইহারই নাম বিরহ,—ঠাকুরপোতে আর হেমপ্রভাতে বিচ্ছেদ ঘটেছে ?"

এবার দেবেন্দ্রনাথ হাসিয়া কহিলেন,—"এখন উপায় ?"

পূর্ব্বের মত হাসি হাসিয়া কমলকুমারী কহিলেন,—"উপায় আর কি ? উপায়—মিলন, যুগল মিলন।"

দেবেন্দ্রনাথ।—কিসে হয় ?

কমলকুমারী ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তার পর কহিলেন,—"উপায়। আচ্ছা, কয় দিন পরে বলিব।" এই বলিয়া, কমলকুমারী "ঠাকুরাণী ডাকিতেছেন,"—বলিয়া, চারিদিকে আপনার পূর্ণ-যৌবনের অতুল্য দেহ-কান্তি বিকীরণ করিয়া পায়ের মল চারিগাছী একটু বেশীমাত্রায় মি'ঠে তালে বাজাইতে বাজাইতে, গৃহান্তরে প্রবেশ করিয়া, নিভৃতে বসিয়া হেমপ্রভাকে একখানি পত্র লিখিলেন :—

প্রাণাধিকা শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী

চিরায়ুঃস্মতিষু।—

স্নেহের ভগ্নি! সতত আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।—

দীর্ঘকাল তোমায় দেখি নাই, অথবা তোমাদের কোনও সংবাদ পাই নাই,—এ জীবনে কোন দিন তোমার দেখা পাইব কি না বলিতে পারি না। আমি, বিবাহের পর স্বামী-গৃহে আসিয়া, সর্ব্বপ্রথম ঠাকুর-পোকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিয়াছিলাম, ঠাকুর-পো'র একটী চাঁদপানা বউ আনি না, দুই ভগ্নীতে মিলিয়া-মিশিয়া সুখে ঘর-সংসার করিব। কিন্তু, যদিও জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদে ঠাকুর-পো'র চাঁদপানা বউ হইল, তবুও আমার ভাগ্যদোষে, তাহাকে লইয়া আমার ঘর-সংসার করা ঘটিল না,—জীবনে সে আশা পূর্ণ হইবে কি না জানি না। আমার কপালে সে সুখ ঘটুক আর না ঘটুক, নিয়ত আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা দুইজনে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সুখে ঘর-সংসার কর,—ইহা ছাড়া আমি আর অন্য আশীর্ব্বাদ জানি না। আবার, ঠাকুরপো না কি কলিকাতায় গিয়াছেন;—কেন? ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, তিনি আর কলেজে পড়িবেন না; তবে আবার কি মনে করিয়া কলিকাতা গিয়াছেন? আমি তাঁহার কলিকাতার বাসার ঠিকানা জানি না; সুতরাং, আমি তাঁহাকে পত্র লিখিতে পারিলাম না। তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইবে যে, হঠাৎ তাঁহার কলিকাতা যাওয়া এবং দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ না করার দরুণ শাশুড়ী-ঠাকুরাণী বড়ই ব্যাকুলা হইয়াছেন। তোমাকে পত্র লিখিতে বলিলাম বলিয়া, আমার উপর রাগ করিও না; কেন না, হাল আইন অনুসারে বিবাহের পূর্ব্বেই এখন স্বামী-স্ত্রীতে পত্র লেখার রীতি নামিয়াছে; এবং শুনিতে পাই, ইহাই না কি বর্ত্তমান সভ্যতার লক্ষণ,—পোড়া কপাল আর কি! আর কি লিখিব,—ইচ্ছা হয়, একবার তোমার ঐ চাঁদমুখখানি দেখি; কিন্তু আশা পূর্ণ হইবার উপায় নাই। তবে অনুরোধ, যদি কখনও তোমার ঐ চাঁদমুখখানি দেখাও,—আশীর্ব্বাদ করি, তখন যেন তোমার ক্রোড়ে সোণারচাঁদ খোকাকে দেখিয়া হৃদয় শীতল করিতে পারি। সকলকে আমার প্রণাম জানাইবে এবং তুমি আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করিও না। ইতি

তোমার—কমল দিদি।

কমলকুমারী পত্র সমাপন করিয়া,—একবারমাত্র আপনার মনে পাঠ করিয়া, পত্রখানি পোষ্ট করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে রাজকুমারী হেমপ্রভা দুই বৎসর হইতে শৈলেন্দ্রনাথকে হারাইয়া, দিন দিন অনুতাপানলে পুড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এতদিন পরে শৈলেন্দ্রনাথের চিন্তায় দিনের পর দিন অমন স্বর্ণলতা অকালে শুষ্ক হইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রেম কি,—এতদিন তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন নাই; এখন শৈলেন্দ্রনাথের দীর্ঘ-বিচ্ছেদে, প্রেম যে কি বস্তু, তাহা বেশ করিয়া বুঝিতে পারিলেন। এতদিন অন্তরের অন্তস্তলে যে প্রেম গুপ্তভাবে ছিল, এখন অবসর পাইয়া সেই প্রেম তীব্র-দহনে হেমপ্রভার মরমে মরমে জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু, এখন আর উপায় নাই! একদিন যে অমূল্য-রত্নের অধিকারিণী হইয়া, আবার নিজের বুদ্ধির দোষে, এমন কি, ঘোরতর অপমান করিয়া যে রত্ন কণ্ঠচ্যুত করিয়াছিলেন,—এ জীবনে আর সেই অমূল্য-রত্ন উদ্ধারের আশা আর নাই। এখন সুধু, নিভৃতে বসিয়া বসিয়া, এই দীর্ঘ দুই বৎসরকাল রাত্রি দিন হেমপ্রভা কেবল শৈলেন্দ্রনাথের সেই দেবমূর্ত্তি ভাবিতে ছিলেন,—আর, ভাবিতে ছিলেন, সেই কালরাত্রির কালিমাময়ী ঘটনা, তার পর পিতা কর্ত্তৃক অপমান, তার পর জননীর নিকট বিদায়কালীন শৈলেন্দ্রনাথের হৃদয়োদ্ভেদি বিলাপ,—আর এই সকলের মূলই যে তিনি নিজে, এই সব ভাবিয়া ভাবিয়া দিনে দিনে হেমপ্রভা শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন। দিনের পর দিন যাইতেছিল, আর হেমপ্রভা ভাবিতেছিলেন,—"হায়, বুদ্ধির দোষে নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছি,—এখন উপায়হীন।" আর এতদিন পরে ধন-গর্ব্বান্ধ রাজা অন্নদাপ্রসাদও সব বুঝিলেন,—বুঝিয়া, আপনার মরমে আপনি মরিয়া গেলেন। হেমপ্রভা যখন এইরূপ দশায় পড়িয়া, বড় কষ্টে আপনার দুঃখ-পূর্ণ জীবনের এক একটী করিয়া দুঃখের দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন, ঠিক, সেই সময়ে কমলকুমারীর পত্র আসিয়া তাঁহার হাতে পড়িল। কমলের পত্র পড়িয়া, এতদিন পরে হেমপ্রভা কাঁদিয়া ফেলিলেন।—পাঠক! এতদিনে পাষাণ গলিয়াছে। পত্র পাঠ সমাপন করিয়া, হেমপ্রভা পত্র লিখিলেন:—

"দিদি! চির-হতভাগিনী দাসী হেমপ্রভার শত সহস্র প্রণাম জানিবে:—দীর্ঘকাল পরে, দিদি, তোমার স্নেহমাখা পত্র পড়িয়া, আজ একবার প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইলাম। কাঁদিলাম কেন,—শুনিবে কি? আমি রাজার মেয়ে,—রাজার মেয়ে বলিয়া এতদিন ধরাকে সরার মত দেখিতাম,—অর্থশালী ধনীর একমাত্র মেয়ে বলিয়া, অহঙ্কারে এতদিন মাটিতে পা' দিই নাই; আর বলিতে কি, সেই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই এতদিন তোমাদিগকে পত্র লিখি নাই। কিন্তু দিদি! এতদিন পরে দর্পহারী ভগবান, এ অভাগিনীর দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। আমার জীবনের যত কিছু আশা ভরসা ছিল, জন্মশোধ সে সবে ছাই পড়িয়া গিয়াছে। আশা ভরসা গিয়াছে সত্য, সুধু দুঃখের বোঝা বহিবার জন্য—সুধু জীবনমাত্র আছে; এ জীবন যাইবে না,—দুঃখীর জীবন বড় সহজে যায় না। আমি আমার নিজের বুদ্ধির দোষে নিজের মস্তকে নিজেই বজ্রাঘাত করিয়াছি, আর এতদিন পরে সেই বজ্রাঘাতের অসহ্য জ্বালায় দিবানিশি দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি। বলিতে কি, একমাত্র আমারই অহঙ্কারের ফলে, আজ দুই বৎসর হইল, তোমার দেবর দেশত্যাগী হইয়াছেন। আমি এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ জানি না,—জীবনে জানিতে পারিব কি না সন্দেহ। আমি তোমাকে কত লিখিব ভাবিয়াছিলাম; কিন্তু পারিলাম না,—অশ্রু আসিয়া আমার দৃষ্টিশক্তি রোধ করিয়াছে। তুমি সতত এ হতভাগিনীকে আশীর্ব্বাদ করিও, আমি যেন শীঘ্র মরি; মরিতে পারিতেছি না, মনে হয়, মরিলে হৃদয়ের এ অসহ্য যাতনার লাঘব হইবে। আর আশীর্ব্বাদ করিও, এবার মরিয়া যেন ভিখারীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, আবার তোমার স্নেহ-প্রতিম ভগ্নী হইয়া একত্রে ঘর-সংসার করিয়া, তোমার এ জন্মের সাধ পূর্ণ করিতে পারি। তুমি এ অভাগিনীকে পত্র লিখিতে ভুলিও না। এখন তোমার স্নেহমাখা সুধা-পরিপূর্ণ পত্র পাইলেও আমার হৃদয়ের শত যাতনার লাঘব হইবে। আর কি লিখিব,—সকলকে এ হতভাগিনীর প্রণাম জানাইও, এবং তুমি নিজেও আমার প্রণাম গ্রহণ করিও। এ অবস্থায় তোমার ঐ চরণ দুইখানি দেখিতে পাইলেও হৃদয়-যাতনার কতকটা লাঘব করিতাম, এ আশা কি পূর্ণ হইবে না?

তোমার হতভাগিনী ভগ্নী—শ্রীমতী হেমপ্রভা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীউমেশচন্দ্র মৈত্রেয়।

তরঙ্গিণী।

দিন নাই, রাত্রি নাই, অস্ফুট-রবে কুল্‌কুল-শব্দে মধুর বাঁশরী বাজাইয়া মধুর লহরী ঢালিয়া পর্ব্বত-দুহিতা তরঙ্গিণী কোথায় চলিয়াছে কে জানে? পাহাড়ের মেয়ে বড় কুশ্রী, বড় কঠোরা, বড় নির্দ্দয়া। তরঙ্গিণী সুরূপা কামিনী, মধুর-ভাষিণী, সদয়া, কোমল-হৃদয়া। দেখ, আধফুটস্বরে, আকুল বিলাপে পথ-বিরোধী রাক্ষসের পাষাণ চরণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে!! আর কাঁদিয়া বলিতেছে, কে তুমি সম্মুখে অবলার প্রেমপথে? সর সর, আমায় বাধা দিও না, আমায় ধরিয়া রাখিও না, যেখানে যাইব বলিয়া এ কঠিন পাষাণময়, দুর্ভেদ্য মঙ্গলময়পথে পদচারণা করিয়াছি, যে প্রকারে হউক, সেখানে আমার যাইতেই হইবে। কোমল বুকের ভিতর এত দৃঢ়তা আর কোথাও দেখিয়াছ কি? আমায় বাধা দিও না—বাধা দিও না। এই বলিয়া ধীরে ধীরে অচলার বক্ষ ছাড়াইয়া শান্তিময়ী তরঙ্গিণী পাষাণে আগুন জ্বালিয়া আবার সেই প্রেমসঙ্গীত গাইতে গাইতে কাহার উদ্দেশে কোথায় চলিয়াছে? এ প্রেমহার কাহার গলায় পরাইবে? এই বিশাল বিশ্বের নির্জ্জন নিভৃত কাননে কুসুমের সুবাসের সহিত কাহার মধুমাখা শান্তিপূর্ণ মুখখানি তাহার মনে জাগিয়াছে? কে জানে, কাহার হাসিটী, দু-ফোঁটা চখের জল সাথে লয়ে তাহার চখের উপর ভাসিতেছে? এ শান্তিময় গভীর বিজনে, সুদূর পর্ব্বতের আড়ালে লুকাইয়া উদাসিনী আপন মনে কি গান গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে পর্ব্বত-গুহায় নামিয়া আসিতেছে? যৌবনে সন্ন্যাসিনী বড় সুন্দর! চল পথিক চল, একবার ঐ প্রেমময়ীর প্রেমমাখা, মুখখানা দেখিয়া ওর প্রাণভরা উদাস-প্রেমের বিরহ গানটী শুনিয়া আসি। চল, শুনিয়া আসি, ঐ মধুর বাঁশী কি বলে। যে প্রেমের দায়ে যোগী সাজে—

"(আমি) আর কারে ভাল বাসিব না,
তারে ভালবেসে পাচ্চি যাতনা।"

ঐ যা, আপনি আর শুনিতে পাইলেন না। আপনার ব্যস্ততা দেখিয়া তরঙ্গিণী লজ্জায় মুখ লুকাইল।

মুগ্ধ মধুপের মত গান গাহিতে গাহিতে আপন মনে একাগ্রচিত্তে তরঙ্গিণী বন্ধুর শিলাভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। অসীম সুনীল-সুন্দর-সাগরে প্রাণের সাধ মিটাইতে, প্রাণে প্রাণে মিশাইতে, মুমূর্ষু প্রাণে সাগরের চরণতলে আছাড়িয়া পড়িল। তবুও তার আকুল বিলাপ কেন ঘুচিল না?

শ্রান্তপদে, ক্লান্ত-কলেবরে, আকুল-নয়নে, বিষাদ-প্রাণে আবার সে কিসের গান তুলিয়াছে ?

"না জেনে না শুনে কেন, দিয়েছি তোমারে মন।
তাই বুঝি করছে নাথ দিবানিশি জ্বালাতন॥"

এত করিয়া এমন লোকের স্থানে তাহার আশা মিটিল কৈ ? হায় ! জগতে এমন কতজন দুর্ভাগ্য হতভাগিনী আছে, যাহারা নিরাশ হইয়া প্রাণের আশা ভরসা জলাঞ্জলি দিয়া জীবনে সমাধি লাভ করিয়াছে, একবার গণিয়া লই। চল পথিক চল, সন্ন্যাসিনী আবার কি গায় শুনিয়া আসি।

শৈশবে যে যখন মায়ের কোলে শুইয়া মধুর হাসি হাসিয়া হেলিয়া দুলিয়া খেলা করে, আপন মনে দিবানিশি গান করে, তখন কে জানে, তাহার অদৃষ্টে কি হইবে ?

"দুই করে চাপি যবে দগধ-হৃদয়
সংসার মরুতে ছুটে দেখিবে আঁধার ;
তখন পড়িবে মনে সংসার আশ্রয়,
তখন চাহিবে তুমি ফিরিতে আবার।"

লোকে যখন যৌবনারম্ভে প্রাণের বেগে কত পর্ব্বত শিখর, নির্জ্জন অরণ্য, শত সহস্র বাধা অতিক্রম করিয়া শ্রান্ত-ক্লান্তপদে মহাজলধির চরণতলে আসিয়া পড়ে এবং ভাবে, অসীম সাগরের সঙ্গে ক্ষুদ্র জলবিন্দু মিশাইয়া দুই য়ে এক হইয়া যাইবে, প্রাণের বাসনা, প্রেমের সাধ মিটাইবে এবং চিন্তা করে, আর আমি রহিব না ; প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া, দুইয়ে এক হইয়া জীবনের স্বতন্ত্রতা ঘুচাইব। কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে কই ? সকলের প্রাণের তৃষ্ণা মিটে কৈ ? সকলের আশা পূরে কৈ ? সকলে মনের মত মানুষ পায় কৈ ? তাহারা ভাবে, যাহার আশ্রয় পাইলে চিরদিন হাসিয়া খেলিয়া প্রেমের তরঙ্গ তুলিয়া নিরাপদে ক্ষুদ্র জীবন কাটাইয়া যাইব, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটে কৈ ? অসীম জলধি অপনাতে আপনি মত্ত, গভীর গর্জ্জনে ভীষণ তরঙ্গ তুলিয়া আপন মনে কোথায় চলিয়া যায়, কে জানে ? তাহাদের প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহে না। তাহারা কি করিবে ? চরণে পড়িয়া কুলকুলরবে আকুল বিলাপে রোদন করে, কিন্তু তাহাদের আকুল বিলাপ কে শুনে ? যে, প্রাণের বেগে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত ভেদ করিয়া অসীম সাগরজলে প্রাণ ঢালিয়া দিতে আসিয়াছে, দেখিতেছি, সে পাষাণ হইতেও কঠোরতর। নচেৎ সে কেন ফিরিয়া চাহে না, কেন তাহাদিগকে ডাকিয়া

লয় না। তাহারা অভিমানে নির্জ্জনে নীরবে চরণতলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করে, সতত মনের ব্যথা মরমে লুকাইয়া তাহাদের সাথে হাসে, তাহাদের সাথে কাঁদে, নিজের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া তাহাদের ধ্যান করে। নিতান্ত যাহার জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া অকূলে ঝাঁপ দিয়াছে, সে যদি ভুলিয়াও তাহার পানে না চাহিল, তাহার চক্ষের জল না মুছাইল, তবে তাহার এ জীবনে সুখ কি ? তবে কি ক্ষুদ্রপ্রাণে মহাপ্রাণে মিলন হয় না ? যুবাতে শিশুতে ভালবাসা হয় না ? মহানের সহিত মহানের মিলন, সাগরের সহিত তটিনীর মিলন ! তবে বল দেখি, দুঃখিনী তরঙ্গিণীর গতি কি হবে ? ঝটিকা উঠিয়া একেবারে তাহাদিগকে অস্থির করিয়া তুলে, সহস্রধারে অশ্রু ঝরিতে থাকে ! তখন প্রাণের বেগে পাগলিনী হইয়া সাগরে ঝাঁপ দিয়া জীবনের সকল সাধ, সকল জ্বালা মিটাইতে চায়—কিন্তু কোথা যাবে ?

"এই স্বপনের দেখা, এই স্বপনের কথা,
এখনি ফুরাবে।
অনন্ত আঁধারাকাশে, কক্ষভ্রষ্ট তারাটুকু,
এখনি লুকাবে॥"

তাহারা শিশুকালে যখন নিভৃত গুহায় মার কোলে লুকাইয়া থাকে, আপন মনে কত নাচে, কত খেলে, কত গান গাহে ; তখন তাহার মনে কতই আনন্দ থাকে ! মার বুকে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া জগতের কত বিষয় ব্যাপার দেখিয়াছে। মেঘের গর্জ্জনে, চপলার চমকে চমকিয়া মাকে বুকে জড়াইয়া ধরিত, অমনি নিশ্চিন্ত হইত। মার কোলের মত নিরাপদ স্থান শিশুর পক্ষে আর একটী নাই। ঈশ্বর, হে করুণাময় ! আমি যদি চিরকাল শিশু থাকিতাম, পূর্ণিমা রজনীতে পাখীরা আমার মাথার উপরে চারিধারে নাচিয়া নাচিয়া গান করিত, তখন সুমন্দ হিল্লোলে মধুর তানে শৈশব হৃদয় নাচিয়া উঠিত। বরষার আগমনে প্রাণের উল্লাসে কুল্‌কুল রবে আমিও হৃদয় খুলিয়া তান ধরিয়া কোথায় ভাসিয়া যাইতাম। সেই সব সুখের দিন আমার কোথায় ? পূর্ব্ব স্মৃতিগুলি শৈশব-স্বপনের মত ধীরে ধীরে মুছিয়া যাইতেছে। জগতের অবিচার, সমাজের অত্যাচার, প্রেমের পরিণাম দেখিয়া আবার কোন্ প্রাণে উজান ফিরিয়া যাইব ? যাইলে কি আবার তেমনটি পাইব ? যাহা ছিল, তাহা কি আর আছে ? ভগ্নহৃদয়ে ভগ্নদেহে অনাথাকে প্রতিবেশীগণ, আত্মীয়স্বজনগণ আবার কি সম্ভাষণ করিবে ?

"জুড়াইতে চাই
কোথায় জুড়াই।"

হতভাগ্যগণ এত সুদীর্ঘ পথ আসিয়াছে, আর যে ফিরিবার শক্তি নাই, এইখানে শুইয়া শুইয়া যাহার চরণে আশ্রয় লইয়াছ, তাহারই চরণে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া প্রেমব্রতের উদ্‌যাপন কর,—যথার্থ প্রেমিকের পরিচয় দাও।

"ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই তোমা বিনে জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, ভালবাসি বড় ভালবাসি।
তাই দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥"

জলধি, জলধি, অম্বুনাদী মহান বারিধি, জলরাশি বুকে লইয়া আনন্দে মাতিতে মাতিতে কোথায় চলিয়াছ? সখা হে, একবার ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে দেখ, হতভাগ্যগণের দুর্দ্দশা একবার অবলোকন কর।

সাগর হো হো করিয়া উঠিল, হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে জলরাশিকে বুকে তুলিয়া কোথায় চলিয়া গেল। অভাগিনী, অভিমানিনী আর কথাটী কহিল না। ধীরে ধীরে সাগরের পদপ্রান্তে, সেই সিকতাময় বেলাভূমে নীরবে, নিঃশব্দে, বায়ুবিচ্যুত লতিকার ন্যায় লুটাইয়া পড়িল; শয়নেও সে নয়ন সেই দূরগামী সাগরমুখে অনিমিষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। ধীরে ধীরে তাহার প্রাণবায়ু কোথায় চলিয়া গেল।

প্রেমের পরিণামই কি এইরূপ? গঙ্গা তীরবর্ত্তী বংশবাটী গ্রামে শ্রীধর কবিরত্ন জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি কথকতা ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী প্রেম অঙ্কের বিরহ গর্ভাঙ্ক অভিনয় করিতেছে।

"যাবত জীবন রবে কা'রে ভাল বাসিব না।
ভালবেসে এই হ'ল ভালবাসার এ লাঞ্ছনা॥
আমি ভালবাসি যারে, সে কভু ভাবে না মোরে,
তবে কেন তারি তরে, নিয়ত পাই এ যন্ত্রণা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব।
এ জগতে কেহ যেন কা'রে ভাল বাসে না॥"

যে প্রেমের পরিণাম এইরূপ, সে প্রেমের জন্য সকলে পাগল হয় কেন? কেন উহার জন্য লোকে এত যন্ত্রণা সহ্য করে? পাঠক বলিয়া দিবেন কি?

শ্রীফণিভূষণ মৈত্র।

দ্বাদশ বর্ষ সম্পূর্ণ।